পূর্ব বাংলার সমকালীন সেরা গল্প

রুহুল আমিন নিজামী
সম্পাদিত

ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাব্‌লিশার্স : ৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক
এম, মুস্তাফা
ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাব্লিশার্স
৬, হায়াৎ খান লেন
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
১৩৬২ আষাঢ়

দাম পাঁচ টাকা

প্রচ্ছদপট
মণীন্দ্র মিত্র

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ভারত প্রেস

মুদ্রাকর
শ্রীসন্তোষ কুমার ধর
ব্যবসা ও বানিজ্য প্রেস
৯/৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে

ভূমিকা

সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যের দু'জন কর্ণধার—তথা তন্ত্রধার একথা জোর গলায় জাহির করে বসেছেন যে, গত তিরিশ বছরের তামামি করতে বসলে দেখা যায়, বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ছাড়া আর কোনো সার্থক সৃষ্টি হয় নি।—এক কথায় তাঁরা তিরিশ বছরের সাহিত্যের তামামি করেছেন, আর সেই তামামিতে উপন্যাস-নাটক-কবিতা মায় প্রবন্ধ পর্যন্ত বাতিল করে দিয়েছেন।

উক্তিটি যদি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আসত, তাহলে গৌড়জনের মধুচক্রে এমনি করে ঢিল পড়ত না। কিন্তু এঁরা তন্ত্রধার—দু'জন না হন একজন তো বটেই। আর একজনও কম যান না। তিনিও সাহিত্যের অন্যতর ক্ষেত্রে দিকপাল। তাই মহা সোরগোল পড়ে গেছে। এ-কাগজে, সে-কাগজে তীব্র সমালোচনা বেরিয়েছে; আবার যাঁদের হাতে কাগজ-হাতিয়ার নেই—তাঁরা গুমরে মরছেন।

যাহোক উক্তিটি খতিয়ে দেখলে মালুম হয় তন্ত্রধার-সুলভ আপ্তবাক্যের চড়া মেজাজ এবং কড়া ঝাঁজ দুই-ই এতে বর্তমান। সবকিছু নস্যাৎ করবার ঝোঁকটাই এখানে আদৎ হয়ে উঠেছে। তবু এরই সঙ্গে যে সত্যের খাদ মেশানো নেই এমন নয়।

বাংলা সাহিত্যে গত তিরিশ বছরের গণ্ডীতে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পড়ে যান—আবার শৈলজানন্দ, মানিক, বিভূতি ভূষণ, তারাশঙ্কর, বনফুল প্রভৃতিও এরই সীমা-সরহদ্দের মধ্যে আবদ্ধ। তাই তন্ত্রধারদ্বয়ের কথাটিকে রকমফের করে বলা যায়—বাংলা সাহিত্যে তিরিশ বছরে উপন্যাস হয়েছে, ভ্রমণ কাহিনী হয়েছে, আত্মজীবনী হয়েছে—সবই হয়েছে। তবে ছোট গল্পের যেমন ফলাও চাষ হয়েছে, এমনটি আর কিছুই হয়নি। কবিতার ক্ষেত্রেও সেকথা খাটে, কিন্তু এখানে কথা-সাহিত্যই আমাদের উপজীব্য।

ছোট গল্প বাংলায় নতুন ব্যাপার নয়। বাংলার লোকায়ত সাহিত্য তার নজির। বাঙালী ছোট গল্পকে দিয়েছে রূপকথার আকার, সমাজ জীবনের সঙ্গে কল্পনার রং মিশিয়ে অ্যালকেমির জাদুতে জারিয়ে তাকে এনে পরিবেশন করেছে ঘরে ঘরে—ঠাকুমা, দিদিমা, নানীর মুখে মুখে। নিবু নিবু চেরাগ-জ্বলা গৃহকোণ

থেকে বিদ্যুৎ-ঝলা পরিবেশ অবধি তার সমান গতি। আবার সান্ধ্য আসর জমে উঠেছে বারোয়ারি তলায়, মুসাফিরখানায়—পথে-ঘাটে। একই ঠাঁইয়ে বসে শুনেছে মানুষ তার প্রাণের কথা—পুরাণকথা, উপকথা, রূপকথা।

আর সবার উপরে টেক্কা মেরেছেন বাংলার পল্লী কবিরা। পথে-ঘাটে ছড়িয়ে দিয়েছেন কেনারাম, চন্দ্রাবতী, মানিকতারা, দুলাল-মদিনার গল্প গানে গানে। দ্বিজবংশী দেওয়ান ভাবনা, আমির, আলাওল প্রভৃতি পল্লী কবির দল এঁরা। এঁদের কারো বা নাম হারিয়ে গেছে, কারো বা নাম আছে কথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধদের মগজে; কিন্তু পদ অমর হয়ে আছে, অমর হয়ে আছে কাহিনী। এই লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে গচ্ছিত করে দীনেশচন্দ্র সেন ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ স্মরণীয় হয়ে-আছেন বাংলা সাহিত্যে। বীরবলের কথায় এগুলি লোকায়ত পাঠ্যপুস্তক—টেক্সটবুক। শুধু টেক্সটবুকই নয়, আনন্দের সামগ্রী। বাঙালী যে ছোট গল্পের প্রধান কর্তা ও ভোক্তা তারই পাকা দলিল।

বাংলা ছোট গল্প—তথা সাহিত্যের সঙ্গে নবজাগৃতি বা রেনেসাঁর নাম এক নিঃশ্বাসে স্মরণীয়। সেদিন বাংলা সাহিত্যের সড়ক বাঁধা হয়েছিল। রমন্যাস, নবন্যাসের প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল। ট্র্যাডিশনকে বজায় রেখে তার উপরে বিদেশী কাঠামো খাড়া করে দিয়েছিলেন সাহিত্যের কারুকৃতের দল। বঙ্কিমচন্দ্র এ দলের অগ্রণী। গল্প যে শুধু ইংরেজ স্কট—থ্যাকারেই বলতে পারেন তা নয়, বাঙালীও পারেন—আর তার প্রমাণ তিনি দাখিলও করলেন। আবার ঐতিহাসিক থেকে সামাজিক সমস্যা এসেও দেখা দিলো। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসই লিখলেন—ছোট গল্প নয়, (অবশ্য 'যুগলাঙ্গুরীয়,' ও 'রাধারাণী' আছে বটে; কিন্তু সেগুলি গল্প হলেও মাপে ছোট নয়, বড়। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ঐতিহাসিক অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতে—ছোট গল্পের জন্মদাতা ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ভূদেব ব্রতী হলেও এ শিরোপা তিনি পাননি। পারিবারিক ও সামাজিক প্রবন্ধের দিগন্তেই তিনি অস্ত-গেছেন।

সাগরের পারে তখন বোকাচিয়ো থেকে অনেক বেশী এগিয়ে গেছে ছোট গল্প। একজন তুর্গেনিয়েভের হাতে সে তখন একটি ছবি—একটি আদরা হয়ে দেখা দিচ্ছে—আবার একটি গদ্য কবিতার রূপ নিচ্ছে। আবার একজন শেখভ, তাঁকে নিয়ে মানব মনের নানা দিকের সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন। একজন মোপাসাঁ তাঁকে মধ্যবিত্ত আর চাষী স্তরে নিয়ে গেছেন—ফুটিয়ে

তুলছেন নরম্যাণ্ডির জীবনের নৈতিক অন্ধতা। কিন্তু বাংলা সাহিত্য তখনো ছোট গল্পকে রূপকথার আসন থেকে সমাজ জীবনের স্তরে এনে ফেলতে পারেনি। তাই 'কালা ইংরাজ' এদেশী মানুষের দল বিদেশী সাহিত্যেই মশগুল হয়ে রইলেন। এদিকে জনগণের মন 'কিস্‌সা' নিয়েই সন্তুষ্ট রইল।

এরই মধ্যে বাংলা সাহিত্যে অঘটন ঘটে গেল। শেকভ তুর্গেনিয়েফের দল যা করেছেন রুশ সাহিত্যে, গল্পের বাদশাহ মোপাসাঁ যা করেছেন ফরাসী সাহিত্যে—বাংলা সাহিত্যে একক রবীন্দ্রনাথ তাই-ই করলেন। তাঁর হাতে ছোট গল্প যেন এক বিচিত্র রূপ নিয়ে দেখা দিলো। এযে রস টসটসে আনার। উপরের রূপটিও মনোরম, আর আধেয় তো রসে টৈটুম্বুর। দেশের গ্রাম, নদী পথঘাট ফুটে উঠল তাঁর গল্পে—আবার দেশের মানুষের মনের ব্যথা, আনন্দ, সুখদুঃখও রূপ পেল। তবু সেদিনকার এক এডিটর উক্তি করলেন, গল্প ভাল কিন্তু পাঠক কি বুঝবে (আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ দ্রষ্টব্য)? রবীন্দ্রনাথ জানতেন, বুঝবে, বেশি করেই বুঝবে। আর হ'লও তাই। ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথ বাংলার হৃদয় জিনে নিলেন। তাঁর কাব্য তবু রবি আনা বলে একদল উড়িয়ে দিতে গিয়েছিলেন, উপন্যাসে সনাতনীরা খড়গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন—কিন্তু ছোট গল্প সবাই সাদরে বরণ করে নিলেন। ঐতিহ্য যাকে নিজের কোটরে বন্দী করে রেখেছিল, তাকে মুক্ত করে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে নতুন নতুন আঙ্গিকে চলল দেশের আত্মার রূপায়ণ। সমাজ সমস্যাও বাদ পড়ল না। এমনি করেই রবীন্দ্রনাথ ছোট গল্প উপহার দিয়ে গেলেন বাংলাকে—তথা সারা দেশকে—সারা পৃথিবীকে।

আর তারই ধারায় এলেন নারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রভাতকুমার, বীরবল শরৎচন্দ্র, এস ওয়াজেদ আলী, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র, বনফুল, মানিক, তারাশঙ্কর, প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ ফরাসী চালে বাংলার কথা, বাঙালীর কথা বলেছিলেন কিনা জানা নেই—কিন্তু চাল যা-ই-ই থাক—সে চালে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হ'ল—এবং আজও হচ্ছে। আর পূর্বোক্ত তন্ত্রধারদ্বয়ের মতামতের শান পাথরখানিরও এইখানেই হদিস মিলছে।

বঙ্গ হলেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গ দূর অসৃত্। সমতট, হরিখেল আর কর্ণসুবর্ণে মনের তফাৎ না থাকুক দূরত্বের ফারাকটা ছিল।

পরের আমলে জাহাঙ্গীরনগর আর মুর্শিদাবাদের মন জোট বাঁধলেও, মাইল নিশানার ব্যবধান দূর হয় নি। এমন কি রেলপথের আগমনেও সে দূরত্ব পুরোপুরি ঘোচেনি। কেননা, পূর্ববঙ্গের এমন জায়গা এখনো আছে, যেখানে রেল-সড়কের দাগ পড়েনি। তাই নবজাগৃতি এল কলকাতায় গঙ্গার পারে প্রথম। তাই সে কলকাতা, তথা পশ্চিমবঙ্গ-কেন্দ্রিক হয়ে রইল। নদী পাড়ি দিয়ে সুন্দরবন পেরিয়ে যেতে তার সময়ও লাগল ঢের। এর মধ্যে দু-একজন নবজাগৃতির তীর্থক্ষেত্র কলকাতায় এসে তার বিভূতির একটু ছিটে-ফোঁটা পেলেন। নবীনচন্দ্রের নাম এদিকে করা যায়। আবার পদ্মার পাড়ে তাকে আমদানী করার চেষ্টাও যে না হ'ল তা নয়, কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'বান্ধবে' তার পরিচয় রয়ে গেছে। কিন্তু নবজাগৃতির পালা তেমন জমল না। ট্র্যাডিশনের পলিমাটিতে যেখানে ফনফনিয়ে বেড়ে উঠতে পারত নবজাগৃতির নতুন ফসল, সৃষ্টি হোত নতুন গণসাহিত্য—সেখানে মাটি বন্ধ্যা না হোক, ফসল সম্ভারে ভরে উঠতে পারল না। তবু মীর মোশাররফ হোসেন* 'বিষাদসিন্ধুতে' এক মহা নাটকের বর্ণনা করলেন। সমকালীন বাস্তবতার ছাপ পড়ল তাঁর নাটকগুলিতে, কিন্তু সেগুলি অবহেলিত হয়েই রইল। কালীপ্রসন্ন, অশ্বিনী কুমার প্রবন্ধ সাহিত্যে অগ্রসর হয়ে গেলেন ; ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাস লিখলেন স্বভাব কাব্য। কিন্তু ছোট গল্পের চাষ পদ্মা-মেঘনা-আড়িয়ালখাঁ-কর্ণফুলীর মাটিতে ফলাও হয়ে উঠল না। এর কারণও ছিল। আর সে কারণ পূর্ববাংলার ঐতিহ্য, তার সংস্কৃতি। সংস্কৃত ফারসির মিলনে এর বনিয়াদ, তাই এই সংস্কৃতির শরিক একা হিন্দু নন ; আবার একা মুসলমানও নন—হিন্দু-মুসলমান দুজনেই এঁর ওয়ারিশ। হিন্দুরা তখন সর্বত্র নবজাগৃতির ভগীরথ—কিন্তু মুসলমানেরা সাড়া দিচ্ছেন না। তাঁরা বিদেশী রেনেসাঁকে বর্জন করে নিজেদের পুরাতন সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে রইলেন। নবাবী আমলের সূর্যাস্তের সোনাটুকুই তাঁদের কাছে সত্য হয়ে রইল। দেশের সর্বত্র এ সত্য প্রকট হয়ে উঠল—পদ্মা, মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ, কর্ণফুলীর পাড়ে দেখা দিল আরো চরম হয়ে। একে তো নবজাগৃতির প্রভাব হিন্দুদের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়তে তেমন

---

* মীর মোশারফ হোসেন কুষ্টিয়ার অধিবাসী। কুষ্টিয়া এককালে পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত হলেও এর বহু মহকুমায় পূর্ববঙ্গের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। আর মীর মোশাররফ হোসেনের কর্মস্থান ছিল পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলায়। তাই তাঁকে পূর্ববঙ্গের ঐতিহ্যের শরিক বলেই ধরা হ'ল।

করে পারল না, তার উপরে ফর্‌রাজি আন্দোলনের জিগিরে মুসলমানগণ কর্তৃকও বর্জিত হ'ল। রাজা রামমোহন, স্যার সৈয়দ আহ্‌মদের তিরিশ বছর আগে নবজাগৃতির প্রাণ বন্যা এদেশে বইয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই তিরিশ বছর পদ্মার পারে তিনশো বছরের ফারাক হয়ে রইল। এর উপরে বাদ সাধল নতুন গদ্য ভাষা। এতো পয়ার, ত্রিপদী, লাচারী নয়, এযে শানিত, সবল ভাষা। তাই পদে পদে 'বাঙাল' বাঙালীরা হোঁচট খেতে লাগলেন। তবু এই ভাষায়ই মুন্সিয়ানা দেখালেন মীর মোশাররফ হোসেন, কালীপ্রসন্ন, অশ্বিনী কুমারের দল।

বাংলা সাহিত্যের সে যুগ শীঘ্রই গত হ'ল। রেল-ষ্টীমার নদীর বুকে মিলনের সাঁকো বাঁধল। নয়া সংস্কৃতির কেন্দ্র কলকাতা তখন আর দুর নয়—একেবারে ঘরের কোলে। উভয় বঙ্গই নয়া বাংলা ভাষাকে রপ্ত করে নিল। তাতে দু'বঙ্গই শব্দের যোগান দিলে। বাংলা ভাষা একা পশ্চিম বা পূর্ববঙ্গের নয়, সমগ্র বঙ্গের ভাষা। এরই মধ্যে পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিক দলেরও উদয় হ'ল। এঁরা পূর্ববঙ্গের হ'লেও সমগ্র বঙ্গের রূপকেই ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন। পূর্ববঙ্গের রূপও ফুটে উঠল। নাজিবুর রহমান 'আনোয়ারায়' তার পথপ্রদর্শক। পরে এ পথে এলেন প্রতিভাধর শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং আরো অনেকেই। পূর্ববঙ্গ যে সাহিত্যেই পশ্চিম বঙ্গেই দোসর, তার নজির হিসেবে পূর্ববঙ্গ থেকে বেরুল প্রাচী, প্রগতি, পূরবী, পাঞ্চজন্য, পূর্বাশা প্রভৃতি মাসিকপত্র। উভয় বাংলার মিলনের সেতু এমনি করেই মাসিকপত্রের মারফতে তৈরি হ'ল। এর উপরে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের পূর্ববঙ্গ সফরে সে মিলন আরো দানা বাঁধল। সীমানার অবরোধ এমনি করেই ভেঙে গেল।

মুসলিম সমাজ থেকেও অভ্যুদয় হলেন শক্তিশালী শিল্পীর দল। মোজাম্মেল হক, কাজী ইমাদুল হক, মওলানা আক্রাম খাঁ, ডক্টর শহীদুল্লাহ, কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ—মননশীল প্রবন্ধে জীবনীতে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেন। কাব্যে নজরুল ইসলাম এনে দিলেন এক নতুন বলিষ্ঠ সুর, জসীম উদ্দীন, বন্দেআলী নকসী কাঁথার্ মাঠ আর ময়নামতির চরকে ছন্দোবন্ধে গেঁথে দিলেন বাংলা সাহিত্যের গলায়। আবার গল্পে উপন্যাসে নজিবুর রহমান, মোতাহের হোসেন, আবুল ফজল, মাহবুব আলম, আবুল মনসুর আহমদ, নাজিরুল ইসলাম, মঈনুদ্দীন, এক্রামুদ্দীন, আবু জাফর, শামসুদ্দীন, প্রভৃতিরা নিজের সমাজের কথা এনে পেশ করলেন

সাহিত্যের দরবারে। নতুনের দলও এসে বসলেন আসর জাঁকিয়ে। এঁরা সবাই শক্তিশালী। এঁরা সৈয়দ মুজতবা আলী, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, গোলাম কুদ্দুস, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ওবায়েদুল হক আরও অনেকে। তাঁদের গঠন ও উপকরণে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হ'ল গল্পে-উপন্যাসে।

এরই মধ্যে বাংলা ভাগ হয়ে গেল। শুধু ভাগ নয়, দুই বঙ্গ দুটি নয়া রাষ্ট্রের ভাগে পড়ল। তাই দুই বঙ্গের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে অদল-বদলও হয়ে গেল যথেষ্ট। অখণ্ড বাংলার বহু মুসলিম লেখক পূর্ববাংলায় চলে এলেন। আগেও গল্পে উপন্যাসে তাঁদের উপজীব্য ছিল পূর্ববঙ্গ—কিন্তু এ পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তার যে আসমান-জমিন ফারাক। আশে-পাশের মানুষও যেন এক লহমায় বদলে গেছে। নয়া রাষ্ট্র, নয়া চেতনা। সাধারণ মানুষ—রাজনীতিক মানুষে পরিণত না হোক ডাল ভাতেও আমদানী হয়েছে রাজনীতি। জীবনে ডটপাখী বৃত্তি তো অচল। জীবনে নয়া জমানার জন্যে লড়াই শুরু না হোক নয়া জামানার কথা ভাববার দিনও অন্তত এসেছে। তাই এই আবিষ্কারে তাক লেগে গেল। শিল্পীরা খুঁজতে লাগলেন পূর্ববঙ্গের সমাজ জীবনের চাবিকাঠি। একেবারে নাড়ির সন্ধানটি যে চাই। ঢুঁড়ে বেড়ানো শুরু হ'ল। আবার নতুনের দলও এগিয়ে এলেন। এঁরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এলেন, নিচুতলার শরিকদের সুখ দুঃখের ভাগীদার—দাবিদার হয়ে গাইলেন, তাদের পাঁচালী। আবার জান দিয়ে বাংলা ভাষা—তথা সাহিত্যের মান বাঁচাতেও আগুয়ান্ হয়ে গেলেন। এই নতুনের দলেই আছেন মুনীর চৌধুরী, আলাউদ্দীন আল-আজাদ, বোরহান উদ্দীন, খান জাহাঙ্গীর, শহিদ সাহেব, আনিস চৌধুরী প্রভৃতি। আবার পূর্ববাংলার অধিবাসী হিন্দু শরিকও আছেন। যেমন—সুচরিত চৌধুরী ও গোপাল বিশ্বাস। মহিলারাও বাদ যায় নি। আছেন সাহেদা খানম আর রাবেয়া খাতুন এবং আরো অনেকে। এঁরা ক্ষেতখামার থেকে চাষীকে আমদানী করেছেন গল্পে—রেলবস্তি থেকে মজুরকে—আবার মাঝি-মাল্লার দলও এঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। নয়া মধ্যবিত্তের নখ গজিয়ে উঠেছে শাসন শোষণের যন্ত্র হিসাবে, তাদের পরিচয়ও এতে আছে। এমনি করে রিয়ালিজমের বনেদ গড়ছেন প্রবীণ আর নবীনের দল মিলে। গণমানসের আশা, আকাঙ্খা তাঁদের রচনায় ফুটে উঠেছে।

'পূর্ব বঙ্গের সমকালীন সেরা গল্প তারই পরিচয়। সার্থক পরিচয় কি না—সেটা রসিক পাঠক বিচার করবেন। তবে এখানে যাঁদের রচনা আছে তাঁরা

সবাই পূর্ববঙ্গে বসে লিখছেন পূর্ববঙ্গেরই কথা। তাঁদের পাশাপাশি :যারা আছে তাদেরই ল্যাজা-মুড়ো সুদ্ধ এনে পেশ করে বসেছেন সাহিত্যের দরবারে। আবার তাদের প্রাণের ধুকধুকানিটুকুও আমদানী করে বসেছেন। তাই এখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাদের ভাবনার স্বাক্ষর মিলবে। তারপর রসাস্বাদনে কোথায় বা বাড়তি-কমতি হ'ল সে বিচারের ভার তো পড়ুয়াদের, সম্পাদকের নয়।

প্রবীণদের মধ্যে আছেন উভয় বঙ্গের স্বীকৃতিনামা পাওয়া শিল্পী আবুল ফজল, মাহবুব আলম, নবীনদের মধ্যে আছেন শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আবুল কালাম সামশুদ্দীন, বুলবুল চৌধুরী প্রভৃতি।

আবার একেবারে নতুন দলে আছেন মুনীর চৌধুরী, আবু রুশদ, আনিস চৌধুরী, আলাউদ্দীন আল আজাদ, সর্দার জয়েন উদ্দীন, সিরাজুল ইসলাম, ফজহল লোহানী, শাহেদ আলী, আবদুল হাই এবং আরো অনেকে। এক কথায় যাঁর ভিতরেই সম্ভাবনা আছে, তিনিই নিজের স্বাধিকারে এখানে ঠাঁই করে নিয়েছেন। এরা কেউ বা গড়নে ওস্তাদ মিস্ত্রী, কেউ বা আনাড়ী না হোন শিক্ষানবীশ তো বটেই।—কিন্তু মালমশলার কোথাও ঘাটতি পড়েনি। সবাই পাশের মানুষকে দেখেছেন, আর সে দেখার সত্য সাহিত্যের সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে। তাই দেখা যায় প্রবীণ কথাশিল্পী আবুল ফজল মওলানাকে ঘাত প্রতিঘাতে মেহনতি মানুষের শামিল করে দিয়েছেন; মাহবুব আলম 'মোমেনের জবানবন্দী'র স্তর থেকে নেমে এসে কমল ঘরামি আর নবীনের মনের ব্যথাকে রূপ দিয়েছেন। শওকত ওসমান বেগবতী গোমতীর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন ফরাজ আলীর জীবন। সে নিরক্ষর হলেও ভাবুক। গোমতীর লাস্যময়ী রূপে সে মজেছে। আবার বুলবুল চৌধুরীকে দেখি, চোরা-বাজারীদের বস্ত্রহরণের আর এক পালার গায়েন হিসেবে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সামান্য তুলসী গাছকে কেন্দ্র করে নীচুতলার মানুষের মনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। আর আবু রুশদ এঁকেছেন আনকোরা মধ্যবিত্ত সমাজের ছবি। মুনীর চৌধুরী নেমে গেছেন দৈনন্দিন জীবনে। সেখান থেকে এক বেদনা-উচ্ছল কাহিনী এনে উপহার দিয়েছেন। আবুল কালাম সামশুদ্দীন একটি সড়ককে কেন্দ্র করে লিখেছেন নগণ্য গহুরালীর ব্যর্থ জীবন কাহিনী। তরুণ শাহেদ আলী জিব্রাইলের ডানায় শিশু মনের কত আশা-আকাঙ্খা ফুটিয়ে তুলেছেন। পুরাকাল আর বর্তমান একাকার হয়ে গেছে।

আলাউদ্দীন আল আজাদ কমলা লেবুর কোয়ায় কোয়ায় পুরে দিয়েছেন তরুণ মনের দরদ। মেহনতী জনগণের সেবার ভার যিনি নিয়েছেন, সেই ইলা মিত্রের সেবা হ'ল মেহন্নৎ দিয়ে পাওয়া কমলালেবুতে—ধার করা পয়সায় কেনা নয়। আবার আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠেছে গল্পে—এ ঝিলিক পূর্ববঙ্গের মনেরই আলোর। আবদুল হাই 'স্মাগলিং' নিয়ে কাহিনী গড়েছেন। তার সঙ্গে মাতৃত্বের মিশেল দিয়ে তাকে বেদনা উজ্জ্বল করে তুলেছেন। আতোয়ার রহমান গাঁয়ের পাঠশালার 'পন সাব'কে আমদানী করে বসেছেন। দরদী শিক্ষাব্রতীর ছবিটি কলমের আঁচড়ে ফুটে উঠেছে। শহীদ সাবের জেলখানায় রাজবন্দীর জীবনে খুঁজতে গেছেন তাঁর কাহিনী। রাজবন্দীদের রোজনামচা নয়, ফুটে উঠেছে গোটা পরিবারের একটি বেদনা-মধুর ছবি। শক্তিমান শিল্পী সুচরিত চৌধুরী তাঁর গল্প খুঁজে পেয়েছেন গ্রাম্য কবিয়ালের জীবনে। এ কবিয়াল তারাশঙ্করের কবিয়ালের স্বগোত্র, কিন্তু রুক্ষ লাল মাটির দেশ বীরভূমে আর নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গে যে তফাৎ এ গল্পেও সেই তফাৎই দেখা দিয়েছে। এ গল্পের তার আলাদা।

এমনি করে প্রবীণ আর নবীনের দল মিলে সারা পূর্ববঙ্গকে কলমের টানে-টোনে ফুটিয়ে তুলেছেন। নদী মাঠ পথঘাট গ্রাম শহর রঙে রেখায় জেগে উঠেছে, পূর্ববাংলার মানুষের আশা, ভরসা, সুখদুঃখ রূপ পেয়েছে। এক কথায় সবগুলি গল্প মিলে হয়ে উঠেছে পূর্ববঙ্গেরই পরিচয়। শিল্পীরা এই পরিচয় দিতে গিয়ে কোথাও বা রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন ; কোথাও বা বস্তুতান্ত্রিকতার ঝোঁকে রূপকে খর্ব করেছেন। কোথাও বা রূপের ঝোঁকে আসল জিনিসও গেছে হারিয়ে। তবু কেউই জাত খোয়ান নি। যেখানে যতটুকু টুটাফুটা আছে দরদের পলেস্তারায় তাকে ঢেকে দিয়েছেন। এই দরদ আছে বলেই গল্পে গল্পে সাহিত্যের নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। অন্নদাশঙ্কর যে গণসাহিত্যের সম্ভাবনার কথা বলেছেন, এ হয় তো তাঁরই আভাস।

ভূমিকাকারের কর্তব্য শেষ করে সম্পাদকের জবানীতেই বলি—সাহিত্য যুগেরই মূর্ত প্রকাশ। এই গল্পগুলি যদি পূর্ববাংলার সমকালকে ফুটিয়ে তুলতে পারে তাহলেই তার সার্থকতা, নচেৎ নয়।

আর একটাকথা। মারমুখো কোনো বোধ থেকেই বলছি না—বলছি বাঙালী হিসেবেই। পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গের সাহিত্যের প্রতি কিছুটা বা উদাসীন। এই উদাসীনতা এতে খানিকটা দূর হলে আমার প্রয়াস সার্থক বলেই মনে করব।

পরিশেষে বক্তব্য—গল্প সংকলনের কাজ এক দুরূহ ব্যাপার। এতে সম্পাদকেরও যেমন মন ওঠে না, তেমনি লেখকের না এবং পাঠকেরও না। এ সংকলনগ্রন্থ সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। বহু প্রবীণ ও নবীন লেখক নানা কারণে বাদ পড়ে গেছেন। আবার গল্প নির্বাচনেও হয় তো সুবিচার সর্বত্র হয় নি। কিছু কিছু গল্প অবশ্য লেখকরাই নির্বাচন করে দিয়েছেন। যাহোক এ ত্রুটি-বিচ্যুতির ভাগীদার সম্পাদক স্বয়ং—লেখকগণ নন। তাই আর একটি খণ্ড প্রকাশ করার ইচ্ছা নিয়েই বিদায় নিচ্ছি। কিন্তু বিদায় নেবার আগে যাঁরা এই গ্রন্থের প্রকাশনায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এঁরা অশোক গুহ, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইফ্‌তিখারুল আলম আলাউদ্দীন আল্ আজাদ ও তুলসীদাস। এঁদের সাহায্য ছাড়া এই সংকলনের দায় দায়িত্ব পালন আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠত।

কলিকাতা
১লা অষাঢ়,
১৩৬২

রুহুল আমিন নিজামী

জন্মান্তর

আবুল ফজল

ষোল বছরের মেয়েকেও ছাব্বিশ বছরের মতো দেখায় আবার ছাব্বিশ বছরের তেনাকেও ষোড়শী বলে ভ্রম হয়। অর্থাৎ মেয়েদের বয়সের কোন গাছ পাথর নেই। আসলে ষোলর পর মেয়েরা হয় দ্রুত বাড়ে না হয় থ হয়ে থাকে, বাড়েই না আদৌ। বিয়ের পর অবশ্য প্রায় মেয়ের দেহে ঘটে অঘটন—আঙুল ফুলে হয় কলাগাছ। বিয়ে যাদের হয়নি তাদের বয়স নিয়েই আধুনিকদের যত মাথা ব্যথা, আর প্রাচীনদের যত সব ধাঁধাঁ। যে মেয়ে দশ বছর ধরে মাষ্টারী করছে বয়স জিজ্ঞাসা করলে সেও উত্তর দেয় আঠারো, মেয়ের মা বা খালা-আম্মা সঙ্গে থাকলে অবশ্য সংশোধন করে যোগ করেন সতর বছর সাত মাস। এই নির্ভুল ঐতিহাসিক তথ্য আপনি যদি বিনা প্রতিবাদে হজম করতে পারেন তা হলে আপনাকে মনে মনে মানতেই হবে—এই অসাধারণ 'প্রতিভা' মাত্র আট বছর বয়সেই ম্যাট্রিক পাশ করেছেন।

এই গল্পের নায়ক হাফেজ মওলানা মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের অবশ্য এই নিয়ে দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই। কারণ তিনি আধুনিক নন্ প্রাচীনও তাঁকে বলা যায় না। উপরন্তু তিনি বিবাহিত এবং তাঁর স্ত্রীর বয়স তাঁর অর্ধেকের বেশী নয়। তবে আফসোস্ তাঁর স্ত্রীকে এখন দেখায় বয়সের চেয়ে অনেক বয়স্কা; একটি ছেলে হওয়ার পর, সত্য কথা বলতে কি ফরিদাকে দেখাতে লাগল ঠিক মওলানার খালা-আম্মার মতোই। এইটিই মওলানার বড় দুঃখ। এমন কি তার খালা-আম্মার স্বাস্থ্য এখনো ফরিদার চেয়ে অনেক ভাল তুলনা মনে জেগে উঠলে তাই খালা-আম্মার চেয়ে নানীর চেহারাই তাঁর বেশী করে মনে পড়ে। মনেই শুধু; মুখে কিন্তু তিনি ঘুণাক্ষরেও খালা-আম্মা

বা নানী শব্দ উচ্চারণ করেন না। কারণ ঐ দু'জনই তাঁর পক্ষে মুহরোমাৎ অর্থাৎ ওঁদের সঙ্গে বিয়ে হারাম। ফরিদার রঙ বেশ ফর্শা—একেবারে দুধের মতোই সাদা কিন্তু গাল দুখানি এরি-মধ্যে ভেঙ্গে চুপসে গেছে এবং তাতে রক্তের নেই কোন চিহ্ন। এবং দেখায় তা প্রায় সাদা কাগজের মতই। চোখ দু'টি কোটরগত—বুক প্রায় ছেলেদের মতোই সমতল। ছেলে হওয়ার আগে কিন্তু ফরিদা এমনটি ছিল না। সুপুট গোল গাল দু'টিতে তখন কথায় কথায় রঙের হোলিখেলা চলত। চঞ্চল চোখ দু'টিতে যে ভাবে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাতো, দেখে মগজে আস্ত কোরাণ মজিদ, মুখমণ্ডলে বিপুল চাপদাড়ী ও মুখাবয়বে ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য নিয়েও মোহাম্মদ হোসেন প্রায় নিম্-খুন হয়ে পড়তেন। চলতে ফিরতে ফরিদার সারা দেহে স্বাস্থ্য যেন উছলে পড়ত তখন। বিশেষ করে প্রতি পদক্ষেপে বুকের যে মৃদু নর্তন হ'ত তা দেখে হাফেজ সাহেবের বুকের রক্ত ঝড়ের দিনের পদ্মার মতই করে উঠত তোলপাড়। ভাল হেফজের জন্য তাঁর খুব সুনাম ছিল। তবুও বিয়ের পর প্রথম প্রথম খতম পড়তে তাঁর প্রায়ই হ'ত ভুল। বুড়া মোয়াজ্জিনকে প্রায় দিতে হ'ত লোকমা অর্থাৎ সংশোধনী। এখন ফরিদাকে আগের ফরিদার কঙ্কাল বললেই হয়।

আশ্চর্য, হাফেজ সাহেবের খতমে আজকাল আর ভুল হয় না আগের মত মোটেও। সারা রমজান মাস ব্যাপী রাতের পর রাত এখন তিনি এক দম নির্ভুলভাবেই আবৃত্তি করে যান সমস্ত কোরাণ শরীফ। খোশনাম তাঁর ছড়িয়ে পড়ে দেশের চারদিকে ভাল হাফেজ ও পরহেজ্গার বলে। তবে জোয়ান মুসল্লীরা কোন কোন দিন আপত্তির সুরে বলে বসে "হাফেজ সাহেব, আজকাল এত লম্বা মুনাজাত করেন কেন?"

হাফেজ সাহেব হেসে পাল্টা প্রশ্ন করেন "দেরি হলে বিবিরা রাগ করেন বুঝি?"

বুড়োদেরও কেউ কেউ এই আলাপে শরীফ হন "বিয়ের পর হাফেজ সাহেব মুনাজাত করতেন কিন্তু খুব মুখতসর। আমাদেরত দিলই ভরত না। মনে থেকে যেত আফসোস্।" ঠোঁটে কিন্তু এঁদেরও দেখা দেয় মৃদু হাসির বক্ররেখা।

জোয়ানরাও টিপ্পনি কাটতে ছাড়ে না "তখন ভাবী সাহেবা জোয়ান ছিলেন কিনা।" উত্তরে কিছুটা হতাশার সুরেই হাফেজ সাহেব বলে ওঠেন "এ্যা মুছা দিন নেহি রহেগা।"

হাফেজ সাহেবদের অবস্থা ভাল। তাঁদের ঘর খুব বনিয়াদি না হলেও বহুকালের সচ্ছল চাষী গৃহস্থ তাঁরা। বাবার আরজু ও খেয়াল বড় ছেলে মোহাম্মদ হোসেনকে হাফেজ ও আলেম বানাবেন। কোরাণ শরীফ হে'ফজের পর তাই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল হিন্দুস্তানে অর্থাৎ দেওবন্দ। বছর দুই সেখানে কাটিয়ে বস্তা বন্দী হয়ে তিনি একেবারে একচোটে হাফেজ মওলানা মোহাম্মদ হোসেন হয়েই ফিবে এলেন। বাবা বস্তারবন্ধী ছেলেকে দেখে বেশ খোশ তবিয়েতেই এন্তেকাল করলেন মোহাম্মদ হোসেন ফিরে আসার অল্পকালের মধ্যেই। গ্রামে একটি মাদ্রাসা দিয়ে তারই হেড মৌলবী হলেন তিনি স্বয়ং। পাড়ার মসজিদের ইমামতী ও রমজান মাসে খতম পড়া ত আছেই। ছোট ভাইরা কেউ লেখাপড়া শিখেনি তেমন। তাবা গৃহস্থালি ও হালচাষ করে সংসার চালায়। পিতা মারা যাওয়ার পরও তারা সব ভাই একান্নেই আছে। পরিবারের একজন আলেম ও হাফেজ হওয়ায় দেশে তাদের কদর ও ইজ্জৎ গেছে অনেক বেড়ে। হাফেজ সাহেবের ভাই বলে হাটে বাজারে অনেকে এখন তাদের সালাম পর্যন্ত করে। হাফেজের বিয়ের বেলায় এই কদরের প্রমাণ পাওয়া গেল হাতে হাতেই।—ফরিদা মুন্সী বাড়ীর মেয়ে। মুন্সীরা মান-সম্ভ্রম ও শরাফতীতে এদের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের আদমী। মুন্সী পরিবারের ছেলেরা অল্পবিস্তর সবাই কিছু না কিছু ইংরেজি পড়েছে ও পড়ে। ফরিদার বড় ভাই খাস মহাল আফিসের কেরানী। ছোট ভাই শহরে কলেজে পড়ে। কাজেই গ্রামে দেশে এরা কেউ কেটা নয়। ফরিদার অবশ্য কোরাণ শরীফের উপরে বাংলায় বাল্য শিক্ষার বেশী আর কিছু পড়ার সুযোগ ঘটেনি। বলাই বাহুল্য সমকক্ষ ঘর না হলেও একাধারে হাফেজ ও মওলানা বলেই ফরিদার সঙ্গে মোহাম্মদ হোসেনের বিয়ে সম্ভব হয়েছে।

অবশ্য কাবিনের শর্তে লেখা হয়েছে; 'ফরিদা ধান চালের কোন কাজ করবে না, ঢেকিশালেও সে যাবে না, গোয়াল ঘরেও ঢুকবে না কোনদিন।' অর্থাৎ চাষবাসের মত হীন কাজের সঙ্গে তার থাকবে না কোন সম্পর্ক।

নামজাদা পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ হবে এই খুশীতে এই পক্ষ থেকেও এই সব শর্তে কোন আপত্তিই উঠল না! আর মওলানা মোহাম্মদ হোসেন সাহেবত জানেন কোন আলেমের বিবিই এ সব কাজ নিজের হাতে করে না। পানটা নিজের হাতে বানালেই যথেষ্ট। মুন্সী বাড়ীর মেয়েদের হাতে পানের খ্যাতি আছে: বিয়ের আগে সেই খ্যাতি মোহাম্মদ হোসেন যতবারই শুনেছেন

ততবারই তাঁর জিভে লালা এসেছে। ওরকম মিহি সুপারী শহরের বড় বড় বনিয়াদি ঘরের মেয়েরাও নাকি কাটতে পারে না।

রমজান মাস। মসজিদ থেকে এসে মওলানা সাহেব দেখলেন বিবি ঘুমুচ্ছেন অঘোরে। কাগজের মত সাদা ফ্যাকাশে শীর্ণ মুখে এতটুকু লাবণ্যের চিহ্ন নেই। ছেলেকে দুধ দিতে দিতেই ফরিদা ঘুমিয়ে পড়েছে। দুধের একটি বাঁট এখনো ছেলের মুখেই নিবদ্ধ। চুপসে যাওয়া বেলুনের মত নুয়ে-পড়া স্তন। ইচ্ছা করলে বুকের সব হাড্ডিই গোনা যায়। দেখে মোহাম্মদ হোসেনের মনটা কিছুমাত্র উৎফুল্ল হ'ল না। আগে হলে হয়ত অন্যরকম কাণ্ড ঘটত—নামাজের কাপড় খানা বদলাবার তরও সইত না। তখন তাঁর...আজ কিন্তু চোখটা ফিরিয়ে নিয়ে তিনি শুধু সজোরে গলা খাঁকারিই দিলেন।

ফরিদা ধড়ফড় করে বসল। কাপড় চোপড় রইল তেমনি বিস্রস্ত। ছেলের মা হওয়ার আগে কিন্তু ফরিদা স্বামীকে দেখলেই ঘোম্‌টাটা মাথার উপর টেনে দিতো। আর মওলানা সাহেব হাতের তসবি ছড়াটা ছুঁড়ে ফেলে এই ঘোমটা নিয়েই শুরু করতেন ধ্বস্তা-ধ্বস্তি। এই ভাবেই হ'ত তখন ভূমিকা পত্তন।

আজ কিন্তু মওলানা বিরক্ত কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলেন, "নামাজ পড়েছো?"

ফরিদা কিছুটা থতমত খেয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বললে, "পড়েছি। এশাটাই শুধু পড়েছি আজ।" বলেই ঠোঁটে জোর করে হাসি ফুটিয়ে তুললে স্বামীর সহানুভূতির আশায়।

রুক্ষ কণ্ঠে জবাব এল, "তারাবী পড়নি কেন?" শরিয়তের ব্যাপারে স্বামীর কণ্ঠস্বর সব সময় রুক্ষ ও কঠোর। ফরিদার ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গেল মুহূর্তে।

"হঠাৎ খোকা কেঁদে উঠল কিনা। নমাজ ছেড়ে এসে মাই দিতে হ'ল। এখন কি অজু আর আছে?" বলে, ম্লান শুষ্ক ঠোঁটে আবার সে একটুখানি হাসি ফোটাবার ক্ষীণ চেষ্টা করলে। তার চাহনিতে কিন্তু ফুটে উঠল হাসির চেয়ে মিনতি-ই বেশী।

"যাও অজু করে তাড়াতাড়ি তারাবী পড়ে নাও।" স্বামী ঠোঁটে হাসির কোন আভাস ফুটল না বরং ভ্রূ হ'ল কিঞ্চিত কুঞ্চিৎ। মওলানা সাহেব জানেন, ভাল করেই জানেন। হাসি হচ্ছে শরিয়তের শক্ত দুশমন। এরকম প্রসঙ্গে তাঁর কোন ওস্তাদকেই তিনি হাসতে দেখেননি। ফরিদাকে অগত্যা উঠতে

হ'ল। না হয় স্বামী অন্য বিছানায় গিয়ে শোবেন—ছেহরীও খাবেন না তার হাতে। বে-নমাজীর চোহবৎ তিনি এড়িয়ে চলেন, খান না বে নমাজীর ছোঁয়া কোন জিনিস।

যাক্, দেওবন্ধ থেকে ফিরে আসার পর হাফেজ মওলানা মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের জীবন খুব নির্বিঘ্নে ও বেশ আরামেই কেটে যাচ্ছিল। হাফেজ সাহেব সুস্থ ও বলিষ্ঠ দৈহিকগঠন উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছেন। স্বাস্থ্যের শেকায়েৎ তাঁকে কোন দিন কবতে হয়নি। তদুপরি হাফেজ মৌলবীদের খাওয়া পরার ব্যাপারে কোন কষ্ট হয় না গ্রাম দেশে কোন কালেই। নিজের বাড়িতে যত না হোক, পরের বাড়িতে মোরগ-খাসীব ভালো গোস্তটা হামেশাই জোটে তাঁদের ভাগ্যে। বিশেষতঃ হাফেজ সাহেবের পরহেজগারীর খ্যাতি আছে আশে পাশের সব গ্রামেই। তাই যুদ্ধের আকাল দুর্ভিক্ষে আর যারই যা কিছুর অভাব ঘটুক হাফেজ সাহেবের খাওযা পবার কোন অভাব ঘটেনি। কাজেই সম্প্রতি বয়স চল্লিশ পার হলেও শরীরটা তাঁব বেশ পুরুষ্টু'ও তাজাই আছে এখনো। ফরিদার স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন উন্নতি না হলেও প্রায় বছর বছরই তার একটি করে সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে নিয়মিতই। সব যে বেঁচে আছে তা নয় তবে আসাটা থামেনি এখনো। প্রতিবার ছেলে বা মেয়ে হওয়ার সংবাদ পেলেই মওলানা কোরাণের যে আয়াতে নারীকে শস্য ক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তা আবৃত্তি করে খোদার শোকরানা আদায় করেন এবং যথাবিধি নিজেই আজান দিয়ে এই খোশ খবর পাড়াময় জানিয়ে দেন।

বিবির চেহ্তের কথা ভেবে প্রথম প্রথম তিনি খুব বিরক্ত বোধ করতেন বটে, এখন কিন্তু তাও সয়ে গেছে। আল্লার হুকুম ও তাঁর তক্দির বলে তাও এখন তিনি মেনে নিয়েছেন। জওয়ানী অবস্থায় বৌ বিবির ব্যাপারে সকলেরই একটু আধটু বাড়াবাড়ি থাকে বইকি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সবই মিইয়ে আসে আপনা থেকেই। রুগ্না স্ত্রীতেও তখন আর আপত্তি থাকে না। মনে হয় এই স্বাভাবিক, এই তকদিরের লেখা। কয়েক বছর আগেও বিবিকে, তখন ফরিদা মাত্র দু'টি সন্তানের মা, এখন ত ছ'টির; খোঁচা দিয়ে মওলানা সাহেব বলতেন, "তোমার সারা গায়ে শুধু হাড্ডি, হাড্ডি, হাড্ডির ধাক্কা খেয়ে খেয়ে আমার বুকটাও হাড্ডির মত শক্ত হয়ে গেল। পাশ বালিশ বুকে নিয়ে যতটুকু আরাম তোমাকে বুকে নিয়ে তার অর্ধেক আরামও পেলাম না জীবনে।"

বলেই কিন্তু জীর্ণ শীর্ণ ও হ্যাংলা বৌকে মওলানা একেবারে কোলের উপরই তুলে নেন্। তারপর দীর্ঘ ও ঘন দাড়ি দিয়ে তার ঘাড়ে গালে ও থুতনিতে সুড়সুড়ি দিয়ে এখানে ওখানে চুমু খেয়ে এলাহি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেন। স্বামীর কণ্ঠ-লগ্না ফরিদার ক্ষীণ দেহও তখন পুলক-রোমাঞ্চে কাঁপতে থাকে। আবেগে চোখ হু'টি আসে তার বুজে, পান রাঙা ঠোঁট হু'খানি অজ্ঞাতেই উত্তোলিত হয় স্বামীর মুখের দিকে। হাফেজ সাহেবের ঠোঁটে ফরিদা নিজ হাতেই পানের খিলি গুঁজে দিয়েছিল একটু আগেই। তাই তাঁরও ঠোঁট হু'খানি হয়েছে টক টকে লাল। চারিটি রক্ত-রাঙা ঠোঁটের মিলনে মওলানা বোধ করি বিবির স্বাস্থ্যহীনতা ও হাড্ডি সার দেহের কথা ভুলে যান মুহূর্তে।

এই সব অবশ্য এখন বাসি কথা। এই সব দিনের কথা স্মরণ করেই হয়ত মওলানা সেদিন বলেছিলেন "এ্যাছা দিন নেহি রহেগা।"

হঠাৎ পাড়ার লুলির মা গেল মারা। নিঃস্ব ভিখারিণী লুলির মার লুলি ছাড়া এ সংসারে আর দ্বিতীয় কেউ নেই। থাকলেও তারা আর এখন কোন সম্বন্ধই স্বীকার করে না। লুলির একখানি হাত আর একখানি পা নুলো। কোন একটা ভাল নাম তার থাকা বিচিত্র নয় কিন্তু তা ব্যবহার হয়নি কোনদিন, শোনা যায়নি কারো মুখে। মা থেকে পাড়ার মাতব্বরেরা পর্য্যন্ত সবাই তাকে ডাকে লুলি বলে। এই তার পরিচয় আশে পাশের সব গাঁও-গ্রামে নুলো বা' পা খানি টেনে টেনে সে কোন রকমে মায়ের পেছনে পেছনে যায় এপাড়া থেকে ও পাড়া। কোথাও কিছু উঁচু-নীচু বা গর্ত খন্দক পার হতে হলে মা-ই হাত ধরে করে দিত পার। এমনি করে ঘরে ঘরে ভিক্ষা করেই চল-ছিল তাদের মা মেয়ের জীবন। হাতও একটি নুলো বলে কাপড়টাও সে পরতে পারে না নিজের হাতে। মাকেই দিতে হ'ত পরিয়ে। অন্ধের যষ্টি সে মা-ই তার আজ গেছে মারা। লুলিরও বয়সের কোন গাছ পাথর নেই। কেউ মনে করে কুড়ি, কেউ মনে করে সতর-আঠারো। যারা জানে তারা বলে ত্রিশের কাছাকাছি। মুখখানি তার প্রায় বেটা ছেলের মতোই, তাতে পড়েনি বয়সের কোন রেখা-চিহ্ন। নেই তাতে কিছুমাত্র মেয়েলী লাবণ্য, সারা মুখমণ্ডলে জড়িয়ে আছে একটা মর্দানা-ভাব। ঈদে-পরবে মা কোনদিন তার মাথায় তেল ছোঁয়ালেও ছোঁয়াতে পারে, না হয় তার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত

উস্‌কুখুস্‌কু চুলে কোন তৈল-চিহ্নই যায় না দেখা। শতছিন্ন ময়লা এক খণ্ড বস্ত্র তার পরনে, তাতে কোনরকমে শুধু হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে। গলায় একখানা ছেঁড়া তেনা গেরো দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে—মা-ই দিয়েছে। মাঝে মাঝে অশান্ত বাতাস সেই বস্ত্রখণ্ড উড়িয়ে তাকে করে তোলে বিব্রত। কোন রকমে একহাতে সেই ছেঁড়া তেনাটাকে চেপে ধরে তাকে রক্ষা করতে হয় আব্রু। এখন সেই লুলি হ'ল মাতৃহারা এবং পড়ল অকুল পাথারে।

পাড়ার মড়া। মওলানা সাহেবকে বিনা খয়রাতেই আসতে হ'ল জানাজায়। জানাজা পড়ে মওলানা বাড়ী যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই লুলি টলতে টলতে পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এসে মওলানার দু'খানি পা'ই এক হাতে জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। বিলাপের সুরেই বলে চলল "আমার কি হবে, আমি কি করে থাক ?ব কে আমার ইজ্জৎ বাঁচাবে ? কেমন করে ইজ্জৎ নিয়ে মরবো ? ইত্যাদি ইত্যাদি।"

পড়শীরা ধমক দিয়ে বলে "ইজ্জৎ চুলোয় যাক্। পেট চলবে কি করে আগে তাই ভাব।"

বুড়া হামজার বাপ বললে "ভিক্ষা করে কিছু আনলেও রেঁধে দিবে কে, বেড়ে দিবে কে ? কাপড়টা পরিয়ে বা বদলে দিবেই বা কে ?"

সব ক'টাই সঙ্গত ও অতি খাঁটি কথা। কিন্তু একটা আস্ত মানুষের ঝুঁকি ত কম নয়। পাড়ার লোক দু' একজন করে পেছনে সরতে লাগল। কেউ কেউ নিজের হাতে করবে একটা ঢেলা দিয়ে কিছু সোয়াব হাসিলের জন্য ব্যস্ত হয়ে সেদিকেই গেল দ্রুত এগিয়ে।

মওলানা সাহেব পাড়ার এই সব দুনিয়াভী ব্যাপার নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাননি। লুলিকে তিনি যে ইতিপূর্বে দেখেননি তা নয়। দেখেছেন বহুবার। তাঁদের বাড়িতেও ত মা-মেয়ে ভিক্ষে নিতে আসত প্রতি শুক্রবার। বাসি ভাত-টাত বেঁচে গেলে মওলানার বিবি মা-মেয়েকে খাইয়েও দিয়েছেন কতদিন। কিন্তু আলেম মানুষ তিনি, চোখ মাটির দিকে রেখে চলার শিক্ষাই পেয়েছেন কেতাবে। সেই তাঁর অভ্যাস। তাই কোনদিন তিনি মুখ তুলে চাননি লুলি বা তার মার দিকে। কখনো ভাবেননি এদের সমস্যা।

মেয়েটি হঠাৎ অকুল পাথারে পড়ে গেছে দেখে তাঁর মনে মুহূর্তে দয়ার সঞ্চার হ'ল বুঝি। বিশেষত তাঁর মনে পড়ল কোরাণের আদেশ ও হাদিসের শিক্ষা ; 'এতিম ও মা'জুরের প্রতি দয়ার হস্ত প্রসারিত করবে।' পা সরিয়ে নিয়ে তিনি

বললেন, "আজ আমাদের বাড়ী খেতে আসিস্ ! ঘরে আলাপ করে দেখি কিছু হিল্লে হয় কিনা।"

পাড়া পড়শীদের এখনো যে কয়জন অবশিষ্ট ছিল তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যোগ করলে, "হুজুর আশ্রয় দেন ত বেচে যায়।"

মওলানা কোরাণের আয়াৎ ও হাদিস আবৃত্তি করে সকলকে শুনিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "দেখি বাড়ির তেনারা কি বলেন ?"

তেনারা অবশ্য বিশেষ আপত্তি করলেন না। গিন্নী শুধু বল্লেন, "থাকবে কোথায় রাত্রে।"

মওলানা বল্লেন, "কেন, ঢেঁকি ঘরেই না হয় রইল।"

ফজুর মা নিকটেই ছিল সে বলে উঠল, "রাত্রে বের টের হবে কেমনে ? কেউ একজন না ধরলে সেত দাওয়ায় উঠা-নামাই করতে পারে না।"

মওলানা তারও সমাধান করে দিয়ে বললেন, "কেন ফজুর মা, তুমিও না হয় ওর সঙ্গে ঐ ঘরে রইলে।"

ফজুর মা কিন্তু লুলির সঙ্গে এক ঘরে থাকতে রাজি নয়। হাজার হোক সে ভিক্ষে করে খায়নি কোনদিন। তার উপর সে মুন্সী বাড়ীর চাকরানী—তার নিজস্ব একটা আভিজাত্য আছে সে যে মনে মনে তা বোধ করে শুধু তা নয় সুযোগ পেলে তা প্রকাশও করে। বিয়ের দিন তাকে ফরিদার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। সেই থেকে এই বাড়ীতেই সে আছে ফরিদার ফাই ফরমাস পালন করে। আর সুযোগ পেলেই মুন্সী বাড়ীর সঙ্গে এই বাড়ীর তুলনা করে ফরিদার হাত থেকে জর্দা দেওয়া পানের খিলি আদায় করে। ঢেঁকিশালের পাশেই লাগানো রান্নাঘর। ফজুর মা রাত্রে রান্না ঘরেই শোয়।

ফজুর মা জানে বাড়ীর কর্তাকে খুশী রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। তাই বললে, "লুলির বাইরে যাওয়ার হাজৎ হলে আমাকে ডাক দিলেই আমি উঠব। মাঝখানে একটি বাঁশের বেড়াইত শুধু।" অগত্যা এই ব্যবস্থাই কায়েম হ'ল।

লুলির একখানি হাত ও একখানি পা ই যে শুধু নুলো ও শীর্ণ তা নয়, সারা শরীরটা চর্ম-সার। এতটুকু মাংসের বালাই নেই কোথাও। হয়ত কোনদিন পেট ভরেই খেতে পায়নি। মা যদ্দিন বিছানায় পড়েছিল তদ্দিন অনেক বেলাই উপুস দিতে হয়েছে নীরবে। কোনদিন হয়ত জুটেছে আধপেটা, কোনদিন তাও জোটেনি। বোধ করি এই শীর্ণ চেহারা দেখেই মওলানার মনে জেগেছিল দয়া, 'আহ, হাজার হোক্ আল্লার বান্দা।'

মাস দুই পরে বোধ করি মওলানা একদিন দুপুরবেলা ফিরছিলেন দূর এক গ্রাম থেকে জানাজার নামাজ শেষ করে। বিল পাতাড়ী এসে তাদের পুকুর পাড়ে উঠেছেন মাত্র হঠাৎ ঘাটে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে থমকে গেলেন তিনি। সরে একটা গাছের আড়ালে গিয়েই দাঁড়ালেন। লুলি এর মধ্যে মাঝে সাঝে যে তাঁর চোখে পড়েনি তা নয়। তবে তিনি কোনদিন চোখ তুলে ভাল করে তাকিয়ে দেখেন নি ওর দিকে। বেগানা ঔরতের দিকে চোখ তুলে তাকানো শরিয়তের মানা। শরিয়ত পা-বন্ধ আলেম তিনি সজ্ঞানে তার অন্যথা করেননি কোনদিন। আজ হয়ত নেহাৎ বে-খেয়ালেই এই-নীতির প্রথম খেলাপ হ'ল।

লুলি ঘাটে লেপটে বসে, ভাল পাটা পানিতে ডুবিয়ে গোসল করছে। একহাতে যতটুকু পারা যায় ডলে ডলে যেন বুকের ময়লা তোলবার চেষ্টা করছে। নিঝুম নিস্তব্ধ দুপুর বেলা। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই। কাজেই নিশ্চিন্ত আরামে ধীরে সুস্থে বুকের কাপড়টা ফেলে সে গাত্র মার্জনা করছিল অসীম মনোযোগ দিয়ে। এখানে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পেয়ে লুলির দেহে যে এমন সব অঘটন ঘটেছে তা ভাবাই যায় না। এটাই মওলানা তাজ্জব হওয়ার বড় কারণ। এত তাজ্জব তিনি হলেন যে নিজেকেই যেন গেলেন ভুলে, চেয়েই রইলেন এক দৃষ্টিতে বেশ খানিকক্ষণ। নুলো হাত পা দু'খানি ছাড়া বাকি সারা শরীর থল থল করছে লুলির মেদ মাংসে। শীর্ণ মুখমণ্ডল ভরে গোলগাল হয়ে প্রায় ফেটে পড়ার অবস্থা। মওলানার চোখ দু'টি নিবদ্ধ হয়ে রইল তার পুরুষ্টু স্তন দু'টির প্রতি। মনে পড়ে তাঁর দেওবন্ধে থাকতে মেওয়ার দোকানে সুপুষ্ঠ ও বেশ বড় বড় আপেল দেখতে পেতেন, যা এক হাতের মুঠোয় ধরত না মোটেও। মনে হ'ল এও এক হাতের মুঠোয় ধরবে না। এমন পুরুষ্টু সুগোল ও সুঠাম বুক বাংলা মুল্লকে কখনো দেখেছেন বলেই মনে হ'ল না তাঁর। আশ্চর্য, পরক্ষণেই কিন্তু তাঁর মনে হাফেজ মওলানা মোহাম্মদ হোসেন জেগে উঠল। তিনি 'তৌবা তৌবা' করে কোন রকমে লুলির চোখ এড়িয়ে নীচে নেমে পুকুরের বাইরের ধার বেয়ে ঘরে ফিরে এলেন।

ফরিদা দেখল স্বামীর মুখ আজ অতিমাত্রায় গম্ভীর মনে হ'ল তিনি যেন অন্যমনস্ক ও চিন্তিত। ফরিদা জানে স্বামীর গাম্ভীর্য ভাঙাবার পরমৌষধ হচ্ছে—নিজের হাতে এক খিলি পান তাঁর মুখে গুঁজে দেওয়া। সেই ঔষধ

প্রয়োগের পর সত্যই হোসেনের ঠোঁট দু'টি শুধু লাল হ'ল না' তাতে মৃদু হাসিরও সোনালী রেখা দেখা দিল ঘন শুক্ল শ্মশ্রুর ফাঁকে। ফরিদার দিকে চেয়ে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবেই বলে উঠলেন মওলানা। "লুলির জন্য বড় দুঃখ হয়।"

বিস্মিতা ফরিদা বলল, "কেন? সে ত এখন দিন দিনই খোদাব খাসী হচ্ছে। শবীবটা যা হয়ে উঠেছে দেখলে ত রীতিমত হিংসা……"

ফরিদাকে বাক্য শেষ কবতে না দিয়ে মওলানা বল্লেন, "তাইত বেশী কবে ভাবছি। কাবো সঙ্গে একটা কলমা পড়িয়ে দিতে পাবলে খুব সওয়াবের কাজ হ'ত।"

"অমন লুলো মেয়েকে কে বিয়ে কবতে যাবে, শুনি!" তাবপর ঠোঁটে বাঁকা হাসি হেসে যোগ করলে, "অত দযা হলে নিজেই কবে ফেলেন না কেন? এক ঢিলেই দু'পাখী শিকাব হবে—মোটা সোটা ও স্বাস্থ্যবতী বৌও মিলবে, ঐদিকে সওযাবও হবে বেশুমাব। আমি হ্যাংলা বলে আপনিত সাবা জীবনই আফসোস্ কবে মরলেন। সেই আফসোস্ আব কবতে হবে না। তবে নাকে মুখে কাপড গুঁজেই ওব কাছে ঘেঁষতে হবে এই যা।" ফরিদাব শুষ্ক শীর্ণ মুখেও ফুটে উঠল চটুল হাসি।

"দেখ, আল্লার বান্দাকে ঘৃণা কবতে নেই। আল্লাহ তাতে না-খোশ হন্। আল্লার মর্জি কে বুঝতে পাবে, তিনিই ওকে ঐ রকম বানিয়েছেন। ও'র দোষ কি?"

মিনিট খানেক চুপ থেকে ফের যোগ কবলেন, "আমি ভাব্ছি কত কানা খোঁড়া পুরুষের বিয়ে হচ্ছে, এমন কি সত্তর আশি বছরের বুড়োরাও বিয়ে করছে কত কচি কচি মেয়ে আর এর বিয়ে হবে না। এ কেমন ইনসাফ? শুধু লুলো বলে জীবনের একটা বড় লজ্জৎ থেকে এ একেবাবে মাহ্রুম থাকবে এ কখনো খোদার হুকুম হতে পারে না।" সত্যই আন্তবিক বেদনায় মওলানার হৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠল। মুখে পড়ল বেদনা ক্লিষ্ট অন্তরের কালো ছায়া।

পরদিন বাড়ীব চাকর গফুরকে এক পাশে ডেকে নিয়ে নিজেই প্রস্তাবটা পাড়লেন। গফুরের বৌ মারা গেছে বছর দুই, এ পর্যন্ত বিয়ে করেনি অর্থাৎ করার সামর্থ্য হয়নি।

মওলানা বললেন, "সব রকম খরচ আমি দেব, ওকে সারা জীবন আমরাই রাখব, পালব। তোমার এক পয়সাও লাগবে না। বরং তোমাকে আমি শ'খানেক টাকা এমনিই দিচ্ছি যদি আলাদা ঘর দোর করতে চাও।"

গফুর কিন্তু তাতেও রাজি হ'ল না। বললে, মিথ্যা কথাই বললে, "হুজুর, আমি আর শাদীই করব না। শাদীর মজা হাড়ে হাড়েই টের পেয়েছি....আর না।"

মওলানা সাহেব এই ভাবে আরও দু' একজনকে বাগাবার চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হলেন। ফলে তাঁর দুঃখ ও আফসোস গেল আরো বেড়ে।—কি করা যায়, কি করা যায়? ভেবে তিনি অত্যন্ত বে-করার হয়ে পড়লেন। তাঁর বাড়ীতে ও না থাকলে বা হামেশা না দেখ্‌তে পেলে তাঁর মন এই ভাবে হয়ত বে-করার ও অস্থির হ'ত না। চেষ্টা তিনি করেছেন, আরো করবেন। হাল ছাড়বেন না—এই তিনি সঙ্কল্প করলেন মনে মনে।

মসজিদে তাঁকে ইমামতী করতে হয়। এরি মধ্যে একদিন ভোর রাত্রে তিনি অন্দরের পুকুর থেকে অজু করে ফিরছিলেন। কাক ডাকেনি তখনো, কেউ জাগেনি কোথাও। এই ভাবে ছোবেহ্‌ সাদেকের আগে ওঠা তাঁর চিরকেলে অভ্যাস। ঢেঁকি ঘরের পাশ দিয়েই পথ। দেখলেন আজ ঢেঁকি ঘরে কুপি জলছে এই অসময়। স্বভাবতই তাঁর কিছুটা কৌতুহল হ'ল। বেড়ার ফাঁকে চোখ দিয়ে ভিতরে চেয়ে দেখলেন। কুপিটা সাম্‌নে রেখে লুলি বিছানার উপর বসে আছে, বুকে ছেঁড়া তেনাটুকুও নেই। চোখে মুখে অতৃপ্ত কামনার বহ্নি-শিখা যেন জ্বল জ্বল করছে। মাঝে মাঝে মাথার ছেঁড়া বালিশটা তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরছে। দুই গণ্ডদেশ বেয়ে ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। মনে হ'ল দেহে যেন তার চল্‌ছে ভূমিকম্পের প্রচণ্ড আলোড়ন। দেখে মওলানার বুকের রক্ত তোলপাড় করে উঠল। এক প্রবল উত্তেজনায় তাঁর অমন সবল হৃষ্ট-পুষ্ট দেহও কাঁপতে লাগল বেতস পাতার মত।

কোন রকমে পা' দু'খানিকে টেনে নিয়ে তিনি নিঃশব্দে ঘরে ফিরে এলেন। ঘরে এসেও মাথার ঝাঁ ঝাঁ ও দেহের কাঁপুনী থাম্‌তে সময় লাগল বেশ খানিকক্ষণ। তারপর বার কয়েক আউজুবিল্লাহ পড়েও তৌবা তৌবা বলতে বলতে তিনি দ্রুত এগিয়ে চললেন মসজিদের দিকে।

লুলির বিয়ে দেওয়ার জন্য এইবার তিনি আরো মরিয়া হয়ে উঠলেন। পুরস্কারের টাকা বাড়িয়ে দু'শ করলেন। অর্থাৎ যে লুলিকে বিয়ে করতে সম্মত হবে তাকেই তিনি দেবেন দু'শ টাকা। বিয়ের খরচ, লুলির সারা জীবনের খাওয়া-পরার ভার সে সব ত আছেই। সে ত তিনি নেবেনই।

আশ্চর্য, তবুও পাওয়া গেল না কোন বর। কেউই রাজি হ'ল না বিয়ে করতে ঐ নুলো মেয়েকে, যার পাশ দিয়ে চলতে নাকে মুখে গুজতে হয় কাপড়। এখন থেকে লুলির চিন্তায় প্রায় রাত্রে মওলানার হতে লাগল ঘুমের ব্যাঘাত। আলেম-মানুষ তিনি—হালাল-হারাম, বেহেস্ত-দোজখ ও হুর গেলমান নিয়েই তাঁর কারবার তবুও সেদিন রাত্রে লুলির ঘরে যে দৃশ্য তিনি দেখেছেন তা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। মন তাঁর অস্থির হয়ে ওঠে বারবার। ফজুর মা কয়েক দিনের জন্য মেয়ের বাড়ী গেছে বেড়াতে। লুলির শরীর এখন যা হয়েছে ধরে তুলে বার করার আর দরকারই হয় না। একটা লাঠি ভর করে এক পায়েই সে এখন ছোট খাট নালা খন্দক পার হয়ে যেতে পারে। দাওয়ায় উঠা-নামা ত করে অতি সহজেই। বিকলাংঙ্গের অসুবিধা গায়ের জোরেই সে এখন পুষিয়ে নেয়।

হঠাৎ এক মাঝরাতে মওলানার ঘুম যায় টুটে—ভাবেন লুলির কথা। আপনা থেকেই এসে যায় ভাবনা।

এ রকম এক রাত্রে মওলানা উঠলেন আলগোছে বিছানা ছেড়ে। ছেলে-মেয়েদের দিকে ফরিদা ঘুমুচ্ছে অঘোরে। এক হাতে নিলেন বদ্‌না অন্য হাতে টর্চ। নিঃশব্দে বদ্‌নাটা রাখলেন উঠানের এক পাশে। ঢেঁকি-ঘরে বাতি নেই। বাঁশের দরজা—ঠেলে ঘরে ঢুকলেন, টর্চটা একবার জ্বেলে বিছানাটার অবস্থান দেখে নিলেন মুহূর্তে। লুলি ও-পাশ ফিরে শুয়ে আছে। বোধ করি ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ আস্ত একখানি মানুষের হাত তার উন্মুক্ত ও সমুন্নত বক্ষে এসে লাগল। তারও ঘুম গেল ছুটে—মুহূর্তে সর্বশরীর উঠল শিহরে। ভীতা—বিস্মিতা, লুলি, হয়ত কি বা কে ধরে দেখার জন্য ভাল হাত খানি বাড়াতেই তা ঠেকল এমন এক মুখে যা ঘন চাপ-দাড়িতে ভরা। সে জানে এই বাড়ীতে ঐ রকম দাড়িওয়ালা মুখ একখানিই মাত্র আছে।

মুহূর্তে সর্বদেহ যে এমনভাবে স্বয়ংক্রিয় হয়ে উঠতে পারে এই অভিজ্ঞতা লুলির জীবনে এই প্রথম। নৈশ অন্ধকারে জৈব ক্ষুধার আদিম শিকার দুই নরনারীর জীবনে রইল না দিনের বেলার কোন বৈষম্য, তলিয়ে গেল মুহূর্তে সব রুচি ও পাপ পুণ্যের হিসাব-নিকাশ। জেগে রইল শুধু আদি ও অকৃত্রিম মানুষ।

আশ্চর্য্য, মোহাম্মদ হোসেন ফিরে গিয়ে আজ আউজুবিল্লাহ্ পড়লেন না একটি বারও। হয়ত ভুলেই গেলেন, হয়ত মনেই হ'ল না আজ শয়তানের কথা।

লুলির দেহ মনে কিন্তু বয়ে চলল এক অজ্ঞাত আনন্দের ফল্গুধারা। নুলো হাত পাও আজ তার কাছে মনে হ'ল পরম সম্পদ। মনে হ'ল জীবনটাই একটা মস্ত বড় নেয়ামৎ। বেলা ন'টা পর্যন্ত সে আজ বিছানা ছেড়ে উঠলই না। দরজা ফাঁক করে কে একজন তার বরাদ্দ পান্তাভাতের মাটির বাসনটা রেখে গেছে সেই সাত-সকালে। হঠাৎ একটা কুকুর ঢুকে তাই খেতে লাগল সপ্ সপ্ শব্দ করে। লুলি চোখ মেলে তাকালো। ক্লান্ত ক্ষুধিত লুলি দুই প্রসন্ন কৌতূহলী চোখ মেলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কুকুরের খাওয়া দেখ্‌তে লাগল। জিভ্ দিয়ে চেটে খাওয়া, লুলির কাছে ভারী অদ্ভুত ও আশ্চর্য মনে হ'ল আজ।

প্রায় মাস ছয় কাটল।

একদিন ফজরের নামাজের পর মসজিদ থেকে এসেই মওলানা ঘোষণা করে বসলেন: তিনি হজে যাবেন। আজ তিনি মসজিদে যাওয়ার আগে ভোর রাত্রে উঠে গোসল করেছেন। ঘুম থেকে উঠে ফরিদা ঘরের ভিতর ভিজা লুঙ্গী দেখে কিছুটা অবাক হয়েছিল। যে ছেলেটা বিছানায় প্রস্রাব করে সেটা ত তাঁর পাশে শোয় না। স্বামীকে ঠাট্টা করে কি জিজ্ঞাসা করবে—এতক্ষণ ধরে ফরিদা মনে মনে তারই মহড়া দিচ্ছিল। কিন্তু মওলানা ফিরে এসে তাঁর এই মহৎ সঙ্কল্পের কথা প্রচার করতেই তার সব কথা ও খেয়াল গেল তলিয়ে। কথাটা দ্রুত বাড়ীময়, বাড়ী থেকে আশে পাশের ঘরে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাড়াময় রাষ্ট্র হয়ে পড়ল মওলানা হজে যাচ্ছেন।

সময় বেশী নেই। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই প্রয়োজনীয় দরখাস্ত ও পাস্‌পোর্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

ভাইরা ছুটে এসে বললে, "এত অল্প সময়ের মধ্যে টাকার যোগাড় হবে কি করে? আগামী বছর যান না কেন, ভাইজান?"

"না, আমি নিয়ত করে ফেলেছি। এই বারই যেতে হবে। টাকা কোন রকমে যোগাড় করা চাই-ই।"

ভাই একধারে হাফেজ ও মওলানা তদুপরি হাজী হয়ে ফিরে এলে পারিবারিক নাম ইজ্জৎ আরও অনেক বেড়ে যাবে। অতএব জমি বিক্রয় করে হলেও ভাইরা টাকা যোগাড়ের সঙ্কল্প করল।

কিন্তু জমি বিক্রী আর করতে হ'ল না। কে জানত পাড়ায় এত লোকের মনে মনে এত সব মানস ছিল, আর মেয়েদের ছিল এত সব নিজস্ব সঞ্চয় ও

তহবিল। কথাটা রাষ্ট্র হতেই এক টাকা দু'টাকা থেকে দু'দশ বিশ যে যা পারে মওলানা সাহেবের হাতে দিয়ে নিজেদের সাধ আরজু ও মানসের কথা জানালো। কেউ বলল আমার জন্য একটু জমজমের পানি। কেউ বলল আমার জন্য কিছু খোরমা, কেউ বলল ওখানকার কিছু তেঁতুল, কেউ বলল উটের সস্তা গোস্ত আনবেন। কেউ টাকা দিলে কাফনের, কেউ দিলে জেয়ারৎ করার। কেউ দিলে শুধু দোওয়া করার জন্য। কেউ দু'টো টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বললে— আমার জন্য ওখানকার শুধু একটু মাটি···। কেউ কেউ মৃত মা-বাপের জন্য হজ করার টাকা গছালে তাঁর হাতে। এমন কি বুড়ী ফজুর মাও দশ টাকার একখানা নোট দিয়ে বল্লে, "আমার জন্য এক কাফনের কাপড় আনতে হবে বাবা।" ফজুর মা ত আর জানে না সেই কাপড় তৈয়ারী হয় ওয়াশিংটন আর ম্যাঞ্চেষ্টারে। সে জানে মক্কা শরীফ থেকে আনীত কাফনে তার মৃত-দেহ দাফন করা হলে তার আর কোন গোর আজাবই হবে না এবং সারা জীবন দুই মনিব বাড়ী থেকে সে যা সরিয়েছে আখেরাতে তারও আর কোন জবাবদিহি হতে হবে না। সব গোনাই তার হয়ে যাবে মাফ। তাই তার বহু কষ্টের সঞ্চয়ও সে এনে দিলে মওলানার হাতে। দেশে ফজুর মা ও ফজুর বাপের সংখ্যা ত নেহাৎ কম নয়। কাজেই মওলানা সাহেবের হজের টাকার জন্য জমি আর বিক্রী করতে হল না। বরং ভাইরা হিসাব করে দেখলে—ভাইজান যদি একটু হিসেব করে চলেন বেশ কিছু নগদ টাকা ফেরৎও আসতে পারে। করাচী থেকে বিবিদের জন্য এক একখানা শাড়ী আনলেও ত যথেষ্ট—এখানে শাড়ীর যা দাম। ওদিকে সোনা নাকি খুব সস্তা, চাই কি ইচ্ছা করলে সব বৌয়ের জন্য এক এক পদ অলঙ্কারও হয়ে যেতে পারে। কথা হচ্ছে ভাইজান ইচ্ছা করবেন কি? মুখ খুলে অবশ্য তাঁকে এই সব দুনিয়াভী কথা বলা যায় না। মওলানা সাহেবের বিবি বলে ভাবীর সামনে তাদের যাওয়া কি বাতচিৎ করা একদম মানা। না হয় ভাবীকে দিয়েই তারা সওয়াবের সঙ্গে এই সুবিধার দিকটাও ভাইজানকে বুঝিয়ে দিতে পারত।

জমি যে বিক্রি করতে হ'ল না এতেও অবশ্য কম খুশী হ'ল না তারা। এখনো ত ঘর থেকে বেরিয়ে রেলে চড়ে বসা পর্যন্ত যে যা দেবে তা ত বাকিই আছে। কাজেই ঘর থেকে এক পয়সাও বের করতে হ'ল না।

বড় ভাই যাচ্ছেন হজে—দীর্ঘ সফরে। তাই যথারীতি বিদায় দিতে শালা সম্বন্ধীরাও এসে পড়েছেন। কবির মিয়া অর্থাৎ এ, কে, এম, কবির উদ্দীন

আহমদ, যে শহরের কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে, মায়ের অনুরোধে সেও এসেছে। গ্রাম দেশে এলেও সে পরে পায়জামা ও হাফশার্ট, মাথায় দেয় না টুপি। অনেকের বিশ্বাস সে নামাজ রোজার ধারও ধারে না, ফলে অনেকেই তাকে দু'চোখেও দেখ্‌তে পারে না। নামাজের জন্য তম্বি করেছিল বলে ভগ্নিপতি মওলানা সাহেবকে পর্যন্ত সে একবার শরিয়তের দারোগা বলে ঠাট্টা করেছিল। ফলে মওলানা সাহেব চটে মটে লাল হয়ে তার সঙ্গে বাক্যালাপই বন্ধ রেখেছিল পুরা এক বৎসর।

তাকে দেখে এইবার মওলানার গম্ভীর মুখ অধিকতর গম্ভীর হ'ল। মনে মনে ভাবলেন—নিশ্চয়ই দোওয়া চাই—এই বার বি, এ পরীক্ষা দেবে কিনা। হয়ত মক্কা শরীফে বসে তার পাশের জন্য দোওয়া করতেই বলবে। দারোগা বলে যত ঠাট্টাই করুক, ঠেকায় সকলকেই দারোগার দ্বারস্থ হতে হয়।—দুনিয়াভী ব্যাপারে যেমন আখেরাতের বেলাও তার ব্যতিক্রম নেই।

কথাটা ভেবে মওলানা মনে মনে একটু হাসলেনও।

মওলানার অনুমান, মিথ্যা নয়। মা এই উদ্দেশ্যেই কবিরকে পাঠিয়েছেন। কবির কিন্তু এসেছিল মা'র অনুরোধ এড়াতে না পেরেই। না হয় ওসবে তার আস্থাও নেই, বিশ্বাসও নেই। তাই বলেওনি সে কোন রকম দোওয়ার কথা দুলাভাইকে। বরং মওলানার গাম্ভীর্যকে অগ্রাহ্য করে কবির বলে উঠল, "মক্কা শরীফ থেকে আমার জন্য কি আনবেন দুলা ভাই! বলেন দেখি?"

"জমজমের পানি ছাড়া গরীব মানুষ আর কি আনবো।" কিছুটা নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গেই মওলানা উত্তর দিলেন।

"ও পানি আমি কিছুতেই খেতে পারব না দুলাভাই। কয়মাস ধরে টিনে আবদ্ধ থাকে, টিনটা আদৌ ধোওয়া হয় কিনা তার ঠিক নেই, কত রকম জারমৃই যে ওখানে ঢোকে তার কি হিসাব আছে? আর এক রকম যা বিদ্‌ঘুটে গন্ধ হয়! ও আমি কিছুতেই খেতে পারব না দুলাভাই। ও আনবেনই না, পবিত্র স্থানের জারম্ হলেও ওতে রোগীর মউত আটকায় না।"

"তৌবা তৌবা পাক জিনিস সম্বন্ধে ওভাবে কথা বললে গোনাহ্ হয়।" উত্তর দিলেন হাজী নাছির আলী। তিনি এ পর্যন্ত তিনবার হজ করেছেন। মওলানাকে ওখানকার হাল-হকিকৎ বাৎলাবার জন্যই এসেছেন।

"সত্য কথায় গোনাহ্ হয় না দুলা ভাই।" হাজী সাহেবকে অগ্রাহ্য করেই কবির উত্তরটা দিলে।

পাশের গ্রামের জনাব মুজিবল হক চৌধুরীও তখন ছিলেন হাজির। তিনি তাঁর বাবার বদলে হজের জন্য টাকা দিতে এসেছেন। চৌধুরী সাহেব সেই অঞ্চলের ইউনিয়ন বোর্ড, মুসলিম লীগ, ঈদ-রি-ইউনিয়ন কমিটি, বাজার সমিতি, রিলিফ কমিটি ইত্যাদির প্রেসিডেণ্ট। নাম বলতে হয় না প্রেসিডেণ্ট সা'ব বললে ও অঞ্চলে একমাত্র তাঁকেই বোঝায়। এইবার নতুন করে তিনি স্কুল কমিটিরও প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন। খুব দূরদর্শী লোক—আগামীবার ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড্, তারপর হয়ত এসেমব্লী। মনে মনে এই তাঁর খসড়া। মন্ত্রীর খোওয়াব অবশ্য এখনো দেখতে শুরু করেননি তিনি। সময়ে সেই খোওয়াবও যে তিনি দেখবেন এই বিষয়ে স্থানীয় লীগ মহলে এখন থেকেই কানা ঘুষা চলছে।

কবিরের কথা শুনে তিনি বেশ বিরক্তি ও উষ্মার সঙ্গেই বলে উঠলেন, "হাজী সাহেব কথায় এদের সঙ্গে পারবেন না, ওরা হচ্ছে কমিউনিষ্ট—তর্কে ওদের হারাতে পারে এমন বান্দা এখনো পয়দা হয়নি।"

কমিউনিষ্ট কি বস্তু মওলানার তা জানা ছিল না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "চৌধুরী সাহেব, কমিউনিষ্ট কাকে বলে?"

বিরক্তি-মিশ্রিত কণ্ঠে চৌধুরী সাহেব বললেন, "ওরা আল্লাহ্ রসুল মানে না, নামাজ রোজারও ধার ধারে না, খালি ভাত কাপড়ের কথাই ওদের মুখে শুনতে পাবেন। ভাত কাপড়ই ওদের সব, পেট আর পিঠ ছাড়া ওরা কিছুই মানে না।"

কবির ও ছাড়বার পাত্র নয়। বললে, "চৌধুরী সাহেবের কথাটা আংশিক সত্য। কমিউনিষ্ট হই বা না হই আমাদের কথা হ'ল আগে মানুষের ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করতে হবে, পরে মানুষ আপনা আপনিই ধর্ম কর্ম ও সাহিত্য শিল্পের দিকে ঝুঁকবে।"

ভাত কাপড়ের কথা শুনে মুহূর্তে মওলানার চোখের সামনে লুলির চেহারা উঠল ভেসে। যদ্দিন ভাত কাপড় জোটেনি তদ্দিন তার চেহারা ছিল চামচিকের মত, চর্মসার দেহে এতটুকু চিহ্ন ছিল না মেদ মাংসের। কেউ একজন সাহার্য না করলে চলতে ফিরতেই কষ্ট হ'ত তার। এখন নিয়মিত ভাত কাপড় যখন পাচ্ছে তার সারা দেহে ঘটেছে অঘটন। যৌবনের ভারে দেহ যেন তার পড়ছে ফেটে। মুলা পা টেনে টেনে সে এখন ঘুরে বেড়াতে পারে এখান থেকে ওখানে —এ পাড়া থেকে ও পাড়া। এক হাতে যতটুকু পারে বাড়ীর কাজেও নাকি এখন আসে এগিয়ে, করতে চায় এটা সেটা।

সব চেয়ে আশ্চর্য, একদিন মওলানার কাছে এসে বলে কিনা; "আমি নামাজ পড়ব। কিন্তু কি করে পড়ব? নিয়ত জানি না, সুরা জানি না, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারিনা, ভাল করে বস্‌তে পারি না, কাপড়-চোপড়ও নিজে ধুতে পারি না বলে অনেক সময় থাকে নাপাক। তবুও হুজুর মন চায় নামাজ পড়তে···।"

মওলানা সাহেব সেদিন তাকে বলেছিলেন; "মন আল্লার দিকে রুজু হলে যেমনি ভাবে পার তাঁকে ডাকবে। শুধু সেজদা দিয়ে তোমার মনের কথা আল্লাহ্‌কে বলবে, তাঁর কাছে মাফ চাইবে সব গোনাহ্‌, তাতেই তিনি হবেন খুশী।"

কি জানি কেন হঠাৎ তাঁব মনে হ'ল কবিরের কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। লুলিই ত তার জীবন্ত প্রমাণ।

কবির আবার বলে উঠল, "আচ্ছা দুলাভাই এই মর্মে এক হাদিস আছে না যে, খানা যদি তৈয়ার থাকে আগে খানা খেয়ে নাও পরে নামাজ আদায় করবে।"

মওলানা, "হাঁ, ঐ মর্মে একটি হাদিস আছে বই কি।"

কবির, "তা হ'লে আমাদেব দোষ কোন্ খানটায় শুনি! আমরাও ত সেই কথাই বলছি—আগে মানুষেব পেটেব আগুন নেবাও তাবপর তাকে আল্লাহ রসুল ও বেহেস্ত দোজখের কথা শোনাও—তখনই সে তা মন দিয়ে শুনবে। দুলাভাই জানেন? এক ইংরেজ লেখক বলেছেন টাকা পয়সা অর্থাৎ যা দিয়ে ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা হয়—তা হচ্ছে মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। ঐ ইন্দ্রিয় না থাকৃলে আর পাঁচটা ইন্দ্রিয়ও ভোঁতা হয়ে যায়। অকেজো হয়ে পড়ে।"

মওলানার মনে আবার লুলির চেহাবা উঠল ভেসে। ভাত কাপড় না পেলে তার এই স্বাস্থ্য ও লাবণ্য কোথায় থাকত? কোথায় ছিল এতদিন? তাজা ও নিটোল আপেলের মতো দুই পুরুষ্টু স্তনে আজ যে তার বুক ভবে গেছে তা কি কখনো সম্ভব হ'ত? বে-দীন নছারার কথা হলেও তিনি দেখলেন কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়।

চৌধুরী সাহেব গা তুললেন। তবে যাওয়ার আগে বলে গেলেন, "পাকিস্তান হ'ল আল্লার মুল্লুক, এখানে কায়েম হবে আল্লার সোলতানৎ, এখানকার ধন দৌলৎ মালমাত্তা ধান গম পাঠ সবই আল্লার সম্পত্তি—সেই সম্পত্তি আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা দেবেন, না···তার বিরুদ্ধে আপত্তি করা আল্লার সঙ্গে দুশমনি করা ছাড়া

আর কি ? মওলানা সাহেব, এই কমিউনিষ্টরা হচ্ছে আল্লাহ্ ও রসুলের দুশমন, আমার ইউনিয়নে তাই আমি এদের ঢুকতেই দিই না, এ নেহাৎ আপনার ভাই সাহেব বলেই আজ বেঁচে গেল।"

"তা হলে চৌধুরী সাহেব, আপনার গোলাভরা ধানটাও ত আল্লার সম্পত্তি, আল্লার যে-সব বান্দা খেতে পাচ্ছে না—তার থেকে কিছু দেন না কেন ওদের ?" বেশ শান্ত কণ্ঠেই কবির বলে উঠল।

"আল্লার তাই যদি উদ্দেশ্য হ'ত তা হলে ঐ ধান তিনি আমার গোলায় না দিয়ে দিতেন ওদের গোলায়। জানেন, আল্লার হুকুম ছাড়া একটা বালি এদিক ওদিক হতে পারে না ?" আল্লার মহিমায় গদ গদ হয়ে বললেন চৌধুরী সাহেব।

"তা হ'লে এদের দাবিই ত আল্লার দাবি, এদের জবান দিয়েই আল্লাহ্ বলাচ্ছেন শুধু। আল্লার ইচ্ছা ও তৌফিক না হলে এরা কি এই ভাবে ভাত কাপড়ের দাবি করতে পারত ? দেন না আপনার গোলা থেকে কিছু ধান আল্লার এই সব গরীব বান্দাদের।" মিনতির সুরেই বললে কবির।

গা তুললেন চৌধুরী সাহেব। "আল্লাহ্ নিজে যাদের দেন নি, আমি তাদের দিয়ে অনর্থক আল্লার নাফরমানী করতে যাব কেন ? আল্লাহ্ রহমানুর রহিম, আমার গোলার ধান ত তাঁরই দান।" শোকর আল হামদুলিল্লাহ বলে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট সা'ব। রাগের চোটে অভ্যস্ত সালাম আলায়কুম বল্‌তেও তিনি ভুলে গেলেন আজ। পরদিন ভোরেই মওলানা সাহেবের যাত্রা করার কথা। রাত্রে তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফরিদা ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বললে। শুনে তাঁর পক্ষে কিছুমাত্র অবাক হওয়ার কথা নয়। তবুও অবাক তিনি হলেন, এমন কি যেন আসমান থেকেই পড়লেন তক্ষুনি।

ফরিদার কণ্ঠ এবার স্পষ্টতর হ'ল, "মুলা মেয়ে বলে মেহেরবানী করে আশ্রয় দিয়েছিলেন এখন ঠেলা সামলান। আপনি ত চললেন, কে সামলাবে এ সব ঝামেলা এখন ?"

এমন অভাবনীয় সংবাদেও মওলানা কিন্তু কোন সাড়াই দিলেন না। তাঁর যেন বিস্ময়ের ঘোর এখনো কাটেনি।

ফরিদাই ফের বললে, "আচ্ছা এমন কাণ্ড কে করল ? এমন মুলো মেয়ের সর্ব্বনাশ এক জানোয়ার ছাড়া কে করতে পারে ?"

মওলানা কোনরকমে বললেন, "আর কেউ জানে? সে কিছু বলেনি?" মওলানার কণ্ঠস্বর ভীতিবিহ্বল ও কম্পিত।

ফরিদা; "এখনো বোধ হয় কেউ জানে না। আমার জা'য়েরা অবশ্য সন্দেহ কচ্ছে আজ কয়দিন ধরেই। এখনো তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি। কিন্তু চেহারা ও শরীরের লক্ষণে মনে হচ্ছে ঠিকই। কয়দিন ধরে নাকি খেতেই পাচ্ছে না, খেতে বসলেই নাকি বমি করে···। দেখে আমারও পুরোপুরি সন্দেহ হয়।"

বাকি রাত্রি মওলানার আর ঘুমই হ'ল না। সকালে যথারীতি তিনি যাত্রা করলেন। তবে মুখ তাঁর সারা পথ অতিমাত্রায় গম্ভীর ও বিষণ্ণ হয়ে রইল। তীর্থ-যাত্রা পুণ্য কাজ, তাই লোকে জোর করে হলেও হাসে। লোকেরা আশ্চর্য হ'ল, মওলানার মুখে হাসি ফুটল না একটি বারও। ট্রেনে তুলে দিয়ে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীরা ফিরে এল যে যার ঘরে।

শহরে এসে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে মওলানা সাহেবও হাজী ক্যাম্পেই উঠলেন। কিন্তু জাহাজ ছাড়ার আগের দিন কাকেও কিছু না বলে তিনি সরে পড়লেন ক্যাম্প থেকে।

জাহাজ ছাড়ার সময়ও সঙ্গীরা তাঁকে খুব করে খুঁজলেন ইতস্তত। কিন্তু কোন সন্ধানই মিল্‌ল না তাঁর কোথাও। জাহাজ যথা সময় দিল ছেড়ে। পরিচিত হজ-যাত্রীদের কেউ কেউ ভাবল—হয়ত পরের জাহাজেই আসবেন তিনি, মওলানা সাহেব দিন দুই শহরে আত্মগোপন করে থেকে রওয়ানা দিলেন সিলেট। জেয়ারৎ করলেন শাহ জালালের দরগা। সিলেট থেকে গেলেন ঢাকা—পরীবাগ, আজিমপুর, কোনটাই বাদ দিলেন না, নামাজ পড়লেন, জেয়ারৎ করলেন সেখানেই। ফিরে এলেন চাটগাঁ বায়জীদ বোস্তামীর দরগা, শাহ্ আমানত ও বদর শাহের রৌজায় গেলেন—জেয়ারৎ করলেন অত্যন্ত ভক্তির সাথে। দিলেন সব দরগায় প্রচুর মোমবাতি—এমন কি দিনেও জ্বালালেন বহু। তবুও মনে যেন শান্তি ও তসল্লি পেলেন না কিছুতেই। এইভাবে দিন পনের কাটিয়ে তেমনি গম্ভীর ও বিষণ্ণ মুখে একদিন ফিরে এলেন দেশে। দেখে সবাই ত তাজ্জবের একশেষ। পাড়ার আবাল বৃদ্ধবনিতা সবাই হ'ল অবাক। তাঁর ভাইরা আশ্চর্য হ'ল সকলের চেয়ে বেশী।

কৌতূহলীদের তিনি শুধু বললেন, "এইবার হজ আমার তক্‌দিরে ছিল না। মন কিছুতেই এগুতে চাইল না সামনের দিকে। টিকিটের টাকাটাই নষ্ট হ'ল—। তক্‌দিরে থাকে ত আগামী বার ইন্‌শা আল্লাহ্ যাবোই।

"যে যা টাকা পয়সা দিয়েছিল, পাই পয়সা হিসেব করে তা তিনি ফেরৎ দিলেন সবাইকে। ভাইরা এইবার মনে মনে না-খোশ্ হ'ল আরো বেশী।

কিন্তু দেশ-শুদ্ধ লোক শুধু অবাক নয়, একেবারে আসমান থেকে পড়ল দিন দুই পরে যখন মওলানা প্রচার করলেন—তিনি লুলি:কে বিয়ে করবেন। তাঁর ভাইদের মাথা কাটা গেল লোকের সামনে। রাগে গোসায় তারা ফেটে পড়ল তাঁর উপর। কিন্তু মওলানা কিছুতেই টললো না। তাঁর মাদ্রাসার এক মোদার্‌রেস্‌কে ডাকিয়ে এনে সেই রাত্রেই তিনি কলমা পড়ার কাজটা শেষ করে ফেললেন।

লুলির সম্বন্ধে যে ব্যাপারটি এই কয়দিন মেয়ে মহলে শুধু অনুমান ও কানাকানির মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ তা এইবার সকলের কাছে দিবালোকের মতোই হয়ে উঠল স্পষ্ট, লজ্জা শরম ও ক্রোধে সমস্ত অঞ্চল যেন ফেটে পড়ল মওলানার উপর।

"দুনিয়ায় কাকেও বিশ্বাস করতে নেই।" বললে কেউ কেউ।

"এত বড় হাফেজ-মওলানা হয়ে এই কাণ্ড।" বললে আর এক পক্ষ।

"কেয়ামৎ নজ্‌দিক, কেয়ামৎ নজ্‌দিক—এ তারই আলামৎ।" যোগ করল আর এক বিজ্ঞজন।

"শেষ কালে রক্ষক হয়েই ভক্ষক হলেন মওলানা।" আর একটি বিস্মিত কণ্ঠের উক্তি।

"এত বড় ভণ্ডের পেছনে এতকাল নামাজ পড়লাম, তৌবা, তৌবা।" এক বুড়া মুসল্লী বলেই থুথু ফেলতে লাগল।

"আল্লাহ্ বাঁচিয়েছেন, আর একটু হলেই মওলানা এই হারামের বোঝা আমার ঘাড়েই দিতেন চাপিয়ে।" বলাই বাহুল্য গফুরেরই কণ্ঠস্বর।

ফরিদা এই দু'দিন ধরে শুধু মৃত্যু কামনাই করেছে। না ডাকতেই যে-মৃত্যু আসে ফরিদার বহু ডাকা ডাকিতেও কিন্তু সেই মৃত্যু এল না। অগত্যা দিনের বেলায়ও মশারি খাটিয়ে সে তার নীচে শুয়ে রইল। মুখ দেখাবে সে কেমন করে? মওলানা সাহেবের বিবি বলে মনে মনে তার বেশ কিছুটা দেমাক ছিল। সেই দেমাক মাঝে মাঝে বাইরেও যে প্রকাশ না পেত তা নয়। সেই দেমাক কিনা একটা ভিখারিনী মুলো মেয়ের পায়ের নীচে এই ভাবে ভেঙে হ'ল খান খান। মশারির নীচে বসেই ফরিদা কপালে করাঘাত করতে লাগল বার বার।

এরপর সারা অঞ্চল ব্যাপী যে প্রতিক্রিয়া শুরু হ'ল তার প্রথম ধাক্কায়

মওলানার মাদ্রাসাই গেল উঠে। মিলাদ-জানাজা ইত্যাদির দাউয়াৎও হ'ল বন্ধ। মসজিদের ইমামতীও গেল খসে। খতম পড়ারও হ'ল খতম।

"এমন লোকের পেছনে নামাজ পড়বে কে?" সবার মুখে এই এক প্রশ্ন। ভাইরা বজ্রের মত ফেটে পড়ল: "আহাম্মক কোথাকার! হয়েছিল যদি এক কাম হয়েছিলই। হজে যাচ্ছিল চলে যদি যেতে কে এত সবের খবর নিত, কে টের পেত? কেউ এক জনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই চলত। লুলিকে শহরে বা অন্যত্র সরিয়ে ফেললেই সব হাঙ্গামা যেত চুকে। বেকুবের মত ,বিয়ে করতে গিয়েই ত যত সব জানাজানি, আহাম্মক আব কাকে বলে? না, এমন আহাম্মকের সঙ্গে আমরা আর থাকব না।"

ছোট ভাইটি অধিকতর বিজ্ঞতার সঙ্গে বললে, "আমাদের ডেকে গোপনে বললেই ত হ'ত, অন্য কাউকেও রাজী করান না গেলে আমরাই একজন না হয় স্বীকার করে নিতাম। ওর মান ইজ্জৎটা ত বাহাল থাকত!"

নিজেদেব মান ইজ্জৎ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই হয়ত ভাইরা মওলানাকে পৃথক কবে দিলে তাড়াতাড়ি।

পৈত্রিক জমিজমা এমন কিছু বিরাট ব্যাপাব ছিল না। ভাইরা নিজেব নিজের হাতে চাষবাসের কাজ করত বলেই সংসার স্বচ্ছন্দে চলে যেত। ভাগাভাগির খবর পেয়ে বোনেরাও একের পর এক শ্বশুর বাড়ী থেকে এসে হাজির হ'ল বাপের বাড়ী। তাদের দাবি তারা ছাড়বে কেন? মওলানারা তিন ভাই ও চার বোন। ভাগাভাগি কবে প্রত্যেকেব অংশে যা মিললো তা অতি সামান্য। নিজের হাতে চাষ করতে পারলে হয়ত কোন রকমে টানা হ্যাঁচড়া করে সংসার চলতে পারে।

মওলানারই হ'ল বিপদ। তিনি ত জীবনে কোনদিন নিজের হাতে চাষবাসের কাজ করেন নি। অথচ আজ তাঁব অন্য সব রকম আয়ের পথ বন্ধ। মা'শাল্লাহ তাঁর বালবাচ্চার সংখ্যা ত কম নয়। বিবি ও বালবাচ্চাকে তিনি ত আর উপুস রাখতে পারেন না। একদিন বড় ছেলেটাকে সঙ্গে করে হাটে গিয়ে মওলানা কিনে নিয়ে এলেন এক জোড়া বলদ। লাঙ্গলও একটি খরিদ করলেন তার পরের দিন। মনে মনে ভাবলেন: হজরতও নিজের হাতেই রুজি রোজগার করতেন। পরদিন ভোরে সমস্ত পাড়া অবাক বিস্ময়ে দেখল: হাফেজ মওলানা মোহাম্মদ হোসেন সাহেব নিজের হাতেই লাঙল ধরেছেন, খবর পেয়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে সেই অঞ্চলের দূর গ্রাম থেকেও

বহু লোক এসে বিলের ধারে জড় হ'ল। মওলানা কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করলেন না এই কৌতূহলী জনতার দিকে।

নিজের হাতে চাষ না করলেও মওলানা চাষী পরিবারের ছেলে, চোখে দেখেছেন সব কিছুই। কাজেই কষ্ট হলেও খুব বেগ পেতে হ'ল না। দু'একদিনের মধ্যেই অনেক কিছুই শেখা হয়ে গেল। সপ্তাহ দু'য়েকের মধ্যেই চাষের প্রায় কাজে এক রকম হাত এসে গেল তাঁর। মানুষ অভ্যাসের দাস—মওলানার বেলায়ও তা আর একবার হ'ল প্রমাণিত।

সময়ে দেখা গেল ফরিদা নিজের কাবিনের শর্ত নিজেই লঙ্ঘন করতে লাগল একটার পর একটা। ছেলে মেয়েদের নিয়ে সে নিজের হাতে শুরু করল ধান মাড়াতে ও ভানতে। এমন কি গোয়াল ঘর পর্যন্ত সাফ্ করতে লাগল নিজে। দেখে মওলানা নিজেই হ'ল তাজ্জব, অন্যদের ত কথাই নেই।

মওলানার এই সব কাণ্ডে বলাই বাহুল্য শুধু তাঁর ভাইদের নয় তাঁর শ্বশুর বাড়ীর মাথাও গেল কাটা। লজ্জা-শরমে তাঁরা এখন এই দিকে আসাই দিল ছেড়ে।

মওলানার শ্বশুর একদিন বিবিকে শুনিয়ে শুনিয়েই বললেন; "ফরিদা বলে আমার কোন মেয়ে নেই, ছিল যে মনে করবে সে মরে গেছে।" শ্বশুর জামাইয়ে এর পর থেকে মুখ দেখাদেখি হ'ল বন্ধ। এক পক্ষের ছেলেমেয়েরা ছাড়ল বোনের বাড়ী যাওয়া, আর পক্ষের ছেলেমেয়েরা ছাড়ল নানার বাড়ী আসা। এই সব খবর শহরে কবিরের কানেও যে যায়নি তা নয়। সে কিন্তু রইল নির্বিকার। হয়ত কালের চাকা ঘোরার একটা ইঙ্গিত সে এই সবের মধ্যে দেখ্‌তে পেল। মনে মনে হয়ত খুশীই হ'ল।

একদিন মওলানা, তাঁদের ভিটা-বাড়ীর পাশের জমিতে ধান ফেলার জন্য খুব করে মই দিচ্ছিলেন। বলদ জোড়ার মত তাঁরও সর্বাঙ্গ হয়েছে কর্দমাক্ত। দেখলে চেনাই যায় না। হঠাৎ চোখ তুলতেই দেখতে পেলেন অদূরে আলের উপর দাঁড়িয়ে সাদা ধব ধবে পাজামা আর হাফ্ সার্ট-পরা এক ভদ্রলোক মৃদু মৃদু হাসছেন তাঁর দিকে তাকিয়ে। দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন; "কবির ভাইয়ে, এসেছ? হঠাৎ এদিকে কেমন করে পথ দেখলা?"

কবিরও হাসি মুখে বললে, "চোখ থাকলেই পথ দেখা যায়।"

"দুলা ভাই, আপনি কেমন ধারা লোক শুনি, আজাদী দিবসেও আজ লাঙল

চালাচ্ছেন? আজ যে ১৪ই আগষ্ট, মনে নেই বুঝি? শহরে আজ সব কাজ কাম বন্ধ। আমাদের কলেজও ছুটি। ভাবলাম দুলাভাইর নূতন জীবনটা একবার দেখে আসি।"

মওলানা তিনি আর নন্। এখন শুধু মোহাম্মদ হোসেন হয়েই বললেন, "আমরা ভাই চাষী মানুষ। কাজ করেই আমরা পালন করি আজাদী দিবস। আপনাদের মত শহুরে ও ইংরেজি ওয়ালারাই শুধু কোনরকম কাজ না করেই আজাদী দিবস পালন করে থাকেন। অমন আরাম আয়াসী উৎসব আমাদের পোষায় না। ভাইয়া, যে ভাত কাপড়ের কথা বলেন সেই ভাত কাপড় এই ভাবে রোজ রোজ মেহনত করেই রোজগার করতে হয়। সব সময় ধোপ্— দোরস্ত কাপড় পরে থাকলে আমাদের মোটেও চলে না—জোটে না ভাত-কাপড়। আচ্ছা এসে কাঁধ মিলান দেখি…।" হাস্তে হাস্তে যোগ করলেন— "বলদের সঙ্গে নয়, আমার সঙ্গেই মিলাতে বলছি।" বলেই আর এক চোট আসমান ফাটা হাসি হেসে উঠলেন মোহাম্মদ হোসেন।

কবির বেশ কিছুটা অবাক হয়ে ভাবল—দুলাভাই যদ্দিন হাফেজ মওলানা মোহাম্মদ হোসেন ছিলেন তদ্দিন ত কখনো এমন হাসি মসকরার কথা তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়নি। এমন দিল-খোলা হাসিও কোনদিন শুনা যায়নি। মেহনত কি তাঁর মত লোকের মনেও রসিকতা জাগিয়ে তুল্ল?

খাওয়া দাওয়ার পর কবির তার এ্যাটাচি কেস্টা বের করল। খুলে চকোলেটের প্যাকেট্টা ডেকে ছেলে মেয়েদের হাতে দিয়ে দিলে। কাগজে-মোড়া দু'খানা শাড়ীও ওখান থেকে হ'ল বের—একই রঙের। একই রকমের শাড়ী, একখানা ফরিদার হাতে দিলে। আর একখানা হাতে নিয়ে সে যেন ইতস্তত করতে লাগল।

মোহাম্মদ হোসেন বললেন, "ওখানা কার?"

"লুলি আপা কই? এখানা তাঁর জন্য।"

লুলি দরজার ওপাশেই ছিল। তার এত বয়স পর্যন্ত কোন না-বালকা শিশুও তাকে আপা বলে ডাকেনি আর এমন দামী শাড়ীও কেউ তাকে কোন-দিন দেয়নি কিনে। বিয়ের পরও তাকে পরতে দেওয়া হচ্ছে ফরিদার পুরোনো কাপড়। তার দু'চোখ জলে ভরে এল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কেঁদে উঠল সশব্দে। খুশীতেও যে লোক এমন করে কাঁদে এই দৃশ্য এই প্রথম কবির দেখ্লে। লুলির এতদিনের উপেক্ষিত লাঞ্ছিত মানবতা আজ সর্ব-

প্রথম তার এই চোখের জলের ভিতর দিয়েই যেন আত্ম-প্রকাশের সুযোগ পেল।

প্রায় এক বছর হ'ল মোহাম্মদ হোসেন লুলিকে বিয়ে করেছে—। একটি ছেলেও হয়েছে তার গর্ভে। কিন্তু, কেউ এখনো তাকে স্বীকার করেনি—তার বিবির মর্যাদা দেয়নি কেউ-ই। সে কি নিজেই দিয়েছে? আজ এই ইংরেজী পড়া শৌখিন ছোকরাটা, যে ছিল তার দু'চক্ষের বিষ, সে কিনা তাকে জানালো প্রথম স্বীকৃতি! কি একটা অজানা ভাবাবেগে হোসেনের বুকও যেন আলোড়িত হয়ে উঠল। সেটাকে চাপা দেওয়ার জন্যই হঠাৎ গলা ছেড়ে হো হো করে হেসে বলে উঠলেন, "এই বুঝি তোমাদের কমিউনিষ্ট নীতি? কমি-নাস্তি বললেই ভাল হয় অর্থাৎ যেখানে কোন কিছুরই কমতি হবে না, সবাই খাটবে, সবাই পাবে, সবাই খাবে।" বলে আর এক চোট হাসি হাসলো মোহাম্মদ হোসেন।

কবির বললে, "ঠিক বলেছেন দুলাভাই, তবে আমি কমিউনিষ্ট বুঝি না, বুঝি, আমার যেমন খাওয়া পরার দরকার, আপনারও তেমনি দরকার। ফরিদা আপার যেমন ভাত কাপড়ের প্রয়োজন তেমনি লুলি আপারও প্রয়োজন।"

"সেই ভাত কাপড়ের জন্যই ত নিজের হাতে লাঙল ধরেছি, ভাইয়া। ফলে একদিন যারা আমাকে সালাম করার জন্য এক চোখের পথ থেকে ছুটে আসত আজ তারা আমাকে দেখলে সরে যায় দু'চোখের পথ। ভাই বেরাদরেরা ত করে রীতিমত ঘৃণা ও হেকারৎ।"

"করুক।" দৃপ্ত কণ্ঠেই কবির বললে। "মেহনতী মানুষের দিন আসবেই, না এসেই পারে না। কারণ মেহমতী মানুষেরাই গড়ে দুনিয়া। আর সব দেশের চাষীই হচ্ছে সে দেশের মেরুদণ্ড—মওলানা-মৌলবী নয়, পাদরী-পুরোহিত নয়, এমন কি উজির-নাজিরও নয়, চাষী-ই—আপনি আজ দেশের সেই মেরুদণ্ডের অংশ হয়েছেন। আপনি কখনো ছোট হতে পারেন না।" মোহাম্মদ হোসেন এই সব কথার মাথামুণ্ড হয়ত কিছুই বুঝল না। তবে এইটুকু বুঝল কবির তার এই জীবনকে তারিফ করছে, আর দেখছে না খাটো নজরে।

মন তার খুশীতে ভরে উঠল। গতবার হজ করতে না পারায় মনের ভিতর যে কাঁটাটা অহরহ খচ্ খচ্ করছিল্ আজ তা যেন সমূলেই হ'ল উৎপাটিত। দিলটা যে শুধু হালকা হ'ল তা নয়, দুনিয়াটাকেই মনে হ'ল আজ আগের চেয়ে অনেক সুন্দর। এমন কি এই দাড়ী-গোঁফহীন বে-নামাজী শালাটাকে পর্যন্ত মনে হ'ল কত ভাল—আশে-পাশের সব মানুষের চেয়েই যেন সে কত বড়, কত মহান।

আবহাওয়া

মাহবুব উল্ আলম

কমল ঘরামীকে দেখিতে পারি না। মুখটার জিরান নাই, হরদম বকর-বকর চলিয়াছে। কত শাসন করি!—তবু বলি, বড় বাধ্য সে। যেই ডাক-গিরি করি, কমল অম্‌নি চুপ করে। কিন্তু কেমন যে স্বভাব, কখন নিজের অজ্ঞাতেই আবার 'বকর-বকর' শুরু করিয়া দেয়—হয় হাতের হাতিয়ারের সহিত, নয় বাঁশ-গাছের সহিত, নয় আমার শিশু ছেলেটির সহিত। সহকর্মী। নবীন ওকে শাসায়, তখন চম্‌কে আবার চুপ করে। আমি ভাবি মুদ্রা-দোষ! মন জিজ্ঞাসা করে—কখন হইতে এ মুদ্রা দোষের আরম্ভ?

বকর-বকর করিতে করিতে কাজের উপর হইতে কমলের মনোযোগ ছুটিয়া যায়। আমার কাজের ক্ষতি হয়। তাই তাহাকে দেখিতে পারি না। তবুও ভবিষ্যতের যতটুকু দেখা যায়, তাহাতে কমলকে যে আমার কাজ হইতে কখনও বিদায় দিব এরূপ মনে হয় না। হয়ত সে বাধ্য বলিয়া তাহার প্রতি মনের এই পক্ষপাতিত্ব, নয়ত আর-কিছু।

কমল যেদিন প্রথম কাজ করিতে আসে সেদিন ঘোড়ার মতো একটা লম্বা নাক ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে নাই। পরে নজরে আসিল তাহার 'বকর বকর' স্বভাব। উহা তাহার প্রতি আমাকে চটাইয়া রাখিল।

ওদিকে প্রথম দেখাতেই টের পাইলাম যে নবীন কাজের লোক বটে, নীরবে কাজ করিয়া যায়। কোথাও এক তিল ফাঁকি নাই। তাহার প্রতি খুশী না হইয়া পারি!

কমল ও নবীন কাজ করে। আমি সাম্‌নে বসিয়া তদারক করি। আমাদের সম্পর্ক হইতেছে কাজের। চুপ-চাপ বসিয়া থাকিলেও নবীন ও আমার মধ্যে

বেশ একটা বোঝাপাড়া চলিতে থাকে। আমি প্রতি বেলায় কতটা কাজ আশা করি, নবীন তাহা আপন মনেই বুঝিতে পারে। সে উহা একবিন্দুও কম হইতে দেয় না এবং যাহা করে ভালো করিয়াই করে। কমল ইহার কোনই ধার ধারে না। বকর-বকর চালাইতে পারিলেই বাঁচে। যখন বাধ্য হইয়া চুপ করিতে হয় তখন তাহার মুখটা এত গুরু-গম্ভীর দেখায় যে মনে মনে না হাসিয়া পারি না।

একেই ত কমলের দা'য়ের অভিযোগ, বাঁশ কাঁচা হওয়ার অভিযোগ, ঘরে চাল না রাখার অভিযোগ, বৌয়ের পিঠে কাপড় না থাকার অভিযোগ—সম্ভব অসম্ভব একশ' রকমের অভিযোগ থাকে, তার উপর পরের দিন হইতে অভিযোগের নূতন কারণ দেখা দিল 'ছোট মিঞা' অর্থাৎ ছোট খোকা। একেই কমল অকেজো ও বেগোছাল বলিয়া আমার ধারণা, তার উপর আবার অকর্মণ্যতা ও বেগোছাল ভাব ষোল আনা ধরাইয়া দিবার জন্যই যেন ছোট খোকা কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। কমল বাঁধটি দিয়া যখন বাড়তি বেত কাটিতে দা'য়ের জন্য হাত বাড়ায়, তখন দেখে দা'খানি পাশে নাই। ছোট খোকা অদূরে তাহা দিয়া একাগ্র মনে মাটি কোপাইতেছে। কমল যখন তামাক সাজিতে যায়, দেখে দেশলাইটি যথাস্থানে নাই; তল্লাস করিয়া বক্সটি পায় পুকুর ঘাটে, ভিজা অবস্থায়, খালি। কাঠি-গুলো কিছু ঘাটে ছড়ানো, কিছু পুকুরের জলে ভাসিতেছে। কাঠিগুলি কুড়াইয়া রোদে শুকাইয়া লইতে কমলের একটি ঘণ্টা যায়। কমল যখন বাড়ী ফিরিবে, দেখে গায়ের ছাড়া কোর্তাটিতে মাটি বাঁধিয়া ছোট খোকা উঠানময় টানিয়া বেড়াইতেছে। কমলকে দেখিয়া অন্দরে পলাইয়া যায়। কমল ঢেলা খুলিয়া কোর্তাটি ঝাড়িয়া লয়। দিন-শেষের পুরস্কারের ন্যায় ময়লা কোর্তাটিকে হাসিমুখে কাঁধে ফেলিয়া লম্বা কদমে বাড়ী চলিয়া যায়।

কমল ও ছোট খোকার মধ্যে সম্পর্ক ইহার বেশী দুর গড়াইল না। না কমল খোকাকে কোলে করিল, না খোকা গায়ে পড়িয়া তাহার সহিত দুর্বোধ্য ভাষায় আলাপ জমাইল। আমার কড়া দৃষ্টির ফল হইতে পারে। কমলকে খোকার উৎপাত হইতে বাঁচাইবার জন্য আমি তাহার দা, তামাকের সরঞ্জাম ও ছাড়া কাপড় প্রভৃতি রাখার জন্য বিশেষ স্থান দেখাইয়া দিলাম। কিন্তু ইহাতে কাজ হইল না। একদিকে কমলের ভুল হইতে লাগিল বেশী, অপর দিকে খোকার আঁচ ও নির্ভুল হইয়া উঠিল সে পরিমাণে।

নূতন উপায় চিন্তা করিতেছি, ইহারই মধ্যে একদিন মনে হইল যে, উহার

কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, দেখিতে পাইলাম, নীরবতার ভিতর দিয়াও উহাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইয়া গেছে। খোকার দৌরাত্ম্য যে কমলের শুধু প্রীতিকর তাহা নহে, বরং সে যেন উহারই আশায় থাকে! আর উহারই আশায় থাকিয়া যে সময়টা যায় উহার ভিতর কমল পূর্বের ন্যায় আর বকর-বকর করে না। পূর্বাপেক্ষা গোছালভাবে কাজ করে। এ যেন একই জিনিস আপসে উভয়ে ব্যবহার করিতেছে। খোকা যখন দা লইয়া যায়, কমল দ্বিরুক্তি না করিয়া অপর কাজে হাত দেয়। কমলের যখন কাজ শেষ হইয়া আসে, খোকা পূর্ব হইতেই তাহা বুঝিতে পারিয়া মাটি টানা ছাড়িয়া কমলের কোর্তাটি যথা-স্থানে রাখিয়া দেয়। কমল হাসিমুখে খোকার দিকে চায়। খোকাও এক মুখ হাসি ছড়াইয়া অন্দরে পলাইয়া যায়।

এক সময় নবীনও যে কাজ করিতেছে সে-কথা আমি ভুলিয়াই গেলাম। সেটা—ঘরের যখন খোকার অংশটা নির্মাণ হইতেছে, কমলের তখন উৎসাহের সীমা ছিল না। সে এমন নিখুঁত নক্সা অনর্গল দিতে লাগিল যে, আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। এই খেই-হারা লোকটির কোন্‌খাদটায় যে এত সব কল্পনা জট পাকাইয়াছিল, তাহা কে জানে! উৎসাহের আতিশয্যে, কাজের প্রতি একা-গ্রতায় এ কয়দিন খোকাও পেছনে পড়িয়া রহিল। আমার সহিত কমলের সম্বন্ধ নিবিড় হইয়া উঠিল। এ কয়দিন কমল যাহা করিল না, তাহা আমার মনঃপূত হইল না। নবীনটা যে কাজ করিতেছে, সবই যেন উদ্দেশ্যহীন মনে হইল।

একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—"কমল! তোমার কয় ছেলে।"

কমল এক ঝলক জ্যোতি আমার মুখের উপর ছড়াইয়া উত্তর করিল—"আজ্ঞে, এক ছেলে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কত বয়স?"

সে হিসাব না করিয়াই উত্তর দিল—"আজ্ঞে, ৮ বৎসর ৩ মাস ২৩ দিন।"

ভাবিলাম, পিতা বটে! ছেলের বয়সের মাস দিন পর্যন্ত হিসাব করিয়া রাখিয়াছে। হবেও বা! একটি মাত্র ছেলে কি না।

তারপর বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যাওয়ায় কয়দিন কাজের এমন তাড়াহুড়া লাগিয়া গেল যে ছোট খোকার কথা একরূপ ভুলিয়াই গেলাম। বড় সেনাপতির ন্যায় নবীন যেন একাই একশ' জন হইয়া উঠিল। কোন কথাই হইল না! তবুও এটা পরিষ্কার মনে হইতে লাগিল যে, ভিটা যদি ভিজে তবে সে দায়িত্ব

হইবে নবীনের। নবীনও তাহার আড়ষ্ট ভাব কাটাইয়া হঠাৎ ভয়ানক দৃঢ়তার সহিত হুকুম দিতে আরম্ভ করিল। আমি যে মনিব, আমার উপর যে কারও হুকুম খাটে না, এ প্রশ্ন মনেই আসিল না। আমি ও কমল পরম ক্ষিপ্রতার সহিত তার হুকুম তামিল করিতে লাগিলাম। এ কয়দিন শুধুই মনে হইল: নবীন আমাদের সর্দার, আমরা তাহার অনুগত মাত্র, একমাত্র তাহার হুকুম তামিল করাই হইতেছে আমাদের কাজ। কমল বকব-বকর করিল কি না করিল, তাহা নজরেই পড়িল না।

অবশেষে কাজ শেষ হইয়া আসিল। আমি সামনের সাবেক আসনে বসিয়া কাজ তদারক করিতে লাগিলাম।

যেদিন কাজ শেষ হইবে সেদিন নবীনকে মনে হইল মুক্তির সম্ভাবনায় উৎফুল্ল। কমলকে মনে হইল বড় অন্যমনস্ক।

সে বকর-বকর না করিয়া খুব একমনে কাজ করিল; কিন্তু, তবুও বারে-বারে নবীনের চোখে তাহার অনেক ভুল বাহির হইয়া পড়িল। আর আর দিনের ন্যায় নবীন ইহার জন্য শাসন করিল না বরং দু' একটা হাসি তামাশা করিল। কিন্তু তবুও মনে হইল, যেন প্রতিবারেই কমল উত্তরোত্তর লজ্জিত হইয়াছিল।

পরের দিন উহাদের বেতন চুকাইয়া দেওয়ার দিন। সকালে অভ্যাস মতো কিছুক্ষণ রাস্তায় পায়চারি করিয়া ঘরে ফিরিতেছি—দূর হইতে দেখি দহলিজের সম্মুখে কমল ও ছোট খোকা মুখোমুখী দাঁড়াইয়া আছে। খোকার সদ্যজাগা মুখে তখনও তন্দ্রার আলস। দেখি, কমল একবার চুপি চুপি চারিদিকে চাহিল। তারপর কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া হাত বাড়াইল। খেকোও হাত বাড়াইয়া তাহার কোলে গেল, কিছুক্ষণ কমল তাহাকে বুকে চাপিয়া রাখিল। তারপর সন্তর্পণে নীচে নামাইয়া দিল। এত শীঘ্র যে নামাইয়া দিবে খোকা বোধ হয় আশা করে নাই। কারণ, তখনও তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কমল অতি যত্নে ধুতির খুটে-বাঁধা একটি পাকা বেল বাহির করিয়া খোকার হাতে দিল। বেল হাতে পাইয়া খোকা অন্দরের দিকে ভোঁ-দৌড় দিল। কমল বোধ হয় ইহা আশা করিয়াছিল। কারণ, তাহার মুখটা দেখিলাম হাসি-হাসি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতেই যেন কোথায় কি বিকল হইয়া সে ধীরে ধীরে সেখানে বসিয়া পড়িল।

কমলের বেতন দিতে যাইয়া বড় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। যে করিয়াই

হউক এই আধ-ক্ষেপা লোকটিকে একটা চাকরের মতো হিসাব করিয়া বেতন দিতে আমার বড় লজ্জা লাগিল।

নবীন আসিল পরে। বেতন চুকাইয়া দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "হাঁ হে, তুমি কমলের ছেলেটিকে দেখেছ?"

নবীন মাথা নাড়িয়া ধীরভাবে উত্তর করিল, "তার ত ছেলেপুলে নাই।"

আশ্চর্য হইয়া বলিলাম :—"কি রকম! এই যে বললে, এক ছেলে—আট বছরের মতো বয়স।"

নবীন মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল : "এটা তার স্বভাব। ছেলে কবে মরে গেছে, এখনও প্রতিদিন ও জীবিতের ন্যায় মানুষের মতো তার বয়স হিসাব ক'রে রাখে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম : "আশ্চর্য! ছেলে মরতে নিজের চোখে বিশ্বাস কর্‌তে চায় না যে, ও বেঁচে নেই?"

নবীন ধীরভাবে বলিল : "মরতে ও দেখেনি। তখন ও ছিল রেঙ্গুনে। যে দিন ছেলেটি মারা যায় তার পরের হাটেই কমলের পার্শেল এসে পৌঁছায়—ছেলের জন্য জুতা, বই, কত কি খেলনা! বড় সাধ ছিল ছেলে মানুষ করার। তারপর বাড়ী ফিরে এই 'বকর বকর'—সব কিছুর বিরুদ্ধেই নালিশ। কেউ কাজে নিতে চায় না। আমি কোন রকমে চালিয়ে নিচ্ছি।"

আমি নীরবে পরিমাপ করিতে লাগিলাম, কত বড় একটা অভিযোগ ভিতরে লুকাইয়া এই লোকটা বাহিরে অভিযোগের অভিনয় করিয়া যাইতেছে।

নবীন চলিয়া গেল। কিন্তু আধা পথ হইতেই কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিল। খানিক অপেক্ষা করিয়া বলিল, "বাবুজী! আমার একটা অনুরোধ। শশাঙ্কবাবুকে ব'লে আমার চৌকিদারী ট্যাক্সটা মাফ ক'রে দিতে পারেন? ছেলেপিলে ত জন্মাল না। এ বুড়া হাড় ক'খানার উপর কি চৌকিদারের পাহারা না হ'লেই নয়?"

প্রশ্নে ও গলার স্বরে চমকিয়া উঠিলাম। মনে হইল, এ যেন নবীন আমার সঙ্গে কথা কহিতেছে না। এ যেন একটা ক্লান্ত লোক তাহার ভিতরের মানুষটার ভিতর আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিতেছে। ভাবিতে লাগিলাম : এই লোকটি কতখানি বড়। নিজের নিঃস্বতার ব্যথা ভিতরে চাপিয়া রাখিয়া অপর এক রিক্তের ব্যথা অবলীলাক্রমে বহিয়া যাইতেছে! মনে হইল : এ যে কত বড় তাহার পরিমাপ একমাত্র কমলই জানে। তাই একমাত্র ইহারই শাসন কমল মানিয়া চলে।

দু'মাস পরে। বড় বিপদ! জ্বরের ঘোরে খোকা প্রলাপ বকিতেছে। ডাক্তার কব্‌রেজ শঙ্কিতভাবে পালা করিয়া রাত দিন তাহার শয্যার পাশে কাটাইতেছে। খোকা শুধুই ঝগড়া করিয়া যাইতেছে--বড় ভাই ইউসুফের সহিত ঝগড়া : "দাদা! আমাল বেল! আমাল বেল!"

বিকালের দিকে জ্বর পড়িয়া আসিল। কিন্তু, ডাক্তার বদ্যির মুখে একটা আসন্ন বিপদের ছায়া নামিয়া আসিল। মনটা এত খারাপ হইয়া গেল যে, শান্তির আশায় রাস্তায় নামিয়া পড়িলাম।

কখন যে নিজের অজ্ঞাতেই হাটের নিকটে আসিয়া পড়িলাম তাহা টেরও পাইলাম না। হঠাৎ হুঁশ হইল—রথ-তলায় বহুলোকের সমাগম দেখিয়া এবং বাদ্য কীর্তনের আওয়াজে। চাহিয়া দেখি—যে বাজাইতেছে সে কমল। দু'চোখ বহিয়া আষাঢ়ের ধারা নামিতেছে। সে বাজাইতেছে, কি বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া নিজেই বাজিয়া উঠিতেছে, তাহা ভালো বোঝা গেল না। আর মুদিত নয়নে ভাবাবেশে "হরি রাম হরি রাম হরি হরি রাম রাম" চীৎকারে যে নৃত্য করিতেছে সে নবীন। চোখের জলে তাহার বুক পর্যন্ত ভিজিয়া উঠিয়াছে। দর্শকদের কাহারও চোখ শুষ্ক নহে।

নিজের অজ্ঞাতেই এক পাশে বসিয়া পড়িলাম। দেখিতে দেখিতে মনে হইল, উপস্থিত কাহারও মনেই যেন গ্লানি নাই। মনে হইল : এই সংকীর্তনের মাঝে যেন নবীনের অনাগত সন্তানগণ, কমলের আট বছরের ছেলে, সুস্থ-দেহ ছোট খোকা, মায় তাহার সেই কবেকার সেই বেলটি—সকলেই দু'হাত তুলিয়া আনন্দে নাচিতেছে। যেন সব হারানো জনের দেখাই ইহার ভিতর পাওয়া যাইবে!

নতুন জন্ম

শওকত ওসমান

গোমতী নদী এইখানে হঠাৎ মোচড় মেরে আবার সোজা এগিয়ে গেছে।

পাশে বন্যারোধী চওড়া বাঁধ, মনে হয়, যেন একখানা সুদীর্ঘ বাহু জলা-খাদ মাঠ গোঠ বনানী-শীর্ষ সবুজ-নীল গ্রামের ভিতর দিয়ে সুদূরে মিশে গেছে। দিগন্তের সরু রেখা ঐ বাহু-প্রান্তে উপুড়-করা কর-তালু-লগ্ন রাঙা আঙুলের সমষ্টি। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে তারই নীচে গোমতীর নেশা-ছলছল চোখ। দূরে দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে গোমতী কারো প্রতীক্ষায়। অনুভূতির ঝঞ্ঝা স্রোত-রূপে উদ্বেলিত বুকের সমতলে ফুঁসে উঠ্‌ছে!

বর্ষার অবেলায় ঝিরিঝিরি বাতাসের পিঠে সওয়ার পাহাড়ী মেঘ আকাশ-বিজয়ে তাঁবু তুল্‌লো এই মাত্র।

নিচে গহ্‌নার নৌকা, মাছ-ধরা জেলে-ডিঙি, সাদা গাং-চিল ছন্দের সমতা বজায় রাখছে।

—হালী আইজ ক্ষেপ্‌ছে।

ডিঙি থেকে একজন মন্তব্য করল। হালী অর্থাৎ শালী।

গোমতীর এই মুহূর্তের ভগ্নিপতি ফরাজ আলি ছোট ডিঙির উপর হাল ধরে দাঁড়িয়েছিল। বাঁশের লগী ঠেল্‌ছে তারই বছর এগারো বয়সের পুত্র আক্কাস।

আকাশের দিকে চোখ ফিরিয়ে একবার দেখল ফরাজ আলি। ঝড়ের সম্ভাবনা আছে! কিন্তু পলকে অন্য চিন্তার ঢেউ ওঠে। ঝড়ের কথা আর মনে থাকে না। হাল বগলে দাবিয়ে গলুইয়ের মুখ থেকে সে বিড়ি বের করে, মাটির হাঁড়ি-জীয়ানো আগুনে ধরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি।

গোমতীর বুক, মুখ কালো হয়ে এলো। মেঘের ওপারে সূর্যের অস্তিত্ব এখন অনুমানের ব্যাপার।

বড় আরামে বিড়ি টানে ফরাজ আলি।

স্রোত একটু খর। দুই পাড়ে আছড়ে-পড়া পানির গর্জন-শব্দে অস্বাভাবিকতা। তা ফরাজ আলির কান এড়ায় না।

দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় শব্দে উচ্চারণ করল সে, "হালী…।"

আক্কাস লগী ঠেল্‌ছে। শীতার্ত্ত বৃদ্ধের দাঁতের মত ডিঙির গায়ে লগীর ঠক্‌ঠক শব্দ হয়। উজানের তোড় খুদে কিশোরের কাছে সহজে হার মান্‌তে চায় না।

ফরাজ আলি উৎসাহ দিতে থাকে, সাবাস বেটা!

আক্কাস দাঁত মুখ খিঁচিয়ে লগী ফেলে আর পা টিপে-টিপে অগ্রসর হয়!

শেষে সে ডাকে, বা জান।

কণ্ঠে অসহায়তার আবেদন। বা জান, অর্থাৎ আমি হাল ধরি, তুমি লগী চালাও।

জবাব আসে একটু পরে। জবাব নয়, অনুরোধ।

গোমতীর স্রোত ঘূর্ণী-তোড়ে চীৎকার করে উঠ্‌ল।

—হালী আইজ ক্ষেপ্‌ছে।

ফরাজ আলি গোমতীর সঙ্গে এই সম্বন্ধ পাতিয়াছে বহু-দিন!

চেহারা খানা কালো, আঁট-সাট গাট্টা-বাঁধন, খাটো কদ্‌। তার উপর সে যা' পীচ-রং, দেখতে ঠিক নধর শিশুকের মত! নদীর সঙ্গে রিস্তা থাক্‌বে না কেন?

ফরাজ আলির কালো ভুরুর উপর খোঁচা খোঁচা চুল এসে পড়ে। চোখে দয়া-মায়ার দাগ পর্যন্ত নেই। চোখ নয় ত, গোল কোটরের ভেতর দুটো কালো কাঁচ বসিয়ে মাঝখানে কেউ অতি ছোট্ট পিদিম জ্বালিয়ে দিয়েছে। কথার বলার সময় ফরাজ আলির দৃষ্টি জ্বালা ছড়ায়। বেঁটে শরীর। আরো বেঁটে, মাংসল, পেশী খাড়া হাত। থুতনীর দু-পাশে রুক্ষ চোয়াল থেবড়ে বসে গেছে গৃহস্থের দাওয়ায় কাবুলী-ওয়ালার মত—দেনা-শোধ অথবা সুদ ছাড়া উঠবে না।

দম্ভের প্রতিমূর্তি ফরাজ আলির মুখাবয়ব।

এক হাতে পালের দড়ী ধরেছিল সে। কাফ্রি-সম্রাট যেন স্যালুট নিচ্ছে তাঁবেদার ফৌজ মহলে!

কিন্তু ইতিমধ্যে বাতাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আকাশের প্রাঙ্গণে ধুম্রী নেমেছে। মেঘ-মহল্লা গোষ্ঠি-সুখ চায় না আর।

ফরাজ আলি তাড়াতাড়ি পাল নামিয়ে ফেলল ; এত বাতাসে ছিঁড়ে যেতে পারে। গণ্ডা দশেক তালি বাদামের পাঁজরায়।

—বা-জান, আইস্তা লগি চলাইস্।

—ক্যান ?' পুত্রের জবাব।

—আমাগো ভিটা ছিল এহানে। তোঁয়ার চাচার কবর আছে।

—চাচা ?

—হ। তারে দেখস নাই। হে এক জোয়ান ছিল। ফরাজ আলি উৎসাহে অগ্রজের কাহিনী বয়ান করে। আকাশের দিকে খেয়াল থাকে না। 'তুফানে ডুইব্যা মরছিল।' কথা শেষ করে ফরাজ আলি পুত্রের মুখের দিকে তাকায়। ভয়ের ছায়া কচি মুখে।

—ডর করস, বা-জান ? ডরের কি আছে ? 'এই হালী'···ফরাজ গোমতীর শ্রাদ্ধ-শেষে অন্য কাহিনী পাড়ে। বড় জোর স্রোত। হাল বাগ মানে না। রুক্ষ কণ্ঠে বিড়বিড় করে সে, 'হালী···'।

আবার অস্পষ্ট গলায় পুত্রের আবেদন : বা-জান।

আবেদনের দিকে লক্ষ্য নেই ফরাজ আলির। নিজের মনে আউড়ে চলে, "হালী, তরেও খমু একদিন। বা-জান ?"

বা-জান তখন লগির সঙ্গে কুস্তি-রত। পলিমাটি ছিল নীচে, লগি পুঁতে গেছে। আক্কাস-ও শক্ত ছেলে। লগি তুলে ডিঙির কিনারে-কিনারে এগিয়ে যায়।

—বা-জান, ডর কির লেইগ্যা ?

আবেদন-মাখা কণ্ঠে আক্কাস বলে, "বা-জান, আসমানের দিকে চাইয়া ভাহেন।"

আকাশ কালো হোয়ে গেছে। বেলা বেশী নেই। ফরাজ আলি চেয়ে দেখল। তবু কোন বিকার নেই মুখে।

পুত্র লগি ঠেলে নিঃশব্দে। পিতার মুখের দিকে আর তাকায় না।

গোমতী যেখানে বাইজীর মত কোমর বাঁকায় নৃত্য-ছন্দে, তার-ই কোলে কোলে ঘর আছে। জোর একখানা, দু-খানা। বন্যারোধী বাঁধ আর নদী-তট—মাঝখানে দশ-বারো হাত জায়গা কি আরো কম ফাঁক থাকে। সেখানেই ফরাজ আলির মত আরো যারা আলি আছে তারা আস্তানা বাঁধে। শনে ছাওয়া কুঁড়ে। বাঁধের উপর থেকে মনে হয় ঝড়ে উড়ে

এসে কারো ঘর জমিনে মুখ খুব্ড়ে পড়েছে। কিন্তু বাঁধের গায়ে পায়ে-চলা সরু দাগ-পথে নেমে গেলে দেখা যায়, আর এক জগৎ। আস্ত ঘর। ঘরের মুখ আছে। কান নেই, চোখ নেই। সম্মুখে বালি-চিকচিকে উঠান! কলা গাছের ঝাড় আছে, বান-ভাসি কন্দে ফুলের গাছ আছে। কেউ কেউ চারা ফুলগাছ লাগিয়ে রাখে। ফরাজ আলির চালের সঙ্গে পাখীর খাঁচা ও পাখী ঝুলছে, বুনো লতা কঞ্চির দেওয়াল বয়ে চালে উঠে গেছে। শুচিতার স্পর্শ চৌদ্দিকে। ঘব, ঐ ঘরের ভেতর রহস্য-পুরী। বাইরের মানুষের কাছে জানার কথা নয়, এখানে আছে বাঁশের তক্তপোষ। সোনার পাথর-বাটিব নবতম সংস্করণ। বাঁশেব পায়া, উপরে বাখারি বিছানো—মাদুর পেতে শোযার কাজ চলে। কিন্তু আরো অভিনবত্ব আছে মায়া পুবীর ভেতর। তক্তপোষ, ঐ তক্তপোষের নানা সাইজেব পাযা জড়ো করা থাকে এক কোণে। বর্ষা ও কোটালের জোয়াবে গোমতী একটু গৃহ-সুখ চায, তখন জলের পরিমাপ অনুযাযী পায়া বদল চলে। মাঝে মাঝে তক্তপোষ আভিজাত্যে ফুলে মট্‌কায গিয়ে ঠেকে, কারণ খুব লম্বা বংশ-পায়ার উপর আসীন থাকেন কিনা। পানির সঙ্গে সঙ্গে আবার খাড়াই ছোট হয়ে আসে।

ফরাজ আলির ছোট উঠানের পাশে দু-ঝাড় কলা গাছ দু-দিকে! মাঝখানে বাঁশের পৈঠা। গ্রীষ্মের সময় নদীর পানি সরে যায়। তখন পৈঠা বয়ে নীচে নেমে থালা-বাসন ধোয়া, গোসলের কাজ চলে। অঢেল ভাদ্রের সময় মাচাং-পোষ (মাচাং ও তক্তপোষ) থেকে আর নাম্‌তে হয় না কোন কাজের জন্য। কলাগাছ খুব বাড়ে পলিমাটির উপরে। তলায় দাঁড়িয়ে এইখান থেকে পাতার ফাঁক দিয়ে ফবাজ আলির স্ত্রী দেখত, দূরের আকাশ আর সূর্যোদয়। দু-বছর আগে সে মরে গেছে। এখন সেই জায়গায় মাঝে মাঝে আন্‌মনা হোয়ে দাঁড়ায় আক্কাস।

বসুন্ধরা কত কৃপণা, এখানে এলে বোঝা যায়। দিগন্ত-বিস্তার কত ছোট হোয়ে গেছে! এক ফালি জায়গার বেশী ধরিত্রী তার শিশুদের আর কিছু ঋণ নিতে বিমুখ। ওভারসীয়ার সাহেব এসে বলেছিল, 'ফরাজ আলি, বে-আইনী ঘর তুলেছো'। 'হুজুর নদীর লগে হব গ্যাছে গ্যা'। তার মুখের কথা কেড়ে নিয়েছিলেন ওভারসীয়ার সাহেব, "জমিনটুকু শুধু বাকী। তা ঠিক। কিন্তু কিছু দিতে হয় যে—"

—বে-আইনী করতাছি দিমুনা ক্যান?

—ঠিক বুঝেছো। ওভারসীয়ার সাহেব তখন পরিতৃপ্ত মুখে বিড়ি গুঁজে বলতেন, "জানো ফরাজ আলি, আমাদের আবার ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে দিতে হয়। এই দেয়া-নেওয়ার খেলা চলছে তুনিয়ায়। দিবে আর নিবে, মিলিবে মিলাবে···"। পাঠ্য-পুস্তকের ঢেকুর তুলছিলেন তারপর। সেদিকে ফরাজ আলির কোন কৌতূহল থাকার কথা নয়। দেওয়ার ব্যাপারেই উৎসাহ বেশী। নদীর কোল ছাড়া মন টেকে না। যাক্, কিছু যাক্।

ফরাজ আলির এক প্রতিবেশী প্রায় বলত, "চলেন মিয়া বাই, চইলা যাই এহান থেইক্যা"।

—যামু কোথা? এই হালীর লগে বড় পীরিত, আর কোথাও মন লয় না। গ্যাহো, চুলের লাহান সোতের গেরো।

চুলের মত সোতের গ্রন্থি।

কণ্ঠস্বরে ফরাজ আলির অনুভূতি রূপ পায়। অবয়বে সে পাষাণের মত অনড়।

প্রতিবেশী হাসত। "বড় জবর পীরিত, মিয়া বাই। শাদী করেন এবার। ভাবী-সাব ত বহুৎ জমানা এন্তাকাল করছেন।"

—না। আর শাদী করমু না। এই হালী লগ ছাড়ে কৈ। কিন্তু আমার লগে এত পীরিত ক্যা?

—পছন্দ অইছে।

—হালীরে কৈ, হালী—আঁর কি আছে। ক্ষেইপ্যা উঠস্, ক্ষেইপ্যা ওঠ। যা' হালী বাঁধ ভাইঙ্যা কুমিল্লা শহরৎ—ওহানে বড় বড় সা'ব আছে—পীরিত মজাসে করতা পারবি। সাব মটোর চড়াইবো, শরাব পিলাইবো। যা, হালী যা' —ওহানে ইমারত মিলবো—পাতার ঘরৎ আসস্ ক্যা—হালী হুনস্ কৈ—

অবিকৃত মুখে ফরাজ আলী শ্যালিকার উপর অভিসম্পাত ঝাড়ত।

আজও স্ত্রীর সহোদরা নির্বিকার।

বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে গোমতীর স্রোত দ্রুত শুরু হয়। বাঁশের লগির গায়ে খলখল কল-হাস্যে আছড়ে পড়ে।

আকাশে হুঙ্কার-রত পুরু মেঘ ছিন্ন-ভিন্ন কালো গো-পালের মত গুঁতো-গুতি শুরু করে।

আক্কাস এবার দাবি-দৃঢ়কণ্ঠেই কথা চালায়, "বা-জান। আঁই আর পারতাম নয়। লগি ধরেন আপনে!"

এতক্ষণে হুঁশ হয় ফরাজ আলির, আরো জোরে ঝড় উঠতে পারে।

সমস্ত আকাশ ঝুলে পড়েছে। গোমতীর দূর-বিস্তার-বক্ষ মেঘের অন্ধকারে লুপ্ত। আশে-পাশে কোন নৌকা নেই। পিতা-পুত্র কালো পট-ভূমির গহ্বরে যেন সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

—বা-জান, জল্‌দি করেন।

আশঙ্কা-ক্লিষ্ট চীৎকারে পুত্র হুঁশিয়ারি ছাড়ে। শন্‌শন্‌ বাতাসের আওয়াজ মৃদু-ভাষের কোন দাম নেই আর! ফরাজ আলির চীৎকারে জবাব দিতে হয়ঃ আইতেছি।

পিতার জায়গায় পুত্রের সমাসীন হোতে কয়েক মুহূর্তের অপচয়। তারই ভেতর নৌকা চর্কির মত তিন পাক খেয়ে গেল।

জোরে চীৎকার করে ফরাজ আলি, 'হাইল জুরসে কোলের দিকে টান্‌তে লাগ্‌, বা-জান।"

আঁবে কওয়া লাগ্‌ব না।

এম্নি আক্কাস শান্ত ছেলে। এখন তেজী গলায় বিরক্তি ষোল আনা জানান দেয়।

নৌকা সায়েস্তা হোয়ে গেছে। লগি ফেল্‌ছে ঝপ্‌ঝপ্‌ ফরাজ আলি।

নিমিষে চারিদিক সীসার খাপে যেন ঢুকে গেল। ঝড় উঠ্‌ল জোরে।

চীৎকারে এখন সাধারণ বাক্য বিনিময় হয়। ফরাজ আলি বলে, "ডর না করস, বা-জান। হাইল ঝিক্যা দে। ঝিক্যা দে!"

...দিতাছি। বালকের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বাতাসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

—হালা ক্ষেপ্‌ছিস, হালী। তোরে ডরাই না। তরে ডরাই না! বাচ্চা লগে। হালী আর সময় পাইলি না মস্করার। তরে হ্যাহামু, ছিনাল...

আপন মনে চীৎকার করে আর লগি ঠেলে ফরাজ আলি। কুঁজো হোয়ে যাচ্ছে সে। লগি বেঁকে যাচ্ছে ধনুকের মত! দরদর ঘাম ছুট্‌ছে গা থেকে।

আক্কাস আন্দাজে হাল চালায়।

শন্‌শন বাতাসের সঙ্গে এবার বৃষ্টি শুরু হোলো। শব্দে কান পাতা দায়। চতুর্দিক মুছে গেছে। আঁকা-বাঁকা নানা কোণে বৃষ্টির ফোঁটা তীর বেগে ছুটে আসছে।

ফরাজ আলির ডিঙি থামে না। আঁকছে, বাঁকছে—ঢেউ-এর দোলায়

নেচে নেচে তলিয়ে যাচ্ছে, আবার মাথা ফুঁড়ে উঠ্ছে। হাতের পেশীর কাছে প্রাকৃতিক আক্রোশ বৃথাই ফোঁস চালায় বিষ-শূন্য নাগিনীর মত।

টোকা মাথায় দিতে যায় ফরাজ আলি, উড়ে পড়ে গেল নদীর ভিতর।

—যা 'হালী লিয়া যা, শরীফ খান্দানের মাইয়ার লাহান বুকে কাঁচুলি বাঁধবি। বা-জান, তর টোকা ফেইলা দে—ফেইল্যা দে! একখান কাঁচুলি তোয়ার খালা আম্মার বুকে বেঢপ হ্যাহাইবো—ফেইল্যা দে—।

বাতাসের রন্ধ্রে ফরাজ আলির চিৎকার দাপটের পথ পায়।

আব্বাস পিতার অনুরোধ রাখে না। চুপ-চাপ নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে।

হেসে উঠল ফরাজ আলি। দাঁত বেরোয় না, ঠোঁট কাঁপে না, গালে টোল পড়ে না। তবু হাসে সে। আজব ধরণ। বুক শুধু গুরগুর করে ওঠে, দোলা খায় বার-বার।

ফরাজ আলির মুখ বন্ধ হয় না: "দুলা বাইয়ের লগে মস্করা করতাছস? আঁই মরদ। বুজ্ছনি হালী? মহাজনের কেরায়া নাউ, নইলে হ্যাহাইতাম হালী নাউ চালান্ কারে কয়।"

ফরাজ আলি স্বগতোক্তি কেউ শোনে না। শোনে সে। হয়ত শোনে উন্মাদিনী গোমতী।

গাছ-পালার মেরুদণ্ড রবারের মত কুঁচকে আবার সটান হোচ্ছে। ঝাপসা বৃষ্টি-শীকরে বোঝা যায় না, ওইগুলো গ্রামান্তের গাছ-পালা। পুঞ্জীভূত কালির পাহাড় যেন ভূমিকম্পে কাঁপছে। তারই আর্তনাদ, ছলাৎছল পাগল ঢেউএর অট্টরবে, বাতাসের গলা টেপা গোঙানির শব্দ-পটে।

হাজার লকলকে জিভ নিয়ে বিজলীর সাপ আকাশের আলকাৎরা-গা চেটে নিচ্ছে।

ফরাজ আলি এই চকিত ইশারার ফাঁকেই দেখতে পায়: নিকটে ঘর ও ঘাট। বাঁকের মুখে এসে পড়েছে তারা।

আর একবার ভেংচি দিল সে শ্যালিকার উদ্দেশ্যে!

বৃষ্টি থেমে এলো ইল্সে-ফোঁটায়। ঝড়ের আক্রোশ অবিরাম-গতি তেমনই চল্ছে।

ঘাটে নৌকা বেঁধে ফরাজ আলি চুটিয়ে ঝাল নিংড়ে দিল, "আয় হালী, দেহী ত'র। বা-জান, টোকা ফেইলা দে—।"

শেষ সম্বোধন পুত্রের উদ্দেশ্যে।

আক্কাস কোন কথা না কানে তুলেই জাল কাঁধে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

ঝড়ের জুলুমে মাছ ধরা মাটি। আক্কাসের বড় খারাপ লাগে।

পৈঠায় নৌকা বেঁধে পেছন পেছন এলো ফরাজ আলি।

আগেই ডিপা জ্বেলে দিয়েছে আক্কাস।

ভিজে গামছা খুলে ফালি লুঙ্গি পরছিল, ফরাজ আলি তখন জিজ্ঞেস করে, "সালন পাক করতা চাস্, বা-জান ?"

মাথা দোলায় আক্কাস। নঅ।

—আব্বা। ছাড়ান দিন্। দুফরের বা'তে অইব।

আর কথা বল্‌তে পারে না সে। হি হি করে শীতে কাঁপতে থাকে। অনেক বৃষ্টি গেছে কচি মাথাব উপর দিয়ে।

বাঁশের আল্‌না থেকে কাঁথা টেনে গায়ে দিল আক্কাস।

ফরাজ আলিরও খুব শীত পেয়েছে। এখন প্রয়োজন সামান্য তামাক। নৌকায় সব ভিজে গেছে। বাঁধের উপর, আবো দক্ষিণে বহম মুদীর দোকান আছে। যাওয়াব প্রশ্ন ওঠে না এমন দুর্বিপাকে!

দুইজনে ক্লান্ত।

আক্কাস বেশী কথা বলে না। চুপচাপ থাকে। কিন্তু মনে মনে সংলাপ চলে সে অবিকল পিতাব সংস্করণ। খেলাধূলায় খুব পটু ছিল। আজকাল বাপ সঙ্গী হিসেবে তাব মর্যাদা দিয়েছে। মৃত পত্নীর স্মৃতি অথবা জীবিকার জুটি-রূপে। তাই আরো চুপ করে থাকে আক্কাস। অনেক দিন ঘরে বসে বা ডিঙির লগি ঠেলার সময় নদীর পাড়ে ছেলেদের কোলাহলে তার মেজাজ তেতে, মুখেব পেশী শক্ত হয়ে উঠতো। কিন্তু মুখে সরব কিছু শোনা যেত না।

বাইরে অন্ধকার নদী আব ঝড়ের গর্জন একাকার মিশে গেছে।

পিতা-পুত্র পাশাপাশি বসে আছে। দুইজনে নীরব। সামান্য নড়া-চড়ার ইচ্ছা-টুকুও অন্তর্হিত।

আক্কাস মাঝে মাঝে কান খাড়া করে।

পৈঠার উপর গোমতী মাথা কুটছে। পাড় ভেঙে পড়ছে ঝপঝপ শব্দে।

কলাগাছের জন্য আক্কাসের দুঃখ হয়। সব হয়ত নদীতে ভেঙে পড়বে কাঁদি সহ।

—বা-জান, নদী যা' গরজাইতাছে কেলা গাছ হব পইড়া যাবো, চলেন কাঁচ্চা কাইট্যা আনি।

—আইজ ঠিক থাইকব।

জনক অভয় দিল সংক্ষেপে।

আক্কাস তবু উসখুস করে। তার মন সরে না। সামান্য গড়িমসির ফলে এমন তৈরী জিনিস নষ্ট হবে। এক সপ্তাহ থাকলে পাকা কলা বাজারে বিক্রী করে আসতে পারত।

ঘরের প্রবেশ-পথে সে মুখ বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করল। জোরে ঝড় দিচ্ছে অন্ধকারে আন্দাজেই সে দেখতে পায় যেন, কলাগাছ জোরে নাড়া খাচ্ছে। শিকড়ে বেশী মাটি নেই। রাত্রি কাবার হোতে-হোতে গাছের আয়ুও কাবার হবে।

কিন্তু নিকটে কি যেন সাদা সাদা দেখা যায়। দমকা বাতাসে ছলাৎ শব্দ হয় পৈঠার নিকট। পানি কি বাড়ছে তবে ?

আশঙ্কিত ডাকে আক্কাস, অ বা-জান। বা-জানের খোয়ারী লেগেছিল। আক্কাসের গলা অতদুব পৌঁছায় না।

আবো জোরে ডাকল সে, অ বা-জান।

কি ক'। সুপ্তোত্থিত কণ্ঠ।

—দ্যাহেন। পানি বাড়তাছে। বান আইতা পারে।

গোমতীব বগ্ চেনে ফরাজ আলি। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সে। মাটির বাসন আড়াল দিয়ে পিদিম হাতে এগিয়ে এলো। ফিকে আলো নদীর ধারে পৌঁছায়।

ফরাজ আলি চেয়ে দেখে, নূতন ফেনা পৈঠার গায়ে। আক্কাসের আশঙ্কা মিথ্যা নয়।

আশঙ্কায় ফবাজ আলির বুকও হয়ত কাঁপল। সে বিড় বিড় শুরু করে, 'হালী, এহন-ই জ্বালাইতা লাগছস।"

গালি দেওয়ার বেশী অবসর নেই। ঘরে ফিরে এলো সে। এক কোণে স্তূপীকৃত বংশ-পায়া ঠিক আছে কিনা, পরীক্ষা করল। বান বাড়লে, মাচান-পোষই একমাত্র আশ্রয়।

বাইরে চড়চড়-ধ্বঅস-স শব্দ হোলো। আবার স্রোতের ছুট্‌পাট। যেন কুমীর কোন জংলা হাতী শিকার ধরেছে।

আক্কাস বলে, বা-জান। নদী গাছ নিতাছে, নদী। চলেন··"

—না' আন্দারে যাওনের কাম নাই।

পিতার কণ্ঠ রুক্ষ। সমস্ত নদীর গায়ে কত ফাটল। এখন যাওয়া সমীচীন নয় মোটে। আক্কাস বোঝে না কেন?

বাঁশের পায়া ঠিক করে, দুইজনে প্রতীক্ষায় থাকে। হুড়হুড় শব্দ হচ্ছে। ষাড়ের পাল গাঁ-গাঁ রবে মাঠের সড়ক ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। ঝড়ের দাপট পূর্ববৎ।

আধ ঘণ্টার ভেতর বন্যার জল হু হু বাড়তে থাকে। পৈঠা কবে পার হোয়ে, এখন ঘরে ঢুক্‌ছে।

ওসব দুর্বিপাক ফরাজ আলির গা-সওয়া। কিন্তু আরো কত বাড়ে বন্যা, সেখানেই সমস্যা।

সে আরো কয়েক ইঞ্চি লম্বা পায়া লাগালো মাচাং-পোষে।

আক্কাস চুপচাপ হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে বসে থাকে। বাবা একবার খাওয়ার তাড়া দিল। কিন্তু ক্ষুধা তার মিটে গেছে। ক্রূর কালো অন্ধকার পটে দৃষ্টি মেলে সে এক-একবার তাকায়। তার কিশোর মনে হাজার রকমের প্রশ্ন অর্থহীন জিজ্ঞাসায় ভিড় করে।

দু-ঘণ্টায় বানের জল হু হু করে ঢুকে পড়ল চারিদিকের রন্ধ্র পথে। মাচাং এবার দ্বীপ। পিতা-পুত্র দ্বীপের অধীশ্বর। এখনও জ্বলছে টিম্ টিম্ প্রদীপ। ঝড়ের দমকে ঘরখানা মচ্‌মচ্ শব্দে কাঁপছে। থুবড়ে পড়বে না তো সব নিয়ে! ফরাজ আলি একবার ভাবল।

নীচে হাঁটুর বেশী পানি। দড়ির শিকের হাঁড়ি-কুড়ি ঝুলছে। পাখীর খাঁচা ঘরে তোলা হয়েছিল। ডানায় মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে আছে পাখীটা এক পায়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ খাচা নড়ে উঠল। ডানার ঝট্‌পটানি ওঠে।

সান্ত্বনার স্বরে ফরাজ আলি বলে, "র' র'।" বিষণ্ন খেচর আবার মাথাগুঁজে ডানার ভেতর।

ঝড় সামান্য কম্‌লো। কিন্তু বন্যার জল মেঝের উপর এক বুক

এমন বহু রাত্রি কাটিয়েছে ফরাজ আলির স্ত্রীর সঙ্গে। সেও আজ ভয় পায়। নূতন তৈরী ঘর। এই যা' ভরসা।

নেশাগ্রস্ত প্রাণীর মত আক্কাস ঝিমোয়।

চোখে নিদ্রা। বুকে ভয়। দোটানায় ঝড়ের দমকে ঘর কেঁপে ওঠা মাত্র হঠাৎ সে হাউ-মাউ করে উঠল।

—বা-জান'?

—চুপ র'। ডরাস ক্যা?

ধমক দিল ফরাজ আলি। কিন্তু পর মুহূর্তে সে-ও বিবেচনার লাঙল চালায় মনে মনে। বন্যা পড়েছে, বাড়ছে। এমন কালরাত্রি। এখনও সাঁতার দিয়ে বাঁধে ওঠা চলে।

কিন্তু ঝড়ের মুখে পড়া যুক্তিযুক্ত নয়!

সৌভাগ্য তাদের। ঝড় থেমে গেল একটু পরে। কিন্তু আকাশ সাক্ষী যে-কোন মুহূর্তে আসতে পারে আরো জোরে। দম্‌কা বাতাস থামেনি এখনও।

এই সুযোগ!

আক্কাস বাবার ধমক খেয়ে মাচাঙে শুয়ে পড়েছিল কাঁথা মুড়ি দিয়ে।

ফরাজ আলি তা-কে ঈষৎ ঠেলা-মেরে বলে, "বা-জান, ওড্‌। এহানে আর না।"

—কুই যাবো?

—কি কস? এহানে আর না। বাঁধের উপর যামু।

আক্কাস যেন এমনই অনুরোধের প্রতীক্ষা করছিল। এক মুহূর্তে তৈরী সে।

ফরাজ আলির গলা-সই পানি। আক্কাসের সাঁতার ছাড়া উপায় নেই।

ফরাজ আলি ভাতের হাঁড়ি, মাদুর কাঁথা মাথার উপর চাপিয়ে দিল। শেষে চোখে পড়ে, খাঁচা আর পাখী। তা-ও মাথায় তুলে নিল সে। মনে মনে বলে, "ময়না, এই ঝড়ের রাইত। তোরে ছাড়মু না। জান্‌ যাবে তোগোর। কাল বিহানে ছাইড়া দিমু। হালী..."

ডিপা নিভে গেল একটু অসাবধানতার ফলে। অন্ধকারে উঠানে নাম্‌ল ফরাজ আলি।

"বা-জান"। পুত্রকে সম্বোধন করে বলে সে, "বা-জান আমার কান্ধার পর হাত রাইখ্যা সাঁতার দিতা র'। ঠিগ যামু বান্ধের লগে।"

আকাশে কোন-কোন ঠিকানায় মেঘ সরে গেছে। নিষ্প্রভ চাঁদ ছিল শুক্লা তিথির। এইটুকু বিরাট সান্ত্বনা ফরাজ আলির কাছে। হোক ঝাপসা, বাকীটুকু আন্দাজ পরিপূরক।

আক্কাস পিতার কাঁধ ধরে সাঁতার কাটে। এগিয়ে যায় ফরাজ আলি। খাড়া বাঁধ। সব জায়গা দিয়ে উপরে ওঠা চলে না। পায়ে পায়ে পথ-পড়া দাগ খোঁজা চাই। চাঁদের আলো আর একবার দুই মনুষ্য সন্তানের উপকারে এগিয়ে এলো।

বাঁধের উপর পৌঁছল তারা

আকাশ আরো পরিষ্কার হয়ে আসে। মেঘ-মুক্তির আস্বাদে জ্যোৎস্না ফুটফুটে রোশনাই ছড়ায়।

কাঠের কয়েকটা মোটা গুঁড়ি পড়েছিল চওড়া বাঁধের এক পাশে। তারই উপর পুনর্বসতির মহড়া। সব গুছিয়ে রাখ্‌ল ফরাজ আলি।

তার গামছা, লুঙ্গি পরিধেয় সম্বল দুই ভিজে গেছে। যা' শীত, স্যাঁত্‌সেতে কিছু পরে থাকা অসহ্য। ফরাজ আলির উপস্থিত বুদ্ধি সর্বক্ষণ ঘটে জমা থাকে। সে চট করে ভিজে লুঙ্গি খুসে ফেলে উলঙ্গ হয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে বসে পড়ল কাঠের গুঁড়ির উপর।

আক্কাস মাথায় গামছা বেঁধে সাঁতার দিয়েছিল। তার পরনে কাপড়। শুধু গা শির্‌শির করে শীতে। সে দাঁড়িয়ে থাকে।

ফরাজ আলি বলে, বয়, ব'-জান।

—আঁই বইতাম ন।'

—ক্যা ?

—আঁই আর এহানে থাকুম না।

—যাবি কুই ?

—শহরে যামু।

—খাইবি কি ওহানে ?

—চুরি করমু, ডাকাইতি করমু, কাম করমু—

—মরদের বাচ্চা, চুরি ডাকাইতি করতা চাস, শরম করে না—শরম করে না ?

চিড়-ধরা গলায় জবার দিল আক্কাস, "মান্‌সে এ্যামনে থাহে ? তুমি সুসুণ্ডের বাচ্চা, না মান্‌সের বাচ্চা ? নদীর লগে-লগে থাকার চাও, তোয়ার শরম করে না ? সুসুণ্ডের বাচ্চার লাহান খালি ...।" শিশুকের বাচ্চা ! বিস্ময়ে তাকায় ফরাজ আলি পুত্রের মুখের দিকে।

তারপর জোর করে রুষ্ট পুত্রকে পাশে বসিয়ে বলে, "বয়। ঠিক কইছস। বিয়ান আইতে দে। আমিও যামু তর লগে। মহাজনের নাউ দিয়া দিমু।"

ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপে আক্কাস।

ফরাজ আলি সস্নেহে তাকে কাঁথার ভিতরে মুড়ি দিয়ে নিতে নিতে অপরাধীর মত বলে, "শরম না করস। আঁই তোয়ার পোলা ন, বা-জান ?

বিবস্ত্র পিতা। পাশে গামছা-পরিহিত পুত্র।

দুইজনে ভোরের প্রতীক্ষা করে।

আগুন

বুলবুল চৌধুরী

সত্যি বলতে একরকম রাতারাতিই গৌরীসেনের ভাণ্ডার লুটে এনেছিল তারা। কি দিনই না গিয়েছে সব। আর্থকাটিং, জাঙ্গলক্লিয়ারিং, হাটিং, ব্রিকসলোডিং, আব আন্‌লোডিং,—এক একটা কণ্টাক্ট-এর সঙ্গে রানিং পেমেণ্ট। আরাং নেই এক পয়সার অথচ টাকা এসেছে যেন স্রোতের মতো—উপচে পড়েছে গিয়ে ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে। আর সে কি কর্মচঞ্চল জীবন! রয়েল ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের এস, ডি, ও, থেকে শুরু করে গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ারের হেড কোয়াটার্স অবধি কি ছুটোছুটিটাই না করতে হয়েছে। একদিকে কর্ণফুলির ব্রীজ অন্যদিকে সীমান্তবর্তী রামু—আরাকান রোডের প্রতিটি ধূলিকণাই যেন চিনে নিয়েছে তাদের মোটরের চাকার দানব টায়ার গুলোকে।

তখন চলেছে যুদ্ধ এ্যাসেনসিয়্যাল মিলিটারী ওয়ার্কের সর্বগ্রাসী প্রাধান্য আর প্রায়োরিটি, মাথায় ঘুরেছে কেবল নূতন নূতন কণ্ট্রাক্ট বাগাবার ফন্দি-ফিকির। মুখে মুখে ক্যাপ্টেন মেজর আর লেফ্‌টেনেণ্ট কর্নেলদের মধু-নাম সংকীর্তন। তোয়াজ তদ্‌বির। ফুরসৎ ছিলনা এক মুহূর্তেরও, যেন ঝড়ের গতিতে বয়ে গিয়েছে এক একটা দিনের কর্মবহুল জীবন! তবে হ্যাঁ, এই অমানুষিক ব্যস্ততার মধ্যেও এক একবার মনে হয়েছে: সত্যি, খোদা মেহেরবানই বটে—যিসকো দেতা ছপ্পর ফাড়কে দেতা। চলুক, চলুক এই যুদ্ধ—এই লড়াই—বছরের পর বছর যুগের পর যুগ ধরে চলুক!

বড় আপসোস্ করে নজুমিয়া,—বলে, "এমন যুদ্ধটাই থেমে গেল ডাক্তার! কি ছাই যে এখন করি? ভেবে ভেবে মাথাটা একেবারে গুলিয়ে যেতে বসেছে।"

উদাস ভঙ্গিতে সিগারেটের টান দেয় গোলাম রহমান, আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়ে, "তা যা বলেছে,—উহু, কী ডোবানটাই সত্যি ডোবালো এই জাপানী শালারা। ভেবেছিলাম ব্রিটিশরা আকিয়াব ফিরে দখল করলেও সেখানে বেশীদিন টিকতে পারবে না—আবার এক ধাক্কায় জাপানীরা বেটাদের মংড়ুর দরিয়ায় ফেলে আচ্ছা করে নাকানি—চোবানি দিয়ে ছাড়বে। বলতো' কী ভাবলাম আর আর কী হলো! বদকিস্‌মতি আর কাকে বলে।"

পিট্ পিট্ করে ওঠে নবীন ডাক্তারের চোখদুটো—কথা বলে না যেন চিবোয়, "যে যাই বল, যুদ্ধটা থেমে গিয়ে সবদিক থেকে কিন্তু ভালই হলো। ওষুধ পত্তরটাও রেগুলার পাওয়া যাবে এবার।"

—"কোন দিক থেকে ভাল হলো শুনি।"—প্রতিবাদে যেন ফোঁস করে ওঠে গোলাম রহমান, "ওষুধপত্তর তখনও কী পেতে না? গ্লুকোজ থেকে শুরু করে কুইনিন পর্যন্ত কোন মালটা তুমি আগুন দরে বেচনি বলত পার? আর তার ওপর সুদ বাবদ এই যে হাজারে হাজার টাকা কামালে, বলি যুদ্ধ না বাঁধলে আসমান থেকে বুঝি অতগুলো টাকা তোমার সিন্দুকে ঝরে পড়তো? দেখ ডাক্তার যখন তখন অমন সাধু সেজো না, ভারী রাগ ধরে বুঝেছ?"

রাগ অবশ্য ধরবারই কথা। হাজারে মাসিক একশ টাকা সুদে কর্জ্জ দিয়ে যুদ্ধের দিনে গোলাম রহমানদের মতো নামগোত্রহীন অনেকেই রাতারাতি কন্ট্রাক্টার বানিয়ে ছেড়েছে ডাক্তার। আর্মি মেডিকেল কোর থেকে পেটিপেটি মেপাক্রিন গাপ করে এ অঞ্চলে 'কুইনাইন-মাষ্টার' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে। লালে লাল হয়ে গিয়েছে কালো বাজারে ওষুধ বেচে। তার ওপর এই তল্লাটে বিশ বর্গ মাইলের মধ্যে সেই একমাত্র পাশ করা এল, এম, এফ্ ডাক্তার। একবার ভেবেছিল সব ছেড়েছুড়ে রাতারাতি কন্ট্রাক্টর বনে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই ভুলটা বুঝতে পেরেছিল নবীন। চাটগাঁয়ের এই ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বর অধ্যুষিত দরিদ্র পল্লীঅঞ্চলে কুইনাইনের পরিবর্তে স্রেফ ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার পুরে ইঞ্জেকশন চালিয়ে যাওয়া অনেক বেশী অর্থকরী আর নির্ঝঞ্ঝাট। উপরন্তু হালের এই সব রাতারাতি সাত রাজার ধন পাওয়া ভাগ্যবানেরা তো রয়েছেই—তাদের বিবিসাহেবাদের গর্ভাবস্থায় এক শিশি অস্‌টো ক্যালসিয়াম আর নবজাতকের জন্য নিয়মিত মিল্ক ফুডের যোগান চালিয়ে যেতে পারলে আর চাই কি? এ মুনাফার কাছে কী ছার সাত রাজার ধন।

সৎ বা সাধু নয় ডাক্তার। নিজেও জানে তা ভালভাবেই। আর সত্যি

বলতে, কেইবা এমন সাধু এই দুনিয়ায়। ম্যান ইজ্ এ রেশন্যাল এনিম্যাল—যার স্বার্থবুদ্ধিতে যত শান পড়েছে সে তত রেশন্যাল। পশুর সঙ্গে তুলনায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার কূট বুদ্ধিতে, তার স্বার্থ চেতনায়—এমনি একটা থিওরিতে ডাক্তার আস্থাবান। বলাবাহুল্য, যুদ্ধ থামতে সে নিজেও কম আঘাত পায়নি। কিন্তু তবু সাধুতার ভান করে গোলাম রহমানদের চটাতে বেশ আমোদ পায় ডাক্তার, বেশ খানিকটা কৌতুক অনুভব করে।

গোলাম রহমানের সরোষ উক্তিতে মিট মিট করে ডাক্তার হাসে, বলে—"আমরা হলাম গিয়ে ডাক্তার মানুষ—সেবাব্রতী। গরীব দুঃখীর মঙ্গলের দিকে চেয়ে কথা বললেই তোমাদের গা জ্বালা করে ওঠে—কিন্তু কী করি বল? খাঁটি কথা বলা যে আমার বদ্ অভ্যেস।

—খাঁটি কথা!—চাপা ক্রোধে গোলাম রহমানের সারা শরীরটা রি রি করে ওঠে। অধৈর্যভাবে পকেটে হাত চালিয়ে বের করে নেয় সিগারেট কেসটা, "ওরে আমার দরদীরে—লোকের দুঃখে রাতে তার ঘুম হচ্ছে না! খুব বলতে শিখেছ যা' হোক ডাক্তার।"

—"আহা রাগ কর কেন, তোমরা রাগ করলে আমি বেচারা যাই কোথায় বলতো?"—অমায়িক হাসিতে মোমের মতো গলে ওঠে ডাক্তার; "আসল কী জানো, যুদ্ধ না থাকলেই যে টাকা কামানো যায় না তা নয়। এ্যাদ্দিন ফোঁকটে টাকা কামিয়েছ; যখন তখন বিল দিয়ে টাকা পেয়ে গেছ—এতটুকুও তার জন্য কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। তাই এখন যুদ্ধ থামতেই হন্যে হয়ে উঠেছ, ভেবে পাচ্ছনা কী করবে। আরে বাবা কিঞ্চিৎ বুদ্ধি খরচ করলে অমন কত টাকা ঘরে আসবে। তোমরা তো আর শুনবে না আমার কথা, নইলে—কই, দাও একটা সিগারেট। চা'টা আনাও।"

—"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই"; মন্ত্র বলে সবাই যেন মুহূর্তে উৎসাহিত হয়ে চটপট পকেটে হাত পুরে দেয় মণিব্যাগের জন্য। কার আগে কে চায়ের অর্ডার দিয়ে ডাক্তারকে তুষ্ট করবে তারই যেন একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। কেউ কেউ প্রায় সঙ্গেই ডেকে ওঠেঃ ওরে হাবিব, চা আন খারা খারা,—ছ কাপ আর ছয়ান বিস্কুট।

ডাক্তারের দিকে সিগারেট কেসটি বাড়িয়ে ধরে গোলাম রহমান, বলে; "কী করে বুঝলে যে তোমার কথা শুনবো না? তালিম-টালিম দাও তবে সে বুঝি তুমি দোস্ত। দু' একটা ট্যাক্সি খাটিয়ে পয়সা হয় না ছাই।"

গেন্থমিয়া ফোঁড়ন দিয়ে বসে, "তাও যদি শালার পেট্রোল পাওয়া যেত ঠিক মতো। তার ওপর আমাদের গুলো মোটর নাকি ? আজ স্প্রিং ভাঙছে কাল টায়াব ফুট্‌ছে—বাজনার চেয়ে খাজনা বড়। বল, ডাক্তার বল, বুদ্ধিটুদ্ধি বাৎলাও একটা—শালার লেগে পড়ি—এমন নিষ্কর্মা বসে থাকা চলে না আর।"

অন্তরে যতই বিদ্বেষ থাক, বাইবে ডাক্তারকে খাতির করে এরা। ডাক্তাবেব ধূর্তমির একটা কণা পেলেও এরা বর্তে যেতো। এ জন্যও দুঃখ তাদের কম নয় —গোপন একটা ঈর্ষার ভাবও রয়েছে এদেব ডাক্তারের প্রতি।

ডাক্তার অবশ্য সবই জানে, সবই বোঝে। ঝোপ বুঝে কোপ মাবার কৌশল তার জানা আছে আর সেই জন্যই তার ঠোঁটের কোণে আভাস লাগে ক্ষীণ বাঁকা হাসির। নিরাসক্ত ভঙ্গিতে সিগারেট টেনে টেনে বলে, "তোমবা দুটো পয়সা কামাবে এতো সুখেব কথা—তবে হ্যাঁ, চুনোপুঁটি মেরে হাতে গন্ধ করে লাভ নেই। টাকা কামাতে হলে এয়শা কামাবে যাতে দেদার উড়িয়েও সাত পুরুষ নিশ্চিন্তে চ'লে যায়। এখন যুদ্ধ নেই যে তিরিশ টাকার কাজ করে তিরিশ হাজারের বিল করবে। সে যুগ গেছে। পয়সা অত সহজে আর এখন আসবে না। রীতিমতো মাথা ঘামাতে হবে। আচ্ছা, ভেবে তোমাদের বুদ্ধি একটা বাৎলাব'খন !"

খোদাতালা সত্যি মেহেরবান। যার প্রতি তিনি সদয় তার খোস্‌-কিসমতি আর দেখে কে ! মাথা খেলিয়ে নবীন ডাক্তার কিছু একটা বাৎলাবার আগেই একদিন বিস্ময়করভাবেই গোলাম রহমানের মগজে এক সুতীব্র চমক লাগলো —অতিন্দ্রীয় প্রেরণার আলো যে ভাবে আলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি করেই উদয় হলো বুদ্ধির। আকস্মিক হলেও সেটা দৈব ব্যাপার। এই সেদিনকার ঘটনা, কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ প্রতিবেশী আমির হামজা ফুঁসতে ফুঁসতে এসে হাজির। চোখ দুটো ভাটার মতো জ্বলছে, নিরুদ্ধ ক্রোধে সর্বাঙ্গ কাঁপছে ঠক্‌ ঠক্‌ করে। "মগরপুৎ হালা, আইন দেখাইতো আইস্যেদে তে আঁরে। বাইনঞ্চৎ, বেয়াদপ।"

—"ওবা কি অইল্‌, এত গোস্‌সা কার উঅর ?"—বিস্মিত কৌতুহল প্রকাশ করলো গোলাম রহমান।

আমির হামজা বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মতোই গুরুগর্জনে যেন চিড় খেয়ে উঠলো, "হালার ফইরার পোয়া ফইরা,—পিন্দনর যে একখান তেনা যোগাইৎ ন পারে

তারে কনে কইল্ বিয়া গইরতো ? আচ্ছা, কন তো মিয়া”—আমির হামজা অগ্নিমূর্তি হয়ে বলে চললো।

অভিযোগ গুরুতর ; “বেটা ভিখারীস্য পুত্র ভিখারী, পরনের যে একটুকরো ন্যাকড়া যোগাতে পারেনা সে এসেছে বৌকে নিয়ে যেতে। স্বামীত্বের অধিকার দেখিয়ে আইনের ভয় দেখাচ্ছে—শরিয়তের নজির টানছে! মেয়েকে জবাই করতে হয় তাও সই তবু এমন স্বামীর ঘর করতে আর কখনই তাকে পাঠাবে না আমির হামজা। দুবেলা দুমুঠো খাওয়া যোগান চুলোয় যাক যে মরদ লজ্জা নিবারণের জন্য বিয়ের এই দু'বছরেব মধ্যে এক ফালি কাপড় দিতে পারলো না বৌকে, তার এত তড়পানি।”—আমির হামজার রাগটা চরমেই উঠেছিল।

গোলাম রহমান আজকাল মিয়ামানুষ, ধন দৌলতের অধিকারী প্রতিপত্তি আর সম্মানে গ্রামেব দশজনের ওপর আসন এখন তার। চাষাভূষোদের সালিস নিষ্পত্তি তো তারই করার কথা। অতএব রায় একটা তাকে দিতে হলো—“তালাক নিয়ে ফেলো গে ; সত্যি তো, খাওয়া পরাব অভাবে দলুব বৌয়ের মতো গলায় দড়ি দিয়ে মরতে তো আর পাঠাতে পারোনা মেয়েকে। মেয়ে যখন তোমার সুন্দবী তখন অত ভাবনাই বা কিসের—কত ভাল ভাল জামাই পাবে তুমি” — হাকিমী গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রতিবেশীর অকৃত্রিম হমদরদী মেশাতে গিয়ে একবার ঢোঁক গিলে নিলে গোলাম রহমান। “আর শোনো, যদ্দিন মেয়ের জন্য জামাই একটা না পাচ্ছ তদ্দিন ও আমার বাড়ীতেই থাক। খাবে দাবে, একটু আধটু ঘরের কাজকর্ম করবে। গরীব দুঃখী মানুষ তুমি, নিজের একটা পেট চালানোই ভার—বুঝতে তো পারি সব। যাও, ওকে পাঠিয়ে দাওগে। আহা বেচারী! অমন মেয়ের কপালে কী দুর্ভোগ দেখ না। আজ একটা কাপড়ও না হয় এনে দেবো ওকে এজাহার মিয়ার কণ্ট্রোল থেকে।”

কথাগুলো বলতে বলতে গোলাম রহমান তার বহুদিনের আরাধ্যা সুন্দরী জমিলার যৌবন উদ্বেল দেহ-তনুর একটা কাল্পনিক সান্নিধ্যের উষ্ণতা অনুভব কোরে সচেতন অবচেতনায় কামনার যে স্পন্দিত শিহবন অনুভব করছিল শিরায় উপশিরায়, কিসের একটা চকিত চমকে মুহূর্তে তলিয়ে গেল সেই বিচিত্র অনুভূতিটা। ‘কণ্ট্রোল!’ শেষের কথাটা উচ্চারণ করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা ভীষণ চমক লাগলো গোলাম রহমানের। আর পরমুহূর্তেই যেন উন্মেব লাভ কবলো তার দিব্যদৃষ্টির।......চোখের সম্মুখে এদেশের সাম্প্রতিক বস্ত্র-সংকট জল জল করে উঠলো কাফনের অভাবে মুর্দার অবধি বিড়ম্বনার অন্ত নেই।

অথচ কন্ট্রোলওয়ালাদের কাছে কাপড় আসে,—দরবেশহাট সাতকানিয়ার বড় বড় বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের গুদামগুলো যে খালি পড়ে নেই সে সবাই জানে। তবু দিনের আলোয় একখানা কাপড়ও দেখতে পায় না কেউ,—অলক্ষ্যে সব পাচার হয়ে যায় কাল-দামে। কিন্তু তাতেই বা এমন কী মুনফা করছে এজাহার মিয়ার দল? অনেক, অনেক বেশীগুণ মুনাফার সন্ধান সে জানে। ......গুমদুম, বাউলিবাজার মংডু ভুথিদং...ছায়া ছবির মতো পর পর ভেসে উঠলো তার মনশ্চক্ষে যুদ্ধের দিনের সেই ফ্রণ্ট লাইন—বিবস্ত্র হয়ে আদিম অরণ্য যুগে ফিরে গিয়েছে যে সব অঞ্চল!—গোলাম রহমানের কুটিল ভ্রূদু'টোর নীচে অতি প্রকট তীক্ষ্ণতায় চোখের তারা দুটো নেচে উঠলো: এই তো সুযোগ!

উৎসাহের উত্তেজনায় কখন যে উঠে পড়ে বেরিয়ে পড়েছিল তা সে নিজেই জানতে পারেনি গোলাম রহমান।

আর সে দিন রাত্রেই যখন চারিদিক নিঝুম হয়ে এসেছে, আরাকান রোডের ধূলি উড়িয়ে কাপড়ের গাঁট বোঝাই গোলাম রহমানের বাস দুটো সেই প্রথম দক্ষিণ মুখি হাওয়া হয়ে যেতে শুরু করলো।

শনিবার হাটের দিন।

একটু বেলাবেলিতেই রহমান বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো। পুকুরের ধার দিয়ে, ক্ষেতের বুক-চিরে চলা আল বেয়ে সে এগিয়ে চললো শিস্ দিতে দিতে।

মনটা আজ খুশীতে ভরে আছে রহমানের। একটা নয়, দুটো নয়, ছ' ছ-জোড়া শাড়ীর উপহার পেয়েও পাঁকাল মাছের মতো বার বার পিছলে যাচ্ছিল জমিলা। কিন্তু আজ তার ভাবে-ভঙ্গিতে যেন এই প্রথম আত্ম-নিবেদনের একটা সম্মতি-সূচক ইঙ্গিত পেয়েছে গোলাম রহমান। সত্যি সত্যিই এবার হয়তো ধরা দেবে বন-হরিণী। তবে এইটেই একমাত্র খুশীর কারণ নয়। আরো একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছে আজ সকালে।—সি, ও, আর থানার বড় দারোগা এসেছিল বাঁটে। তার বিরুদ্ধে নাকি সদরে দরখাস্ত গিয়েছে পল্লীমঙ্গল সমিতি থেকে। স্থানান্তরে কাপড় পাচার করছে নাকি সে। অন্যায় করছে! স্বয়ং ডি, এম, এন্‌কোয়েরী চেয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু সে-ও গোলাম রহমান। কত ঘাগী সাদা চামড়া মেজর কর্ণেলদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে এনেছে সে, আর এরা তো সব চুনোপুটি।

গোলাম রহমান ব্যবস্থা করে ফেলেছে চট্ চট্। বীটের মুন্সির ছোট রুমটির গণ্ডীর মধ্যেই এন্‌কোয়ারীর পরিসর সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে চির দিনের জন্য। যাওয়ার সময় দারোগাবাবুরা একটু সাবধানেই কারবার চালাতে উপদেশ দিয়ে গিয়েছে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে আশ্বাসও দিয়ে গিয়েছেঃ এই পল্লীমঙ্গল সমিতির প্রাণ স্বরূপ মোখ্‌তারকে কিছু দিনের জন্য হাওয়া বদলাবার ব্যবস্থা করবেনই তারা শিল্পীর। হাতে তাদের অস্ত্রের কমি নেই। এ সবলোক-মারাত্মক—এ্যাটম বোমার চেয়েও নাকি ভয়ানক।

খুশীটা আজ যেন একটু উপচেই পড়ছে রহমানের। আলের দু'পাশে জমিগুলোতে গ্রামের চাষীরা ধান কাটছে। রহমান সেদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। শীতের সোনালী অপরাহ্ণ—মাঠে মাঠে মধু-গন্ধী সোনার ধানের সম্ভার। অদূরে আরাকান রোড বেয়ে হাটের লোকের গতায়াত। নির্মেঘ আকাশের তলা দিয়ে মিঠে রোদে পাখ্‌না মেলে এক ঝাঁক মরালী বিদ্যুৎ গতিতে উড়ে চলে গেল দক্ষিণের ঢেপার দিকে। এবার আরো খানিকটা লঘুতর ছন্দে জোরে জোরে বাজতে লাগলো—রহমানের শিসে 'ম্যায় বন কি চিড়িয়া বন বন'—

—আঁরার মিয়া নাকি? কডে যাইতো লাইগ্যান? (আমাদের মিয়া নাকি? কোথায় যাচ্ছেন?)—মাঠ থেকে কাস্তে হাতে এক চাষী প্রশ্ন করলে!

মুহূর্তখানেক হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে নিরুত্তরেই আবার চলতে শুরু করলো রহমানঃ কোথায় যেন একটা খোঁচা রয়েছে লোকটার প্রশ্নে, প্রচ্ছন্ন খানিকটা বিদ্বেষ।—নিজের অজ্ঞাতেই রহমানের চলার গতি দ্রুত হয়ে উঠলোঃ রীতিমতো বেতমীজ আর উদ্ধত হয়ে উঠেছে এই অঞ্চলের চাষীগুলো।

কি জানি কী কার্য কারণ যোগ হঠাৎ কোন্ এক ফাঁকে তার মানশ্চক্ষে ঝলসে উঠলো শানিত তরবারীর মতো একটা মুখ। আর সঙ্গে সঙ্গেই অনেকগুলো বিছের কামড়ের মতো সর্বাঙ্গময় এক সঞ্চরমান জ্বালা অনুভব করলো গোলাম রহমান।

কিন্তু সেখানে শেষ হলো না ব্যাপারটা।

হাটে যেতেই পার্শ্ববর্তী খাল পাড় থেকে কার উচ্চ কণ্ঠের ভাসা ভাসা কথার রেশ কানে এলো। কৌতুহলী বিস্ময়ে গোলাম রহমান এগুতে লাগলো সেদিকে। হাটের লোকগুলো খাল পাড়েই এসে যেন ভেঙে পড়েছে। মিটিং।

কিন্তু কে ওই লোকটা যাকে এখনো দেখতে পাওয়া যাচ্ছেনা অথচ যার উদ্দীপ্ত কণ্ঠ আগ্নেয় তীরের মতোই এসে বিঁধছে রহমানের মর্ম মূলে।

বক্তাটি যে কে তা বুঝতে পেরে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখেই রহমান কেমন যেন ভয়ে ভয়ে সভার পেছন দিকের একটা বাঁশঝাড়ের ধার ঘেঁষে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়ালো : চারিদিকে আগুন লাগাবে নাকি লোকটা ! কী সব বলে চলেছে। ..দিকে দিকে বস্ত্র সঙ্কট অথচ আমাদের চোখের সামনে দিনের পর দিন গাঁটকে গাঁট কাপড় লোপাট হয়ে যাচ্ছে কালো বাজারে।—একটা আকাল যেতেই আবার আর একটা আকাল আসছে। আমাদের পরনের কাপড়, মুখের গ্রাস দেহের প্রাণ সমস্তই কেড়ে নিচ্ছে অত্যাচারীর দল।——সংকটের পর সংকট আঘাতের পর আঘাত অত্যাচারের পর অত্যাচার! আর আমরা— যত দুঃখী কিষান ভাইরা নির্জীবের মতো অত্যাচারীর হাজার জুলুম সয়ে চলেছি। কিন্তু আর নয়——মানুষের মতো বাঁচবার অধিকার আমাদের আছে। আমরা বাঁচবোই—এসো আমরা ভাই ভাই জেগে উঠি—দাবানলের মতো জলে উঠে—

গ্রাম-গ্রামান্তরের নিশ্চুপ জনতা রুদ্ধনিঃশ্বাসে শুনে চলেছে। রক্তে কল্লোল জেগেছে তখন ওদের। জলন্ত মুখ—জলন্ত চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুন। ঠিক আগুন নয়, খুন—আর সেই খুনই যেন লাল হয়ে জলছে সান্ধ্য গোধূলির রক্তিম চক্রতীর্থে।

হঠাৎ কোন এক ফাঁকে বক্তার মুখটা এক মুহূর্তের জন্য রহমানের চোখে পড়েই আবার জনতার আড়ালে মিলিয়ে গেল। শানিত তরবারির মতো সেই মুখ। মোখতার, গোলাম রহমানের মনে হলো একটা ছুটন্ত উল্কার মতো অগ্নিপিণ্ড তার চোখদুটোকে যেন ঝলসে দিয়ে গেল ভীষণ ভাবে।

কিন্তু এবার আর বিছের কামড় নয়—খানিকটা তরল আগুনের দহন জ্বালাই যেন সঞ্চারিত হয়ে গেল রহমানের সর্বাঙ্গে। জলন্ত-বিদ্বেষে ফিরতে যাবে এমন সময় সে দেখতে পেলো মন্থরচালে বীটের মুন্সী এগিয়ে আসছে গোটা দুয়েক কনষ্টবলের আগে আগে।

রহমানের পাশ কেটে এগিয়ে যেতে যেতে মুন্সী অভয়ের হাসি হাসলো। চাপাগলায় বললো "ভয় কি? আজই তো মৌকা এসে গেল। দুভিক্ষের নাম গন্ধ নেই অনর্থক প্যানিক সৃষ্টি করছে লোকটা। বুঝুক ব্যাটা এবার—ছ'মাস

অন্ততঃ হাওয়া বদলে আসুক।" বলেই একবার চোখ টিপলো মুন্সী : আজই যাব কিন্তু, থাকবেন বাড়ীতে।

খানিকটা স্বস্তিবোধ নিয়েই রহমান এসে ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারীতে ঢুকলো। বাইরে তখন একটা তুমুল সোর উঠেছে—সহস্র কণ্ঠ প্রতিবাদে যেন ফেটে পড়ছে খালপারে।

—"হুঁ, মুখতার ব্যাটা দেখছি চাষাগুলোর ভারী পেয়ারের লোক হয়ে উঠেছে!" —প্রেস্‌ক্রিপসনের ওপর থেকে চোখ না তুলেই মন্তব্য করলে ডাক্তার!

কিছুদিন পরে—

সম্মুখে এক কাপ চা নিয়ে রহমান দেউড়ীতে বসে হিসেবপত্তর দেখছিল। এমন সময় নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই নবীন ডাক্তারের আবির্ভাব ঘটলো। রীতিমতো বিস্ময় বোধ করলো রহমান, "বলি, ডাক্তার যে! হঠাৎ কী মনে করে? ভুলেও তো কোনদিন এপথ মাড়াও না।"

ঠোঁটের কোণে একবার আলগাভাবে হেসে ডাক্তার একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো। পকেট থেকে বের করে নিজের সিগারেটের প্যাকেটটাই এগিয়ে দিল রহমানের দিকে (কোনদিন দেয় না, এই প্রথম), বললে—"কেমন চলছে তোমার কাপড়ের ব্যবসা? হাজার বিশেক নাকি কামালে? ভালো, ভালো, যেভাবেই হোক ঘরে মোটা কিছু এলেই হলো।"

রহমান একটা নিঃশ্বাস ফেললো, "হচ্ছিল তো ভালই ভাই, কিন্তু কী জানো, পল্লীমঙ্গল সমিতির লোকগুলোই খোদার কসম, সব পণ্ড করে দিচ্ছে। শালারা যেন ওত পেতে আছে চারদিকে। অত ভয়ে ভয়ে কি কাজ-কারবার করা যায়? বেটা মুখতারটাকে ধরবার পর থেকে যেন কী হয়েছে চাষাগুলোর—প্রত্যেক গ্রামে গ্রামেই যেন এক একটা সমিতি গজাচ্ছে। কে জানতো ওকে এরেষ্ট করলে এমন উল্টো ফল ফলবে! তা হলে কী আর আমি—"

ডাক্তারের কানে কিন্তু কথাগুলো ঢুক্‌ছিলো না। সে তখন গভীর তত্ত্ব-চিন্তায় বিভোর। মুহূর্ত খানেক সে নিশ্চুপ থেকে হঠাৎ গম্ভীরভাবে পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ বের করে নিলে। রহমানের সামনে সেটা এগিয়ে দিয়ে বললে, এই দেখ।"

রহমান কৌতূহলী দৃষ্টি বুলালে কাগজটার ওপর : বড়লাটের বেতার

বক্তৃতা ; সমারোহে আগত প্রায় দুর্ভিক্ষের বিজ্ঞপ্তি প্রচার। নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে দেশবাসীর প্রতি গুরুগম্ভীর বাণী দিয়েছেন লর্ড ওয়াভেল।

ডাক্তার সিগারেট ধরিয়ে নিলে একটা, "বুঝলে কিছু ?"

—"পল্লী মঙ্গল সমিতির লোকগুলো দেখ্‌ছি এ্যাদ্দিন মিথ্যেই চেঁচায় নি!"

—"চুলোয় যাক তোমার সমিতি-টমিতি। আমি জিজ্ঞেস করছি, এখন কী করবে ?"

—"কী আবার করবো। যার ভাবনা সে ভাববে, আমার কী ?"

—"নাঃ তুমি দেখছি একটা আস্ত মূর্খ, এখনো ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না।"

একটু ভড়কে গিয়ে গোলাম রহমান ডাক্তারের মুখের দিকে তাকালো!

এবার রীতিমতো বিরক্ত হয়ে উঠলো ডাক্তার, "বলি, টাকা কামাতে চাও ? চাওতো বল। তোমার সঙ্গে একটা বিজনেস ডীলে লেগে পড়ি।"

টাকা! ডীল!—ব্যাপারটা আগাগোড়া একটু রহস্যজনক বলে মনে হলেও এবং সঠিক কোন কিছুর আঁচ করতে না পারলেও রহমান বুঝলে ডাক্তার একটা ভাল মতলবই এঁটেছে! মুহূর্তে সে উৎসাহিত হয়ে উঠলো ঃ "নিশ্চয়— নিশ্চয়।"

তারপর খানিক্ষণ ধরে চা আর ঘন ঘন সিগারেট ধ্বংসের পালা। পরিশেষে ডাক্তার যখন উঠলো রহমানের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম তখন চিক চিক করে জ্বলছে হীরের কণার মতো।

ডাক্তারকে এগিয়ে দিতে দিতে চিন্তিত মুখে রহমান বললে, "বুঝলাম তো ভাই সব—কিন্তু যাই বল—একটু ভয় ভয় করছে!"

—ভয়, কিসের ভয় ?"—যেন দাঁত মুখ খিচিয়ে উঠলো ডাক্তার।

—এই শালার সমিতির লোকগুলোকে। বেটাদের চোখ তো নয়, শকুন ফেল মেরে যায়। বললে বিশ্বাস করবে না, সেদিন রাতে কতকগুলো ফিরতি মিলিটারী ট্রাক থেকে কয়েক টিন পেট্রোল কিনে রাতারাতিই ধান ক্ষেতে পুঁতে রাখলাম। অবাক হয়ে যাই, সে খবরটা পর্যন্ত জেনে ফেলেছে শালারা! আর এবার তো ধান-চাল—মুখের গ্রাস।

—"ওদের চোখে ধুলো দিয়ে কী করে পাচার করতে হয় সে বুদ্ধি বাৎলাবো আমি। তা ছাড়া দক্ষিণে সবখানেই তো আর সমিতি-টমিতি নেই। আর থাকলেই বা, ভয় যদি পাও তবে ভাই এসো না। জানোই তো লোকের অভাব হবে না আমার।"

—"অমনি তোমার রাগ হলো বুঝি? আমি কী বলেছি যে করবো না? নাও, আর একটা সিগারেট নাও।"

সাইকেলে উঠবার জন্য তৈরী হলো ডাক্তার, "তাহলে ওই কথাই রইল। এখন আমি আসি—রাত্রে একবার দেখা করো—চালানের কী ব্যবস্থা করতে হবে বলবো!"

আরাকান রোডের ওপর গভীর রাতের স্তব্ধতা নেমে এসেছে। দু'পাশের আরণ্যানী যেন পিচ-কালো অন্ধকারে প্রেতায়িত। আকাশে বাতাসে একটা আসন্ন ঝড়ের মহড়া চলেছে। কোথায় যেন একটা বাঘ ডাকছে দূরে,—অরণ্যমণ্ডিত পাহাড়ের গায়ে গায়ে তারি ধ্বনি-তরঙ্গের রেশ।

আর বাতাসে পোড়া পেট্রোলের গন্ধ ছড়িয়ে উত্তরমুখী মিলিটারী ট্রাকের একটা ছোট্ট কনভয় হু হু ছুটে চলেছে। দোলাহাজারার 'ঢালা'—দীর্ঘ আট-মাইল ব্যাপি ভয়ঙ্কর সেই অরণ্যপথ। ছুটন্ত হেড লাইটগুলোর তীর্যক আলোয় দু'পাশের নিবিড় বনানী উঠেছে রহস্যঘন হয়ে।

কনভয়ের পুরোভাগে একখানা জীপ—কর্তব্য-দৃঢ়হাতে ষ্টিয়ারিং ধরে বসেছে রহমান নিজেই। রেখাঙ্কিত ললাট,—ঠোঁটের ফাঁকে অসহায়ভাবে সিগারেট পুড়ছে। পাশের সিটখানাতে বসে এক হাব্‌শি সেনা—নেশায়-নির্বাপিত চোখ-দুটো তার এক একবার বুজে আসছে জীপের দোলানিতে।

সমিতির লোকগুলোর শকুন-চোখে ধূলি দিয়ে নিশ্চিন্তে পাচারের উপায়টা ডাক্তার ভালই বাৎলেছে বই কি। বাউলিবাজার, গুমদুম, রামু,—যুদ্ধকালীন সেইসব সীমান্তবর্তী ঘাঁটিগুলো থেকে মধ্যে মধ্যে এখনো দু' একটা করে খালি ট্রাক ফিরছে চাটগাঁ শহরের স্যালভেজ ডিপোতে। ধান তো ধান, ডাকাতি করে লুটের মাল এতে বোঝাই করে নিয়ে গেলেও ধরছে কে তোমাকে? কার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পড়তে পারে এই সব মিলিটারী ট্রাকের ওপর?

দগ্ধপ্রায় সিগারেটটির আগুনে আর একটা সিগারেটই ধরিয়ে নিলে রহমান। আর খানিকটা পথ অতিক্রম করলেই 'ঢালা'র জিরানী খোলা। এক দফা ধান বোঝাই করতে হবে সেখানেও। ফোড়েরা হয়তো ইতিমধ্যে অধীর হয়ে উঠেছে। তা উঠুক, রহমান নিজেও কম অধীরতা অনুভব করছে না। অনেকখানি পথ তার পরেও যেতে হবে তাকে। দোলাহাজারা ছাড়িয়ে চিরিঙ্গা আর চকরিয়া পেরুলে তবেই আসবে হারবাং। সেখান থেকে সাম্পান বোঝাই করে জলপথে

রাতারাতি ধানচাল চাটগাঁ শহর, হাতিয়া, সন্দিপ, নোয়াখালি এমন কি সেই সুদূর কোলকাতার উদ্দেশ্যে পাচার করে না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি কোথায় রহমানের ?

অবশেষে চারদিক ভয়ঙ্কর হয়ে কাল্‌-বৈশাখীর ঝড় উঠলো। ঢালার 'জিরানী-খোলা' পেরিয়ে ততক্ষণে অনেকখানি পথ এসে গিয়েছে কনভয়। মাইল খানেক আর এগুলেই শেষ হবে ভয়াল এই অরণ্য পথটা। হাওয়ার তীব্র-গতির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়েই যেন এক্সিলেটারে আরো খানিকটা চাপ দিয়ে দিলে রহমান।

নিবিড় নিবদ্ধ এই অরণ্যালোকেও জেগেছে ঝড়ের প্রলয় নৃত্যের দোলা। অভ্রভেদী গর্জন সামালিশের ডালে ডালে ক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝার দাপাদাপি শুরু হয়েছে। হুহুঙ্কারে ছুটছে হাওয়া—আর তারই সঙ্গে আরাকান রোডের রাঙামাটির ধুলো উড়ছে।

বাতাসের একটা অতি প্রচণ্ড ঝাপটার সঙ্গে হঠাৎ মুসলধারে বর্ষণ শুরু হলো ! হেড-লাইটের তীব্র আলোতেও খানিকটা দূরের পথ তেমন আর দেখা যায় না। ঘষা কাঁচের মতো কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। সশব্দে সামনের কাঁচে ছিটকে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে একটানা ওয়াইপারটা ঘুরছে। এক্সিলেটরের চাপটা খানিকটা আলগা করে দিয়ে স্পিড মিটারে কাঁটাটা ধীরে ধীরে তিরিশের ঘরে নামাতেই হলো রহমানকে।

ঢালার মুখটা অতিক্রম করতে না করতেই হঠাৎ ভীষণভাবে চমকে উঠে রহমান আচমকা ব্রেক কষে দিলে। সম্মুখের দিকে তাকাতে গিয়েই বিস্ফারিত হয়ে উঠলো হাবশী সেনার চোখদুটো। হেড্‌লাইটের তীক্ষ্ণ আলোকচ্ছটায় খানিকটা দূরে ঘষা কাঁচের মতো পর্দার আড়ালে কতকগুলো ঝাপসা মূর্তি রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে। হাতে তাদের কিরিচ দা'গুলো ঝক ঝক করছে ঃ গাড়ী থামাও, গাড়ীর ভেতর কী আছে আমরা দেখবো।

এখানেও ওরা !— মাত্র একটি মুহূর্তের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা। ঝাপসা মূর্তি-গুলো দু'পা এগিয়েছে কি অমনি একহাতে হাবশীটার পকেটে এক তাড়া 'নোট গুঁজে দিয়ে রহমান ক্রুর আনন্দে গাড়ী ছুটিয়েই টপ্‌ স্পীড দিয়ে দিলে। এবং পলক ফেলতে না ফেলতেই ছুটন্ত গাড়ীটা জনকয়েকের ওপর দিয়েই সাঁ করে বেরিয়ে গেল। পেছনের ট্রাকগুলোও যেন হাওয়ার মুখে উড়ে গেল নির্বিকারে।

তারপর একরকম রুদ্ধনিঃশ্বাসেই একটানা চালিয়ে সেই চিরিঙ্গা। বৃষ্টি বা ঝড়ের কোন নিশানাই নেই এখানে। চিরিঙ্গার ব্রীজটা পার হতে না

হতেই আচমকা গাড়ী থামালে রহমান। সর্বাঙ্গে তখন তার এক শীতল কাঁপুনি লেগেছে। গলাটা উঠেছে শুকিয়ে। হাবশীটাকে লক্ষ্য করে রহমান জড়িত কণ্ঠে বললো—"নাও ইও ড্রাইব সর্জেন্ট। মি ভেরি টায়্যার্ড।" বলেই সে সিট থেকে নেমে পড়লে পথে। কেন কি জানি একবার অত্যন্ত ভয়ে ভয়েই সে তাকালো পেছনের ফেলে আসা পথের দিকে। অকারণে, অত্যন্ত অকারণেই তার মনে হলো সেই ফেলে আসা দূর দিগন্তে যেখানে কালো অন্ধকারে একাকার হয়ে মিশে আছে অরণ্য রেখা—ঠিক সেইখানে কোথায় যেন তুমুল সোর উঠেছে একটা।

অনুমানটা অবশ্য একবারে মিথ্যে নয় রহমানের। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা সোর কিন্তু সত্যই উঠেছিল অন্য কোথায়—অন্য কোনখানে।

ফেলে আসা দূর পশ্চাতে নয়—ক্রোশ আট সম্মুখে, এপথেরই পার্শ্ববর্তী কোনো পল্লীর সুষুপ্তি ভঙ্গ করে দিয়ে তখন জ্বলন্ত করগেটের টিনগুলো সাঁ সাঁ রাত্রির আকাশ পথে উড়ে চলেছে। আগুন লেগেছে রহমানেরই বাড়ীতে আর সে আগুনের লেলিহান শিখা বাতাসের তালে তালে নাচছে প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে! জ্বলন্ত বাড়ীর আতঙ্কগ্রস্ত স্ত্রী পুরুষের বিহ্বল কলকণ্ঠ তলিয়ে দিয়ে আকুল চীৎকারে রহমানের বৃদ্ধ পিতা সাহায্যের নিষ্ফল আর্জি জানাচ্ছে। আর অনড় হয়ে দূর থেকে দাঁড়িয়ে গ্রামবাসীরা উপভোগ করছে সমস্ত দৃশ্যটাই।

—জ্বলুক, জ্বলুক!—মাইনসের বদদোয়া পইড় গে দে তার উয়র।

পুকুরের ওপারে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ হালিম স্বতঃস্ফূর্ত মন্তব্য করলে পাশে দাঁড়ানো প্রতিবেশীদের লক্ষ্য করে।

নিজ বাড়ীর উঠোন থেকে আমির হামজাও তাকিয়ে দেখছে ভয়ঙ্কর কালো আকাশের পটভূমিকার খানিকটা অংশ জুড়ে রুধিরাক্ত সেই দীপ্তিচ্ছটা। উল্লসিত হয়ে মনে মনে সিন্নীই বুঝি সে মানছে এই মুহূর্তে। দশ দশ কানি জমি তার বাকী খাজনার দায়ে নিলামে তুলে কবজ করে ফেলেছে ওই রহমান। এতদিনে গজব পড়েছে তার ওপর খোদার।

কিন্তু আমির হামজা একটু ভুলই বুঝেছে। খোদার গজব নয়—মানুষের ক্রোধই জ্বলে উঠেছে আগুন হয়ে।

উপহারের শাড়ীগুলো বগলদাবা করে খিড়কির পথে উঠানে ঢুকে অলক্ষ্যে বাপের পাশেই এসে দাঁড়িয়েছিল জমিলা। সহ্যের সীমা পেরিয়ে যাওয়ার

অনেক আগেই গোলাম রহমানের আশ্রয় ছেড়ে চলে আসা উচিত ছিল তার। কিন্তু তবু সে সহ্যই করেছে ধৈর্য ধরে। প্রতীক্ষা করছে প্রতিশোধের দিনটির। জমিলা জানতে পেরেছিল গোলাম রহমান কত শত দুঃখী মা বোনদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্রখণ্ড নিষ্ঠুরভাবে হরণ করে চলেছে। দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে সে কয়েকটা উপহারের শাড়ীর বিনিময়ে বার বার কলঙ্ক লেপন করতে চেয়েছে তার নারী সত্তার উপর। এতদিনে তার প্রতীক্ষা সফল হয়েছে। প্রতিশোধ নিয়েই ফিরে এসেছে জমিলা।

তার সর্বাঙ্গ থেকে হঠাৎ বাতাসে এক ঝলক তীব্র গন্ধ ভেসে এলো পাশে দণ্ডায়মান আমির হামজার নাসারন্ধ্রে। পেট্রোলের তীব্র গন্ধ!

আমির হামিজ ভীষণভাবে চমকে উঠে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকালো মেয়ের দিকে

জমিলা জ্বলন্ত বাড়ীর দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই অকম্পিত কণ্ঠে বললো, "আঁই অইন লাগাইদে ও বা'জি।"

শাড়ী বাড়ী গাড়ী

আবু রুশদ

খোদা মুনিমকে ছাপ্পর ফুড়ে দিয়েছে। সংশয়ী বন্ধুরা অবশ্য বলে, তার সব কিছুই শ্বশুরের বদৌলতে। এর পেছনে ঈর্ষা আছে। কারণ, মুনিম শ্বশুর তনয়ার প্রেমে পড়েছিল, এখন শ্বশুরের কথা ওঠালে চলবে কি করে।

জবাবে হয়ত মুনিমের বন্ধুরা বলবে, প্রেম করার পেছনেও তাঁর একটা হিসেব ছিল। আরও হয়ত বলবে, প্রেম করাটা পদমর্যাদার মতো একটা ফ্যাশানের জিনিস, যার ধাপে ধাপে আছে শাড়ী আর গাড়ী। প্রথমে অবশ্য রশীদার টানা চোখটাই মুনিমের চোখে পড়েছিল। তখন বিত্ত তার ঘরে আসেনি, প্রথম যৌবনের চমকিয়ে দেওয়া হৃদয়সম্ভার থেকে তখন সে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়নি। তাই তখন রশীদার আয়ত চোখের স্বচ্ছ গভীরতায় সে মিষ্টি এক নীড়েরই স্বপ্ন দেখেছিল, সোনারূপার কথা ততটা ভাবেনি।

রশীদার খেয়াল ছিল কিন্তু অন্য রকম। দু'হাজারী বাপের আদুরে বেটি ব'লে রূপার ঝলক ও টাকার গমকের কথা ভুলবার অবকাশ সে বড় একটা পায়নি। তাই আচম্বিতে সে যখন আবিষ্কার করল যে, তার হিসেব-না-মানা মন এক সাধারণ চাকুরিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তখন মনের কোণে তার এই খেয়ালই ছিল, কি করে সমাজের উপর-কোঠায় মুনিমকে টেনে আনা যায়।

ইচ্ছে যখন আছে—বিশেষ করে দু'হাজারী দুহিতার ইচ্ছে—পথও একটা বেরিয়ে যায়। তার বাপ সি, আই, ই, করিম সাহেবের আনাগোনা মোগল-পাঠানদের মহলে। তাই মুনিমের নসীবে বাদশাহী অনুগ্রহের ছিটেফোঁটা সহজেই জুটে যায়। এবং রশীদা মিসেস মুনিম হবার বেশ কিছু আগেই পুলকিত

হয়ে টের পায় যে, তার ভাবী স্বামী একশ' থেকে তিনশ', তিনশ' থেকে সাতশ,' সাতশ' থেকে সাড়ে আটশ'তে উঠে গিয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-জীবনের উপরের দিকের ভাঁজে ভাঁজে মিশে গিয়েছে।

মুনিমের চেহারায় আর কিছু থাক বা না থাক্, লোকে যাকে নধরকান্তি বলে তা আছে। তার উপর খোশ নসীবের দ্রুত আনাগোনায় শরীর তার চর্বি এবং মুখে চিকনাই বেশ এসে জমা হয়েছে। এর মধ্যে চাটগাঁর বরকত আলী থেকে তিনটা স্যুট বানিয়ে এবং কোলকাতা থেকে টাই আর জুতা আনিয়ে শরীরের মসৃণতার সঙ্গে বাইরেরও নিভাঁজ পারিপাট্যের সে এক সংযোগ ঘটিয়েছে। যখন সি, আই, ই, সাহেবের (পাকিস্তান হওয়ার পরেও বৃটিশ জমানার মাহাত্ম্যের কথা তিনি ভুলতে পারেন নি) চোখে ঠোকর-মারা-ভাবে সাজানো ড্রইংরুম-এ মোগল-পাঠানদের জমায়েত হয়, তখন তাদের মধ্যে নধর এক ছাগ-শিশুর আবির্ভাব দেখে তাদের দিল বড় খোশ্ নয়।

অতএব যখন একদিন রোশনাই ও বাজনাইর ভেতর দিয়ে তাদের শাদী মোবারক হয়ে গেল তখন রাত্রে সাজানো উপঢৌকনের সারি দেখে বর ও বধূর মনে মিলনের সুখের চেয়ে রূপা ও সোনার জেহেজগুলিই বেশী দোলা দিল।

অবশ্য তাই ব'লে এ বলা যায় না যে, শাদীর শ্বাসরোধ-করা অনুষ্ঠানগুলির পরে মাঝরাতে রশীদার জানালার বাইরে নিম গাছের উপরে তারাখচিত নীল আসমানের ছোট এক কোণে দুষ্টু হাসির মতো আধবাড়ন্ত চাঁদ চোখে পড়েনি, বা মুনিম যখন পাতলা বেগুনী রঙের বেনারসী শাড়ী-পরা নব পরিণীতার দিকে আড় চোখে চেয়ে দেখলো তখন চারবছরের পরিচিতাকে কিছুটা রহস্যময়ী বলে মনে হয়নি।

শাড়ী তো শাদীর পর পরই হ'লো। গণ্ডার পর গণ্ডা, গরীব লোকের ঘরে যেমন ছেলেমেয়ে আসে। শাড়ী পেয়ে যেমন রশীদার তৃপ্তি ; শাড়ী দিয়ে তেমনি মুনিমের চিত্তাস্ফীতি।

বাড়ী হতে কিন্তু বেশ দেরি হ'লো। তার একটা কারণ অবশ্য রশীদার নিজেরই মনে সংশয় ছিল কোনটা ঠিক আগে দরকার : গাড়ী না বাড়ী। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিয়ের কয়েকমাস পরেই ঘরোয়া কয়েকটা বৈঠক হয়ে যায়, এবং দুই জিনিসের সুবিধা অসুবিধার কথা তন্ন তন্ন করে বিচার করে তারা দু'জনেই শেষ পর্যন্ত একই সিদ্ধান্তে আসে যে, গাড়ীর আগে বাড়ীই যেন

ভালো। সি, আই, ই, সাহেবের দৌলতে চাকুরী ও পারমিটের সমন্বয়ে বাড়ী করবার খায়েশ যখন অনেকটা পূরণ হওয়ার পথে, তখন অতর্কিতে বাইর থেকে তুচ্ছ একটা বাধা এসে মুনিমের মনকে দু' একদিনের জন্য বেজার করে তুললো। চিঠি লিখেছে শাহেদ আলী, তার কলেজ জীবনের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। এককালে এমন কিছু নেই, যা তারা দু'জনে মিলে তারুণ্যের সদর্প অহমিকায় করেনি। বেকার হোষ্টেলে থাকতে দু'জনে বাজী রেখে হাড়কাটা গলিতে কোনো শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপককে আচমকা ধরবার খোশখেয়ালে সন্ধ্যের পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছে; মাঝে মাঝে তাদের খায়েশও যে পুরো হয় নি, একথা বোধ হয় বলা যায় না। পরে যখন দু'বন্ধুর মধ্যে আলোচনা হয়েছে, অধ্যাপক সাহেবের সঙ্গে পরের দিন দেখা হলে তিনি যদি জবাবদিহি চান তবে কি উত্তর তারা দেবে, তখন মুনিমই দর্পের সঙ্গে বলেছিলঃ আরে রাখ, ও কি জিজ্ঞেস করতে যাবে, যখন উল্টো জিজ্ঞেস করবো তুমি চান্দু কি করছিলে, তখন বেটা কি জবাব দেবে?

অন্য একবার হয়ত ফারপো রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে পাঁচ ছয় টেবিল দূরে কোনো নীল-নয়নার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শাহেদ সমর্থ হয়েছে। মেয়েটিও দেহের ব্যাঞ্জনায় ও চোখের ভাষায় দু'বন্ধুকে যুগপৎ নাস্তানাবুদ করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেনি। শাহেদ ভেবেছে, মেয়েটির দাক্ষিণ্যতাকেই লক্ষ্য করে, মুনিম ভেবেছে, তারই কাছে অপরিচিতা নিজের হৃদয়ের নৈবেদ্য অর্পণ করেছে। বাইরে অবশ্য মুনিম বললেঃ দেখরে শাহেদ, মেয়েটা তোকে গিল্‌ছে কি ভাবে। শাহেদ উল্টো বলেঃ গিল্‌ছে বটে, তবে আমি-পুঁটিকে নয়।

সে সব অবশ্য অনেকদিনের কথা, পেছনে ফেলে আসা তারুণ্যের ঝলমলানো বৈভব মোগল-পাঠানের বিক্রমে, রূপা জহরতের দ্যুতিতে নরম শাড়ীর অগাধ কোমলতায়, বাড়ী করার নিকট খুশীতে নিষ্প্রভ ও ম্লান হয়ে গিয়েছে। এবং সেজন্য সাতাশ-বসন্তে ভারাক্রান্ত মুনিমের মনে কোন ক্ষোভ নেই।

আশ্চর্য, শাহেদ চিঠি লিখেছে টাকা চেয়ে। বলেছে বউয়ের গুরুতর অসুখ, তার নিজের এখন খুব হাত টান, বন্ধু যদি শ' পাঁচেক টাকা পাঠায় তবে বড় সুবিধা হয়। এই টাকা চাওয়ার প্রস্তাবটা মুনিমের কাছে বড় নোংরা মনে হয়, কারণ মোগল-পাঠানদের দুনিয়ায় গরীব স্বামীর বউয়ের অসুখ হওয়ার কথা কেউ ভাবে না।

বউয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে বন্ধুর চিঠির জবাব এই বলে দেয় যে, বাড়ী

করবার দরুন তাদের হাত বড়ই টানাটানি, এখন শ' পাঁচ টাকা দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। তবে বউ ভালো হয়ে যাবার পর যদি সে এবং শাহেদ দু' এক দিনের জন্য তাদের এখানে এসে বেড়িয়ে যায় তবে তারা খুব খুশী হবে।

তবুও, তাজ্জবের কথা, মন থেকে মুনিম বন্ধু ও তার বউয়েব কথা একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। যখন ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারের কাছে গিয়ে সে পুরো একটা সেগুন গাছ কি ভাবে আদায় করবে তার মতলব ভাঁজে তখন কথার ফাঁকে ফাঁকে শাহেদের বউয়ের কথা তার মনে পড়ে যায়। মেয়েটি শ্যামলী হলেও তন্বী ও হাস্যময়ী ছিল। চোখে লাগতো বেশ। স্পষ্ট মনে পড়ে, বিয়ে করবার পর বন্ধু যখন তার বউকে প্রথম বারের মতো দেখায়, তখন তার নিজের দিলটা বড় বিগড়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, এ হাস্যময়ী শ্যামলী তন্বী তরুণী যে স্নিগ্ধ শান্তির সম্ভাবনা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, তা রশীদার মধ্যে, তাব চোখের স্বচ্ছ গভীরতা সত্ত্বেও, হাজার হাতড়ালেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেন এমন মনে হয়েছিল, তা মুনিমকে এখন কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারবে না। কি কারণে বন্ধুর বউকে দেখে নিজের পরিণীতার প্রতি সাময়িকভাবে গভীর এক অসন্তোষ বোধ জেগেছিল, তাও সে বুঝিয়ে বলতে পারবে না। তবুও তখন একথাটাই মনে জেগেছিল যে, শাহেদ তার উপর দিয়ে টেক্কা মেরেছে। কেন মেরেছে, কি ভাবে মেরেছে—মনের সে গহন-জটিল প্রশ্নগুলির জবাব সে কোনোকালেই দিতে পারত না, এখনও পারবে না।

ফরেষ্ট অফিসারের বাংলো থেকে নিজের আস্তানায় ফিরে গিয়ে প্রথমেই দেখা হয় রশীদার সঙ্গে। অনেক দিন পরে এই প্রথম মুনিম রশীদার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে। সুখী গৃহিণীর সমস্ত চিহ্ন তার সারা শরীর জুড়ে জলজ্বল করছে; কিন্তু কোনো যেন পেলবতা নেই। সহসা এক মুহূর্তের জন্য মুনিমের মনে এই প্রশ্ন জাগে: রশীদাকে সে ঠিক কি ভাবে চেয়েছিল? চটুল, কথাবার্তায় নিপুণা, তাস্ পিটানো, খলখল করে হেসে পড়া, অশুদ্ধ ইংরেজী ঘটা করে বলা ও ঈষৎ মেদাঙ্গিনী, ধন-দর্পিতা গৃহিণী ব'লে, না-অন্য কিছু হিসাবে? তার দিকে স্বামী যে কিছুটা নূতন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তা রশীদার স্থূল চোখেও ধরা পড়লো, বললো: চেয়ে কি দেখছো?

'কিছু না'—মুনিমের স্বর কেমন যেন আড়ষ্ট শোনায়।

তবে বিকেলে যখন সহকারী পুলিস সুপারের বাসা থেকে আমন্ত্রণ এলো

চায়ের, তখন নিজেকে ফিটফাট করতে মুনিম যতটা যত্ন নিলো ততটা তীক্ষ্ণ নজর রাখলো যে, স্ত্রীর শাড়ীর সঙ্গে ব্লাউজের রঙ মিশ খেয়েছে কিনা এবং তার গলার হারের সঙ্গে নূতন স্যাণ্ডেলের ঢপটা মানিয়েছে কিনা।

বাড়ীটা একদিন সম্পূর্ণ হ'লো। এর পেছনে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অজস্র মেহনত করেছে—তাই তৈরী হয়ে যাওয়া বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে রশীদার মনে সাময়িক এক দ্বন্দ্বের ভাব জেগেছিল: তোফা বেশী দেখতে কে—বাড়ী না স্বামী? আর মুনিমেরও একথা মনে হয়েছিল: এখন তার পক্ষে কে বেশী অপরিহার্য: বাড়ী না বউ? দু'জনের আবার একই কথা মনে হয়েছিল: ছেলে হলে গর্বের ভাবটা—সুখের কথা ত তাদের জানাই নেই—এর চেয়ে বেশী হবে কি?

মাঝে মাঝে রশীদার এখন একথা অবশ্য মনে হয় যে, একটা ছেলে কি মেয়ে হওয়া ভালো। দুই কারণে তার এ কথা মনে হয়। শাড়ী হ'লো, বাড়ী হ'লো। গাড়ী না হয়ে ছেলে হওয়াই এখন বরং ভালো। তাতে শুধু সংসারেরই পূর্ণতা আসবে না, মুনিমকেও আরও দৃঢ়তর শৃঙ্খলে বাঁধা যাবে। এর দরকার রশীদা এরই মধ্যে টের পেয়েছে। কারণ, মনে তার কোনো সূক্ষ্মতা না থাকলেও সে নারীর সহজাত অনুমান শক্তির উপর ভর করে এ কথা স্পষ্ট বুঝেছে যে, কখনও কখনও বিরল ও দুর্লভ-গভীর কোনো অবসর ক্ষণে—মুনিম তার প্রতি যেন কিছুটা অসহিষ্ণু, কিছুটা নারাজ হয়ে ওঠে। এই যে এত টাকা ঢালা এত সাধ ও পরিশ্রমের নূতন ইমারত, তাতে এরই মধ্যে কোথায় যেন গভীর এক খাদ আশ্রয় নিয়েছে, কোথায় যেন নোনা ধরেছে।

মাস দুয়েক পরে, রশীদা যখন সন্তান-সম্ভবা এবং গাড়ীর জন্য টাকা যখন বেশ কিছু জমা হয়েছে—তখন টাউন রেশনিং অফিসার-এর বাড়ীতে চায়ের দাওয়াত খেতে গিয়ে এক কোণে শাহেদ ও তার বউকে চুপটি করে বসে থাকতে দেখে মুনিম যেমন তাজ্জব হয় তেমন হয় অপ্রস্তুত। পরে জানতে পারে, বন্ধুর মুখেই, সে এখানে সাবডেপুটি হয়ে এসেছে। অনুযোগ করে মুনিম বলে: তুমি জানো আমি এখানে আছি, তাও এখানে আসবার সময় আমায় কিছু জানালে না!

শাহেদ বেশ ভদ্রভাবেই জওয়াব দিলো: বড় তাড়াহুড়া করে এসেছি, খবর দেবার সময় পাইনি। তারপরে কথাচ্ছলে মুনিম আরও জানতে পারলো যে,

শাহেদ এখনও বাসা পায়নি, তার এক প্রফেসর বন্ধুর তিন কামরাওয়ালা বাড়ীর একটা কামরা নিয়ে আপাতত আছে।

আহত হওয়ার ভান করে মুনিম বলে : কেন, আমাদের এখানে এসে উঠতে পারলে না, বন্ধুকে ভুলেই গিয়েছ নাকি ?

মিষ্টি হেসে—কিন্তু সে হাসিতে কেমন যেন এক শাণিত বিদ্রূপ ছিল, শাহেদ বলে : না ভাই, ভুলব কেন, বন্ধু হলে কি ভোলা যায়।

কথাটা সহজ তাও মুনিমের মনে হ'লো, সে কথার পেছনে কোথায় বেশ একটা মোলায়েম খোঁচা আছে।

ত্বরিত দৃষ্টিতে একবার মুনিম বন্ধুর বউয়ের দিকে তাকিয়ে নিল। সম্প্রতি তার যে কোনো গুরুতর অসুখ করেছিল তার চেহারা দেখে এখন সে কথা বুঝা ভার। আগেকার মতো তন্বীটিই আছে, বেতসলতার মতো কম্পমান তার দেহের সুষমা মুনিমের মনে এখনও কিছুটা ঘোর ধরিয়ে দেয়। সত্যি কি ওর অসুখ করেছিল, না ধার চাওয়ার বাহানা করে বন্ধু সে কথা লিখেছিল ?

মুনিম বন্ধুর বউয়ের দিকে ত্বরিত দৃষ্টিতে যে একবার তাকিয়ে নিলো তা রশীদা ত্বরিততর চোখে দেখতে পেয়েছিল। মনটা হঠাৎ রশীদার কেঁপে ওঠে। এই যে বাড়ী, এই যে হরেক রংয়ের কত ধরনের শাড়ী, এই যে হবু হবু গাড়ী—এগুলিই কি সত্যিকারভাবে সে চেয়েছিল, না এগুলি চেয়েছিল অন্য কোনো কারণে ? তার মনে কখনই ছিল না সূক্ষ্ম কোনো অনুভূতি। সূক্ষ্মতর কোনো চাওয়ার সঙ্গে মুখোমুখি কোনো পরিচয় তার এ পর্যন্ত ঘটেনি। তবে সাড়ে তিনশ' টাকা মাইনে-পাওয়া সাবডেপুটির পনেরো টাকা দামের মিলের শাড়ী-পরা বউয়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার একথাই মনে হ'লো যে, জীবনের কোনো জায়গায় সে যেন বড় এক মার খেয়েছে, অথচ ঠিক বুঝতে পারছে না।

চায়ের যখন জলসা তখন সবসময় এক দম্পতির কথাই ভাবা যায় না। বাধ্য হয়ে মুনিমকে আরো অনেকের সঙ্গে আলাপ করতে হয়, যদিও বন্ধুজায়াকে গভীরতরভাবে পর্যবেক্ষণ করবার ইচ্ছে তার পুরোমাত্রায় ছিল। রশীদাকেও অন্য অনেকের সঙ্গে আলাপ করতে হয় এবং সবসময় স্বামীর দিকে নজর রাখবার চেষ্টা তার ফলবতী হয় না।

জলসা যখন খতম হয়, বন্ধুকে মুনিম বলে : আমাদের এখানে সামনের রোববারে খানা খেতে এস। তারপর সবচেয়ে মিষ্টি হাসি হেসে—অন্ততঃ সে নিজে মনে করে সেটাই তার সবচেয়ে মিষ্টি হাসি, বন্ধুর বউকে বলে : আপনিও

আসছেন ত ? বন্ধুর বউও মিষ্টি হাসির জবাব দেয় মিষ্টিতর হাসি হেসেঃ আপনি যদি আসতে বলেন আর আপনার বন্ধু যদি নিয়ে যান আসবো। এর মধ্যে রশীদা তাদের সামনে এসে শাহেদ ও তার বউ দুজনকেই বলে, যেন তারা কত দিনের জানা আপন লোকঃ যে ক'দিন আপনারা বাসা না পান আমাদের এখানে এসেই থাকুন না কেন। তারপর স্বামীর দিকে মুখ তুলে চেয়ে বলেঃ তুমি কি বলো ? স্তব্ধতার ভাব কৌশলের সঙ্গে গোপন রেখে মুনিম বলেঃ এতে আমি আর কি বলবো, এলে ত ভালই হয়।

শাহেদ জিনিসটাকে মোলায়েমতার পর্যায়েই রেখে বলেঃ না ভাই, এখন আর যাওয়া যাবে না, আমার প্রফেসর বন্ধুটি কিছুতেই ছাড়বে না।

ঈষৎ মেদাঙ্গিনী মাতৃত্বের পূর্বাভাস-স্বাক্ষরিতা রশীদার মধ্যেও সাময়িক-ভাবে কেমন করে যেন এক মসৃণতা আসে, তার স্থূল মনেও সূক্ষ্মতার এক ঝিলিক খেলে যায়। স্বামীর বন্ধুর দিকে তার আয়ত চোখের গভীরতা ছুঁড়ে মেরে বলেঃ ইনিও ত আপনার বন্ধু, এক বন্ধুর এখান থেকে আর এক বন্ধুর ওখানে আসা এমন কি অশোভন ? তারপর শাহেদের বউয়ের দিকে সখীর মতো হাত কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েঃ কি বলেন ভাই, ঠিক না ? সে শুধু মুচকি হাসে।

যাবার সময় বন্ধুকে মুনিম বলেঃ রোববারে তোমার জন্য গাড়ী পাঠিয়ে দেব সাতটা নাগাদ। তারপর বন্ধুপত্নীর দিকে চেয়েঃ আপনিও আসবেন কিন্তু। শেষের কথাগুলি রশীদার বুকে কেমন যেন বাজে।

ধার করে আনা জীপে চড়ে যখন তারা বাসায় ফিরে যাচ্ছে, রশীদা স্বামীকে বলেঃ তুমি যে বললে তাদের জন্য গাড়ী পাঠিয়ে দেবে, গাড়ী আমাদের কই ? তার এক অভাবনীয় জবাব দেয় মুনিমঃ কেন গাড়ী নেই বলে মনে কি তোমার কোনো ক্ষোভ আছে ? প্রশ্নটার ধরণ একটু অতর্কিত বলে চট করে রশীদা তার জওয়াব দিতে পারে না। শুধু বলেঃ কি কথার কি জওয়াব।

সারা পথ ধরে স্বামী-স্ত্রীতে আর কোনো কথা হয় না

শনিবার বিকেলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে মুনিম রশীদাকে বলেঃ শোনো এক ভালো খবর আছে। একটা আটচল্লিশ মডেলের পুরানো অষ্টিন পাওয়া যায়, দেখবে ? তখন স্বামীর এই ব্যস্ততার পেছনে অন্য কোনো অর্থ আছে কিনা, সে

কথা ভাববার মতো অবকাশ রশীদার হয়নি, তাই সহজ স্ফূর্তির সঙ্গে তখনই বলল ঃ চলো এখনই দেখে আসি।

গাড়ীটা এক সাহেবের, দেশে ফিরে যাওয়ার সময় বিক্রী করে যেতে চায়। বলল, শুধু পনেরো হাজার মাইল চলেছে, ইঞ্জিনটা এখনো খাসা রয়েছে, পাঁচ হাজারে দিয়ে দেবে। যদি তারা চায় গাড়ীটা দু'তিনদিন পরখ করে দেখতে পারে, পছন্দ হলে এবং দরে বন্‌লে নেবে, নতুবা কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

মোটামুটি গাড়ীটা তাদের পছন্দই হ'লো। তিনদিন চালিয়ে দেখা যাক কেমন কাজ দেয়, যদি বড় রকমের কোনো গোলমাল না করে তবে হাজার পাঁচেক টাকায় এ গাড়ী কেনা অসঙ্গত বোধ হয় হবে না।

গাড়ী অন্ততঃ তিনদিন রাখতে পারায় মস্ত এক সুবিধা হ'লো ঃ কাল সন্ধ্যায় এতে করে শাহেদ ও তার বউকে আনিয়ে নিতে পারবে। তখন শাহেদ ও তার বউ দু'জনেই দেখবে শাড়ী বাড়ী গাড়ী মিলে মনিম ও রশীদার কি ঠাট-বহর। সেই ঠাট বহর দেখে বন্ধুর নিভাঁজ তৃপ্তির ভাব ও তার বউয়ের শ্যামলী সুষমা অটুট থাকে কিনা সেও লক্ষ্য করবার জিনিস হবে।

রোববারের বিকেলের দিকে গাড়ীটা কিন্তু ষ্টাট নিল না। হাজারো চেষ্টা করেও মুনিম গাড়ীকে যখন চালু করতে পারলো না, তখন এই ভেবে হাঁপিয়ে উঠলো, কি করে বন্ধু ও বন্ধুজায়াকে আনানো যায়। তাই শরণাপন্ন হ'লো রশীদার। সে সল্লাহ্ দেয়, সহকারী পুলিস সুপার খান্‌কে ফোন্ করতে। তার হাতে নাকি দু'টা জীপ আছে। একটা কিছুক্ষণের জন্য হয়তো দিতে পারবে।

খানসাহেব ফোনে বললেন, জীপ পাওয়া যাবে, ঘণ্টাখানেকের ভিতরেই পাঠিয়ে দিচ্ছেন। জীপ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলেও মুনিমকে তেমন যেন খুশী মনে হ'লো না—তার দিকে একপলক চেয়ে রশীদা অন্ততঃ তাই আঁচ করলো। বললে ঃ কেন জীপে বন্ধুদের আনতে কোনো অসুবিধা হবে? কিছুক্ষণ স্ত্রীকে পর্যবেক্ষণ করার পর মুনিম বলে ঃ নিজের গাড়ী পাঠিয়ে যা সুখ পরের জীপে কি তা হয়!

এবার কিন্তু রশীদা বড় তাড়াতাড়ি জবাব দেয় ঃ আসবে যারা তারাও যখন পর তখন জীপটা পরের হলে কিসের এমন ক্ষতি?

পুরুষ নিজের বন্ধুকে ঠিক পর ভাবতে পারে না। আর বন্ধুজায়ার কথা পুরুষ কি ভাবে? রশীদার কথায় যে ঝিলিক ছিল তা মুনিমের মনকে

কিছুক্ষণের জন্য অবশ করে দেয়, শিগ্‌গীরই সামলিয়ে নিয়ে বলে : পর আপনের অত সূক্ষ্ম বিচারের কথা আজ তোমার মনে হ'লো কেন।

রশীদা আর সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার মনে করে না।

জীপ একাই চালিয়ে শেষ পর্যন্ত মুনিম বন্ধুদের আনতে যায়। একবার রশীদাকে বলেছিল সঙ্গে আসতে। জবাবে কিন্তু সে, 'ঘরে অনেক কাজ আছে' সে-অজুহাতে আসতে রাজী হয়নি। মুনিম অবশ্য বুঝে উঠতে পারেনি কাজটা ঠিক কি। কারণ রাঁধবে ত রাঁধুনী, পরিবেশন করবে বেয়ারা, এর মধ্যে এমন কি বড় কাজ রশীদার পড়ে গেল? মুহূর্তের জন্য এ-কথাও তার মনে হয়েছিল, ইচ্ছে করেই রশীদা তাকে একা ছেড়ে দিল, কিছুটা পরখ করবার এবং কিছুটা বাজিয়ে নেবার মতলবে।

অনেকদিন পর এই প্রথম মুনিম সরাসরি নিজের মনের দিকে তাকায়। তাতে অবশ্য জীপ চালিয়ে যেতে কোনো অসুবিধা হয় না। এটুকু সে বুঝতে পারে যে, বন্ধুকে তার দরকারের সময় পাঁচশ' টাকা দিয়ে সে সাহায্য করেনি বলে শাহেদের মনে তার প্রতি নিশ্চয় গভীর এক বিতৃষ্ণা আছে। এবং এও বোধহয় ঠিক, সে বিতৃষ্ণা শুধু শাহেদের মনেই আবদ্ধ থাকেনি, তার বধূর মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। যতই মোলায়েমভাবে শাহেদ তার কথাগুলির জবাব দিক, যতই মিষ্টি হেসে তার বউ মুনিমের দাওয়াত গ্রহণ করুক, তবুও মনে মনে তার সম্বন্ধে কি তারা ভাবে, সেটা তার বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। তাদের দাওয়াত করবার পেছনে মুনিমের আসল উদ্দেশ্য এই যে, তার প্রতি তাদের মনে কোনো খাদ আছে কিনা সেটা বের করা। চায়ের জলসায় সে সুযোগটা ঠিক হয়নি।

আর যতই এ চিন্তাটা সে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুক, সে বুঝতে পারে যে, বন্ধুর প্রতি অদ্ভুত এক ঈর্ষার ভাবও তার মনে ঠাঁই পেয়েছে। তার সঙ্গে বন্ধু-জায়ার তন্বী পেলবতার কতটা সম্পর্ক সে এখনও নিজের মনে যাচাই করে দেখেনি। তবে গত ক'দিন ধরে কাজের ফাঁকে ফাঁকে হামেশাই তার মনে হয়েছে যে, শাহেদ ও তার বউ তাকে এবং রশীদাকে জীবনের গভীরতম এক খেলায় হারিয়ে দিয়েছে। সে হারাটা সত্যি কি মিথ্যা, আজ সে যাচাই করে দেখতে বদ্ধপরিকর।

প্রফেসর বন্ধুর বাড়ীর যে কামরায় শাহেদ ও তার বউ থাকে সেখানে তারা মুনিমকে ডেকে নিয়ে এলো। কামরাতে ঢুকেই তার নিরাভরণতাই

মুনিমের চোখে প্রথম ধরা পড়ে। একটা তক্তপোষ—স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বোধ হয় তাতে শোয়, তিন চারটে পুরনো বেতের চেয়ার, একটা ভাঙা বেতের টেবিল। কামরার এক কোণে ছোট একটা সস্তা দামের বিবর্ণ হয়ে যাওয়া আলনা—সেখানে পাইকারিভাবে শাড়ী তোয়ালে কামিজ মোজা ঝুলছে।

সে কামরায় আসবার আগে স্বামী-স্ত্রী বোধহয় মনের সুখে গল্প করছিল; কেউই যাওয়ার জন্য এখনও তৈরী হয়নি। বন্ধুজায়া হঠাৎ বলেঃ আপনার জন্য একটু সরবৎ নিয়ে আসি? আর মুনিমকে প্রতিবাদ করবার কোনো সুযোগ না দিয়েই সে ভিতরের দিকে চলে গেল।

বন্ধুকে এই প্রথম মুনিম একা পায়। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সে বলেঃ আমি তোমাকে দরকারের সময় পাঁচশ' টাকা ধার দেইনি বলে নিশ্চয়ই মনে মনে তুমি আমাকে খুব ছোট ভাবছো।

—তা ছোট ভাববো কেন, টাকা না থাকলে টাকা দেবে কোথ্‌থেকে? শাহেদ কথাটা যথাসম্ভব সহজ করে দিতে চায়।

—তুমি নিশ্চয়ই সে কথা বিশ্বাস করনি, ভেবেছ, যে-বন্ধু দালান ওঠাতে পারে, সে ইচ্ছা করলে দরকারের সময় তোমাকে নিশ্চয়ই পাঁচশ' টাকা ধার দিতে পারতো।

—থাক ভাই, ওসব কথা, দরকার এখন ত আর নেই, সে কথা তুলে কি হবে। —শাহেদের গলার স্বরে বিদ্বেষের কোনো আভাস পাওয়া যায় না।

নেবুর সরবৎ নিজের হাতে বয়ে এনে তক্তরীর উপর গ্লাসটা মুনিমের সামনে রেখে দিয়ে সহজ মিষ্টি হেসে বন্ধুজায়া বলেঃ আপনাকে খাতির করবার মতো আমাদের তেমন সামর্থ ত নেই, যদি কিছু মনে না করেন এ নেবুর সরবতটুকু খেয়ে ফেলুন।

তার কথাগুলি শুনে মুনিমের একবার মনে হয়েছিল কিছুটা তাতে যেন ব্যঙ্গের ভাব আছে; কিন্তু খুশীতে জলজল-করা বন্ধুপত্নীর শ্যামলী পেলবতা লক্ষ্য করে তার মন থেকে সে সংশয় উড়ে যায়। মনে হয়, খুশীর ভরাট স্রোতস্বিনীতে অবগাহন করে স্বামী-স্ত্রীর কেউই স্রোতস্বিনীর কোনো জায়গায় কোনো পঙ্কিল আবিলতা আছে কিনা, তার খোঁজ নেওয়া দরকার মনে করে না। মুনিম বরং খুশীই হতো যদি তারা ভাবে-ব্যবহারে এ কথাটা তাকে বুঝিয়ে দিত যে, সে তাদের প্রীতি পাওয়ারও যোগ্য নয়।

কিন্তু সরবৎ আনার পেছনে মনের এই যে সহজ অকুণ্ঠিত মাধুর্যতা উপলব্ধি করে বন্ধুজায়ার দিকে বোবা বেদনায় সে চেয়ে থাকে।

খুব ঘটা করে রশীদা শাহেদ ও তার বউকে গাড়ী থেকে নামিয়ে সোজাসুজি তার ড্রইংরুমে নিয়ে যায়। রশীদার সাজবার মধ্যে বেশ একটা রুচির পরিচয় আছে, সচ্ছলতার আভাস ত থাকবেই। শাহেদের বউয়ের সাজ-গোজ লক্ষ্য করে নিজের প্রতি রশীদা বেশ প্রীতিই বোধ করে। তার তীক্ষ্ণ চোখে এড়ায় না—যে-মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ী শাহেদের বউয়ের পরনে, তা নতুন কেনা নয়; গলায় একটা হার পরেছে বটে, তবে বড় সরু; হাতে যে কয়গাছি চুড়ি আছে সেগুলিও তাই; সেগুলোর দামও পনেরো টাকার বেশী হবে না। সব মিলে তাই রশীদা বেশ খুশীই বোধ করে। সে খুশীর ভাব আরও বাড়ে যখন সে লক্ষ্য করে শাহেদ ও তার বউ দু'জনেই রশীদার মহার্ঘ আসবাবে-ভরা ড্রইংরুমের চারদিকে কৌতুহলী ও সপ্রশংসিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

খুশী হয়ে ওঠা মন অবশ্য হঠাৎ বড় দ'মে পড়ে, যখন সে দেখে বার-বারই ড্রইংরুমের আসবাব-পত্র থেকে স্বামী-স্ত্রীর দৃষ্টি পরস্পরের উপর নিবদ্ধ হচ্ছে; চোখে চোখে তারা অন্তরঙ্গ ধরনে কি যেন কথা বলছে। সে কথা বাইর থেকে আঁচ করা রশীদার্র পক্ষে যদিও মুশকিল, এটুকু সে বুঝতে পারে যে, তাতে তার ড্রইংরুমের আসবাব-পত্রের প্রতি কিছুটা কৃপার ভাব আছে। এ কৃপার ভাবের পিছনে তারা পরস্পরে যে কত খুশী সে কথাটাও যেন নিপুণভাবে উচ্চারিত হচ্ছে।

তার অস্বস্তি গভীরতর হয় যখন মুনিমের দিকে সে আড়চোখে চেয়ে দেখে। তার চেকনাই মুখে কেমন যেন এক স্তব্ধতার ভাব এসেছে। মনে হয়, মসৃণ কোনো এক বিষাদে মন তার ছেয়ে গেছে। কি তার কারণ সেও রশীদা অনেকটা আঁচ করতে পারে যখন দেখে মুনিম অবকাশ পেলেই বন্ধুজায়ার দিকে কেমন এক বোবা আকুতিভরা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

স্পষ্ট সে বুঝতে পারে, শাহেদের সঙ্গে আচম্বিতে দেখা হওয়ার পর থেকেই মুনিম মনে মনে তার বউয়ের সঙ্গে রশীদার তুলনা করা আরম্ভ করেছে এবং সে তুলনার প্রতিযোগিতায় রশীদার বারংবার হার হয়েছে। এটা কেমন করে ঘটল সে ঠিক বুঝতে পারে না। রূপসী না হলেও কুরূপা তাকে কেউ বলবে না। কলেজ জীবনে এমনকি তার চোখের প্রশংসা

তার বান্ধবীদের ভাইরা অনেকেই করেছে। একথা বান্ধবীদের মুখেই সে শুনেছে। আর মুনিমও ত তাকে দেখেশুনে, যাচাই করে তাব প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছে।

তারপর তাদের বাড়ী হয়েছে, বিত্তবান না হলেও চিত্তবান অনেক বন্ধু জুটেছে, সমাজের সিঁড়ির অনেক কয়টা ধাপ ডিঙিয়ে তারা এখন বেশ উপরের দিকেই আছে। দু'একদিনের ভেতরেই মোটামুটিভাবে একটা গাড়ীও হয়ে যাবে। তবুও কিনা এ পাঁচ বছর পরে মুনিম তার এক বন্ধুজায়ার দিকে বেদনাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ এ স্থূল সচ্ছলতা-পিয়াসীর মনের আনাচে-কানাচে গভীর এক হতাশা ও সূক্ষ্মতর এক ব্যর্থতার অনুভূতি ঘুরতে ঘুরতে তার সমস্ত অন্তরে অসহনীয় এক জ্বালা ধরিয়ে দেয়। মনে হয়, এ হাল্কা শিফনের শাড়ী তার সারা দেহে বিছুটির মতো হয়ে আছে, কানের হাল্কা দুল এখন যেন বিশমণি বোঝা, নূতন দাসানের ভাঁজে ভাঁজে ঘুণ ও ফাটল ধরেছে, সখ করে যে মটরগাড়ী এনেছিল তা বোধহয় কোনোদিন আব ষ্টার্ট নেবে না।

এমন কি তাজ্জব হয়ে রশীদা আবিষ্কার করে পেটে যে ছেলে তার দেহের সমস্ত রস ও প্রাণশক্তি চুষে নিয়ে তাদের আর্থিক সচ্ছলতার মতোই ফেঁপে ফুলে উঠছে, সেও পরে শাড়ী বাড়ী গাড়ীর মতো—আর সেগুলির চেয়েও যা বড়, তার স্বামীর মতো—তাকে অভাবনীয়, অসম্ভব এক প্রতারণা করবে। আর ধন-মান-দর্পিতা রশীদা এমনি করেই একদিন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

বেয়ারা এসে বলে : মেমসাহেব টেবিল লাগ্‌গিয়া। তাই ত, টেবিল যখন লেগে গেছে, তখন মনের সঙ্গে হিসেব নিকেশ করবার অবসর আর কই ?

এতদিনের অভ্যাস ও সংস্কার মুহূর্তের বেদনা-বোধে ভুললে ত চলবে না। তাই নিপুণভাবে উঠে দাঁড়িয়ে অতি মিষ্টি ধরনে হেসে সে মেহমানদের বলে : চলুন এবার খানা-কামরায় ; খাওয়া তৈরী।

একটি তুলসী গাছের কাহিনী

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ

ধনুকের মত বাঁকা ইট-সিমেণ্টের মত চওড়া পুলটির একশ গজ পরে বাড়ীটা। দোতালা, মস্ত; রাস্তা থেকে খাড়া উঠে গেছে। এদেশে ফুটপাথ নেই, তাই বাড়ীটারও একটু জমি ছাড়বার ভদ্রতার বালাই নেই। তবে বাড়ীটার পেছনে কিন্তু অনেক জায়গা। গোসলখানা-পাকঘর পায়খানার মধ্যেকার খোলামেলা পরিষ্কার স্থানটি ছাড়াও আরো ঢের জায়গা। সেখানে আম-জাম-কাঁঠালের দুর্ভেদ্যপ্রায় জঙ্গল, মোটা ঘাসে আবৃত স্যাঁৎসেঁতে মাটিতে ভাপসা গন্ধ, আর প্রখর সূর্যালোকেও সূর্যাস্তের ম্লান অন্ধকার।

অত জায়গা যখন, সামনে খানিকটা ছেড়ে একটা বাগানের মত করলে কি দোষ হতো?—সে কথাই এরা ভাবে। মতিন ভাবে, বাগান না থাক, সামনে একটু জমি পেলে ওবা নিজেরাই বাগান করে নিতো, যত্ন করে লাগাতো মরশুমী ফুল গন্ধরাজ-বকুল-হাস্নাহেনা, দু-চারটে গোলাপও। তারপর সন্ধ্যার দিকে আপিস থেকে ফিরে ওখানে বসতো। বসবার জন্য না হয় একটা হাল্কা বেতের চেয়ার নয় ক্যানভাসের আরাম কেদারা কিনে নিতো। গল্প করতো বসে-বসে। আমজাদের হুকোর অভ্যাস। সে না হয় বাগানের সম্মান বজায় রাখার মত মানানসই একটা নলওয়ালা সুদৃশ্য গুড়গুড়ি কিনে নিতো সন্ধ্যার বিশ্রামবিলাসের জন্য। গল্প জমিয়ে কাদেরও ছিলো। ফুরফুরে খোলা হাওয়ার তার গলাটা কাহিনীময়, হাস্নাহানার গন্ধের সঙ্গে মিশে মধুর হয়ে উঠতো। কিংবা, জ্যোৎস্নারাতে কোন গল্প না করলেই কী এসে যেতো? মুখ বরাবর আস্তে চাদটার পানে চেয়ে চুপচাপ কী বসে

থাকা যেতো না?—আপিস থেকে শ্রান্ত হয়ে ফিরে প্রায় রাস্তা থেকে ওঠা দোতলায় যাবার সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে সে কথা আরো বার-বার মনে হয়।

এরা দখল করেছে বাড়ীটা। অবশ্য দখল করবার সময় লড়াই করতে হয় নি, অথবা তাদের সামরিক শক্তি অনুমান করে কেউ এমনি হার মেনে নেয় নি। দেশ-ভঙ্গের হুজুগে এ শহরে আশা অবধি উদয়াস্ত তারা একটা যেমন-তেমন ডেরার সন্ধানে ঘুরছিলো। একদিন দেখলো এই বাড়ীটা মস্ত বড় বাড়ী জনমানবহীন অবস্থায় খাঁ-খাঁ করছে। প্রথমে তারা বিস্মিত হয়েছিলো। পরে সদলবলে এসে দরজার তালা ভেঙে রৈ রৈ আওয়াজ তুলে বাড়ীটায় প্রবেশ করে, বৈশাখের আমকুড়ানো ক্ষিপ্র উন্মাদনায় এমন মত্ত হয়ে উঠলো যে, ব্যাপারটা তাদের কাছে দিনদুপুরে ডাকাতির মত মোটেই মনে হলো না। মনে কোন অপরাধের চেতনা যদি বা ভার হয়ে নাব্বার প্রয়াস পেতো সে ভার তুলোধুনো হয়ে উড়ে যেতো তীক্ষ্ণ সে হাসির ঝলকে।

বিকেলের দিকে শহরে যখন খবরটা ছড়িয়ে গেলো তখন অবাঞ্ছিত-দের আগমন শুরু হলো। মাথার উপর একটা ছাতের আশায় তারা দলে দলে আসতে লাগলো। এরা কিন্তু রুখে দাঁড়ালো। ডাকাতি নাকি? যথাসম্ভব মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে বললে, জায়গা কোথায়, সব ঘর ভর্তি। বললে, দেখুন সাহেব, এই ছোট অন্ধকার ঘরেও চার-চারটে বিছানা পড়েছে। এখন তো বিছানা পড়ে ছ ফুট বাই তিন ফুটের চারটে চৌকি, খান ছয়েক চেয়ার বা টেবিল এনে ঘরে জায়গা বলে কোন বস্তু থাকবে না। কেউ সমবেদনা করে বললো, আপনাদের তকলিফ বুঝতে পারছি। আমরা কী এ-কদিন কম কষ্ট করেছি? তা ভাই আপনার কপাল মন্দ। যদি চার ঘণ্টা আগে আসতেন! চার ঘণ্টা কেন, ঘণ্টা দুয়েক আগেওতো নীচে কোণের ঘরটা এ্যাকাউণ্টস আফিসের মোটা মত একটা লোক এসে দখল করলো। রাস্তার উপর ঘর, তবু মন্দ কী। জানালার কাছেই সরকারী আলো, কোনদিন যদি আলো নিভে যায় রাস্তার ওই আলোতেই তোফা চলে যাবে।

দেশময় একটা ঘোর পরিবর্তনের আলোড়ন হয়েছে বটে তবু কোন প্রান্তে সঠিক মগের মুল্লুক বসে নি। কাজেই পরে এ বে-আইনী কাজের তদারক করতে পুলিস এসেছিলো।

পলাতক গৃহকর্তা যে বাড়ীর উদ্ধারের জন্য সরকারের কাছে ধর্ণা দিয়েছিলেন তা' নয়। দখলের কথা জানলে দিতেনও কিনা সন্দেহ। যিনি প্রাণের ভয়ে

এতবড় একটা পরিবার দু'দিনের জন্য স্রেফ দেশ থেকে উধাও করে দিতে পারেন, তাঁর সম্পর্কে সেটা আশা করা বাড়াবাড়ি! পুলিস খবর দিয়েছিলো ওরাই যারা শহরের অন্য কোন প্রান্তে তখন ডাকাতির ফিকিরে ছিলো বলে এখানে চারঘণ্টা আগে, বা দু'ঘণ্টা আগেও এসে পৌঁছুতে পারেনি। নেহাৎ কপালের কথা হচ্ছে, এদের কপালেও মন্দ হবে না কেন। ভাগ্যের ফল নিরীহ লোকেরাও আবার রীতিমত লেঠেল হয়ে উঠতে পারে। সত্যি সত্যি লাঠা-লাঠি না করলেও তার জন্য তৈরী হয়ে থেকে এরা সমগ্র ব্যাপারটা পুলিসকে এমনভাবে বুঝিয়ে দিলো যে সাব-ইন্‌স্পেক্টর দ্বিরুক্তি না করে সদলবলে ফিরে গেলো। রিপোর্ট দেবার কথা। তা এমন ঘোরালো করে রিপোর্ট দিলে যে মর্মার্থ উদ্ধারের ভয়ে তার ওপরওলার কাছে সে রিপোর্ট ফাইল চাপা দিয়ে রাখাই শ্রেয় মনে হলো। তাছাড়া তাড়াতাড়িই বা কী। যারা পালিয়ে গেছে তাদের প্রতি সমবেদনার কোন কথা ওঠে না এবং বাড়ীর নিরুদ্দিষ্ট মালিক যদি এসে কিছু না কয় তবে কেন অনর্থক মাথা ব্যথা করা। তাছাড়া, এরা কেরানী হলেও ভদ্রলোকের ছেলে, দখল করে আছে বলে জানালা দরজা ভেঙে ফেলছে বা ছাতের আস্ত আস্ত বীম সরিয়ে সোজা চোরাবাজারে চালান করে দিচ্ছে, তা নয়।

রাতারাতি সরগরম হয়ে উঠলো বাড়ীটা। এদের অনেককেই কলকাতায় ব্লকম্যান লেন খালাসী পটিতে, বৈঠকখানায় দফতরীদের পাড়ায়, সৈয়দ সালেহ লেনে তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অথবা চমরু খানসামা লেনের অকথ্য দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে। এ বাড়ীর বড় বড় কামরা, নীলকুঠি দালানের ফ্যাশানে দেওয়ালে মস্ত মস্ত জানালা, পেছনে খোলামেলা উঠান, আরো পেছনে বনজঙ্গলের মত আম জাম কাঠালের বাগান এদের কী যে ভালো লেগেছে বলবার নয়। একেকজন বেলাটের মত এক-একখানা ঘর দখল করে নেই সত্যি তবু ঘরে নির্ঝঞ্ঝাট হাওয়া চলাচল, এবং আলোর ছড়াছড়ি দেখে অত্যন্ত খুশী। এবার মনে হয় বাঁচলাম, ফরাগত মত থেকে আলোবাতাস খেয়ে জীবনে এবার সতেজ সবুজ রক্ত ধরবে, হাজার দু-হাজার-ওয়ালাদের মত মুখে জৌলুষ আসবে, দেহ ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের বীজাণু থেকে মুক্ত হবে।

যেমন ইউনুস থাকতো ম্যাকলিওড স্ট্রীটে। সাহেবী নাম হলে কী হবে, গলিটার এক এক অংশ যেন সকালবেলাকার আর্জবনা-ভরা আস্ত ডাষ্টবিন। সে-গলিতেই নড়বড়ে ধরনের কাঠের দোতলায় কর্চ দেশীয় চামড়া ব্যবসায়ীদের

সঙ্গে সে থাকতো। কে কবে বলেছিলো চামড়া গন্ধ নাকি ভালো, যক্ষ্মার জীবাণু ধ্বংস করে। তাছাড়া সে উৎকট গন্ধ ড্রেনের পচা ভোসকা গন্ধও বেমালুম ডুবিয়ে দিত; ঘরের কোণে দশ দিন ধরে ইঁদুর কিংবা বিড়াল মরে পচে থাকলেও নাকে টের পাবার জো ছিল না। ইউনুস ভাবতো মন্দ কী। অন্ততঃ পক্ষে যক্ষার জীবাণু ধ্বংস হবার কথাটা মনে বড় ধরেছিলো। শরীরটা তার ভালো নয় তেমন; রোগাপটকা দুর্বল মানুষ। এখানে দোতলার দক্ষিণ দিকের বড় ঘরটায় জানালার পাশে শুয়ে সূর্যালোকের সোনালী ঝলকানি ম্যাকলিওড ষ্ট্রীটের আস্তানার কথা মনে করে শিউরে ওঠে। ভাবে, এতদিনে কী হয়ে গেছে কে জানে! টাকা থাকলে বুকটা একবার দেখিয়ে আসতো ডাক্তারকে। সাবধানের মার নেই।

ভেতরে রান্নাঘরের বাঁ ধারে একটা চৌকোণ আধ হাত উচু ইটের মঞ্চের ওপর একটি তুলসী গাছ। একদিন সকালবেলায় নিমের ডাল দিয়ে মেছোয়াক করতে করতে মোদাব্বের উঠোনে পায়চারী করছে হঠাৎ তার নজরে পড়লো তুলসী গাছটি। মোদাব্বের হুজুগে মানুষ, একটু কিছু হলেই প্রাণ শীতল করা রৈ রৈ আওয়াজ উঠিয়ে দেয়। এরা সব উঠে এলো। যতটা আওয়াজ ততটা গুরুতর না হলেও কিছু তো অন্তত ঘটেছে।

এই তুলসী গাছটা। এটাকে উপ্‌ড়ে ফেলতে হবে। আমরা যখন এসেছি বাড়ীতে কোন হিন্দুয়ানীর চিহ্ন থাকবে না।

সবাই তাকালো সেদিকে। খয়েরী রঙের আভায় গাঢ় সবুজ পাতাগুলো কেমন ম্লান হয়ে আছে। নীচে ক'দিনের অযত্নে ঘাস গজিয়ে উঠেছে। আশ্চর্য, এটা এতদিন চোখেই পড়েনি, কেমন যেন লুকিয়ে ছিলো।

ওরা কিন্তু হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। যে বাড়ী এত শূন্য মনে হয়েছে, সিঁড়ির ঘরের দেয়ালে কাঁচা হাতে লেখা কটা নাম থাকলেও বে-ওয়ারিশ ঠেকেছে যে, বাড়ীর চেহারা হঠাৎ বদলে গেলো; তুলসীগাছটা আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে অনেক কথা যেন বলে উঠলো।

এদের স্তব্ধতা দেখে মোদাব্বের আরেকটা হুঙ্কার ছাড়লো। ভাবছো কী? কথা সেই, উপড়ে ফেলো।

হিন্দু রীতিনীতি এদের ভালো জানা নেই। তবু কোথায় শুনেছে হিন্দু বাড়ীতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রী তুলসীগাছের তলে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। ঘাস গজিয়ে ওঠা পরিত্যক্ত চেহারার এ-তুলসীগাছের

তলেও প্রতি সন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিতো। আকাশে যখন সন্ধ্যাতারাটি বলিষ্ঠ একাকীত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, ঠিক সে সময়ে ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের নীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটি শান্ত ধীর প্রদীপ জ্বলে উঠতো প্রতিদিন, হয়তো বছরের পর বছর এমনি জ্বলছে। ঘরে দুর্দিনের ঝড় এসেছে, হয়তো কারো জীবন-প্রদীপ নিভে গেছে, তবু হয়তো এ প্রদীপ দেওয়া অনুষ্ঠান একদিনের জন্যেও বন্ধ থাকে নি।

যে গৃহকর্ত্রী বছরের পর বছর এ তুলসী তলে প্রদীপ দিয়েছে সে আজ কোথায়? কেন চলে গেছে? মতীন এক সময়ে রেলওয়েতে কাজ করতো। সে ভাবে হয়তো কলকাতায়, নয় আসানসোল, নয়তো বৈদ্যবাটি হাওড়ায় কোন আত্মীয়ের আস্তানায়। লিলুয়াও বা নয় কেন। বিশাল রেলইয়ার্ডের পাশে মসৃণ একটি কালো চওড়া লাল পাড়ের শাড়ীটা ঝুলছে হয়তো সেটা এ গৃহকর্ত্রীরই। কিন্তু যেখানেই থাকুন, আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন হয়তো প্রতি সন্ধ্যায় এ তুলসীতলার কথা মনে করে গৃহকর্ত্রীর চোখ ছলছল করে।

গতকাল থেকে ইউনুসের সর্দি সর্দি ভাব। সে কথা বললে,—থাক না ওটা। আমরা তো আর পূজা করতে যাচ্ছি না। বরঞ্চ ঘরে একটা তুলসীগাছ থাকলে ভালোই। সর্দি কফে তার পাতার রস উপকারী।

মোদাব্বের এধার ওধার চাইলো। সবার যেন তাই মত। ওদের মধ্যে এনায়েত মৌলভী ধরনের মানুষ। মুখে দাড়ি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আছে, সকালে নাকি কোরাণ তালওয়াতও করে। সে পর্যন্ত চুপ। প্রতি সন্ধ্যায় ছলছল করে ওঠা গৃহকর্ত্রীর চোখের কথা কী ওরও মনে হলো? অক্ষতদেহে তুলসীগাছটা বিরাজ করতে থাকলো। বাড়ীটার আবহাওয়া ভালো। কলকাতায় ঝিমিয়ে-আসা নিস্তেজ ভাবটা যেন কেটে গেছে। আড্ডাও তাই জমে ভালো, দেখতে না দেখতে মুখে ফেনা-ওঠা তর্ক বিতর্ক লেগে যায়। সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক সবরকম আলোচনা। সাম্প্রদায়িকতার কথাও ওঠে মাঝে মাঝে।

—ওরাই তো মূল, সবের বলে।

বলে হিন্দুদের নীচতা ও গোঁড়ামির জন্যই তো আজ দেশটা এমন ভাগ হয়ে গেল।

তারপর তাদের অবিচার-অত্যাচারের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেয়। রক্ত গরম

হয়ে ওঠে সবার। দলের ভেতর বামপন্থী নামে চালু মকসুদ মিঞা কখনো কখনো প্রতিবাদ করে। বলে অতটা নয়। এতটা হ'লেও আমরা বা কম কী। মোদাব্বের দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে। দেখে তথাকথিত বামপন্থীর কাঁটা নড়ে। সে হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবে, কে জানে বাবা আমরাও হলপ করে বলতে পারি দোষটা ওদের, ওরাও শালা তেমনি হলপ করে বলতে পারে দোষটা আমাদের। ব্যাপারটা বড় ঘোরালো, বোঝা মুশকিল। ভাবে, হয়তো, আমারই ঠিক। আমাদের ভুল হবে কেন। আমরা কী জানি না আমাদের ?

কাঁটা সংশয়ে দুলে দুলে হঠাৎ ডানে হেলে গিয়ে স্থির হয়ে গেলো। কাঁটাটি কখনো কখনো না বুঝে বাঁয়ে হেলে আসে বলেই ওর বামপন্থীর অপবাদ।

পায়খানার দিকে যেতে যেতে রান্নাঘরের পাশে তুলসীগাছটি চোখে পড়ে। কে আগাছা সাফ করে দিয়েছে। পাতাগুলো শুকিয়ে উঠে খয়েরী রং ধরেছিল আবার যেন গায়ের রঙের মধ্যে কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে। কে তার গোড়ায় পানি দিচ্ছে। অবশ্য খোলাখুলি ভাবে, লোক দেখিয়ে দিচ্ছে না। সমাজে চক্ষুলজ্জা বলে একটা কথা তো আছে।

ইউনুস ভেবেছিলো ম্যাকলিওড ষ্ট্রীটের চামড়া-ব্যবসায়ীদের নোংরা আস্তানায় আর কখনো ফিরে যেতে হবে না—এখানে আলোবাতাসের মাঝে জীবনের জন্য সে বেঁচে গেলো কিন্তু সে ভুল ভেবেছিল। শুধু ইউনুস কেন, সবাই—যারা ভেবেছিল এ-মাঙ্গার দিনে ভালো করে খেতে না পাক, বাড়ীতে প্রয়োজন মত টাকা পাঠাতে না পারুক, কিন্তু আলোহাওয়ার ভেতর ফরাগত মত থেকে জীবনের দুষ্প্রাপ্য আরামটুকু করবে—তারা প্রত্যেকে ভুল করেছিলো। তবু যাহোক সামনে জমি নেই। থাকলে ওরা আজ বাগান করতো, এবং এই সময়ে অন্য কিছু না হোক, গাঁদাফুলের গাছ বড় হয়ে উঠতো। তাহলে কী প্রচণ্ড ভুলই না হতো।

মোদাব্বের হন্তদন্ত হয়ে এসে বললো, পুলিস এসেছে।—কেন ? ভাবলো, হয়তো রাস্তা থেকে পালিয়ে একটা ছ্যাঁচড়া চোর বাড়ীটায় এসে ঢুকেছে। কিন্তু সেটা খরগোশের মত কথা হলো। শিকারীর সামনে পালাবার আর পথ না পেয়ে হঠাৎ বসে পড়ে চোখ বুঝে খরগোশ ভাবে, কই আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তারাই তো চোর, কেবল গা ঢাকা দিয়ে না থেকে চোখ বুজে আছে।

পুলিসের সাব-ইনস্পেক্টার সাবেকী আমলের হ্যাট বগলে রেখে তখন

দাগ পড়া কপালের ঘাম মুছছে। কেমন একটা নিরীহ ভাব। পিছনের বন্দুকধারী কনষ্টবল দুটোকে মস্ত গোফ থাকা সত্ত্বেও আরো নিরীহ দেখাচ্ছে। ওরা নিস্তব্ধভাবে কড়ি কাঠ গুনতে লাগলো। ওপরে ঘুলঘুলির খোপে এক জোড়া কবুতর বাসা বেঁধেছে। একটা সাদা আরেকটা ধূসর। তাও দেখতে পাবে তারা, তাকিয়ে তাকিয়ে। হাতে বন্দুক আছে কিনা।

মতিন সবিনয়ে বললে,—

—আপনার কাকে দরকার?

—আপনাদের সবাইকে। আপনারা বে-আইনীভাবে এবাড়ী কবজা করেছেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের এ বাড়ী খালি করে দিতে হবে—ব'লে অর্ডার দেখালো।

বাড়ীর কর্তা তাহলে ফিরে এসেছে ট্রেন থেকে নেমে। এখানে এসে কাণ্ডটা দেখে সোজা থানায় চলে গেছে। এখন সঙ্গে এসেছে কি না দেখবার জন্ম আফজল একবার গলা উঁচিয়ে দেখলো। কেউ নেই। পেছনে কেবল গোঁফ-ওয়ালা বন্দুকধারী কনষ্টবল দুটো।

—কেন? বাড়ীওয়ালা কী নালিশ করেছে?

—গভরমেণ্ট বাড়ী রিকুইজিসন করেছে।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলো তারা। অবশেষে মতিন বললে,—

—আমরা তো গভরমেণ্টেরই লোক।

মাঝে মাঝে মানুষের নির্বুদ্ধিতা দেখে অবাক হ'তে হয়। কথা শুনে নিস্তব্ধ কনষ্টবল দু'টো পর্যন্ত কড়িকাঠ থেকে চোখ নামিয়ে তাকালো তাদের পানে, ভাবাচ্ছন্ন চোখ হঠাৎ কথা কয়ে উঠলো।

বাড়ীতে এরপর একটা ছায়া নেমে এলো। ভাবনার অন্ত নেই। কোথায় যাই এই চিন্তা। কেউ কেউ রেগে উঠে বলে কোথাও যাব না, এইখানেই থাকবো। দেখি কে ওঠায়। কেউ যদি এ বাড়ীর চৌকাঠ পেরোয় তবে সে আমাদের লাশের উপর দিয়ে আসবে। (কোথায় ছাত্ররা নাকি এমনি এমনি গায়ের জোরে একটা বাড়ী দখল করে আছে। তাদের ওঠাবার চেষ্টা করে সরকারের উচ্চতম কর্তরা পর্যন্ত নাকি নাস্তানাবুদ হয়ে গেছে। সে কথাই স্মরণ হয়।) অবশেষে রক্ত তাদের গরম হয়ে ওঠে। বলে কখ্‌খনো ছাড়বো না। যে আসে অস্নুক, কিন্তু সে যেন এ কথা জেনে রাখে যে, তাকে আমাদের লাশের উপর দিয়ে আসতে হবে।

ক-দিন গরম রক্ত টগবগ করলো। কাজে মন নেই, খাওয়ায় মন নেই। কেবল কথা, তিক্তরসে সিঞ্চিত ঝাঁজালো কথা। কিন্তু ক্রমশঃ কথা কমতে লাগলো। এবং এদের কথা থামলে রক্ত ঠাণ্ডা হ'তে ক-দিন।

এরা তো আর ছাত্র নয়। এরা যে কী, সে-কথা দর্প ক'রে সেদিন পুলিসকে নিজেরাই তো বলেছিলো। বাড়ী রিকুইজিসন হবার কথা শুনে কিছুক্ষণ বিমুখ থেকে বলেছিলো, কেন, আমারা তো গভরমেণ্টরই লোক।

একদিন তারা সদলবলে চলে গেলো। যেমন ঝড়ের মত চলে গেলো, ঘরময় ছিটিয়ে রেখে গেলো পুরোনো খবর কাগজের টুকরো, কাপড় ঝোলাবার দড়ির একটা দুর্বল অংশ, বিড়ি-সিগারেটের টুক্‌রা, বা ছেঁড়া জুতোর গোড়ালিটা। নীল কুঠি-বাড়ীর ফ্যাশানে তৈরী দরজা-জানালাগুলো খাঁ খাঁ করতে লাগলো। কিন্তু সে আর ক-দিন। রঙ-বেরঙের পর্দা ঝুলবে সেখানে।

পেছনে বান্নাঘরের পাশে তুলসীগাছটা কেমন শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় আবার খয়েরী রঙ ধরেছে। যেদিন পুলিস এসে বাড়ী ছাড়বার কথা জানিয়ে গেলো সেদিন থেকে তার গোড়ায় কেউ পানি দেয় নি। তুলসীগাছের কথা না হোক, গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও কী এদের আর মনে পড়েনি ?

কেন পড়েনি সে কথা কেবল তুলসীগাছ জানে, যে তুলসীগাছকে মানুষ বাঁচাতে চাইলে বাঁচাতে পারে, ধ্বংস করতে চাইলে এক মুহূর্তে ধ্বংস করতে পারে অর্থাৎ যার বাঁচা বা সমৃদ্ধ হওয়া আপন আত্মরক্ষার-শক্তির উপর নির্ভর করে না।

মানুষের জন্য

মুনীর চৌধুরী

আত্তাহিয়াতো শেষ করে কেবল ছালাম ফিরিয়েছেন, মোনাজাতের জন্য তখনও হাত তোলেন নি। বাইরে রাত কেটে আলো ফুটেছে কিন্তু ফিনকি দিয়ে সে আলোর ফালি ছড়িয়ে পড়েনি তখনও। ফজরের নামাজের প্রান্তে মোনাজাতের আগুক্ষণে প্রকৃতির সমস্ত সাদা পবিত্রতাকে চিরে ছিঁড়ে খান খান করে উত্তর বাড়ীর প্রাঙ্গণ থেকে আকাশের দিকে উঠে গেল একটা বিকট অশ্রাব্য সম্ভাষণ। চৌধুরী বাড়ীর মুন্সী আফজাল সাহেব জায়নামাজের উপরই একবার মুখ বিকৃত করে ফেললেন সে শব্দে। চেষ্টা করলেন, দু'কানকে কিছু না শুনিয়ে শূন্যে এমনি ঝুলিয়ে রাখতে। প্রাণপণ চেষ্টা করলেন জোড়া হাতের প্রশস্ত গহ্বরে মনকে নিমজ্জিত করে আল্লাহর কাছে পৌঁছুতে। পৃথিবী থেকে পালিয়ে সম্পূর্ণ মায়ামুক্ত দিল দিয়ে চাইলেন জলদি জলদি মোনাজাত খতম করতে।

আফজাল সাহেব পরহেজগার মুসল্লী হলেও এমন কিছু সুফী আউলিয়া ছিলেন না, কাজেই মোনাজাত করবার সময়ও উত্তর বাড়ীর প্রাঙ্গণ থেকে ছদুমিঞার কণ্ঠস্বর তিনি সর্বক্ষণ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলেন। ছদুমিঞার যেমন গলা তেমনি ভাষা। অর্থজ্ঞাপক অঙ্গভঙ্গীও যে নিশ্চয়ই সব সময় ভাষা প্রয়োগকে টীকা হিসেবে অনুসরণ করে চলছিল তাও আফজাল সাহেব অজুকরা রেখাঙ্কিত হাতে স্পষ্ট দেখতে পান।

ছদুমিঞা গালি দিচ্ছে। লক্ষ্যবস্তু বাড়ীর কেউ। বেশী দূর হলেও সে নিশ্চয়ই পাঁচ দশ হাতের মধ্যেই উপস্থিত আছে; কিন্তু গলার স্বর গ্রামের

দূরতম গৃহ কোণের গভীরতম নিদ্রায় মগ্ন মানুষকে হঠাৎ উচ্চকিত করে তুলবার পক্ষে যথেষ্ট। আর যে বিষয়বস্তু সে কণ্ঠ দিয়ে নিঃসৃত হচ্ছিল, তার ভাবার্থ হয় না। দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তিও সম্ভব নয়। যেমন তার বেগ, তেমনি তার আবেগ। সে গালিগালাজ দুপুর অবধি চললেও মনে হবে যেন ছদুমিঞার নিরবচ্ছিন্ন প্রথম বাক্যটাই ব্যাকরণসম্মতভাবে এখনও শেষ হয়নি। প্রতি উচ্চারণেই সে একটা করে নতুন যৌনসম্পর্ক স্থাপন করছে। এই মুহূর্তে নিজের আপন ভাইকে, মাকে, বৌকে, বোনকে সম্বোধন করছে নিজের ঔরসজাত সন্তান বলে। আবার পরমুহূর্তেই এদের প্রত্যেকের আগত এবং অনাগত প্রতিটি সন্তানের দেহসঙ্গত জন্মদাতা বলে নিজের দাবিও জানিয়ে রাখছে নির্বিকার চিত্তে।

তছবিহ্ ছড়া লম্বা কোর্তার পকেটে পুরে আফজাল মুন্সী এবার উঠে দাঁড়ালেন। আকাশ ভরে এখন ছদুমিঞার কণ্ঠস্বর, সে বিষ ঠেলে আরো ওপরের কোন পুণ্যস্তরে ভক্তের পবিত্র আর্তনাদ হয়তো পৌঁছবে না। ছদুমিঞার প্রতিটি স্পষ্ট উক্তি কখন যেন অলক্ষ্যে পিছলে ঢুকে পড়েছে মুন্সী সাহেবের মনের মধ্যেও—চকচকে সাপের পিঠের মত ইচ্ছেমত কিলবিল করে বেড়াচ্ছে এখন।

চারদিক আবার শান্ত না হলে খোদার কথায় মন দেওয়া মুন্সী সাহেবের পক্ষে সম্ভব নয়। নামাজের পাটি থেকে উঠে খড়মজোড়া পায়ে দিলেন। পুকুরের ডান পাড় দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন উত্তর বাড়ীর দিকে। অনেক রকম বিলাপ ও গর্জনের মধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু ছদুমিঞার কণ্ঠ একাগ্রচিত্তে শুনছেন। আর তার খণ্ড খণ্ড সূত্র ধরে প্রাণপণে বুঝতে চেষ্টা করছেন পুরো ঘটনাটা।

উত্তর বাড়ীর আঙ্গিনায় ঢুকে মুন্সী সাহেব আরো হকচকিয়ে গেলেন। ছদুমিঞা একটা ভাঙা পুরানো নৌকার বৈঠা তুলে বার বার চেষ্টা করছে পাশের বন্ধ দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। হুঙ্কারে হুঙ্কারে ঘোষণা করছে, হত্যা করার অটল সঙ্কল্প। সঙ্গের মসজিদে যারা নামাজ পড়তে এসেছিল, তারাই ভিড় করে রয়েছে ছদুমিঞাকে ঘিরে। ৪।৫ জন চেপে ধরে রেখেছে অসম্বৃত লুঙ্গিতে আধঢাকা, কামিজহীন, ছদুমিঞার স্ফীত মাংসপেশীর ঘর্মাক্ত কালো বলিষ্ঠ দেহটাকে। কেউ তাকে উপদেশ দিচ্ছে, কেউ হুমকী কেউ অনুনয়ও করছে। কিন্তু ছদু অপরিবর্তিত; শরীরে, আওয়াজে, ভাষায় ভয়ঙ্কর রকম বে-সামাল।

মুন্সী সাহেব বুঝলেন যে, বন্ধবরের মধ্যেই এমন একটি লোক আছে, যাকে ছদ্দু খুন করতে চায়, কিন্তু কেন? আশ্চর্য, আজ উঠানের একটি লোকও মুন্সী সাহেবের শান্ত, সৌম্য, গম্ভীর মুখ দেখে একবারের জন্যও সসম্ভ্রমে ছালাম জানাল না। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন দেখেও কেউ একটি পিঁড়ি এনে দিল না। অথচ এই মুন্সী সাহেবের মুখের কথা এ গাঁয়েই শরিয়তের শেষ ফতোয়ার মত মান্য। উত্তেজনায় এত বে-খেয়াল হয়ে আছে সবাই। এমনি নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ আর এমন চাঞ্চল্যকর দৃশ্য দেখা চলে। মুন্সী সাহেবেরও ধৈর্য্যের সীমা আছে, কৌতুহলের শুরু হয়। একবার মুন্সী সাহেব ইশারা করে একে ডাকেন, আবার ওকে। আদ্যোপান্ত সবটা ঘটনা জানার জন্য মুন্সী সাহেব ব্যগ্র, চঞ্চল, রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

কয়েকমাস আগে ছদ্দু ক্ষেতে গেছে ধান নিড়াতে। রান্নার কাজ সেরে তফুরী বিবি ঘরের দাওয়ায় বসে পাটি বুনছিল। স্বামীর কিশোরী ছোট বোন হঠাৎ কোত্থেকে ছুটতে ছুটতে এসে ভাবীর গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলো। একটা বেতের চাছা লতা ঠিক ঘর মত বসাতে যাবে এমন সময় ননদের আকস্মিক সোহাগ এসে বাধা দিল কাজে। কৃত্রিম রাগের ঢঙে ধমকে উঠলো—

"এইলা উলালে দেখি একছার বাছছনা আর। তোর কি আইজ হাঙ্গা লাইগছে নি। ছাড়, গলা ছাড়ি দে।"

"একখানে এ্যাক মজার ছিজ খেই আইছি ভাবী, কইত্যাম ন অাঁই।"

মজার জিনিস আবিষ্কার করে যে অত উৎফুল্ল হয়ে ভাবীর কাছে তা প্রকাশ করতে ছুটে আসে, সে জিনিস সম্পর্কে কিছুই গোপন রাখা যে ফজিলতের উদ্দেশ্য নয়, একথা বোঝা পানির মত সোজা। বরঞ্চ প্রথমে রহস্য সৃষ্টি করে, পরে প্রকাশের ইচ্ছের মধ্যে একটা কিছু স্বার্থ লুকোনো থাকা সম্ভব। তফুরীর কল্পনা মিছে নয় ভাবীকে চুপ করে থাকতে দেখে ফজিলতই আবার গায়ে পড়ে বলে।

"এক খাওনের জিনিস, বড় মজার। হুইনলেই জিব্বাৎ হানি আইব।"

ভাবী তবু বেশী উৎসাহ প্রকাশ করে না। দীর্ঘ নিটোল বাহুতে ঢেউ তুলে

বেতলতা ঘরে ঘরে টানা দিতে থাকে। ফজিলত কানের কাছে মুখ লাগিয়ে ফিস ফিস করে এবার সব বলেই দেয়। এইমাত্র অন্দরের ঘাটলা দিয়ে পানি তুলবার সময় সুপারীর খোলের পর্দার ফাক দিয়ে সে অমন অতুলনীয় লোভনীয় দ্রব্যটি আবিষ্কার করেছে। মোটা ফুটফুটে এক থোকা ঝুলমান বেতফল, শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে যার প্রতিটি ফল ফুলেফুলে নধর হয়েছে ইচ্ছে করলেই নাকি সেই থোকাটা খুব সহজে এখনই পাড়া যায়। ডাগর কাল চোখ নাচিয়ে ভাবীই এবার ননদকে আদর করতে শুরু করে দেয়। মেটে হাঁড়ির তলার কালি আর বাটা মরিচ নুনে ঝাকিয়ে নিলে যে অদ্ভুত স্বাদ আসবে ঐ বেতফলের টকে-ঝালে—সেই কল্পনাতে উথলে উঠে ভাবী। ফজিলতের পরামর্শ কল্পনাকে নিকট বাস্তবে নিয়ে আসে—

"আঁই আঁকশি বান্ধি ঠিক করি রাইখছি। গেলে অনই উডন লাইগব। হইর কিনারে গোছলের ভিড় জইমলে হেই ওক্তে আর ব্যাত ঝোপের পর্দায় কুলাইত ন।" ভাবীও তৎপর হয়ে ওঠে। ফজিলতের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে ঘাটলার দিকে। কর্মে এত প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ফজিলতের একটা আপত্তি আছে, "আঁই ছাট-দেয়ালের হেই কিনারে দিনে দুফরে গেলে মা'য়ে হ্যাদাইবো" একটু থেমে সে-ই আবার প্রশ্ন করে, "আইচ্ছা ভাবী, হেইদিন'ত হাললম দিন পাড়া চরি বেড়াইলাম, এই ক'দিনেই আঁই এমন কিইবা ডাঙর হই গেলাম। মা'র উদ্বেগ ও সাবধানবাণীর তাৎপর্য তফুরী বোঝে, ফজিলতের গালে দু'টো টোকা মেরে ছন্দ মিলিয়ে, অঙ্গ দুলিয়ে বলে, "তোর যে দুই দিন বাদে হাঙ্গা।"

বিয়ের কথায় কিশোরী ফজিলত লাল হয়ে চোখ বুজে ফেলে। এটাত আর ঠাট্টা নয়, এ সত্য কথা। ও নিজেও জানে। হাড়ির কালি, বাটা মরিচ, নুন এবং আরো অন্যান্য সরঞ্জাম ঠিক করবার নির্দেশ দিয়ে তফুরী ঘাটলার পথে পা বাড়ায়। ফজিলত তার আবিষ্কৃত রহস্যের চাবিকাঠিটা শেষ বারের মতো ছুঁড়ে মারে, চীৎকার করে। "বাইর বাড়ী দি' যান ভাবী, হুইর কিনার দি। কাঁডল গাছের হোচ্ছম দি' রেইনলেই সামনে বেত্যার থোব দেইখবেন।" যেতে যেতে মাথা নাড়িয়ে ভাবী আঁকশিটা তুলে নেয়। শাশুড়ীর উপস্থিতি হঠাৎ কোন বিস্ময়কর দুর্যোগ ডেকে না আনে, এই ভয়ে ত্রস্ত পদে তফুরী মিলিয়ে গেল ছাট-দেয়ালের ওপাশে। যাবার ভঙ্গিটার কথা ফজিলত কিন্তু তখনও ভাবছে। ভাবীর রূপ যেন থেমে থাকতে চায় না কখনও। বড় বড় পা, বড় বড়

হাত, বড় চোখ, বড় চুল, একটুখানি নড়লেই রূপ যেন সারা গায়ে অঙ্গে টল টল করে নাচতে থাকে। ফজিলত একবার মনে মনে ভাবে, কিসের জোরে ভাবী শ্বশুর বাড়ীতেও দিগ্বিজয়ী রাণীর মতো বেপরোয়া চলাফেরা করে। সেকি শুধুই রূপের জোরে, না আর কারও সোহাগ বর্ম হয়ে ঘিরে রয়েছে ভাবীকে? ছনুভাই ভাবীকে আর ভাবী ছনুভাইকে এত ভালবাসে যে, ফজিলত পর্যন্ত মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায়, তার তৃপ্তিহীন, সীমাহীন, কূলকিনারাহীন উচ্ছ্বাসের কথা কল্পনা করে।

দুটো মাটির হাঁড়ির সরাকে মুখোমুখি উপুড় করে চেপে ধরে ভাবী-ননদে ঝাকুনি দিয়ে তৈরী করেছে বেতুই ফলের ভর্তা। ভাবী এত মশগুল হয়ে আছে যে, বেতে কাঁটায় ছিঁড়ে যাওয়া শাড়ীর আঁচলটা পর্যন্ত স্বামী বা শাশুড়ীর চোখ থেকে আড়াল করার চিন্তাটুকুও নেই। ভাবী-ননদে কাড়াকাড়ি করে খায়। মন্তব্য প্রকাশ করে, কালির ঝুলে বেতফলের কাঁচা কষ কতটা কেটেছে আর কতটা রয়ে গেছে। ফজিলত অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারে যে, ভাবীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে জেতা তার পক্ষে সম্ভব নয়। গালের মধ্যে মস্ত একদলা ভর্তা আঙুলের পাতা থেকে পাতলা জিবের ডগা দিয়ে ভাবী তুলে নিচ্ছে। তারপর আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঠোঁট দুটো স্বল্প জোরে সংযুক্ত করেই এক কোণের একটুখানি শিথিল পথ দিয়ে পুট পুট করে এক গাদা স্বাদহীন মসৃণ দানা জিব দিয়ে ঠেলে বার করে দিচ্ছে। ঝগড়া শুরু করে দেয় ফজিলত। লাভ হচ্ছে না দেখে জোরাজোরি, তাতেও হেরে যাচ্ছে দেখে এবং ভাবী নির্বিকার চিত্তে নির্মম বেগে খেয়েই যাচ্ছে বুঝে ফজিলত ফুঁপিয়ে শুরু করে তার অপরাজেয় সংগ্রামের প্রথম পাঠ। নাছোড়বান্দা ভাবী ভর্তার সরাসহ ছুটে সরে পড়তে চাইল রণক্ষেত্র থেকে। মরিয়া হয়ে ফজিলত ভাবীর ফুলে ওঠা উড়ন্ত আঁচল শূন্য থেকে সাফটে ধরলো। চোখের পলকে এক হেঁচকা টানে ফস করে ওর ক্ষুদে মুঠো থেকে বেরিয়ে গেল আঁচল, উড়ে চলে গেল ভাবী। শুধু যাবার সময়ের সামান্য অ-সাবধানতার জন্য মাটির সরাটা পড়ে খান খান হয়ে গেল। শব্দ শুনে হাঁ হাঁ করে এক দিক থেকে বেরিয়ে এল মা, দৈবক্রমে ঠিক সে সময়ে বার থেকেও লাঙ্গল কাঁধে আঙ্গিনায় প্রবেশ করল কর্ম-

ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত ছদু। সুন্দরী স্ত্রীর পলায়মান গতিটুকু দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসতে লাগল। মনে মনে মরণ ক্ষুধার মধ্যেও নিজের খোশ নসীবের জন্য খোদার কাছে একবার শোকরগুজারী করল। লাঙ্গলটা উঠানের কিনারে রেখে, বৌয়ের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে ডাকল। ভাত বাড়ার জন্য, জানিয়ে দিল ক্ষিদেয় সে মরে যাচ্ছে। মা তখন ফজিলতকে জেরা করছে, সরা ভাঙলো কে? বেতুই ফল পাড়তে খোলা পুকুর পাড়ে গিয়েছিল কে? বৌর দুঃসাহস যে কুলটা রমণীর পুকুর পাড় ধরে প্রান্তরে পা বাড়াবার পূর্ব্বাভাস মাত্র, সেটা বেশ জোরে জোরেই রূপসীর স্বামীকে শুনিয়ে দিল। একে পেটের মধ্যে ক্ষিদে নাভিমূলে মোচড় দিতে দিতে ব্যথা তুলে দিয়েছে, তায় মা'র ঐরকম সুউচ্চ কণ্ঠের হৃৎকাঁপানো মিথ্যে কটাক্ষ। ছদুমিঞার মেজাজটা গরম দুধে লেবুর মত রাগে ঝাঁজে ভরে উঠলো। আরো বেশী কিছু শুনতে হয়, এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি বাইরের ঘাটলায় হাত-পা ধুতে চলে গেল। কিন্তু শব্দ বাতাসে ভর করে চলে, যত বেশী জোরে সাড়া দেবে, ততই বেশী দূরে ধেয়ে যাবে। মা তখন বৌ'র শাড়ী ছেঁড়ার পর্ব শুনেছেন মাত্র। বস্মীভূত বিষ তাঁতানো জিব থেকে জলন্ত আগুনের হলকার মত বেরুচ্ছে। শাড়ী তো আর এমনি সব সময়ে ঘোমটা হয়ে বৌ'র মাথায় পড়ে ছিল না। কাঁটায় যখন শাড়ী একবার আটকে ছিল, তখন নিশ্চয়ই শাড়ীর সে অংশটা হয় বৌর গায়ের উপর ছিল, নয় গাছের উপর ছিল। একই সময় একই শাড়ীর আঁচল তো দু'জায়গায় থাকতে পারে না। আর গাছে, আটকেই তো শাড়ী ছিঁড়ে যায় নি, বৌ নিশ্চয়ই তাড়াহুড়ো করে টানাটানি করেছে বলেই ফেড়ে গিয়েছে। গাছে কারো শাড়ীর প্রান্ত অসভ্যভাবে আটকে গিয়ে থাকলে পুকুরপাড় থেকে—হয়তো রহিম মোল্লা হা করে মানুষটাকে দেখেছিল—নইলে বৌ তাড়াহুড়ো করে হ্যাঁচকা টানে আঁচল ছিঁড়বেই বা কেন?

ছদুমিঞা রান্না ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বৌ'কে আরেকবার ডাকল কর্কশ ঝাঁঝাল কণ্ঠে। নিছক ক্ষুধাতুর মানুষ—স্বামী নয়, প্রেমিক নয়—যেমন করে তার রাঁধুনীকে ডাকে। মাথায় কাপড় টেনে রক্তিম মুখে মাথা নীচু করে এগিয়ে এল তক্ষুরী। এক হাতে সরাটা পরিচ্ছন্ন করে ধোয়া। কিন্তু ঘরে ঢুকেই তক্ষুরী থ বনে যায়। চোখ মুখ তার ফ্যাকাশে হয়ে আসে। হাতের ভাল সরাটাও খসে পড়ে গিয়ে চৌচির হয়ে যায়। ছদু ততক্ষণে ঘরে ঢুকে পড়েছে। সেও দেখল ভাত আর তরকারীর হাঁড়িটা খোলা পেয়ে পোষা

বিড়ালটা আর রাস্তার একটা ঘেয়ো কুকুর নির্বিবাদে মুখ ঢুকিয়ে মাছ আর ভাত হুপ হুপ করে খাচ্ছে। ছদুর মাথার মধ্যে কোথায় যেন একটা খুব প্রয়োজনীয় রগ বুঝিবা অতিরিক্ত রক্তচাপ সহ্য করতে না পেরে ছিঁড়ে ফেটে পড়ল। তফুরী চোখের পানি ঠেলে রেখে কোনরকমে একবার বলতে চেষ্টা করল, অল্পক্ষণের মধ্যেই সে কিছু চাল ফুটিয়ে নেবে। এই এক ছিলিম তামাক শেষ না হতেই সে আবার ভাত বেড়ে আনছে। ঠায় অমনি চুপ করে ঠিক কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, তা ছদু নিজেও বলতে পারবে না। আচমকা সে চিৎকার করে উঠলো বিভৎসভাবে। রাগে, ক্ষুধায় কাঁপতে কাঁপতে ছদু যা উচ্চারণ করল, তার মর্ম স্পষ্ট। এখন কেন, কোন দিনই আর এই চুলোয় তফুরীকে ভাত চড়াতে হবে না। সে তাকে মুক্তি দিচ্ছে। তফুরী স্বচ্ছন্দে ফুল কাঁটায় আঁচল আটকে মাথার কাপড় বুকের নীচে ফেলে এখনই পুকুর পাড় ধরে রহিম মোল্লার হাতে হাত রেখে প্রান্তরের পথে পা বাড়াতে পারে। তফুরী চিৎকার করে দু'হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরতে ছুটে এসেছিল। কিন্তু ততক্ষণে চরম বাণী ছদু উচ্চারণ করে ফেলেছে। তালাক। তাও সোজা সহজ কিছু নয়, একেবারে তিন তালাক।

উঠান থেকে মা আর মেয়ে আচম্বিৎ এমন সাংঘাতিক ঘোষণা শুনে শিউরে আঁৎকে ভয়ার্ত আর্তনাদ করে দৌড়ে ছুটে আসে। বাইরের প্রাঙ্গণ থেকে ছুটে এল ছোট ভাই ফজু। সঙ্গে আরো দু'একজন প্রতিবেশী। কিছুক্ষণ আগের তুমুল ঝগড়ার কথা মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গিয়ে হায় হায় করে ঘরের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ল মা আর মেয়ে।

তফুরী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপর। ছদু বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আছে সে দিকে। এগিয়ে এসে ঐ সোনার শরীরকে স্পর্শ করার সাহসটুকু পর্যন্ত তার উবে গেছে। বাজ পড়া মানুষের মতো সে শুধু খাড়া হয়ে আছে। নিশ্চল দাঁড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করছে চোখের পলকে কোত্থেকে কি করে এ কাণ্ড হয়ে গেল। মা মেয়েপাড়া প্রতিবেশীনীর সহানুভূতিসূচক বিলাপ আর কান্নার করুণ ঐকতানের মধ্যে ধীর শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে এল বয়সে কম কিন্তু বুদ্ধিতে প্রবীণ, ছোট ভাই ফজু। কেবল সেই উপলব্ধি করছিল যে ছদু'র নিশ্চুপ তন্ময়তা অস্বাভাবিক ও ভয়ংকর। কিছু না বলে সে বড় ভাইকে টেনে বার করে নিয়ে গেল, বহু কান্নার ফোঁপানিতে দমবন্ধ করা ঘরের গুমোট আবহাওয়া থেকে।

নিজের হঠকারিতায় যে বুকভাঙা ঘটনার সৃষ্টি করেছে, তার জন্য অনুতাপে শোকে কাহিল ছদু সারা দুপুর কারো সঙ্গে কথা বলতে পারে নি। রহিম মোল্লাও সবটা শুনে ফতোয়া দিয়েছে শরিয়ত মোতাবেক। তিন তালাকের কঠিন বিধি-নিষেধ ছদুমিঞার মহব্বতের জন্য শিথিল করে দেয়া সম্ভব নয়। ঠিক হলো, পরের দিন লোক এসে তফুরীকে তার বাপের বাড়ী নিয়ে যাবে।

গভীর রাতে নিদ্রাহীন ছদুমিঞার বিছানার প্রান্তে এসে ফজু বসল। ফজু থাকে পশ্চিমের ঘরে। এঘরের ভাইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক মূলতঃ আর্থিক ও সাংসারিক। নাড়ি আর পরিবারের বন্ধনটাকে গতবছর সে অনেকখানি শিথিল করে দিয়েছে। তখন মেজাজ তার সব সময় একটু রুক্ষ থাকলেও ভেতরে ভেতরে সে ছিল বেজায় রসিক। হপ্তায় হপ্তায় গঞ্জের হাটে, ফুলেল তৈল মেখে, ঢেউ পাটের সিঁথি কেটে একটু গান বাজনা ও ফুর্তির আসরে না বসলে তার চলত না। একবার কিছু সুপারী চুরি করে বেচতে গিয়ে ভাইর কাছে ধরা পড়ে যায়। যোয়ান বড় ভাইয়ের হাতে সেদিন প্রচুর মার খেয়েছিল। তারপর থেকেই নাকি তাকে আর কেউ কোনদিন কোন রকম হাসিতামাশার হল্লায় দেখে নি। এর কিছুদিন পর সে নিজেই উদ্যোগ করে জায়গা জমি সব ভাগ করিয়েছে। কিন্তু পাড়ার দশজনে মিলে দু'ভাইয়ের জমির যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়েছে ফজুমিঞার তা মোটেই পছন্দ হয় নি। তার ধারণা, গ্রামবাসীরা তাকে অপছন্দ করে বলে বড় ভাই তাদের সঙ্গে একজোট হয়ে ষড়যন্ত্র করে তাকে ঠকিয়েছে। বেছে বেছে তার ভাগে ঠেলে দিয়েছে। যতো পড়ো, অজন্মা জোলো-জংলা জমিগুলো। লোকে বলে, সে নাকি আব্বার কবরের ওপর দাঁড়িয়ে রোজ রাতে বিড বিড় করে আজও ভাইর বিরুদ্ধে নালিশ জানায়, গজব দেয়। প্রতিশোধের জন্য ক্ষমতা মাগে। ছদু অবশ্য এ সব প্রচারের কিছুই বিশ্বাস করে না। সে দেখেছে ফজু কেমন ধীরে ধীরে সুস্থ শান্ত, কর্মঠ, হয়ে উঠেছে। ছদু ঠিক করেছে, ওকে স্বেচ্ছায় আরো কিছুটা জমি ছেড়ে দেবে।

ফজুমিঞা ভাইয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, "আঁইন্তে যদি আঁবে বিশ্বাস করেন ত একটা কতা কইতাম হারি।"

"কি ?"

"ভাবীরে এক দিনের লাই বিয়া করি আঁই ছাড়ি দিমু। কারোত্তন কিছু ন কইলেই শাইরবো। এক লগে হুইতলেও আল্লার দোহাই।"

ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠলো ছদু। তার মায়ের পেটের ছোট ভাই। হোলোই বা তালাক দেয়া বৌ, তাই বোলে বড় ভাইয়ের অনুরোধে তিন মাস দশদিন পর তাকে একটা লোক দেখান বিয়ে করে একরাত মন ভুলানো ঘর তার সঙ্গে পেতে সবার চোখে ধুলো দিয়ে সে যদি পরের দিন তাকে তালাক দিতে পারে? রাতের বেলায় অর্গল দেয়া দুয়োরে ফাঁক দিয়ে রহিমত আর উঁকি দিয়ে থাকছে না? আনন্দে উল্লাসে ছদু বুকে জড়িয়ে ধরে ছোট ভাইকে। অস্ফুট কণ্ঠস্বরে আবার বুঝিয়েও বলে যে, তালাক তার ত সত্যি সত্যি হয় নি। দিল দিয়ে সে তালাক দেয়নি। কাজেই ফজু যেন বিয়ের রাতেও তকুরীকে ভাবীর সম্মান দেখায়। ভাবী, ভাবী, কে না জানে ভাবী মায়ের সমান।

ঠিক তিন মাস দশদিন পর গতরাতে তিনজন সাক্ষী আর একজন মোল্লা নিয়ে ব্যাপারটা তারা এত চুপচাপ সেরেছে যে মুন্সী সাহেব পর্যন্ত একদম টের পাননি। ফজুর সাথে তকুরীব বিয়ে হয়ে গেছে। ভোররাত থেকেই তিনজন সাক্ষীসহ ছদু প্রান্তের আঙ্গিনায় অপেক্ষা করছিল ফজুর জন্য। সকাল বেলাই ফজু তালাক দেবে তার নয়া বিবিকে, পুরানো ভাবীকে। কিন্তু ফজু হঠাৎ ভোরবেলা দরজা খুলেই নাকি ভাইকে দেখে বহুদিন পর তার বাজারের সেই পরিচিত পুরাতন অট্টহাসিতে চমকে দিয়েছে সব্বাইকে। তারপর চিৎকার করে বলেছে—"তালাক আঁই দিতান ন্য। দিতান ন্য। ব্যাক ভালা ভালা জমির টুকরা আঁরে ভাড়াই আননে লই গ্যাছেন, ইয়াদ আছে হেই কথা? হে—হে—হে। আইজ আননের ব্যাকেরতন ভালা জমির টুকরা আঁই হাইছি। এইডা আঁই ছাড়ুম ক্যা? ছাইড়তান ন্য, আঁই ছাইড়তান ন্য।"

ছদুর শ্রেষ্ঠ সম্পত্তির টুকরো সে যখন আজ একবার মুঠোর মধ্যে পেয়েছে, তখন জান গেলেম ফজু তা ছাড়বে না। সঙ্গে এটুকুও জানিয়ে দেয়, "হেই লগে এইডাও হুনি রাখেন ভাইজান, জমির লগে জমির ফসলও যায়, বুইজছেন? আঁর জমিৎ আমনে ফসল কইল্লান ক্যা হেইডাও আই দিতান ন্য। গলা টিপি

মারি হালাইয়্যুম।" ছদু'র অনাগত সন্তানকে পর্যন্ত সে গলা টিপে মেরে ফেলতে চায়। বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে ছদু তখন উন্মাদ হয়ে উঠেছে। হাতের কাছে শক্ত যে জিনিসটা ছিল সেটা নিয়েই সে ছুটলো ফজুকে খুন করতে। সড়াৎ করে ঘরের ভেতর ঢুকে ফজু দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, কয়েকজন এসে চেপে ধরেছে ছদুমিঞাকে। চিৎকারে ছদুর গলা দিয়ে যেন রক্ত বেরুচ্ছে, চোখ যেন উল্‌টে বের হয়ে আসতে চায়।

সবটা ঘটনা বুঝতে পেরে মুন্সী সাহেবের শুভ্র দাড়ি উত্তেজনায় স্ফীত নাসার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ফেঁপে ফুলে উঠলো। সত্তর বছরের দুর্ব্বল দেহটাকে হঠাৎ টান দিয়ে সিটিয়ে শক্ত সবল করে ফেললেন এক ঝাঁকুনিতে। তারপর আচম্বিতে পায়ের খড়ম জোড়া হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ছদুমিঞার ওপর। সকলে হতবাক হয়ে শুনলো মুন্সী সাহেবের গালাগালি—অশ্লীল, অকথ্য, অশ্রাব্য। গ্রামবাসীর দৈনন্দিন উত্তেজনার আদিম বুনো পরিভাষা। বল্গাহীন, উদ্দামতার স্রোতবেগ :

"আরামজাদ, জারুয়া—শরীয়ত তোগো লাইন্‌গ, তোগো লাই শারীয়তন্য। হাইওয়ান জানোয়ারের লাই শরীয়ত হয় ন্য—শরীয়ত হইছে মাইনষের লাই"

দম বন্ধ করে মুন্সী সাহেবের এই অভূতপূর্ব ব্যবহার দেখতে থাকে সবাই। ছদু নিজেকে খড়মের পিটুনীর হাত থেকে বাঁচাতে ভুলে গিয়ে চীৎ হয়ে পড়ে মুন্সী সাহেবে অস্বাভাবিক চেহারার দিকে চেয়ে থাকে, মুন্সী সাহেব প্রচণ্ড চিৎকারে ফেটে পড়েন—

"মজুর মান্দার আরমজাদ ·কোনানকার। আরামজাদ বিয়া কইছত ক্যা? বিয়া করছ ক্যা? এইডাও জানছনা যে হেইড্যা মাইয়া হোলার উপর তালাক লাগে না—হ্যাডে হোলা থাইকলে তালাক অয় না। হেই কথা না জাইনলে তালাক দ্যাছ ক্যা? শরীয়ত মানছ ক্যা? আইজো মানুষ হ। মানুষ হ। শরীয়ত মাইনষের লাই, হাইওয়ান জানোয়ারের লাই ন্য।"

মুন্সী সাহেব আর পারেন না। হাঁপাতে থাকেন। ক্ষোভে, ক্রোধে চোখ ভেঙে তার পানি গড়িয়ে আসে। সন্তানবতী নারীকে যে কখনই তালাক দেয়া যায় না এই নতুন তথ্য শুনে উত্তর বাড়ীর প্রাঙ্গণ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। সব উত্তেজনাহীন, কোলাহলহীন, নীরব। সব্বাই এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ছদু-মিঞার দিকে। খট করে একটা শব্দ হতেই দরজা খুলে নতুন লালশাড়ী পরা তস্বুরী বেরিয়ে এল ঘর থেকে আঙ্গিনায়, এক পা এক পা করে এগুতে লাগলো

ছহুর দিকে। নিতান্ত অনভিপ্রেত একটা মলিন ভোরের পাকাধানী আলোতে বার বার কম্পিত তার চুলে, চোখে, আঁচলের প্রান্তে। আর ছহু আজ থেকে তিন মাস দশদিন আগে ঠিক যেমন অর্থহীন মরা চোখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখছিল তফুরীর ভূলুণ্ঠিত অজ্ঞান দেহটাকে—সেই অকম্পিত চোখ জোড়াই সে আজও আবার মেলে ধরল মুন্সী সাহেবের মুখের ওপর মানুষের জন্য, হাই-ওয়ান জানোয়ারের জন্য নয়—একথা তৃতীয়বার মনে হতেই মুন্সী ছহুর চোখের ওপর থেকে নামিয়ে নিলেন নিজের চোখ মাটির দিকে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলেন ভোর থেকে পকেটে পরিত্যক্ত কঠিন পাথুরে তছবির ছড়াটাকে।

পথ জানা নাই

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

মাউলতলার গফুর আলী ওরফে গহুরালি প্রায় উন্মত্তের মতো একখানা কোদাল দিয়া গ্রামের একমাত্র সড়কটাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিতেছিল।

তাহার এই মত্তজনোচিত কার্যের পশ্চাতে একটা ইতিহাস আছে; দীর্ঘ এক কাহিনীও বলিতে পারো তাহাকে। একটু সহানুভূতির সহিত সে ইতিহাস বিচার করিলে তাহার এ-কর্মের একটা সমর্থনও হয়তো খুঁজিয়া পাওয়া যায়। নহিলে যে সড়ক একদা সকলেরই সমবেত চেষ্টায় গ্রামের উন্নতিকল্পে গড়িয়া উঠিয়াছিল, এমন কী গহুরালিও যাহার জন্য তাহার স্বল্প জমির বিরাট একটা অংশ ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছিল, হঠাৎ তাহা ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য সে-ই বা এমন উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিবে কেন?

এই গত যুদ্ধের পূর্বকাল পর্যন্ত পাকিস্তানের সুদূর দক্ষিণ অঞ্চলের যে গ্রামগুলি বহির্জগতের সহিত একপ্রকার সম্পর্ক-শূন্য থাকিয়াই সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রা যাপন করিতেছিল এই মাউলতলা গ্রামও তাহাদের একটি। বিরাট এই দেশের ইতিহাসে রাজ্যরাষ্ট্রের ভাঙা-গড়া বহুবার ঘটিয়াছে; সুদূর দিল্লী কিংবা ঢাকা-মুর্শিদাবাদের বাদশাহী তখ্‌তে কতো রাজশক্তির উত্থান পতন ঘটিয়াছে—মগ, পর্তুগীজ, বর্গীর বন্যা কত্তোবার কতো স্থানে ঝড় তুলিয়া বহিয়া গেছে কিন্তু মাউলতলার স্বকীয় জীবনযাত্রায় তাহা কিছুমাত্র আলোড়ন তুলিতে পারে নাই। ইংরেজ সভ্যতা সনাতন ও ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির মর্মমূল ধরিয়া নাড়া দিয়াছিল সন্দেহ নাই কিন্তু তবু এই যুদ্ধের পূর্বকাল পর্যন্ত মাউলতলা গ্রামে তাহার কোন বিশেষ প্রভাব অনুভূত হয় নাই।

অন্ততঃ এই সড়কটি নির্মিত হইবার পূর্ব পর্যন্তও মাউলতলা সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লইয়াই বাঁচিয়াছিল।

তখনকার মাউলতলার কথা এখন হয়তো নিছক কাহিনীর মতোই শোনাইবে তোমাদের কাছে। এখানকার মৃত্তিকা-সংলগ্ন জীবনগুলি তখন সংগ্রাম-শৌর্যে ভরপুর। বিরূপ প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহারা ক্ষেতে ক্ষেতে শস্য ফলাইত; ভোগের অধিকার লইয়া আদিম বীরত্ব সহকারে মধ্যযুগীয় অস্ত্রশস্ত্র লইয়া লড়াই করিত, জোর করিয়া ধরিয়া-আনা মেয়েমানুষকে বিবাহ করিয়া ভালোবাসিত আর অবসরকালে গান কিংবা পালা বাঁধিয়া আনন্দ উৎসব করিত। বাহিরের জগতের সহিত কোনরূপ যোগাযোগ এক প্রকার ছিল না বলিলেই চলে। জীবনযাত্রার একটা একান্ত নিজস্ব ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রীতি ও পদ্ধতি বর্তমান ছিল। বিংশ শতাব্দীর বণিক সভ্যতার কিছুমাত্র স্পর্শ তাহা ব্যাহত করে নাই।

কিন্তু ক্রমে করিল—

একদিন এই গ্রামেরই একজন পুরুষ তরুণ বয়সে ছিটকাইয়া বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিল; ধরিতে পারো এখন হইতে সে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার কথা। সে যখন আবার ফিরিয়া আসিল তখন সাথে করিয়া সে শুধু ধনসম্পদই আনিল না, আপাতদৃষ্টিতে উন্নততর আরেক জীবনপদ্ধতি ও সভ্যতাও যেন সে তাহার চিন্তাকর্ম চরিত্রে বহন করিয়া আনিল। কৌতূহলীচিত্তে দীন মাউলতলাবাসীরা সেদিন তাহার চারিদিকে আসিয়া ভিড় করিল।

সে কহিল—এই মাউলতলার বিল খাল, ঐ বিশখালী, আড়িয়লখাঁরও ওপাশে, রাজার যে কাছারীতে সকলে বছরে একবার খাজনা দিতে যায়,—তাহারও দূরে আরেকটা দেশ আছে—শহর তাহার নাম,—সেই দেশের সহিত, সেই দেশের জীবনের সহিত পরিচিত না হইলে এই গণ্ডগ্রাম মাউলতলায় এমন হীনভাবে জীবন কাটাইবার কোনই অর্থ হয় না। মানুষ হইতে হইলে, ভালোভাবে জীবন ধারণ করিতে হইলে ঐসব শহর বন্দরের সহিত যোগাযোগ একান্ত দরকার।

এবং সেক্ষেত্রে তাহার প্রস্তাব হইল, অবিলম্বে এই যোগাযোগের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে একটা সড়ক নির্মাণ করিতে হইবে।

জোনাবালী হাওলাদার সেদিন এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিল যে, এখন হইতে তাহার স্বীয় জন্মভূমি মাউলতলার উন্নতি করাই তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় কর্তব্য বলিয়া মনে করিবে।

চেষ্টাচরিত্র করিয়া জেলা বোর্ডের দ্বারা সে এই সড়ক প্রস্তুতের বন্দোবস্তও করিয়া ফেলিল। মাউলতলায় স্বল্প-সংখ্যক সঙ্গতিপন্ন যাহারা, তাহারা প্রচণ্ড উৎসাহে গ্রামোন্নয়নের তথা স্ব স্ব জীবনোন্নয়নের কাজে লাগিয়া গেল।

কিন্তু মুশকিল বাধাইল এই গহুরালির মতো দীন দরীদ্র প্রজারা। সড়ক প্রস্তুতের জন্য তাহাদের জমির যে অংশখানি মারা পড়িবে তাহা তাহারা কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে রাজি হইতেছিল না। গহুরালি বলিল: মোডে পাচকুড়া আমার ভুঁই, হের দুই কুড়া-ই সড়কে খাইলে আমি খামু কী?

জোনাবালি জবাব দিয়াছে: আরে মিয়া; কেবল ক্ষেতের ধান বেচইয়াই পয়সা হয় দেখছো এতোকাল। সড়কটা হইতে দেওনা, দেখবা উপায়ের আরো কতো রাস্তা খুলইয়া যায়। কইলাম যে, এ সড়করে কেবল সড়ক বলইয়াই ভাইব্যোনা, তউ কই হোনো, এ রাস্তা নতুন জীবনেরো।

গহুরালি কী বুঝিয়াছি, প্রতিবাদের তীব্রতা কিছুটা কমিয়াছিল বৈ কি। একে জোনাবালির মতো ধনী মানী লোকের কথা; তাঁহার উপরে স্বপ্নের মতো সে দেশের বর্ণনা শুনিয়া তাহারও মন তখন এক অদ্ভুত সম্ভাবনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। এই সড়কের কল্যাণে বাস্তবিকই যে জীবনের সম্মুখে এক নতুন পথ প্রসারিত হইয়া পড়িবে না তাহা কে বলিতে পারে! জোনাবালির বাড়ি হইতে বাহির হইয়া তাহার যে জমিখানার উপর সড়ক যাইবার কথা, তাহার উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

এখনও—এই অগ্রহায়ণের শেষেও প্রায় গোড়ালির উপর পর্যন্ত সেখানে কাদায় ডুবিয়া যায়। ধান পাকিতেছে, তাহার শীষগুলি নুইয়া পড়িয়াছে স্তবের মতো, অধিকাংশই লুটাইয়া পড়িয়াছে কাদার মধ্যে। মজা বিলের জমি—এমন হইবেই। কোনো বৎসরই লাভজনক ফসল এখান হইতে পাওয়া যায় না। পানি জমিয়াই প্রায় অর্ধেকেরও বেশি ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে। তবু এ-দিনে ক্ষেতখানার দিকে চাহিয়া তাহার মন ভরিয়া উঠিত এতোকাল; আজ কী জানি কেন মনটা খুব বিরস হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল আর কাহাঁতক এইভাবে দুটি দুটি ধান খুঁটিয়া জীবন চালানো যায়। তাহার চেয়ে সম্মুখে যে নয়া জীবনের হাতছানি, তাহাকে বরণ করিয়াই দেখুন না এবার। জোনাবালির কথায় সুখ-সমৃদ্ধি, মানুষ হইয়া বাঁচিয়া থাকা, সবই নাকি তাহাদেরও জীবনে সম্ভব হইতে পারে। শুধু যে আবহে, যে রীতিতে জীবন চলিত এতকাল, তাহাকে পালটাইয়া নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। দোষ কী, দেখুকই

না একবার পরখ করিয়া। জোনাবালি, দশবৎসর পূর্বেও যাহার পিতা উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া এক মুষ্টি অন্ন সংস্থান করিতে পারিত না, তাহারই পুত্র যখন আজ সেই জগতের কল্যাণে জীবনে অগাধ ধন-ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধি আহরণ করিতে পারিয়াছে, তাহারাই বা কেন তাহাদের তাকত ও হিম্মত লইয়া ভাগ্য বদলাইতে পারিবে না?

বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীকে কহিলঃ ঠিক করলাম, রাস্তার লইগা দিমু জমিটা ছাড়ইয়া।

বউটি অল্পবয়সী হইলেও বুদ্ধি নিতান্ত কম ছিল না, ভাত বাড়িয়া দিতে দিতে হঠাৎ থামিয়া অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল কিছুকাল; কহিলঃ তা হইলে খামু কী?

—অতোশতো ভাবতে গেলে কী আর দ্যাশের দশের কাম হয়? সকলেরই মঙ্গলের জন্য যে কাম তার লাইগ্যা সকলেরই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেই হইবে। গহুরালি অবিকল জোনাবালির কথাগুলি স্ত্রীকে বেশ ভারিক্কীচালে শুনাইয়া দিল।

স্ত্রী তবু খুঁত খুঁত করিলঃ বুঝিনা দ্যাশের দশের কাম কারে কয়—মৌলবী সাইবে তো কইয়া গেলে বেশ আছি আমরা, রাস্তা-ফাস্তা বানাইয়া এয়ে-ওয়ে গেলে জীবনে আরো কষ্ট বাড়বো ছাড়া কমবো না। আরো কইলেন বোলে হগোল-ডিরে বাইর অওনইয়া স্বভাবে পাইছে, এয়া ভালো লক্ষণ না।

—থুইয়া দেও হের কথা। নতুন কোনো জিনিস করতে গেলে একদল মানুষ চাইর দিক দিয়া এরহম বাধা দেয়ই।

স্ত্রী তবু বলিলঃ না হয় বোঝলাম দশের উপগারের কাম। তউ ওয়া কী আমাগো করা সাজে, যাগো খাইয়া পড়ইয়াও বাড়তি আছে হেরা করুক গিয়া। রাস্তা আমাগো অইলেই বা কী, না অইলেই বা কী! গহুরালি কহিলঃ মাইয়া মানুষের বুদ্ধি তো! যে জিনিস নাই, হের লাইগ্যা তারই তো বেশী আহইট। যাগো আছে তাগো গরজ কী! সকলের মঙ্গল মাইনিই তো আমাগো মঙ্গল।

পরে সে হাজেরাকে ক্ষেতের যে উঁচু-পাড়ে তাহাদের বাড়ি, তাহারই কিনারে ডাকিয়া লইয়া গেল। জোনাবালির নিকটে রাস্তার বর্ণনা সে যেমন যেমন শুনিয়াছে ঠিক সেইভাবেই তাহার নিকট বর্ণনা করিয়া গেল। আঙুল দিয়া দেখাইল শাদা মেঘের ভেলা ভাসানো নীল আকাশের নীচের রৌদ্র-

ঝিলমিল দিগন্ত। সবুজ বনানার সীমারেখায়, কাশবনের উদ্দাম ইশারায় সে দিগন্ত যেন কোন সুদুর স্বপ্ন-রাজ্যে হারাইয়া গিয়াছে।—আর মুখে সে আবৃত্তি করিল জোনাবালির সেইকথা কয়টি: এ কী কেবল সড়ক! একটা নতুন জীবনেরো রাস্তা। সুখের আর সমৃদ্ধির—

হাজেরা আর সে সেই সড়কে কল্পনায় দূর হইতে দূরে বিছাইয়া চলিল। পৃথিবী যতোখানি তাহাদের ধারণায় কুলায়, যেন তাহার শেষ সীমানা অবধি। এতোকাল আচরিত জীবনের প্রতি মনে মনে তখন বিদ্রোহ উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। উন্নততর জীবনের জন্য মনের গতি তখন বাধাবন্ধহারা। এই সড়ক তাহাদের সে কামনাকে পরিপূর্ণ করিতে পারিবে কিনা, তাহা বিচারের সাধ্য তাহাদের ছিল না, শুধু বিশ্বাসেই তাহারা উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। গহুরালি অপরূপ বর্ণনায় ভবিষ্যৎ জীবনের যে চিত্র হাজেরার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল, সরলা গ্রাম্য তরুণী হাজেরা অর্ধ বিশ্বাস অর্ধঅবিশ্বাসে তাহা দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। গহুরালিব হাত স্পর্শ করিয়া বারংবার সে জিজ্ঞাসা করিল: সত্য? হাচইও?

দেখবাই ভবিষ্যতে।

কিন্তু ভবিষ্যৎ কথাটির ব্যাপ্তি বড়ো বেশি। সময় সময় তার অন্ত প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়া মনে হইলেও, কার্যকালে তাহার অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া মুশকিল। গহুরালিও তাহার পরিমাপ করিতে পারিল না।

অবশেষে সমস্ত বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূলতা কাটাইয়া সড়ক নির্মাণ শেষ হইল। জোনাবালি দুই দুইটা গোরু জবেহ করিয়া শ্রমিকদের আপ্যায়িত করিল। সে মেজবানে গ্রামেরও অধিকাংশ লোক শরীক হইল। রাত্রে বসিল পালাগানের আসর। এমন উৎসব এখানকার নিস্তরঙ্গ জীবন বড়ো বহুবার করে নাই।

পুরুষেরা একে একে প্রায় সকলেই একবার করিয়া শহর ঘুরিয়া আসিল। এবং সকলেই আসিল কিছু না কিছু সভ্য-জগতের চিহ্ন লইয়া। প্রথম উন্মাদনাটুকু কাটাইয়া লোকে অবশেষে সড়কের উপর গোরু বাঁধিত; ক্ষেতে কাজ করিতে করিতে তাহারই পাশে বসিয়া গল্প করিত; হুঁকা টানিত—আর তাহারই ফাঁকে ফাঁকে গ্রামের চার পাঁচটি যুবক ভাগ্যান্বেষণে বাহির হইয়া গেল।

গহুরালিও একদিন যে কয়টা পিরহান ছিল একে একে সব কয়টা পরিয়া

মাথায় মুখে ভালো করিয়া তেল মাখিয়া প্রসাধন করিয়া একখানা তেল-চকচকে বাঁধানো লাঠি হাতে করিয়া তিনদিন ধরিয়া শহর বন্দর ঘুরিয়া দেখিয়া আসিল। জোনাবালির কথার চাক্ষুষ প্রমাণ মিলিল এবার। সত্যই তো। এখানকার মানুষেরা সত্যই অভিনব। সুখে ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ আরেক জাতের মানুষের সেখানে বাস। তাহাদের প্রতিটি চাল-চলন, কথা-বার্তা, জীবন-রীতি গহুরালির নিকট পরম লোভনীয় বলিয়া মনে হইল। কিন্তু তবু সব দেখিয়া শুনিয়া একটি দুঃখ বরাবরই তাহার মনে খচখচ করিয়া বিঁধিতে লাগিল— উহাদের যেন ধরা ছোঁয়া কিংবা নাগাল পাওয়া যাইতেছিল না। তাহার মতো দীন দরিদ্রের প্রতি কেহই লক্ষ্য দেয় না, দুইদণ্ড থামিয়া এখানে কেহই তো তাহার কুশলও জিজ্ঞাসা করে না। তাহাদের মাউলতলাতে অপরিচিতকেও সম্ভাষণের যে রীতি,—তাহা এখানে নাই। এমন কী কেহ চোখ তুলিয়া তাকায়ও না, যদিও বা কেহ কখনো তাকাইয়াছে, গহুরালি বড়ো অস্বস্তি বোধ করিয়াছে সে দৃষ্টির সম্মুখে। সে দৃষ্টিতে মায়া নয়, মমতা নয়, আত্মীয়তার শুভ ইঙ্গিতও নয়, শুধু তাচ্ছিল্যমাখা বলিয়াই বোধ হইয়াছে তাহার; কেবল রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল সে সন্ধ্যাকালে বাজারের পথ দিয়া যাইবার সময়; দুইধারে সারি সারি মেয়েরা—কেহ বিলোল চোখে তাহার দিকে তাকাইয়া ছিল, কেহ বা আহ্বানও করিয়াছিল হাতছানিতে। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই একটি মেয়ের কী কথায় সকলে যখন হাসিয়া উঠিল। গহুরালি ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। ব্যাপারটা কী বুঝিতে পারে নাই। তবু একটি মেয়ের চোখে চাওয়াটুকু বড়ো ভালো লাগিয়াছিল।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাকালে সে আবার সেই পথে গেল। সেই মেয়েটি তখনো সেখানে দাঁড়াইয়া। গহুরালি তাহার নিকট দিয়া যাইবার সময় সে একটু মধুর করিয়া হাসিল। গহুরালির মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হইয়া গেল; হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত অর্ধচেতনের মত সে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

মেয়েটি হাতছানি দিয়া তাহাকে কাছে ডাকিল:—আয়েন।

গহুরালি সম্মোহিতের মতো তাহাকে অনুসরণ করিল।

মেয়েটি তাহাকে লইয়া গেল হোগলাপাতা আর চাঁচের বেড়া দিয়া বুনানো ছোট একটি ঘরে। একপাশে একটা বিছানা, অন্যদিকে ছোট একটা হ্যারিকেন।

মেয়েটি আলোটা উস্কাইয়া দিয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিল : নতুন আইছো গ্রাম থেইক্যা, না ?

গহুরালি মাথা দোলাইল।

বেশ! তা, ট্যাঁক ভারি আছে তো ? দশ টাকার কম কাম অইবোনা, কইলাম। দেহি কতো আছে,—বলিয়া মেয়েটি তাহার কোমরে হাত দিল। গহুরালি যেমন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, তেমনি ভয়ও পাইল। বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াও তাহার ছলনায় শেষ পর্যন্ত সে ভুলিয়া গেল।

পাঁচমিনিট পরেই গহুরালির প্রায় সবি আদায় করিয়া মেয়েটি তাহাকে উঠাইয়া দিল : আরো রইলে টাকা আরো দেওয়া লাগবে ; এহোন যাও মিয়া।

প্রতিদানে গহুরালি কী পাইল, তাহা সে-ই জানে। তবু এই অনাত্মীয় দেশে আত্মীয়তা বলিয়া, সহৃদয়তা বলিয়া সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা একেবারে চুরমার হইয়া ভাঙিয়া গেল।

মনে মনে গভীরভাবে সে উপলব্ধি করিল এখানে পয়সার মূল্যে সব জিনিসেরই যাচাই হয়। পয়সাই এখানকার জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। প্রাণের কোনো মূল্য ইহারা দেয় না। বড়ো একাকী আর নিঃসঙ্গ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল তাহার। তৃতীয় দিন সকালে একটা বিরূপ বিরস মন লইয়া সে গ্রামের পথ ধরিল।

তবু সারাপথ ভাবিয়া চিন্তিয়া সে এই পয়সার ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প করিল। এবং পয়সা উপায়ের পথ খুঁজিতেই তখন হইতে তাহার ব্যস্ততা শুরু হইল। হতাশ হইয়া এপথে কিছু করা গেল না বলিয়া অন্য চেষ্টার দিকে ঝুকিয়া পড়ার মতো মুখ তো তাহার আর নাই। মনে মনে একটু দমিয়া পড়িলেও স্ত্রীর নিকট যে বাহাদুরী করিয়াছে একদিন—তাহারই জন্য সে হাল ছাড়িল না।

শুধু সে একাই নয়, আরো পাঁচ জন মিলিয়া তরিতরকারী, মাছ যে যাহা জোটাইতে পারে, তাহা লইয়াই সে পথে আসা যাওয়া করিতে লাগিল। এমন যে থানখুনি পাতা—যাহা এখানে বনে বাদাড়ে অজস্র জন্মায়, কেহ ফিরিয়াও দেখেনা, শহরে তাহাতেও পয়সা। এমনি করিয়া ধীরে ধীরে গ্রামের প্রতিটি বস্তু শহরের পথে নীত হইতে লাগিল। হাজেরা একদিন পরিহাস করিয়া কহিল : যা আরম্ভ করলা, শেষকালে আমাগোও না বাজারে লইয়া যাও!

গহুরালি তখন বেশ দু'পয়সা উপার্জন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে তখন বছর তিনেকের মধ্যে খোড়োঘরের চাল ফেলিয়া সে টিনই তুলিয়া ফেলিল। যাহারা জোনাবালির কথায় সংশয় প্রকাশ করিয়াছিল এবার তাহাদেরও চোখ খুলিল।

কিন্তু এইপথে শহরের ফৌজদারী দেওয়ানীতেও ছুটাছুটি শুরু হইল ধীরে ধীরে। সাদামাটা সকল জীবনে আসিতে লাগিল কূটবুদ্ধি আর কৌশলের দড়িজাল। এই সড়কের চারিদিকে প্রচুর গলি ঘুঁজিরও সৃষ্টি হইল! অনেক বাঁক অনেক মোড়। মাউলতলা জটিল হইয়া উঠিল। বুঝিবা তাহার প্রভাব পড়িল এখানকার লোকের মনেরও উপর।

এমন কী একদিন সড়কের উপরেই গোরুতে ধান খাওয়ার সামান্য বিষয় লইয়া দুইদলে লড়াই এবং একটা খুন পর্যন্ত হইয়া গেল।

জোনাবালি খবর পাইয়া ছুটিতে ছুটিতে যখন আসিয়া পৌঁছিল তখন খুন তো একটা হইয়া গিয়াছেই, আর তাহার এতো সাধের সড়কের একটা অংশও ঢিল তৈরির কাজে উড়িয়া গিয়াছে।

সকলকে ডাকিয়া কহিল: সড়ক কী এয়ার লাইগ্যা বানাইছেলাম আমরা? আকাটমূর্খ জানোয়ারের দল! জোনাবালির ভর্ৎসনায় কাহারও মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। থানা, মামলা-আদালত লইয়াই তখন তাহাদের চিন্তা।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ লাগিল।

তাহার ঢেউ এ পথ বাহিয়া এবার আসিল এখানেও। এ দেশের ইতিহাসে তাহা এই প্রথম; রাজ্য-স্বার্থ লইয়া ভাঙাগড়ায় এইসব গ্রামের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই কোনদিন, কিন্তু অতীতের শত শত বৎসরে যাহা ঘটে নাই, দুই শত বৎসরের ইংরেজ-শাসনের ফলে এবার এখানে তাহাই আত্মপ্রকাশ করিল।

চাল-ডালের দাম বাড়িল। দাম চড়িল সব জিনিসের, কমিল কেবল জীবনের। ধীরে ধীরে এই সড়ক বাহিয়াই আসিল মন্বন্তর। আসিল রোগ-ব্যাধি, চোরাবাজার আর দুর্নীতির উত্তাল জোয়ার। তাহার সম্মুখে যতোটুকু নিরুদ্বিগ্নতা ছিল, তাহা কোথায় ভাসিয়া গেল।

সুশাসনে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী আসে এই পথ বাহিয়া, আবার ঘুষ পকেটে লইয়া ফিরিয়া যায়। শহরের সাহেবের বাবুর্চীখানায় কাজ করে যে লুৎফর, তাহার সহিত আসগরউল্লার সোমত্ত কন্যা কুলসুম উধাও হইয়া যায়। লড়াই ফেরৎ ইউসুফের স্ত্রী কঠিন স্ত্রীরোগে হাত-পা মুখে ঘা লইয়া শেষ নিঃশ্বাস

ত্যাগ করে। আর আসে তরি-তরকারী, কাট, মুরগী—হ্যানোত্যানা নানা জিনিস কিনিতে মিলিটারীর দালাল।

ঘটনাচক্রে তাহাদের একজনের সহিত গহুরালির ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল। তখন মন্বন্তরের কাল। গহুরালির নিদারুণ কষ্ট। ভাবিল তাহাকে ধরিয়া যদি তাহার কোনো একটা উপায় মিলিয়া যায়!

কিন্তু উপায় হইল না কিছুই; কেবল একদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া গহুরালি হাজেরাকে খুঁজিয়া পাইল না।

আর সে দালালেরও আর দেখা মিলিল না। খুঁজিতে খুঁজিতে প্রায় মাইল সাতেক দূরে একজন চাষীর কাছে সংবাদ পাওয়া গেল, হ্যাঁ, খুব বিহানবেলা এই পথ বাহিয়াই একটি মেয়েমানুষকে একজন পুরুষের সঙ্গে সে যাইতে দেখিয়াছে বটে।

মন্বন্তরে গহুরালি নিঃস্ব হইয়াছিল বাহিরে, এবারে হইল অন্তরে। নিঃঝুম হইয়া দুটি দিন সে বাড়িতে পড়িয়া রহিল। মনের আবেগ, ক্ষোভ, দুঃখ, অনুতাপ কিংবা রাগ কোনো ভাষা পাইল না, রূপ পাইল না; কেবল এক সময় ক্ষিপ্তের মতো একখানা কোদাল হাতে লইয়া সে নিজের যে-জমি খানার উপর দিয়া সড়কটা গিয়াছে, সে দিকে ছুটিয়া গেল। গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল স্ত্রীর শোকে গহুরালি পাগল হইয়া গিয়াছে। শুনিয়া সকলে তাহাকে দেখিতে আসিল।

গহুরালি তখন উন্মাদের মতো অবিশ্রান্তভাবে সড়কটাকে কোপাইতেছে। তাহার সব দুর্দশার মূল যেন ঐ সড়ক, এইভাবেই সে তাহাকে ভাঙিয়া মাটিতে মিশাইয়া ফেলিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। একার চেষ্টাতে সে পারিবে কী না তাহা একবারও তাহার মনে হইল না।

সকলে প্রশ্ন করিল; আহাহা, এ করো কী গহুরালি?

—ভাঙতে আছি। হাত না থামাইয়াই, চোখ তুলিয়া না চাহিয়াই গহুরালি জবাব দিল।

—ক্যান?

ভুল, ভুল অইছিলো এ রাস্তা বানাইন্যার। আমরা যে রাস্তা চাইছেলাম হেয়া এ না;—ঠিক অয় নাই। কোদাল চালাইবার ফাঁকে ফাঁকে গহুরালি যেন আত্মগতভাবেই কথাগুলি বলিয়া গেল।

সকলের ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে ঠিক হইত কী হইলে, কিন্তু গহুরালি দূরের কথা, তাহারা নিজেরাও কী তাহা জানিত! অন্য কোনো নয়া-সড়কের স্বপ্ন তো তাহাদের মনে কেহ জাগায় নাই!

জিবরাইলের ডানা

শাহেদ আলী

আজিমপুর হয়ে যে-রাস্তাটি সোজা পিলখানা রোডের দিকে চ'লে গেছে, তারি বাঁ-পাশে, গাছ-পালার ভেতর এগিয়ে গিয়ে একখানি ছোট্ট কুটীর। ঘরের মেটে দেয়াল-গুলোর উপরিভাগ চ'লে গেছে অনেক দিন রোদ-বৃষ্টি আর হাওয়ার অবারিত যাতায়াত এই ঘরের মধ্যে। মরচে-ধরা বহু পুরোনো টিনের সুরাখ দিযে দেখা যায় নীল্ আস্‌মানের ছিটে-ফোঁটা।

মা ও ছেলে শুয়ে আছে চাটাই বিছিয়ে।

সন্ধ্যবেলা হালিমা খুবই মেরেছিলো নবীকে। ছ'বছর গিয়ে সাত বছরে পা দিয়েছে নবী। হালিমা তাকে এক বিড়ির দোকানে ভর্তি করে দিয়েছে। কাজ না শিখলে দিন-গুজরানের উপায় থাকবে না। নবীকে দুধের বাচ্চা রেখেই বাপ তার ইন্‌তেকাল করেছে। একা হালিমা কীই বা করতে পারে তার জন্যে? নিজের পেট পালতেই সাত বাড়ী ঘুরতে হয় তার; কাজ না পেলে ভিক্ষে করতে হয় এবং সন্ধ্যোবেলা গিয়ে ব'সে থাকতে হয় গোরস্তানের গেটের কাছে। কবর জেয়ারত করতে এসে অনেকেই দান-খয়রাত করে, তাঁদের কাছ থেকে দু-চার পয়সা হালিমার বরাতেও জুটে যায় কখনো-কখনো। নবী অবশ্যি বিনে মাইনেতেই বিড়ির দোকানে কাজ করে, দোকানী শুধু দুপুরবেলা একবার খেতে দেয় নবীকে। এখনো সে পাকা হয়ে ওঠেনি বিড়ি বাঁধায়। কাজ সম্পূর্ণ শেখা হয়ে গেলেই সে মাস-মাস পাঁচ টাকা ক'রে পাবে দোকানীর কাছে। কিন্তু নবী ফাঁকি দিতে শুরু করেছে আজকাল, কোনো অছিলায় দোকান থেকে বেরিয়েই সে যে কোথায় চলে যায় কেউ বলতে পারে না। সন্ধ্যে পর্যন্ত আর-দেখা-ই মিলে না তার। এ

নিয়ে দোকানের মালিক তিনদিন নালিশ করেছে হালিমার কাছে, আজ তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, সে কাজ ছাড়িয়ে দেবে নবীর, এমন দুষ্টু ছেলেকে দিয়ে দরকার নেই তার। সারাটা বিকেল গোস্বায় আগুন হয়ে ছিলো হালিমা—ছেলে যদি কোনো কাজ না শিখে, তার কি কোনো ভবিষ্যৎ আছে আজকের দুনিয়ায়? অথচ, এমন মগ্‌ড়া যে, এদিকে মনই বসে না তার। মন বসবেই বা কেন? মা তো রয়েছে তার জন্যে ভিক্ষে করতে বাঁদিগিরি করতে! সন্ধ্যেয় নবী বাড়ী ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই হালিমা ধুম্-ধুম্ ক'রে কতকগুলো কিল বসিয়ে দেয় নবীর পিঠে। সারাদিন কাটায় কোথায় নবী? —জানতে পীড়াপীড়ি করেছিলো হালিমা, কিন্তু নবীর কাছ থেকে জওয়াব পাওয়া কঠিন; সে শুধু ফুলে ফুলে কেঁদেছে। কাঁদতে কাঁদতে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে নবী।

হালিমা খেতে বসেছিলো, কিন্তু দু'এক লোক্‌মা গিলেই সে উঠে পড়ে—তার পেটেও ভাত গেল না আজ। কতো অনুনয়-বিনয় করেছে হালিমা, কিন্তু তাতে মন গল্‌লো না অভিমানী শিশুর। শুধু দু'একবার চোখ মেলে হালিমার দিকে তাকিয়েছিলো। তারপর মুখ গম্ভীর ক'রে সে নিজেকে সঁপে দেয় ঘুমের কোলে।

গলে-যাওয়া দেয়ালের ওপর দিয়ে হালিমা তাকিয়ে আছে আস্‌মানের দিকে। একটা হাত তার নবীর ওপর রাখা; নবীর পিঠে কঞ্চি ভেঙেও কোনোদিনই খুব ব্যথা পায় না,—কিন্তু আজ এই মুহূর্তে, ঘুমিয়ে-পড়া ছেলের ওপর হাত রেখে, তার মনটা হু-হু ক'রে ওঠে দুঃখে! সত্যি, এতোটুকু ছেলে, কী-ই বা বুঝে? বাপ তো মরে গিয়ে রেহাই পেয়েছে চিরদিনের জন্য, বাপ-মার যুগল দায়িত্ব নিয়ে বেঁচে আছে হাতভাগিনী হালিমা। এভাবে যখন তখন ওকে মারপিট করা সত্যি অন্যায়।—কিন্তু আজ যদি কিছুই না শিখে, ও বাঁচবে কী ক'রে সংসারে?—হালিমা তো আর চিরদিন বেঁচে থাকবে না যে, নিজের দিন গুজরানের কথা নবীর না ভাবলেও চলবে!

হালিমার চোখ আঁসুতে ভ'রে আসে, আস্‌মান থেকে নজর ফিরিয়ে নিয়ে সে চুমো খায় নবীর কপালে!

নবী আস্তে আস্তে চোখ মে'লে চায়—আর হঠাৎ একবার দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ওই মা, এইডা কে?

—কইরে? বিস্মিত হালিমা প্রশ্ন করে।

—উইযে গেলো, ডান হাত বাড়িয়ে নবী দেখিয়ে দেয় অপরিচিতের যাওয়ার পথটি।

—কেউ না, নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর দেয় হালিমা।

—তুমি লুকাইবার চাও ?—নবীর অভিমান যেন ফুলে ওঠে—খুব ছুন্দর একটা মানুষ গেছে না ? রাঙা ধব্ধবা—আর পিন্দনে ছুন্দর কাপড় ?

—ছুন্দর মানুছ ? হালিমার বিস্ময় এবার আরো বেড়ে যাও!

—হ, চোখ দুটো বড়ো বড়ো ক'রে নবী বলে—মিঠাই লিয়া আইছিল,—তোমার কাছে দিয়া গেছে না মা ?

—হ, দিয়া গেছে, একটা করুণ হাসিতে প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে হালিমা—তারপর একটু শান্ত হয়ে বলে, নবী, এখন তুই ঘুমা,—বিহানবেলা খাবিনে মিঠাই।

—লোকটা কোন্‌খান থে আইছিল্‌, মা ? নবী আবার প্রশ্ন করে—দুইটা পাখনা দেখছো।পঠে ?

—পাখ্‌না ?—হালিমার আক্কেল সত্যি হার মানে এবার। আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতর ক'রে সে তাকায় নবীর মুখের দিকে, কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারে না হালিমা।

নবী আবার বলে—হ, পাখ্‌না।—মউরের পেখমের মতো ছুন্দর!

হালিমা আরো কাছে টেনে নেয় নবীকে, পিঠের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—ফিরিছ্‌তা আইছিল্‌ রে—ফিরিছ্‌তা। আজ ছবে-বরাত না! ঘরে ঘরে আইয়া খোঁজ-খবর নিছে মান্‌ছের। ফিরিছ্‌তার তো আজ ছুটি।

ফেরেশ্‌তা এসেছিলো! নবীর সারা গা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এক দারুণ উত্তেজনায় সে উ'ঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। সুন্দর আজকের রাতটা—রূপা-গলা জোছনায় ধুয়ে ঢল ঢল করছে সারা পৃথিবীর গা। সন্ধ্যেয় ঘরে ফেরবার সময় আজ সে দেখেছে মস্‌জিদে মস্‌জিদে কোরআন-তেলাওৎ-রত ছেলে-মেয়েদের। রাত হয়েছে অনেক, তবু শাহ-বাড়ীর মস্‌জিদ থেকে কোরআন তেলাওতের শিরীন আওয়াজ ভেসে আস্‌ছে এখনো—গোরস্তান গমগম করছে মানুষে। আজ ঘুমিয়ে নেই কেউই, ফেরেশ্‌তার সঙ্গে, মৃতদের রুহের সঙ্গে আজ মোলাকাত করবে সবাই; নিজেদের সুখ দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার মারফত জানাবে আল্লাহ্‌র কাছে। শুধু নবী আর হালিমা-ই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নষ্ট করেছে এ সুযোগটা। তাদেরই দুয়ারের সুমুখ দিয়ে চলে গেছে আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তা,

তাদের চাওয়ার কথা—জীবনপিপাসার কথা কিছুই জেনে যায়নি—কিছুই জানানো হলো না তাকে।

বাতি ধরিয়ে হালিমা পরীক্ষা করে ছেলের হাবভাব। একবার বলে—কিরে, তোর খিদে লাগছে খুব ? ভাত খাবি এখন? নবী কোনো জবাব দেয় না তার, খিদের কথা সে ভুলেই গেছে একদম। মন তার আচ্ছন্ন হয়ে আছে এক মধুর কঠিন ভাবনায়। ফেরেশ্তারা খবর নিয়ে যায় আল্লাহ্‌র কাছে। তাদের খবরও কি নিয়ে গেছে ফেরেশ্তা ? সে কি গিয়ে বলবে না, বরাতের রাতেও সে ঘুমে দে'খে গেছে নবী আর হালিমাকে!—ফিরিছ্তারে কিছু কইয়া দিছো মা ? আবার জিজ্ঞাসু হয় নবী।

কিছু বুঝতে না পেরে চুপ ক'রে থাকে হালিমা।

—দুয়ারের কাছ দে' গেলো আর কিছু কইযা দিলা না ? অত্যন্ত করুণ হয়ে ওঠে নবী, আমারে ডাক্‌লা না ক্যান তুমি ?

—আরে পাগলা, হালিমা তার জ্বালা চেপে রাখতে পারে না, ফিরিছ্তা আমাগো কতা হুন্‌বো ক্যান ? বড লোকগো খোঁজখবর করবার লাই না আইছে ? আমাগো দুয়ারের কাছ দে' তা'গো বাড়ীই হে গেছে।

নবী চুপ ক'রে থাকে অনেকক্ষণ, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসে—তুমি নামাজ পড়ো না ক্যান্ মা ? অসহ্য মুরুব্বিয়ানার সুর বেজে ওঠে তার প্রশ্নে

—কী অইবো নামাজ পইড়া ? একটা পরম বিতৃষ্ণা প্রকাশ পায় হালিমার কণ্ঠে।

—কী, অইবো কি ? এতোটুকু নবী জ্বলে ওঠে বিরক্তিতে, যারা নামাজ পড়ে, তাগো বাড়ীতেই না ফিরিছ্তারা আহে ; আল্লা তো তাগো কতাই হোনে।

—না-রে না, হালিমা একরকম চীৎকার ক'রে ওঠে এবার, আল্লা তো ঘুমাইয়া রইছে কেঁতা গায় দিয়া। হুনা-রূপা দিয়া ছেজ্‌দা করলেই হে চায়। গরীবের সোদা নামাজে হের মন ভিজে না।

আল্লাহ্‌র এই মহৎ গুণের কথা ভেবে একান্তভাবেই ঘাবড়ে যায় নবী। কাঙাল যারা, মিসকিন যারা, তাদের আর কোন ভরসাই নেই তা'হলে। এতো সোনা-রূপাও তারা পাবে না, তাদের দিলের আরজুও গিয়ে পৌঁছাবে না খোদার কাছে। আর তাই তো গরীবদের যারা নামাজ পড়ে তাদের তো মালদার হতে দেখা যায় না ; দুঃখ তাদের ঘুচছে কই ? সোনা-রূপার শিরীন আওয়াজেই

তাহলে ঘুম ভাঙে খোদার! সেই জন্মেই বুঝি মালদার আরো মালদার হয়, একগুণ দিয়ে পায় সত্তর গুণ!

কিন্তু খোদা তো পয়দা করেছেন সবাকেই। তিনি কেন তাঁর রহমত একতরফা বিলিয়ে দেবেন মালদারদের মধ্যে? কোনো দিন কি ঘুমের ঘোরেও দারিদ্র বান্দার দুঃখে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে না তাঁর চোখ? সত্যি কি গরীবেরা ঘুম ভাঙাতে পারে না তাঁর।

হতাশার আঁধারে হাতড়ে ফিরতে থাকে নবীর মন। দুয়ারের সুমুখ দিয়ে গেছে ফেরেশ্‌তা দবদবে আগুনের মতো রঙ, ময়ূরে পেখমের মতো বিচিত্র বর্ণের দুটো ডানা তার পিঠে, আর সারা গায়ে সে কী খোশবু! সাদা ধবধবে তাজী ঘোড়া কোমর নাচিয়ে চলেছে ফেরেশ্‌তাকে নিয়ে। নবী জেগে থাকলে আজ শুয়ে পড়তো ফেরশ্‌তার পথে, আর মিনতি ক'রে বলে যেতো, তার রক্তের-ঢেউ-ওঠা অফুরন্ত দুঃখের কাহিনী। কথা না শুনলে সে ঝুলে পড়তো ডানায় ধ'রে—ফেরেশ্‌তার সাথে সাথে উড়ে উড়ে সেও চলে যেতো একেবারে আল্লাহ্‌র কাছে। অমনি চোখ না মেললে নবী চীৎকার করতো গলা ফাটিয়ে খামচিয়ে রক্তাক্ত ক'রে ঘুম ভাঙাতো আল্লাহ্‌র।

কিন্তু তা তো আর হলো না। অথচ সব কিছুরই চাবি রয়েছে খোদার হাতে। তাঁর ঘুম ভাঙাতে না পারলে কেইবা আর খুলে দেবে ভাগ্যের মণিকোঠা?

বিছানায় গিয়ে আবার শুয়ে পড়ে নবী। রাজ্যের যতো চিন্তা এসে জটলা পাকায় তার মনে। হালিমাও বাতি নিবিয়ে গা এলিয়ে দেয় নবীর কাছে। ছেলে দু'চোখ মে'লে তাকিয়ে আছে বইরের দিকে, হালিমা তা দেখেছে না, শুধু বুক দিয়ে অনুভব করছে নবীর বুকভরা অস্বস্তি! একবার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হালিমা বলে, নবী অনেক রাত অইছে—তুই ঘুমা।

নবী আস্‌মানের দিকে চেয়ে থাকে চুপ ক'রে, আর একটা পথের খোঁজে কল্পনা তার হয়রান হ'য়ে যায়। আকাশ ভ'রে, পৃথিবীতে এতো জ্যোৎস্না—তবু যেন কতো অন্ধকার, চোখের সঙ্গে মনও হারিয়ে যায় সে-অন্ধকারে।

হঠাৎ একবার বিজলি ঝিলিক দিয়ে যায় তার চোখে, অকুল দরিয়ায় যেন নারিকেল কুঞ্জ-ছাওয়া উপকূলের আভাস পেয়েছে নবী। খুশিতে, আবেগ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তার সারা দেহ। হয়েছে, আর ভাবতে হবে না! আরশের পায়ায় রশি লাগিয়ে টান দেবে সে। রশি তো হাতেই রয়েছে তার। এবার থেকে নির্বিকার ভাব ঘুচে যাবে খোদার।

পরদিন। আগের দিনকার পানি-ভাত দুটো খেয়ে দোকানে কাজ করতে যায় নবী—যাবার ইচ্ছে তার মোটেই ছিল না, হালিমা-ই তাকে পাঠিয়েছে অনেক শাসিয়ে। হালিমা বলে, নিজের হাতেই আজ গড়তে হবে কপাল, আল্লার কাছে আরজি পেশ করলেই চলবে না।

কয়েকটা ছেলের সাথে নবী বিড়ি বাঁধছে, কিন্তু তার মন প'ড়ে আছে পিলখানার ওপাশে ফণিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকুতে। দোকান পালিয়ে লোক-চক্ষুর আড়ালে ঐখানে সে রোজই ঘুড়ি ওড়ায় আপন মনে। এ-খবর সে ছাড়া আর কেউ জানে না সংসারে। পৃথিবীকে লুকিয়ে শিশু তার কচি হাত দুটো বাড়িয়ে দেয় আসমানের দিকে। কিন্তু হাত আর কদ্দুরই বা ওঠে? নবীকে তাই নিতে হয়েছে ঘুড়ি—ঘুড়ি উড়িয়ে উড়িয়ে সে তার বাণীকে এতোদিন অজান্তে ওপর হতে আরো ওপরে আরশের দিকেই পাঠিয়েছে!

পেট ব্যথার অজুহাত তুলে নবী বেরিয়ে পড়ে দোকান থেকে। মুহূর্তের জন্যেও সে স্থির হতে পারছে না। আজ অতি সন্তর্পণে বাড়ী পৌঁছে নবী। মা বাড়ী নেই। আনন্দের সীমা থাকে না নবীর। তিনটা পাতিল তচ্‌নচ্‌ করে সে বার করে দু'আনা পয়সা—ওহ! দুই আনা পয়সা তো নয়, সাত রাজার ধন! পয়সাগুলো মুঠোয় পুরে নবী ছুটে যায় নবাবগঞ্জে। সুতো কিনে আবার সে দৌড়তে শুরু ক'রে দেয়। এক নতুন অভিযানের নেশায় বুক তার কাঁপছে। জঙ্গলের ভেতরকার এক পরিত্যক্ত ভাঙা মসজিদের অন্ধকার গুহা থেকে নবী বার করে একটা ঘুড়ি আর লাটাই। এই ঘুড়িই তাকে রোজ দোকান থেকে বের করে আনে কাজ ভুলিয়ে, এই ঘুড়িই তাকে পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে আস্‌মানের পথে নিয়ে যায়। আর সব ব্যাপারেই খই ফোটে নবীর মুখে, কিন্তু এই ঘুড়ির কথা কারো কাছে সে বলে না। এ যেন তার নেহাত পুশিদা খেলা, একান্তভাবেই নিজস্ব।

এক সময়ে নবী চ'লে যায় পিলখানার ওপাশে সেই ফণিমনসার ঘেরা নির্জন জায়গাটুকুতে। পুরোনো সুতোটার সঙ্গে নতুন সুতোটা গেরো দিয়ে সে ঘুড়ি উড়িয়ে দেয় আস্‌মানে। ঘুড়ি যতোই ওপরে উঠতে থাকে উল্লাসে অধীরতায় ততোই বিচলিত হয়ে ওঠে নবী, একটা স্মিতহাস্যে তার মুখ থেকে চোখ পর্যন্ত ঝিলিক দিয়ে ওঠে বারবার। আরশের পায়ে রশি লাগিয়ে আজ সজোরে টান দেবে নবী।

ক্রমেই ছোট হয়ে আসে ঘুড়িটা। এক সময়ে যখন হাতের সুতো শেষ হয়ে

গেল, নবীর দুঃখের সীমা থাকে না। সুতো শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু ঘুড়ি যে দেখা যাচ্ছে এখনো। খোদা কি এতো কাছে তাতো নয়, মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে অনেক দূরে আরশের ওপর ঘুমিয়ে আছেন তিনি। এতো কাছে হ'লে তো খালি চোখেই দেখা যেতো আল্লাহ্কে। সুতো চাই তার আরো অনেক সুতো,—যে তার ঘুড়িকে নিয়ে যাবে মেঘের ওপারে, আরশের একেবারে কাছটিতে! কিন্তু এখানেও দরকার পয়সার। সে যে সুতো কিনবে সে পয়সাই বা কই নবীর? তাদের দুর্দশা তাহলে আর ঘুচবে না! নবী আসমানের দিকে চেয়ে নিজের ব্যর্থতায় আর্তনাদ করে ওঠে। ঘুড়ি ওড়ানো যতোদিন একটা সখ ছিলো, নেশা ছিলো, ততোদিন শুধু ঘুড়ি উড়িয়েই আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু আজ যখন এই ঘুড়ি একটা গভীর অর্থ নিয়ে তার কাছে ধরা দিয়েছে, সহস্র বেদনার সম্ভাবনার পথও অবারিত হয়ে গেছে তার জন্যে!

কিছুক্ষণ ঘুড়ি উড়িয়েই বাড়ী চলে আসে নবী। এই সুতোয় হবে না, আরো অনেক সুতো চাই। বামনের হাত বাড়িয়ে আরশের পায়া ধরা অসম্ভব। পরম যত্নে সে ঘুড়িটা লুকিয়ে রাখে ভাঙা মসজিদের নির্জন অন্ধকারে।

বেলা চলে যাচ্ছে, ঘরেও পয়সা নেই। মার কাছে পয়সা চাইতে গেলে হালিমা কঞ্চি দিয়ে তার পিঠের ছাল না তুলে ছাড়বে না। যে দু'আনা পয়সা আজ সে চুরি করেছে তার জন্যেই তার বরাতে কী আছে কে জানে? তবু লোভ সামলাতে পারে না নবী। আজকালের লিখা পাল্টাতে হলে কিছু খরচ—কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হবে বইকি। মার অবর্তমানে নবী উল্টে পাল্টে দেখে ঘরের সব কটা হাঁড়ি-পাতিল—ছেঁড়া কাপড়ের খোঁজে তন্নতন্ন করে। একটা পয়সা নেই কোথাও। পয়সা থাকবেই বা কী করে? ভিক্ষে করে পরের বাড়ীতে কাজ করে যা দু'চার পয়সা পায় তাতে করে মা-ছেলের আধপেটা খাবারই হয় না কোনদিন, তারা আবার জমাবে পয়সা!

হঠাৎ নবীর মনে পড়ে যায়ঃ ইষ্টিশনে গেলে দু'চার পয়সা পাওয়া যেতে পারে। তার বয়সী ছেলেদের সে কুলিগিরি করতে দেখছে অনেকদিন। নবী আর ভাবতে পারে না, একপেট খিধে নিয়েই সে ছুটে যায় ইষ্টিশনের দিকে। অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয় তাকে। তার পর গাড়ী যখন এলো, তাজ্জব বনে যায় নবী—কতো বিচিত্র রকমের মানুষ, আর কতো রঙবেরঙের পোষাক! বাক্স, বিছানা, পেটেরা প্রভৃতিতে স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে লাইনের কাছটুকু। 'মুটে চাই' 'কুলি চাই' চীৎকারে হারিয়ে যায় আর সব আওয়াজ।

সবার বরাতেই একটা না একটা কিছু জুটে যায় ; কিন্তু নবীর কপাল বড়ো খারাপ, 'মুটে চাই' বলে চীৎকার করতে গিয়ে আওয়াজ এলো না তার গলায়— হাত দুটো চাওয়ার ভঙ্গীতে ওপর দিকে উঁচিয়ে যেন ছুটে যায় এক কামরার সুমুখ থেকে আরেক কামারার সুমুখে। চোখ তার করুণ, আঁসুতে টলোমলো। ভিক্ষুক মনে করে কেউ কেউ তাকে নসিহত করলে শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে, আর অতি আধুনিক কেউ দিলে গলাধাক্কা। কারো কাছ থেকেই নবী কিছু পেলো না।

ট্রেন চলে গেছে। ইষ্টিশনে বসে বসে নিজের বদ্ নসিবের জন্যে বেদনায় ভরে আসে নবীর মন। দুঃখটা এবার আরও বড়ো হয়ে দেখা দেয় নবীর কাছে। মায় বেটায় কোনদিন একবেলা পেট ভরে খেতে পায় না তারা। কোনোদিন একেবারেই উপোস করতে হয় তাদের। বছরে একবার করেও যদি কাপড় কিনতে পারতো তারা! তার বাপ সেই যে ছেঁড়া, শততালি দেয়া কাপড়গুলো রেখে গিয়েছিলো সেইগুলোই আরো তালি দিয়ে এবং গেরোর ওপর গেরো দিয়ে পরছে তারা দুজনে। ঘরের মেটে দেয়াল তো প্রায় সবটাই গলে গেছে, বৃষ্টি হলেই টিনের সুরাখ দিয়ে পানি পড়ে ঘর ভেসে যায়। দুর্দশার আর সীমা পরিসীমা নেই তাদের। আল্লাহ্‌র কাছে তাদের দিলের আরজু পৌঁছাতে পারলেই অবসান ঘটতো দুঃখরাত্রির। কিন্তু হালিমা নামাজ পড়ে না, নবীও আরবী সুরা এবং রাকাতগুলো শিখবার সুযোগ পায়নি কখনো। আল্লাহ্ কেনই বা শুনবেন তাদের কথা।

ঘণ্টাখানেক পরে আরেকটা ট্রেন যখন এলো, নবীর আনন্দ দেখে কে! ট্রেন থামবার আগেই 'মুটে চাই' 'কুলি চাই' বলে সে চীৎকার শুরু করে দেয় প্রাণপণে। ট্রেন থামলে একটা ঘড়ি-পরা বলিষ্ঠ হাতের ইশারায় নবী এসে দাঁড়ায় এক প্রথম শ্রেণীর কামরার সুমুখে। ভদ্রলোক একটা এটাচি ও হোল্ড অল্ দেখিয়ে দিয়ে বললেন—ওয়েটিং রুমে নিতে যেতে পারবি ?

—ক্যান পারুম না ? তাচ্ছিল্যের সাথে জবাব দেয় নবী, দেন আমার ঘাড়ে তুইলা !

—কতো নিবি ? ভদ্রলোকের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে।

—আমার বহুত পইছার দরকার, চোখ দুটো বড়োবড়ো করে উচ্চারণ করে নবী—আপনে কতো দিতে পারবেন ?

ভদ্রলোক এবার দৃষ্টি প্রখরতর করে নবীর মুখের দিকে তাকান ; অদ্ভুত ছেলে তো! বলেন—এতো পয়সা দিয়ে কি করবি ?

—বারে, পইছার বুঝি কাজ নাই! নবী রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করে, ঘুড়ির রছি কিনুম যে—অনেক রছি।

ভদ্রলোক এবার সত্যিই হেসে ফেলেন এবং হোল্ড-অলটা নবীর মাথায় দিয়ে এটাচিটা হাতে করে নেমে পড়েন গাড়ী থেকে। ওয়েটিং রুমে এসে চার পয়সার জায়গায় চার আনা দিয়ে বলেন—এই নে, অনেক সুতো হবে।

নবী সিকিটা ছুঁড়ে মারে ওয়েটিং রুমের মেজেয়—না, আমি নিমু না। চার আনায় আমি কী করুম? আমার অনেক রছি লাগবো। আমার ঘুড়ি আছমান ছুইবো গিয়া।

সবাই অবাক হয়ে যায় নবীর মেজাজ দেখে। ভদ্রলোক সিকিটা হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বলেন—ঘুড়ি আসমান ছুঁলে তোর কি হবে?

—ক্যান্, আরছের পায়ায় বাজাইয়া টান দিমু, এক স্বপ্নিল নেশা আর শক্তির স্ফূর্তিতে নবী মুহূর্তে যেন বিরাট কিছু হয়ে ওঠে—আল্লা খালি আপনাগো কথাই ছুনবো, আমাগো কথা বুজি ছুনোন লাগবো না হের?

এবার সকলে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। পরিবেশটা মুহূর্তে যেন কেমন থম্‌থমে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। কারো মুখে টু শব্দটি নেই। রাজ-ভক্তদের সামনে যেন রাজদ্রোহের বাণী উচ্চারিত হয়েছে শিশুর মুখে! ভদ্রলোক পকেট হতে একটা আধুলি বের করে বলেন—এই নে, এখন হবে তো?

আধুলিটা হাতে নিয়ে কৃতজ্ঞতায় আঁখি ছল্‌ছল্ করে ওঠে নবীর। আন্তরিকতা মিশিয়ে বলে, আমাগো যখন অনেক পইছা অইবো, আমাগো বাড়ী তখন আইয়েন—আপনের জেব ভইরা দিয়া দিমু হেদিন।

নবীর কথায় হেসে ফেলে সবাই। যিনি আধুলিটা দিয়েছেন, তিনি ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন হাসিতে। তাঁর আজকের এই মেহেরবানীর কথা ভুলতে পারবে না নবী—দিন যখন ফিরবে, নবী দুই জেব ভর্তি করে পয়সা দিয়ে শোধ করবে তাঁর ঋণ। হাসতে হাসতেই বলেন, হাঁ হাঁ নিশ্চয়ই আসবো, আমরা সবাই আসবো সেদিন।

নবী এসব শুনবার জন্য অপেক্ষা করে না। সে সোজা চলে যায় চকের দিকে! অনেকটা সুতো কিনে যখন বাড়ী ফিরলো তখন সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। সুতোটা সে লুকিয়ে রেখে আসে মসৃজিদে—তার ঘুড়ির পাশে।

হালিমা ভিক্ষা-করে-আনা চালগুলো জ্বাল দিচ্ছে। গাছতলা থেকে ভিজে-

বন কুড়িয়ে এনেছে আগুন ধরাবার জন্যে। নবীকে দেখেই চোখ কচলাতে কচলাতে বলে, কিবে,—অতোক্ষণে কোন্‌থে আইলি ?

মার দরদ-ভরা প্রশ্নে অত্যন্ত খুশী হয় নবী ; তার মেজাজ তাহলে বিগড়ে যায়নি আজ ! হয়তো পাতিল তচ্‌নচ্‌ ক'রে পয়সা নেবার খবরটি সে জানতেই পারেনি এখনো। মনে মনে আল্লাহ্‌কে সে শুকুরিয়া জানায়। —দোকান তে বার অইয়া একটু ঘুইবা আইলাম, মা,—মার দিকে চেয়ে সে বলে সহজভাবে !

চুলোয় বন ঠেলতে ঠেলতে হালিমার কণ্ঠে দরদ ভেঙে পড়ে—দোকান তে পালাস নে যেন !—কাজটা ছিখে ফেসলে অনেক পইছা আইবো ঘরে,—কাজ না জানলে কি আর ভাত-কাপড় জুটে ? আমাগো মা-পুতের কি এ-ছাড়া আব উপায় আছে ?—এবার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে হালিমা প্রশ্ন করে—হারে নবী, তোব খিদা লাগছে, না ?

মা-এর আন্তরিকতায় নবী একরকম ভুলেই যায় তার খিদেব কথা। তাছাড়া, একদিকে রশি কেনার আনন্দ, অন্য দিকে মার স্নেহ—দু'টোতে মিলে আজকেব দিনটি অপূর্ব্ব হয়ে উঠেছে নবীব কাছে। হেসে সে বলে—না মা—আমাব খিদে লাগছে না দোকানে আমাগোরে খাওয়ায় কিনা দুপুরবেলা।

—তাই ভালা—হালিমা সায় দেয়—ভিক্ষার ভাত যতো কম পেটে দেয়া যায় ততোই ভালো। এ ভাতে ছেলেমাইয়া গো 'বাইড়' থাকে না !

রান্না হলে নবী ও হালিমা, দু'জনেই কিন্তু ভিক্ষের ভাত পেটে ঢেলে স্বস্তিবোধ কবে কিছুটা।

পরদিন দোকানের কথা বলে নবী একটু সকাল সকালই বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। আজ আবহাওযা খুবই অনুকূল—এবং নবীব হাতে অনেক সুতো। পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে অনায়াসে আজ সে তার হাত পৌঁছিয়ে দিতে পারে আসমানে।

নবী ঘুড়িটাকে পয়সা বুকের কাছে চেপে ধরে—বুক তার ঢিপ ঢিপ করছে। কিছুক্ষণ পরেই ঘুড়ি উড়লো আস্‌মানে,—হাওয়ার ভরে নেচে নেচে, দুঃসাহসের দোলায় কেঁপে কেঁপে ঘুড়ি উঠে যায় ওপর হতে ওপরে—আরো ওপরে ! সুতো আজকে ফুরোতে চায় না,—ঘুড়ি ক্রমেই ছোটো হয়ে আসছে—অই বুঝি ঘুড়ি হারিয়ে যায় দৃষ্টির ওপারে অসীম শূন্যতায় ! আবেগে, ঔৎসুক্যে বড়ো হয়ে এলো নবীর চোখ দুটো। তার বুকের শ্বাস দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে আসে, ঠোঁটেব বাঁধন খুলে গিয়ে একটা অদ্ভুত হাসির আমেজ লাগে তার সাবা

মুখে। ঘুড়ির নাচের সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব চঞ্চলতায় নাচতে থাকে তার বড়ো-হয়ে-আসা চোখের চকচকে তারা দুটো।

এক সময়ে টের পায় নবী—লাটাই আর ঘুরছে না—সুতো শেষ হয়ে গেছে। সেই নির্জন ফণিমনসায় ঘেরা জায়গাটুকুতে নবীর চোখ পানিতে ভ'রে আসে। ঘুড়ি এখনো দৃষ্টি-সীমার ভেতরেই!

নবী ঘুড়ি নামিয়ে আনলো। আরো রশি চাই তার, অনেক রশি। খোদা তাঁর আসন এতো দূরে পেতেছেন কেন, বুঝতে পারে না নবী। কিন্তু আসন দূরে পাতলেই কি আরশে বসে ঘুমোনো এতো নিরাপদ? সংসারে কি রশি নেই যে, তাঁর আরশ ছোঁওয়া যাবে না, টলিয়ে দেয়া যাবে না পায়ায় রশি লাগিয়ে? নবীর আকাঙ্ক্ষা আরো প্রবল হয়ে ওঠে বাধা পেয়ে।

চিরদিনকার মতো মসৃজিদে ঘুড়ি আর লাটাই লুকিয়ে রেখে, আজো সে চলে যায় ইষ্টিশনে। পয়সা চাই তার, রশি কেনার পয়সা—যে রশি সে আরশের পায়ায় বেঁধে খোদাকে নামিয়ে আনবে মাটির মানুষের মধ্যে!

শেষ পর্যন্ত দু'আনার বেশী আর জুটে না। কতোটুকু সুতোই বা আব কেনা যায় এদিয়ে!

এমনি ক'রে রোজ কিছু কিছু পয়সা আয় করে নবী—আর তাই দিয়ে সুতো কিনে পুরোনো সুতোটার সাথে জুড়ে দিয়ে ঘুড়ি উড়িয়ে দেয় আসমানে।

পিলখানার ওপাশের ওই স্থানটুকু নবী একান্ত আপন ক'রে নিয়েছে অনেকদিন। অমন নির্জন নীরব পরিবেশে আসমান ছাপিয়ে ওঠে নবীর দুর্জয় সাহস। কিন্তু হাতের সুতো যখন শেষ হয়ে যায়, এবং ছোটো হ'তে হ'তেও ঘুড়ি যখন থেকে যায় দৃষ্টির ভেতরেই, নবীর তখনকার দুঃখ আর আক্রোশ দেখে কে? তবু মন তার ভেঙে পড়ে না—সাফল্যের নিকট সম্ভাবনা তাকে ক'রে তোলে আরো সাহসী, আরো জেদী।

রোজ নবী দোকানের কথা ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়—কিন্তু কোথায় বা দোকান আর কোথায় বা নবী? ইষ্টিশনে, বাজারে মুটেগিরি ক'রে যা দু'চার পয়সা পায় সবই খরচ করে সুতো কেনায় দিনে দিনে সুতো দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হ'য়ে ওঠে।

একদিন সত্যিই ঘুড়িটা ছোটো হ'তে হ'তে একটা কালো বিন্দুর মতো হয়ে আসমানের অসীম শূন্যতায় হারিয়ে গেলো। ডোর ধরে রেখে আসমানের দিকে চেয়ে আছে নবী, আর প্রচণ্ড কাঁপুনীতে থর থর ক'রে উঠছে তার শরীর।

উত্তেজনায় কপাল দিয়ে ঘাম বেরিয়ে এলো তার, বিস্ময়ে-আশঙ্কায় দম যেন বন্ধ হয়ে আসে—একটা করুণ হাসিতে মধুর হ'য়ে ওঠে শিশুর মুখ। আজ যেন টানাটানি প'ড়ে গেছে আসমান আর পৃথিবীর মধ্যে—কে হারে, কে জেতে—এবং তারি আকর্ষণ সে অনুভব করছে হাতের রশিতে! শুধু একটা রশি—টন্‌টন্ করছে আসমানের আকর্ষণে। হয়তো দৃষ্টির আড়াল থেকে কে টানছে রশিতে ধ'রে—আর সেই টানে ফু'লে ফু'লে ওঠছে নবীর হাতের শিরা উপশিরা।

রশি বেয়ে বেয়ে নবীর বিস্মিত দৃষ্টিও হারিয়ে যায় আসমানে। আজকে আর ঘুড়ির রশি গুটোবে না নবী; লোকচক্ষুর ওপারে ঘুড়ি উড়ে বেড়াক আপন ইচ্ছেয়—আপন ধর্মে! এক সময় হয়তো আট্‌কে যাবে আরশের পায়ায়—আর শক্ত টান প'ড়বে হাতে, রশিতে টান দিয়ে নবী টলিয়ে দেবে আল্লার আরশ। ভয়-চকিত আঁখি মে'লে আজ তিনি তাকাবেন মাটির মানুষের দিকে—অনিচ্ছায়ও শুনতে হবে দুঃখী বান্দার কাহিনী,—তাদের ইতিহাস!

নবী চেয়ে আছে ওপর দিকে—শুধু একটা সুতো—সে-রাতের পুলের মতো সূক্ষ্ম একটা সিঁড়ি বেহেশত্ আর দুনিয়ার মাঝখানে। মাঝে মাঝে সাদা, কালো নানা রঙের মেঘ আনাগোনা করছে এবং আঁৎকা টান প'ড়ে প'ড়ে ঝন্ ঝন্ করে উঠছে সুতোটুকু—মেঘ দু' টুকরো হয়ে যাচ্ছে সে সুতোর ধারে! নবীর চোখ দুটো পানিতে ভ'রে আসে। আল্লাহ্‌র আরশ ঠিক কোন্‌খানটিতে তা' সে জানে না, কিন্তু আজ তার মনে হ'লো—সে যেন তার বিদ্রোহের নিশান আরশের কাছাকাছি কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছে। আর যেন দূর নয় বেশী!

পেটের ক্ষিধে, মা ও সমস্ত সংসার—সব কিছু ভু'লে যায় নবী। সন্ধ্যের পরও অনেকক্ষণ 'ডোর' ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে সে। কই, কোথাও তো আটকে গেলো না ঘুড়ি! এক সময়ে সে সুতো গুটিয়ে ঘুড়ি নামিয়ে আনে নীচে এবং জমিন ছোঁ'বার আগেই ঘুড়িটাকে চেপে ধরে তার বুকের মাঝে; ঘাড় নীচু ক'রে সে পরশ নেয় ঘুড়ির,—কেমন যেন একটা অদ্ভুত গন্ধ পায় নাকে, আর ঘুড়িটাকে মনে হয় ভেজা-ভেজা! আহ্—নবীর বুকে খুশী আর সামাই পায় না যেন! বহুদিন পর খোদা আজ তাঁর গরীব বান্দার দুঃখে কেঁদেছেন, আর তারই আঁসুর ধারায় সিক্ত হ'য়ে উঠেছে নবীর ঘুড়ি।

আরশের পায়া ধ'রে টান দিতে হলো না আর; এর আগেই খোদা কেঁদে ফেলেছেন তার বান্দার দুঃখে। নবী আজ সত্যি বিজয়ী—সে সার্থক হয়েছে তার অভিযানে; আজ থেকে আর কোনো দুঃখ থাকবে না তদের।

বাড়ী ফিরে দেখে—হালিমা বিছানায় প'ড়ে কোঁকাচ্ছে—জ্বর এসেছে তার। জোহবের সময়েই চ'লে এসেছিলো ঘরে—আজ আর কিছুই জোটেনি কপালে। মনটা খারাপ হ'য়ে যায় নবীর—খোদা যদি তার বান্দার দুঃখে কাঁদবেন তো তার মার জ্বর হবে কেন আজ? তাদের ঘরে আজ ভাত জুটবে না কেন? এ তা'হলে আল্লার আঁসু নয়—শয়তানের পেশাব! শয়তান চায় না যে মানুষের দিলের আরজু পৌঁছুক গিয়ে আসমানে।

নবী বুঝতে পারে—আরো অনেক সুতোর দরকার হবে তার সাত তবক আসমান পেরিয়ে গিয়ে তবেই না আল্লাহ্‌র আরশ! সকালবেলা জ্বর নিয়েই উঠে পড়ে হালিমা। কয়েক বাড়ী ঘু'রে কিছুটা যেন যোগাড় ক'রে নিয়ে আসে নবীর জন্যে। নবী বলে—তুমি খাইবা না, মা?

না,—হালিমা ধীরে ধীরে বলে—তুই খাইয়া দোকানে যা। নবী পিয়ে পিয়ে ফেনটা গিলে নেয়। তারপর মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—তুমি চিন্তা কইরোনা মা—আল্লা আমাগো উপরে মুখ তুইলা চাইবো। এ-হাল আমাগো বেছি দিন থাকবো না।

হালিমা ছেলের দিকে চেয়ে একটু করুণ হাসি হাসে—কিছু বলে না। টল্‌তে টল্‌তে এক সময় সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সে জানে না যে, নবী দোকানে যায় না একদিনও—বাজারে ইষ্টিশনে মুটেগিরি করে, আর পিলখানার ওপাশে ঘুড়ি উড়ায়!

নবী মুটেগিরি ক'রে ক'রে রোজ কিছুটা সুতো কেনে। উর্ধ্ব হতে আরো উর্ধ্বলোকে পাঠিয়ে দেয় তার বিদ্রোহের নিশান! কিছুতেই থামতে পারে না নবী; যার নূরের তজল্লিতে সিনাই পাহাড় পু'ড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলো, তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় দুঃসাহসী শিশু!

কিন্তু যতোই সুতো জু'ড়ে দিচ্ছে—ঘুড়ি ততোই ওপর হ'তে আরো ওপরে উঠছে—কোনো কূল কিনারাই পায় না নবী। এতোদূরে—মানুষের নাগালের বাইরে এ-ভাবে আত্মগোপন করার কী মানে থাকতে পারে, কিছুই সে বুঝে উঠতে পারে না!

একদিন নবী সন্ধ্যের সময় ঘুড়ি উড়িয়ে ফিরে এসে দেখে—মা আজ বড়ো খুশী! পরনে তার নতুন শাড়ী—সান্‌কি আর বাটিতে ভাত-সালুন বে'ড়ে ব'সে আছে নবীর অপেক্ষায়!

বহুদিন পর সান্‌কি-ভরা ভাত দে'খে পেঠ জ্বালা ক'রে ওঠে নবীর। সে

সোজা গিয়ে ব'সে পড়ে হালিমার কাছে। খেতে খেতে মাকে বলে—মা অতো ছব্ পাইলা কই আইজ!

আজো জ্বর ছিলো হালিমার! কিন্তু এই মুহূর্তে নবীর খাওয়া আর খুশী দেখে সে যেন সুস্থ হ'য়ে ওঠে হঠাৎ। ধীরে ধীরে বলে—কাহারটুলির জমিদার বাড়ীর বউ মরছিল না, তারি ফাতিহা আইছে আইজ,—বহুত কাপড়-চোপড় আব টাকা পয়ছা দান-খয়রাৎ করছে তারা। দেখ না—তোর লাইগা একটা লুঙ্গিও আনছি চাইয়া। হালিমা উঠে পড়ে এবং একটা ছোট্ট নতুন লুঙ্গি এনে দেয় নবীর হাতে।

বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে যায় নবী। আজ বুঝি সত্যি তাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন আল্লাহ্, ঘুম তা'হলে ভেঙেছে তার আজ! শুকৃরিয়ার বান ডেকে যায় তার বুকে। ছলোছলো চোখে মার দিকে চেয়ে বলে—কইছিলাম না মা—এ হাল আমাগো বেছি দিন থাকবো না।

হালিমা নবীর এ-কথায় সায় দিতে পারতো না কোনোদিনই। কিন্তু এই মুহূর্তে সে সায় না দিয়ে পারে না। নবীর চোখে যেন সে পরিচয় পেয়েছে—তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের!

জমিদার বাড়ীর দেয়া পয়সা আর চালে দু'দিন ভালোই যায় তাদের; আবার শুরু হয় আধ-পেটা খাওয়া আর উপোসের পালা। নবীর মন ভেঙে পড়ে—রাগে জ্বালা ধরে যায় তাব সমস্ত সত্তায়। একি ছলনা—একি ছিনিমিনি খেলা বান্দার জীবন নিয়ে? তাদেব আরজু তা'হলে এখনো গিয়ে পৌঁছয়নি খোদার কাছে।

নবী রোজ ঘুড়ি উড়ায় আর মনে মনে বলে—আল্লাহ্র আরশ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে এতো সুতো যদি সে কিনতে না-ই পারে এতো ফেরেশ্তা রয়েছে কী জন্যে?—তারাই তো মানুষের দিলের আরজু পৌঁছয় গিয়ে খোদার কাছে। আল্লাহ্র কাছ হতে তারাই পয়গাম নিয়ে আসে মানুষের কাছে। আজকাল এতো নিষ্ক্রিয় কেন এই ফেরেশ্তারা? কেন তারা নবীর ঘুড়িকে নিয়ে যায় না আল্লাহ্র কাছে।

সেদিন সোমবার। নবী না খেয়েই ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ে চুপি চুপি। সেই ফণিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকু! নবী দুর্বার ওপর ব'সে নতুন সুতোটাকে জুড়ে দেয় পুরোনো সুতোটার সঙ্গে। আসমান কেমন যেন মেঘ্লা মেঘ্লা। সূর্যের আলো প'ড়ে মেঘগুলো সাদা হয়ে গেছে। আর

ফাঁকে ফাঁকে চক্‌চক্‌ করছে গাঢ় নীল আসমান। এই সময় নবী ঘুড়িটাকে উড়িয়ে দেয় আসমানে,—তাতে তার লাটাই আর ঘুড়ি শন্‌শন্‌ ক'রে ধাওয়া করছে উর্ধ্বদিকে। নবী অপলক চোখে চেয়ে আছে ঘুড়ি পানে—আর রশিতে টান প'ড়ে প'ড়ে ঝিন্‌ ঝিন ক'রে উঠছে তার সারা শরীর। অকারণ উল্লাসে ভবে উঠছে নবীর মন। নবী কিছুই বুঝে উঠতে পারে না! মন তার আবেগ-উৎসাহে থর থর করে কেঁপে উঠছে, কল্পনা স্বর্ণ-ঈগলের মতো ডানা মেলেছে আসমানে!

ঘুড়ি ক্রমেই ছোট হয়ে এলো। একসময়ে নবী বিস্মিত হয়ে দেখতে পেলো, তার ক্ষুদ্র ঘুড়িটার চারপাশে একটা বৃহৎ পাখী উড়ছে আর ঘুরছে। মাঝে মাঝে পাখীটা হারিয়ে যাচ্ছে মেঘের আড়ালে,—আবার দেখা যাচ্ছে ডানা মে'লে ঘুড়িটাকে কেন্দ্র ক'রে। আশ্চর্য, একবার ঘুড়ির রশি আটকে যায় পাখীর গায়, নবীব হাতে টান পড়ে আর তাতেই সারা দেহ অজানা আশঙ্কায় দুলে ওঠে--পাখীটা ঘুড়ি নিয়েই ঘুরতে থাকে আরো দ্রুতবেগে। রশি আরো প্যাঁচ খেয়ে লাগে পাখীব ডানায় আব গায়ে। হঠাৎ এক সময় নবী টের পায়, সূতো ঢিল হয়ে গিয়ে নেমে আসছে আর ঘুড়ি ঘুরছে পাখীর পিছে পিছে। নবীর এতোদিনেব অহংকার মাটি হয়ে যায় আজ! আরশের পায়ার রশি লাগিয়ে আরশকে টলিয়ে দেয়া আর সম্ভব হলো না জীবনে।

একাকী শূন্য মাঠে ডুকরে কেদে ওঠে নবী। দুচোখে-ভরা আঁসু নিয়েই সে একবাব তাকায় ঘুড়ির দিকে। একটা কালোবিন্দুর মতো পাখীর পিছে পিছে ঘুবছে ঘুড়ি, আর পাখীটা শুধু ঘুরে ঘুরে উপরেব দিকেই উঠছে। আচম্‌কা নবীর মনে হলো—এতো পাখী নয়—এ যে ফেরেশ্‌তা,—জিবরাইল এসেছে পাখীর সুবত ধ'রে তার ঘুড়িকে আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যাবার জন্যে! দু'চোখ ফেটে এবার কৃতজ্ঞতার আঁসু গড়িয়ে পড়ছে নবীর গাল বেয়ে; তার আঁসু ধোয়া মুখে ফুটে ওঠে একটা অপূর্ব হাসি—বেদনায় আর আনন্দে ঝল্‌মল্‌-করা।

নিজের বোকামির কথা ভেবে শরম হয় নবীব। এতোদিন পর ফেরেশতা এসেছে তার দিলের আরজু আল্লাহ কাছে নিয়ে যাবার জন্তে! আর সে কি না কাঁদছে, পাখী তার ঘুড়ি নিয়ে গেল বলে! চোখ মুছে সে তাকায় আসমানের দিকে—দেখে পাখীও নেই—ঘুড়িও নেই,—শুধু সাদা সাদা মেঘ, আর তারি ফাঁকে চক্‌চক্‌-করা গাঢ় নীল আসমান! অনেকক্ষণ নবী চেয়ে থাকে আসমানের দিকে,—আবাব তার চোখ ফেটে দরদর করে বেরিয়ে

আসে কৃতজ্ঞতার আঁসু। আজকে সে সার্থক—আজকে সে জয়ী! আর কোনো ভাবনা নেই তার,—জিবরাইল এসে নিয়ে গেছে তার ঘুড়ি—নতুন পাতা খুলবে এবার জীবনের।

আবার আসমানের দিকে চেয়ে, এক ঝলক হেসে নবী বাড়ী ফিরে আসে। খুশীতে তার সারা শরীর আজ নেচে নেচে উঠছে। হালিমা উঠোনে ব'সে শাক বাছ্‌ছিলো—"মা—মা—হুন্‌ছো"—ব'লে নবী ঝাঁপিয়ে পড়ে হালিমার কোলে।

হালিমা হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে পড়ে—তারপব বাগে ঠোঁট কামড়ে, টিপে ধরে নবীর ঘাড়ে—গর্‌গর্‌ ক'রে বলে—কোথে আইলিরে হারামজাদা? আইজ তোর রঙ্‌ আমি না বাইর কইরা ছাড়ুম না।

নবী তার মার রাগের কারণ বুঝতে পারে না—তবু, তার খুশীব খবরটুকু সে না দিয়ে পারছে না তার মাকে,—মা, আইজ্‌ জিবরাইলেরে দেখছি—আমগো খবর···

নবী কথা শেষ করতে পারে না—ধুম ধুম করে হালিমার শক্ত হাতের কিল পড়তে থাকে তার পিঠে।—কিলোতে কিলোতেই বলে—ওরা দিবো আর আমরা খামু, বইয়া বইয়া—ঝাঁটা মার্‌ জিবরাইলের মুখে শতবার!

—মা—মা—তুমি গাল দিয়ো না, চীৎকার ক'বে ওঠে নবী—গুণা অইবো মা, আল্লা রাগ কর্‌বো।

হালিমার রাগ আরো বেড়ে যায়—গালের ফোয়ারা থামতে চায না তাব। নিরুপায় নবী কামড়ে ধরে তার মার হাত।

এবার যেন আগুন লেগে যায় হালিমার গায়। বিড়ির দোকানের মালিক আজকে ব'লে গেছে—নবী দোকানে যায় না কোনোদিনই; সুতরাং কাজ তার ছাড়িয়ে দেওয়া হলো আজ থেকে। দেকানীর কাছেই শুনেছে হালিমা—নবী নাকি কোথায় ঘুড়ি উড়ায় সারাদিন, আব সময সময় ছুটে বেড়ায় বাজারে, ইষ্টিশনে। খবরটা পেয়ে অবধি গোস্বায় আগুন হয়েছিলো হালিমা! এমন অবাধ্য শয়তান ছেলেকে দিয়ে কাজ কি? হালিমা এবার কঞ্চি হাতে নিয়ে সপাং সপাং মারতে থাকে নবীর পিঠে, হাতে, মাথায়।
—হারামজাদা, তোর ভালার লাইগাই না আমার মাথা-বিষ, আর তুই কিনা ফাঁকি দেছ্‌ আমারে! আমি মরলে জিবরাইল থাঞ্চা থাঞ্চা ভাত লইয়া আইবো না তোর লাগি।

আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় নবীর পিঠ—চীৎকার করে সে কাঁদে এবং কামড়ে কামড়ে রক্তাক্ত ক'রে দেয় হালিমাকে। এক সময় প্রায় বেহুঁশ হয়ে সে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

রাতের বেলা হালিমার গায়ে জ্বর এসে যায়। নবী তার মার দিকে একবার চায়,—এবং কিছু না বলেই ঘরের এক কোণে শুয়ে পড়ে মাটির ওপর। কিছুই পেটে পড়লো না তার। শুয়ে শুয়ে কপাল কুঁচকে, ঠোঁট ফুলিয়ে সে কট্‌মট্‌ ক'রে তাকিয়ে থাকে হালিমার দিকে।

তারপর, কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়লো, সে নিজেই জানে না।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নবী স্বপ্ন দেখলো ; জিবরাইল তার ঘুড়ি নিয়ে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আসমানের দিকে ধাওয়া করেছে। এক সময় নীল আস্‌মান দু'দিকে সরে গিয়ে পথ করে দিলো জিবরাইলের জন্যে ? ফাঁকে ফাঁকে আবার যাত্রা শুরু হলো—আবাব একটা আস্‌মান ফাঁক হয়ে গেলো। আবার আরেকটা ষষ্ঠ আস্‌মান খোলার সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে গেলো জিবরাইলের ডানায়,—জিবরাইল তবু এগুচ্ছে নবীর ঘুড়ি নিয়ে! তারপর এক সময় খু'লে গেলো সপ্তম আস্‌মানের দরজা আর তারি ফাঁক দিয়ে একটা তীব্র আলোকচ্ছটা এসে ঝলসে দিলো নবীব চোখ দু'টোকে। আর চাইতে পারলো না নবী—দু'চোখে হাত দিয়ে চীৎকাব ক'রে ওঠে ঘুমের ঘোরে—মাগো, আমার চোখ দুইটা পুইড়া গেলো।

চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসে নবী—গলে-যাওয়া দেওযালের উপর দিয়ে সূর্যের প্রখর আলো তাব নাকে মুখে এসে লাগছে।

অসমাপ্ত কাহিনী

মবিন উদ্-দীন আহমদ

হাসপাতালে একটি কেবিনে শুয়েছিলাম। নিজের অসুখ নয়, এক বড়-লোক সাহিত্যিক বন্ধুর অসুখ। সমস্ত দিন রাত বন্ধুর খবরদারি করি—হাসপাতালেই থাকি—হাসপাতালেই খাই—খাবারটা আসে বন্ধুর বাড়ি থেকে।

বাইরের কেউ হাসপাতালে চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে পারে না—হাসপাতাল আইনে বাঁধে কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাকে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন। বড় লোক বন্ধুর পক্ষে অনুমতি আদায় করতে বিশেষ কিছু বেগ পেতে হয়নি।

বন্ধুর খবরদারি করার লোকের অবশ্য অভাব নেই—দিনে-রাতে দু'জন ভারাটে নার্স থাকে—আমি থাকি ফাউ হিসেবে।

রাত প্রায় বারটা। সকালে বন্ধুর পেট অপারেশন হয়েছে—এখনও পর্যন্ত জ্ঞান ফেরেনি। তার মাথার কাছে চেয়ার পেতে বসে আছে একজন তরুণী নার্স। সেদিন বৈকালেই তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। আমি নীচে বিছানা পেতে ঘুমাবার চেষ্টার ফাঁকে ফাঁকে মেয়েটিকে দেখছিলাম—চওড়া কাল পাড় শাড়িতে ভারি সুন্দর মানিয়েছে তাকে। গৌর-বর্ণ নিটোল হাত-দুখানি নিরাভরণ—মুখে প্রচুর স্নো পাউডারের প্রলেপ। চোখ দুইটি আকারে একটু ছোট বটে কিন্তু ছেলে-মানুষের মত কচি মুখখানায় বেশ মানিয়েছে চোখ জোড়া। ভ্রূ-যুগল কামিয়ে ফেলে কাজল দিয়ে কৃত্রিম ভ্রূ টেনেছে সূক্ষ্ম করে। এটাই বোধ হয় আজকালকার ফ্যাশন—রাস্তা-ঘাটেও অনেক মেয়ের দেখেছি অমন ভ্রূ।

—কী দেখছেন?

—হঠাৎ প্রশ্ন করল মেয়েটি। রূপ-বিশ্লেষণ চিন্তায় বাধা পড়ল—অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। সত্য গোপন করে বললাম, দেখছি না কিছু, ভাবছি।

মেয়েটি একটু হাসলো—ভাবছেন! কাকে ভাবছেন এই রাত দুপুরে?

হেসে ফেললাম আমিও, বিশেষ কাউকে ভাবছি না। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মনে করছি, ভাবনা হচ্ছে, পাছে অফেন্স নিয়ে বসেন।

—অফেন্স নেওয়ার মত কথা হলে নেব বৈকি, কিন্তু সেটা ত কথা শুনবার পূর্বে বোঝা যাচ্ছে না!

মেয়েটি আবার একটু হাসলো। বেশ সপ্রতিভ মেয়েটি। বললুম, আচ্ছা আপনারা কি মানুষের সেবা করে সত্যি কিছু আনন্দ পান, না শুধু···।

বাকি কথাগুলি মুখে আটকে গেল। মেয়েটিই পূরণ করে দিল সেটুকু, বললে, সত্যি আনন্দ পাই, না, শুধু পেটের দায়ে করি—এইত?

—তাই বটে।

—অন্যের কথা জানি না, আমার নিজের কোন আনন্দ এতে নেই!

এরপর আর কথা চলে না—চুপ করে রইলাম। মেয়েটি প্রশ্ন করল, হয়ত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যেই বললে, রোগী আপনার কে হন?

—আত্মীয় নয়, বন্ধু।

—ও! কী করেন আপনার বন্ধু?

—প্রায় কিছুই নয়—প্রচুর টাকা আছে। আইন পাশ করেছে অনেক দিন—মক্কেলের ভয়ে কোর্টে যায় না—বাড়ীতে বসে সাহিত্য করে।

—বিয়ে করেছেন?

—না, তাও করেননি।

—আপনি?

বললুম, বহুদিন আগেই বিয়ে করেছি। বৌ এখানে নেই—ওর মায়ের কাছে দেশে আছে।

জানি না কেন, বেমালুম মিথ্যা বলে বসলুম হঠাৎ। বলেই কিন্তু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম—একটি মিথ্যা ঢাকতে কত মিথ্যা এখন বলতে হবে কে জানে!

মেয়েটি কিন্তু আর কোন প্রশ্নই করল না। চুপ করে রইল। এক সময় লক্ষ্য করলাম, মেয়েটি হাসছে—নিঃশব্দ বক্র হাসিতে মুখখানি তার কুটিল।

বললুম, হাসছেন কেন অমন করে?

—একটি পুরালো কাহিনী মনে পড়ে গেল হঠাৎ।

উঠে বসলুম। বললুম, রাত একটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ—আজ আর ঘুম হবে বলে মনে হয় না। বলুন না আপনার কাহিনীটি, শুনি।

"দুই বন্ধু। মাসুদ আব মাহমুদ। মাসুদ বড়লোক পিতার একমাত্র বংশধর—মাহমুদ শুধু গরীব পিতামাতার একপাল ছেলে-মেয়েরই একজন নয়—নিজেও গরীব—ষাট টাকা বেতনের কেরানী। মাসুদ উকিল।

বড়লোকের সঙ্গে গরীবেব বন্ধুত্ব বেশী দিন টিকে থাকে না কিন্তু এদের বন্ধুত্ব কেমন করে যেন অনেক দিনই টিকে ছিল।

চাকরি পেয়েই মাহমুদ বিয়ে কবে বসল। মাসুদ অবিবাহিতই রয়ে গেল।

মাসুদ একদিন বললে, মাহমুদ, তুই ভাই সত্যি ভাগ্যবান—তোর উপর হিংসে হচ্ছে আমার।

—হিংসার বেশ পাত্রটি ঠিক কবেছিস যা হোক। জীবনে কুড়িটি টাকা একত্রে কখনও চোখে দেখিনি, অবশ্য নিজেব বলে, এক বেলা আধপেটা খেয়ে কোনরকমে মানুষ হয়েছি। প্রথম মাসেব মাইনে পেয়ে মনটা খুশীও হয়েছিল সত্যি কিন্তু বড়বাবুর মুখ খিঁচুনি, সাহেবের চোখ রাঙানি, ঝড়ের মত সে খুশীকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে খবরও রাখিনি। ভাগ্যবান ত বটেই! কি বলিস!

—আরে, জীবনে টাকাটাই কী সব। তোর মত স্ত্রী ভাগ্য কটা লোকের আছে—তোর বউ একটি রত্ন।

বন্ধুর কথায় মাহমুদ হেসে ফেললে, বললে, যদি বলিস, তোর জন্যেও না হয় এমনি একটি রত্নের খোঁজ করি।

মাসুদও হাসলো। বললে, খুঁজলেই কী সকলের ভাগ্যে সব কিছু মিলেরে ভাই—অদৃষ্ট বলেও একটি কথা আছে। খোদাব উপর খোদকারি চলে না। বিশ্বাস কর—আমি একটুও ঠাট্টা করছি না, ফরিদা সত্যি একটি রত্ন। শহরের মেয়েরা স্বভাবতই একটু ফরওয়ার্ড—কিন্তু তোর বৌ সে রকম নয়—ওর যেন জন্মগত একটা কালচার আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—ফরিদা বুঝি শহুরে মেয়ে ছিল?

—ঠিক শহুরে নয়, তবে বহুদিন ওরা শহর-প্রবাসী—শহুরেই বলা যেতে পাবে ওদের।

—তারপর?

"মাসুদের মুখে স্ত্রীর প্রশংসা শুনে আনন্দে মাহমুদের মনটা নেচে উঠল।

বললে, আমার শ্বশুব ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া মানুষ—মেয়েদের ইস্কুলে দেওয়া তিনি একদম পছন্দ করতেন না। বাড়ীতে মৌলবী রেখে সব মেয়েকেই আরবী-উর্দু শিখিয়েছেন। ফরিদা কিন্তু নিজের চেষ্টায় বেশ বাঙলা-ইংরেজী লেখাপড়া শিখেছে। ওকে মনে হয় যেন ও বাড়ীর মেয়েই নয়—ওব প্রকৃতি অন্যান্য বোনদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

—আশ্চর্য ত!

উৎসাহের সঙ্গে বললে, সত্যি আশ্চর্য। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ওকে ইস্কুলে ভর্তি করে দি। ভিতরে প্রতিভা আছে, সুযোগ পেলে ।

মাসুদ বললে, বেশ ত। দে না ইস্কুলে ভর্তি কবে দি!

—সে পথও প্রায় বন্ধ। শ্বশুরবাড়ী থাকি বটে, তবুও মাসে ভাড়া গুণি কুড়ি টাকা। ঐ বাড়িটি ছাড়া শ্বশুব ত একটি কানাকড়িও রেখে জাননি। শাশুড়ীর সংসার চলে ঐ বাড়ী ভাড়ায়। দেখে শুনে যে ছোট আর একটা বাসায় উঠে যাব তারও উপায় নেই—ওদেব দেখবেই বা কে। ছোট এক শালা ইস্কুলে পড়ে—ফবিদাব ছোট বোনটিও বড় হয়ে উঠেছে, তার বিয়ের ব্যবস্থাও করতে হবে আমাকেই। নেহাৎ চক্ষু-লজ্জার খাতিরেও মাসে মাসে ছোটখাট অনেক খবচও হযে যায় ওদের পেছনে। ঝঞ্ঝাট কি আব কমরে ভাই। মাসের শেষে একটিও পয়সাও বাচে না।

মাসুদ বললে, তা এক কাজ করলেই ত পারিস—ঘবে ঘণ্টাখানেক, ঘণ্টা দুই করে নিজে রোজ পড়াবি।

মাসুদের কথায় মাহমুদ করুণ করে একটু হাসলো—বললে, চাকরি ত আব করতে হয না তোমার—কি যে খাটুনি কেমন করে বুঝবে। আফিস করে এসে আবার ছাত্র পড়ান শুধু কষ্টকর নয়, প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তোর ত আর চাকরি করতে হয় না—নূতন উকিল, মক্কেলের কথাটা আর তুলব না—কোর্ট ফেবৎ ঘণ্টা-খানেক করে ফরিদাকে রোজ পড়িয়ে যাবি? তোকে মাষ্টার পেলে ফরিদা সুখিই হবে।

ঠিক হ'ল, মাসুদ প্রত্যহ বৈকালের দিকে ফরিদাকে পড়িয়ে যাবে।

মাসুদ নিয়মিতভাবে পড়াতে আসে, কোন দিন মাহমুদের সঙ্গে দেখা হয়, কোন দিন হয়ও না।

একদিন মাসুদ ববলে, মাহমুদ, ছাত্রী আমার চমৎকার ইন্‌টেলিজেণ্ট—বৎসর চারেকের মধ্যেই ওকে আমি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়ে দেব।

ফরিদা স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললে, ম্যাট্রিক পাশ করে আমি কিন্তু কলেজে ভর্তি হব।

স্ত্রীর কথায় মাহমুদ হেসে ফেললে, ওরে সর্বনাশ! তুমি যে তাহলে আমার চেয়েও পণ্ডিত হয়ে যাবে—আমি একদিনও কলেজের গেটে পর্যন্ত পা দিতে পারিনি!

ফরিদা ঠোঁট ফুলিয়ে আব্দার-তবল কণ্ঠে বললে, বা রে বা! তুমি কলেজে পড়োনি বলে বুঝি আমিও পড়তে পারব না—তা হবে না, কলেজে আমি ভর্তি হবই।

মাসুদ বললে, চার বৎসর শেষ হতে এখনও অনেক দিন বাকি আছে—এখনই ঝগড়া কেন!

তিনজনেই হেসে উঠল

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা আপনি ওদের জীবনের এত খুঁটিনাটি কথাবার্তা জানলেন কি করে?

মেয়েটি বললে, যদি জেরা শুরু করেন তাহলে আর গল্প বলব না এবং গল্প শুনতে হলে জেরা করা চলবে না।

—আচ্ছা, কোন প্রশ্নই আর করবো না—বললুম, বলে যান আপনি।

হাসপাতালের ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। নার্স মেয়েটি পুনরায় গল্প আরম্ভ করল।

"একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ফরিদা বসে বসে অঙ্ক কষছিল, তার মা এসে বললে, ফরিদা, মাসুদ ত তোদের কথায় ওঠে-বসে—চেষ্টা করে দেখনা যদি মালেকার সঙ্গে ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে পারিস্।

মালেকা ফরিদার ছোট বোন।

ফরিদা বললে, তা কেমন করে হবে মা!

—কেন, হবে না কেন?

—মাসুদ সাহেব বড় লোকের ছেলে—আমাদের মত গরীব ঘরে তিনি বিয়ে করবেন কেন! রাজী ত হবেনই না—মাঝখান থেকে কত কি-ই ভেবে বসবেন।

—ভাববে আবার কি হাতী-ঘোড়া! তুই একবার বলেই দেখ না—হয় হবে, না হয়, না হবে—চেষ্টা করতে দোষ কী।

ফরিদার মার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকাশ পেল।

ফরিদা বললে, আমি ওসব কথা মাসুদ সাহেবকে বলতে পারবো না—তুমি বরং তোমাদের জামাইকে বলো।

—বেশ তাই বলব।

ফরিদার মা গম্ভীর মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রাত্রে ফরিদা কথাটা স্বামীকে বললে।

মাহমুদ বললে, তুমি ঠিকই বলেছ—এ হয় না। কত বড় বড় লোকের ঘর থেকে মাসুদের বিয়ের সম্বন্ধ আসছে। আমি আম্মাকে বুঝিয়ে বলব এখন।

পরদিন রবিবার। বৈকালে মাসুদ এসে বললে, ফরিদাকে নিয়ে চল মাহমুদ সিনেমা দেখে আসি—একটা ভাল ছবি এসেছে।

মাহমুদ বললে, আমার যাবার উপায় নেই ভাই আজ—বিশেষ জরুরী কাজে এখনই বেরুতে হবে।

মাসুদ বললে, তা হলে আজ থাক—আর একদিন গেলেই চলবে।

—আর একদিন না হয় সবাই মিলে আবার যাওয়া যাবে, আজ তুই আর ফরিদা দেখে আয় ছবিটা।

সেটা ভাল দেখাবে না বোধ হয়।

মাহমুদ সহাস্যমুখে বললে, খারাপই বা কী দেখাবে! তুই নিয়ে যা ফরিদাকে।

মাসুদ ফরিদাকে নিয়ে সিনেমায় চলে গেলে মাহমুদের ডাক পড়ল শাশুড়ীর ঘরে।

শাশুড়ী বললে, দেখ বাবা, তোমাকে একটা কথা বলব বলে ডাকলুম...।

মাহমুদ হাসিমুখে বললে, আমি ফরিদার কাছে শুনেছি—মাসুদের সঙ্গে মালেকার বিয়ের যেন চেষ্টা করি—এইত?

—তাই বটে। তুমি একটু চেষ্টা করে দেখ বাবা—এমন জামাই আর পাব না। আমার মনে হয় না, মাসুদ অমত করবে।

মাহমুদ বললে, তা কেমন করে হবে আম্মা! এ অসম্ভব।

—কেন অসম্ভব?

—অসম্ভব বৈকি—ওরা কত বড়লোক—আমরা গরীব।

—গরীব হয়েছি ত কী হয়েছে! মাসুদকে যদি তোমরা রাজি করাতে পার—বিয়ে আটকাবে না।

মাহমুদ বললে, তা হয়ত আটকাবে না, কিন্তু মাসুদও রাজি হবে না এ বিয়েতে।

শাশুড়ী মুখ কাল করে বললে, তার চেয়ে বল, তোমরা এ বিয়েতে রাজী নও।

মাহমুদ হেসে ফেললে শাশুড়ীর কথায়, বললে, সে কি কথা! আপনি ভুল বুঝেছেন। আমরা কি চাই না, মালেকার ভাল বিয়ে হয়—কিন্তু সম্ভব-অসম্ভব বলে একটা কথা আছে ত!

এ বিয়ে যদি অসম্ভবই হয়, তা হলে ত মাসুদকে এ-বাড়ীতে আর আসতে দেওয়া উচিত নয়, বাবা।

—কেন?

—এর মধ্যেই ত পাঁচজনে পাঁচকথা বলতে আরম্ভ করেছে। লোকেরই বা দোষ দেব কেমন করে—অবিবাহিত বেটাছেলে, সময় নেই অসময় নেই ফরিদার সঙ্গে এসে হাসি-ঠাট্টা করবে—লোকের মুখ কেমন করে চেপে রাখব বল? এই যে দুজন একা একা সিনেমায় চলে গেল—এটা কি ভাল হ'ল! লোকে ত বলবেই পাঁচ কথা।

মাহমুদ বললে, লোকের কথায় আমাদের কী যায় আসে। ভিত্তিহীন কুৎসায় কান দিলে দুনিয়ায় ত কোন কাজই করা চলে না।

শাশুড়ী বললে, লোকের কথায় তোমাদের না হয় কিছু যায় আসে না—একটি মেয়েও নেই যে বিয়ে দিতে হবে, আমার ত একটি মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে—আজ বাদে কাল তার বিয়ে না দিলেই হবে না—বাড়ীর যদি বদনাম রটে—মেয়ের বিয়ে দেয়াই যে দায় হয়ে উঠবে।

মাহমুদ বললে, মালেকার জন্য আপনার ভাবতে হবে না। আমি যখন আছি—দেখে শুনে একটা ভাল বিয়ে দিয়েই দেব। আপনি লোকের কথায় মিথ্যা মন খারাপ করবেন না—মানুষের স্বভাব কারো ভালই দেখতে পারে না।

মাস খানেক পরে।

সন্ধ্যার পর একদিন ফরিদা বসে বসে পড়া মুখস্থ করছিল। মাসুদ সেদিন কেন যেন পড়াতে আসে নাই। ফরিদার মা এসে বললে, দেখ ফরি, তুইকি শেষকালে আমাদের মুখে চুন কালি পরাবি?

ফরিদা মায়ের কথায় আশ্চর্য হয়ে গেল, বললে, কেন মা—কী হয়েছে?

মা বললে, হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু—পাড়ায় যে ছি ছি পড়ে গেছে।

ফরিদা অসহিষ্ণুকণ্ঠে বললে, কী হয়েছে ছাই খুলেই বল না—ঢি ঢি পড়ে গেছে, মুখে চুন-কালি মাখাবি, এসব আবার কী কথা।

মা গলার স্বর আর এক পর্দা খাদে নামিয়ে রুক্ষকণ্ঠে বললে, তুমি কি কচি খুকি যে বোঝ না কিছু! মাসুদের সঙ্গে তুই অত হাসা-হাসি, ঠাট্টা-তামাশা করিস্ কোন্ লজ্জায় ?

মায়ের এই অপ্রত্যাশিত অভিযোগে ফরিদা শুধু তার চোখ দুটি তুলে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল—কোন উত্তরই তার মুখ দিয়ে এলো না।

ফরিদা এবার কঠিন সুরে বললে, লোকে কি বলে না বলে জানি না—কিন্তু এই মিথ্যা কথাগুলি বলতে তোমার মুখে একটুও বাধল না, মা! মাসুদ-সাহেব আমার ভাইয়ের মতন, তার সামনে যদি কোনদিন একটু হেসেই থাকি– তাতে কি এমন রাজ্যপতন হয়ে গেছে শুনি ?

মা একটা কিছু বলতে যেয়ে থেমে গেল—মাহমুদ এসে ঘরে ঢুকল।

মাহমুদ বললে, কী ব্যাপার ?

ফরিদার মা বললে, না তেমন কিছু নয়—বলছিলাম যে, লোকে ত অনেক কিছুই রটাতে লেগেছে......।

আবার শাশুড়ীর মুখে সেই পুরানো অভিযোগ শুনে মাহমুদ মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে কিছুই বললে না।

ফরিদাও চুপ করে বসে রইল।

ঘুমানর পূর্বে, সমস্ত কথা স্বামীকে বলে ফরিদা বললে, চল এ-বাড়ী ছেড়ে আমরা অন্য কোথাও উঠে যাই—সম্মান থাকতে চলে যাওয়াই ভাল।

মাহমুদ বললে, কিন্তু খরচ যে অনেক বেড়ে যাবে—দু'বাড়ির খরচ চালান কি সম্ভব হবে ?

ফরিদা বললে, খরচের জন্য তুমি ভেবো না—সে আমি গুছিয়ে নেবো।

নার্স মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আমাকে বললে, আচ্ছা নিজের নাক কেটে যারা পরের যাত্রা ভঙ্গ করে, তাদের সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ?

বললুম, তাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব উচ্চ, ভয়ানক সাহসী তারা—আমার অমন সাহস নেই।

—মানে ?

—নাক কাটা বিকৃত চেহারা দেখে মানুষ হাসা-হাসি করবে, নিজের চেহারা আয়নায় দেখে নিজেরই আঁৎকে উঠার সম্ভাবনা আছে জেনেও যিনি স্বহস্তে স্বীয় নাসিকা ছেদন করতে পারেন তিনি যে নিদারুণ সাহসী সে বিষয়ে আমার ত কোন সন্দেহ নাই।

নার্স মেয়েটি বললে, সাহসী, না মূর্খ ?

বললুম তর্ক করে লাভ নেই—রাত প্রায় শেষ হয়ে এল—ভোর হলেই ত আবার চলে যাবেন, তারপর কি হ'ল বলুন।

"মেয়ে-জামাই এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে শুনে শাশুড়ীর চক্ষু ত চড়কগাছ, মেয়ে-জামাই বাড়ি ছেড়ে দিলে সব দিকেই তার ক্ষতি। কিন্তু বাইরে তিনি সে ভাবটা প্রকাশ করতে দিলেন না। শান্তভাবে বললেন, কেন বাপ, হঠাৎ তোমাদের এমন কি অসুবিধা হ'ল এখানে ?

মাহমুদ বলল, অসুবিধা নয়—তবে আমাদের জন্য আপনি কেন মিছেমিছি লোকের কটু কথা শুনে বেড়াবেন—তার চেয়ে আমাদের দুরে যাওয়াই ভাল।

শাশুড়ী মনে মনে এবার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি অনেক ভেবে-চিন্তে, ছোট মেয়ের বিয়েব জন্য যে চালটা চেলেছিলেন সেটা শুধু ব্যর্থ হয়েই গেল না, চালের দোষে তার নিজের কিস্তিই মাৎ হয়ে যাচ্ছে দেখে আর হিতাহিত জ্ঞান রইল না—নিজের নাকে সজোরে ছুরি দিয়ে এক পোঁচ বসিয়ে দিলেন। বললেন, আমার কাছ থেকে তোমরা দুরে সরে যেতে চাচ্ছ, যাও; কিন্তু শেষকালে যেন দুঃখ কবো না।

মাহমুদ বললে, দুঃখ করার কি আছে !

—তা আছে বইকি, বাবা। এ বাড়ীতে তবু আমরা আছি, কিন্তু অন্য বাড়ীতে· · ...মানে, মাসুদ তোমার বন্ধু হতে পারে কিন্তু মনে রেখো, কাকেও একান্ত করে বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমার পরামর্শ যদি শোন, এবাড়ি ছেড়ো না।

মাহমুদ অফিসে চলে গেল কিন্তু কাজে কিছুতেই সে মন বসাতে পারল না। শাশুড়ী যে ইঙ্গিত করেছেন, তাতে মাহমুদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, তার রঙ-চঙে পৃথিবীর চেহারা এক মুহূর্তে বদলে গেল। বুকের ভিতর অসহ্য একটা জ্বালা থেকে থেকে গুমরিয়ে গুমরিয়ে উঠতে লাগল। মনে মনে বললে, যাকে এত ভালবাসি সেই কি না শেষকালে এমন বিশ্বাসঘাতিনী হ'ল ! আর আমার আবাল্য সুহৃদ মাসুদ কী করে এমন সর্বনাশ আমার করতে পারলে ! এ অসম্ভব —নিশ্চয় অসম্ভব !

পরক্ষণেই আবার ভাবল, অসম্ভবই বা কেমন করে হবে—মা হয়ে মেয়ের নামে এমন কথা বলা যে আরো অসম্ভব। এ সবই সত্যি—নিশ্চয় সত্যি। তাই আজকাল ফরিদা কথায়-বার্তায়-হাসিতে এমন উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

মাহমুদ ভুলেও একবার কল্পনা করতে পারল না যে, ফরিদার মূর্খ মা নিজের স্বার্থসিদ্ধির লোভে এমন পন্থা অবলম্বন করেছে, যার ফলাফল তার নিজের কাছেও সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাতা।

মাহমুদ সেদিন ঘণ্টা খানেক পূর্বেই ছুটি নিয়ে সোজা বাসায় এসে দেখে, ফরিদা সযত্নে প্রসাধন করছে। প্রসাধন রোজই সে করে কিন্তু ফরিদাকে প্রসাধনরত দেখে মাহমুদের সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল।

ফরিদা বললে, আজ তাড়াতাড়ি যে ?

—তোমার কি কোন অসুবিধা হয়েছে তাতে ? বল ত না হয় খানিকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে আসি।

স্বামীর এমন অদ্ভুত মেজাজ ফরিদা কোন দিন দেখে নাই। সে আর কোন কথা বলল না, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সন্ধ্যার সময় মাসুদ এসে দেখে মাহমুদ চুপ করে শুয়ে আছে বললে, কিরে এত তাড়াতাড়ি যে আজ ? মাহমুদ মনে মনে বললে, এর কাছেও তাড়াতাড়ি ! মুখে বললে, শরীরটা ভাল নেই।

—তা হলে থাক—আজ আর পড়াব না—তুই আরাম কর।

মাসুদ চলে গেল। মাহমুদ বললে, বৃথাই গেল তোমার আজকের প্রসাধন।

ফরিদা বললে, তার মানে ?

—বন্ধু যে চলে গেল—দেখবে কে ?

মাহমুদ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল—কথাগুলি শোনার পর চেহারাটা তার কেমন হয় দেখার জন্য।

ফরিদা স্বামীর এই হঠাৎ নিষ্ঠুর আচরণের কোন কারণই খুঁজে পেল না। নিদারুণ অভিমানে চুপ করে রইল।

ফরিদা চুপ করে দেখে মাহমুদ বলল, কী, কথা বলছ না যে ?

—কী বলব বল ? কী শুনতে চাও তুমি ? কী করেছি আমি তোমার যে এই অপমান আমাকে করছ !

কান্নায় তার কণ্ঠ রোধ করে দিল।

তিক্তকণ্ঠে মাহমুদ বললে, কী করেছ তুমি জান না ? না জান ত তোমার মাকে জিজ্ঞেস করে এস। লজ্জা করে না, লম্বা লম্বা কথা বলতে ! এ বাড়ি ছাড়তে চাও তুমি কেন—এখানে তেমন সুবিধা হচ্ছে না—না ?

সে রাত্রে স্বামী-স্ত্রী কারো খাওয়াও হ'ল না, ঘুমও হ'ল না। ফরিদা তার

মা ও স্বামীর উপর দুরন্ত অভিমানে বারান্দায় বসে কেঁদে কেঁদে রাত কাটিয়ে দিল আর মাহমুদ অসহ্য ক্রোধে এক বিন্দুও ঘুমাতে পারল না।

পরদিন সন্ধ্যার পর মাসুদ এসে দেখে, ফরিদা ঘরে নেই—মাহমুদ চুপ করে বিছানায় পড়ে আছে। চেহারা অত্যন্ত শুকনো।

মাসুদ বললে, কেমন আছিস আজ ?

—ভাল।

—চেহারা দেখে ত খুব ভাল মনে হচ্ছে না তোকে। ফরিদা কোথায় —আজ পড়বে, না পড়বে না ?

—কে জানে, কি করবে না-করবে !

মাসুদ বন্ধুর ব্যবহারে প্রথমটা আশ্চর্য হয়ে গেল ; তারপর সামান্য একটু হেসে বললে, তোর কথা শুনে এবং চেহারা দেখে মনে হচ্ছে—একজন গোসা ঘরে খিল্ এঁটে বসে আছে এবং আর একজন তারই বিরহে শুকিয়ে যাচ্ছে মিনিটে মিনিটে। তা রাগ করে না থেকে, গোসাঘরের সামনে যেয়ে ধন্না দে পড়—একটা সুরাহা হলে হতেও পারে।

মাসুদ মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। মাহমুদ কোন উত্তরই দিল না—তেমন করে পড়েই রইল।

মাসুদ অনুযোগের কণ্ঠে বললে, কিন্তু আমার অপরাধটা তুই পেলি কোথা ! অভিমান করছিস বৌ এর উপর—কথা বন্ধ বুঝি আমার সাথে !

মাহমুদ ধীরে ধীরে বিছানার উপর উঠে বসল। বলল, অতি বড় পাষণ্ড না হলে, মানুষ অমন সহজভাবে কথা বলতে পারে না।

তার গলার রুক্ষ স্বর এবং কথা বলার ধরণ দেখে মাসুদ আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে, তার মানে ?

—মানে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করে না ! বেশ, মানে খুলেই বলছি—ফরিদার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধটা আজকাল কোথায় গিয়ে পৌঁচেছে শুনতে পারি কি ?

অশ্লীল এই কথাতে লজ্জায়-ঘৃণায় মাসুদের মুখ লাল হয়ে উঠল, বললে, অত ছোট যার মন, তার উচিত ছিল না বৌকে আমার সামনে বার করা। তুই যে এত বড় ইতর হতে পারিস মাহমুদ, আমার ধারণা ছিল না।

মাহমুদ একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল—কী, আমি ইতর ! তবে রে বদমাস……।

রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য মাহমুদ ধাঁ করে মাসুদের নাকের উপর একটা ঘুষি মেরে বসল।

গোলমাল শুনে অন্য ঘর থেকে মাহমুদের শাশুড়ী দৌড়ে এসে মাহমুদকে ধরে ফেললে। নাকের রক্তে মাসুদের জামা-কাপড় ততক্ষণে ভেসে গেছে।

মাহমুদের শাশুড়ী বললে, ছি ছি ছি! মাহমুদ যেন কেমন! রাগলে আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কী যে অনাসৃষ্টি কাণ্ড! ওরে ঐ ছোক্‌রা… কোথায় গেলরে বাবা আমার চাকরটা! বরফ—বরফ নিয়ে আয় শিগ্‌গির।

বরফ এলো। কিছুক্ষণের মধ্যে রক্তও বন্ধ হয়ে গেল। মাসুদ বললে, আচ্ছা, তা হলে চললুম এবং যাবার সময় এইটুকু শুধু বলে যাচ্ছি মাহমুদ, তোমার ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন।

মাহমুদ পাথরের মূর্তির মত বিছানায় বসে রইল, একটি কথাও বলল না।

মাসুদের হাত দুখানি ধরে মাহমুদের শাশুড়ী বললে, যা হবার তা-ত হয়েই গেছে বাবা, তুমি দয়া করে আর থানায়-টানায় যেয়ো না—আমার এই অনুরোধটুকু রেখো।

রাগে মাসুদের সর্ব অঙ্গ জ্বলে উঠল। একবার সে মনে করল, আচ্ছা করে দু'কথা এদের শুনিয়ে দেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বললে না—সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

নীচে সদর দরজার কাছে ফরিদা অপেক্ষা করছিল। মাসুদ নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে এগিয়ে গেল মাসুদের সামনে। বললে, আমি আমার মা আর স্বামীর হয়ে আপনার কাছে মাফ চাইছি। ওরা নিরর্থক আপনাকে অপমান করলেন।

মাসুদ দেখলে ফরিদার সমস্ত মুখ পাংশু—এক বিন্দু রক্তও যেন সেখানে নেই। ফরিদার মুখের দিকে চেয়ে মাসুদের সমস্ত ক্ষোভ মুহূর্ত-মধ্যে নিবে গেল। মনে হ'ল, এই হতভাগিনীর অপমান, দুঃখ আর লজ্জা তার চেয়েও হাজার গুণ বেশী।

মাসুদ বললে, আমার অপমানটাই আপনি দেখছেন, আপনার নিজের অপমানের কথা একবার ভেবেও দেখলেন না। আমার কথা কেউ জানবে না, জানলেও ক্ষতি নেই—পুরুষের পক্ষে এ অপমান কতটুকু! কিন্তু আপনাকে এর জের টেনে বেড়াতে হবে কতকাল কে জানে—হয়ত চিরকাল। মুখ তুলে কথা বলার পথ আজ থেকে আপনার বন্ধ হয়ে গেল!

ফরিদা বললে, প্রতিকারের উপায় যখন আমাদের হাতে নেই, সহ্য তখন করতেই হবে। আমরা নিরুপায়।

মাসুদ বললে, নিরুপায় আপনারা নন। প্রতিবাদে চিরকাল আপনারা সহ্য করেন বলেই আপনাদের আজ এই দুরবস্থা। আপনাদের উচিত এর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ান।

ফরিদা একটি কথাও বলতে পারলে না আর—তার ঠোঁট দুটি শুধু বারকয়েক কেঁপে কেঁপে থেমে গেল।

পরদিন সকালে উঠে ফরিদাকে আর বাসায় খুঁজে পাওয়া গেল না। মাহমুদ নূতন করে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—ঐ শালা মাসুদের কারসাজি—শালাকে আমি জেলে পাঠাব। ফরিদার মা বললেন, পোড়ারমুখী হারামজাদী জাহান্নামে যাক। কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে লোকের কাছে মুখ দেখানর পথটা আর বন্ধ করো না। মনে করব ফরিদা মরে গেছে। ফরিদার মা ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ঠিক সেই সময়, মাসুদের বাড়ীতে ফরিদা যেয়ে বললে, নিরর্থক অপমানের প্রতিশোধ নিতেই আমি আপনার কাছে চলে এলুম। আমাকে আপনার আজ থেকে আশ্রয় দিতে হবে—আমি আর ও বাড়ি ফিরে যাব না।

এমন কোন পরিস্থিতির জন্য মাসুদ আদৌ প্রস্তুত ছিল না। নূতন কেলেঙ্কারীর ভয়ে সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। নীরস কঠিন কণ্ঠে মাসুদ বললে, খুব ভুল করেছেন এখানে চলে এসে। এতে সম্মান আমাদের বাড়বে না—প্রতিশোধ হয়ত একটা নেওয়া হবে—কিন্তু আজকের রাগ দুদিন পরে আপনার থাকবে না, তখন না পারবেন নিজেকে ক্ষমা করতে, না পারবেন আমাকে। আপনি বাড়ি চলে যান। জঞ্জাল বাড়াবার আমার ইচ্ছা নেই। মাসুদের কথা বলার ধরনে ফরিদা দমে গেল। বললে, কাল যে উপদেশগুলি আমাকে দিয়ে এলেন, সেগুলি কি সবই মৌখিক—শুধু কথার কথা?

—কথার কথা কেন হবে! কিন্তু তাই বলে বাড়ী ছেড়ে চলে আসতেও আমি বলিনি—বলেছিলাম, নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে।

অসহায় কণ্ঠে ফরিদা বললে, কিন্তু আপনিই বলুন—এখন আমি বাড়ী ফিরে যাব কোন মুখে! মাসুদ বললে, তার উত্তর আমার কাছ থেকে আপনার আশা করা উচিত নয়—আমাকে জিজ্ঞেস করেও আপনি বাড়ি ছাড়েন নি।"

নার্স মেয়েটি চুপ করল। আমি বললুম, তারপর?

ঘড়িতে ঢন্‌ঢন্‌ করে পাঁচটা বাজল।

আমার রোগী বন্ধু এমন সময় কী যেন বিড়বিড় করে বলে উঠল। হয়ত ওর জ্ঞান ফিরে আসার উপক্রম হচ্ছে ধীরে ধীরে। নার্স মেয়েটি নীরবে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

আমি পুনরায় বললুম, তারপর—তারপর কী হ'ল? কী করলে ফরিদা—মাহমুদই বা করল কি?

মেয়েটি তার বাঁ হাতের তর্জনী ঠোঁটের কাছে তুলে ইশারা করল—চুপ।

ভোরের সময় নার্স বদল হ'ল—গল্পের শেষটা আর শোনা হ'ল না সেদিন। ভাবলুম রাত্রে শোনা যাবে'খন বাকিটা; কিন্তু পরের রাত্রেও পুরাতন নার্স আর এলো না—তার পরিবর্তে এলো নূতন আর একজন। তার কাছে শুনলুম, পুরাতন নার্স-ই একে বদলি দিতে পাঠিয়েছেন—তিনি আর নাকি আসবেন না—কারণটা সে বলতে পারল না!

জ্ঞান ও মান

আসহাব-উদ্দীন আহ্‌মদ

ফেনী থাকতে সিলেটি এক ভদ্রলোকের সাথে আমার পরিচয় হয়। তিনি কাষ্টমসের পিয়ন।

[পিয়নকে ভদ্রলোক বলাতে যেন ভদ্রমহোদয়রা সংজ্ঞা না হারান। আমার ভদ্রলোকের সংজ্ঞা অতি সহজ। কিন্তু এমন সহজ জিনিসটি যাঁদের কাছে কঠিন মালুম হয়, তাঁদের সাথে আমি তর্ক করতে চাইনে। তর্ক শুরু হলে আপনি যা বলবেন (তা আমার জানা আছে) আর আমি যা বলবো (তা আপনার জান আছে কিনা জানিনা) দু'ই লিপিবদ্ধ করতে হবে। অন্য যুদ্ধের মত তর্কযুদ্ধেও খরচ কম হবে না। সম্প্রতি কাগজের বাজারে আগুন লেগেছে। আর সে আগুনে কাগজ বা কাগজ বিক্রেতা পোড়া না গেলেও কাগজ ক্রেতা পুড়ে মরছে। অবশ্যি এক টাকার ফুল্‌স-ক্যাপ যারা 'বিষ' টাকায় বেচতে চায়, তাদের ফুল্‌সক্যাপ (গাধার টুপি) পরিয়ে রাস্তায় ঘুরানোর কোন বন্দোবস্ত এ দেশে নেই। কলা বিদ্যার চর্চা করছে ছাত্ররা কলা পাতায় লিখে। ছয়চল্লিশে কলাগাছকে ভোট দেবার মজাটা খুব দেখা গেল।* যারা আমাদের জন্য 'জান মাল কোরবান করবে' ওয়াদা করেছিল তারা আমাদেরই জান 'কোরবান' করছে। এ দেশকে গরু কোরবানী ও গুরু কোরবানীর দেশ বললে অত্যুক্তি হয় না। তাই লিখতে বসে ভাবছি কত কম কথায় আমার কথাটা শেষ করা যায়। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এ প্রসঙ্গে সবাইকে অনুরোধ করি কাগজ দুর্মূল্য হয়েছে বলে অফিস থেকে কাগজ নিয়ে যেন ছেলে-পিলেদের কাগজ সমস্যার সমাধান না করেন। আমার সোজা কথা, যার ধন আছে সে ধনী, যার মান

---

* ১৯৫৩ ইংরেজীর অক্টোবরের দিকে পূর্ব পাকিস্তানে কাগজের দিস্তা দু'টাকায় বিক্রি হচ্ছিল।

সে মানী। (মানিনা এমন কথা বলবেন না) যার দারিদ্র্য আছে সে দরিদ্র। যার ভদ্রতা আছে সে ভদ্র। সে পিয়ন হউক, লাঠিয়াল হউক বা মাটিয়াল হউক। অনেক দপ্তরী অনেক অধ্যাপক থেকে বেশী ভদ্র। অনেক পিয়ন পিয়নের বড় সাহেব থেকে বেশী ভদ্র। অবশ্যি, বাইরের শান শওকত ধুম-ধামের একটা নাম এমন কি দাম আছে বই কি। তা থাক]

যে ভদ্রলোক এখন পিয়ন, তিনি আগে প্রাইমারী শিক্ষকের কাজ করতেন। শিক্ষক থাকাকালীন তিনি পঞ্চায়েতের সভ্যও ছিলেন। সবল চরিত্রবান পরোপকারী লোক হিসেবে এলাকার উপর তাঁর বেশ প্রভাব ছিল এবং সবার সম্মান ও সমাদর তিনি পেতেন। দিন তাঁর বেশ ভালই চলছিল। অন্ততঃ মন্দ চলছিল না।

এলো পঞ্চাশের মন্বন্তর। দুর্ভিক্ষের পদধ্বনিতে তাঁর ভিৎ কেঁপে উঠল। মাইনে বারো টাকা ঠিকই আছে কিন্তু চাল ও অন্যান্য জিনিসের দাম পাঁচ সাত গুণ বেড়ে গেছে। তাঁর চিন্তা ভাবনার শেষ নেই।

শেষটায় তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে, এ কাহাতের সময় জান ও মান দু'বেটাকে এক সাথে বাঁচান সম্ভব নয়। মান রক্ষা করতে গেলে কখনও জান রক্ষা হবে না। জান বাঁচান ফরজ। তাঁর তুলনায় মান বাঁচান নফলও নয়। তা ছাড়া যদি জানই গেল, তবে মান আর কোথায় রইল।

তিনি ঠিক করলেন জান ও মানের সম্পর্ক সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ভুলে তিনি এবার শিক্ষকতা ছাড়বেন এবং যে পিয়নের চাকুরী তিনি হাত বাড়ালেই পান, তাই তিনি গ্রহণ করবেন। এমন কি বরণ করবেন। কারণ মরণের থেকে রেহাই পাবার জন্য যা কিছু বরণ করুন না, কেউ আপনাকে বারণ করবেন না। করা উচিৎও নয়।

[যারা সুদ খেয়ে, ঘুষ খেয়ে, চোরাবাজারী ও কালোবাজারী করে দেদার ধন দৌলত করেছে, উপবাসের ভয়ে জান নিকলে যাবার ভয় যাদের নেই, তারা লাল নীল ও জাফরানী রঙের নানা চব্য, চুষ্য লেহ্য পেয় অনেক কিছু দিয়ে ফুর্তিতে উদর পূর্তি করে, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে, তারার পানে চেয়ে চেয়ে চিৎ হয়ে এ সম্পর্কে উচিৎ অনুচিৎ এর সূক্ষ্ম পার্থক্য বিশ্লেষণ করুক। গরীবেরা যেন এ সব চিন্তা বিলাস-বটিকা সেবন না করে। জান নিয়ে যার টানাটানি তার আবার মান নিয়ে হানাহানি! পাঁচতলা ও গাছতলার বাসিন্দার চিন্তা ধারা এক হতে নেই। উচ্চরা যা ভাবে তুচ্ছরা যেন তা স্বপ্নেও না দেখে।

মান আবার কি? থাকলেও রসাতলে গেছে। যাদের জীবন যাত্রার মান স্বাধীন সরকার স্বীকার করেন নি, তাদের আবার মান কি ছাতার অভাবে মান কচুর পাতা মাথায় দিয়ে যে শিক্ষক স্কুলে গেল তাঁর মানের প্রশ্নই উঠতে পারে না। এসব বললে বিপ্লব-বিলাসী বন্ধুরা খুব গরম সুরে বলেন—

আসিতেছে শুভ দিন
দিনে দিনে বাড়িয়াছে দেনা
শুধিতে হইবে ঋণ।

ভাব-বিলাসী বন্ধুরাও চুপ থাকা মান হানিকর মনে করেন। তাঁরাও খুব নরম সুরে বলেন:—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ,
যাদের করেছ অপমান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের
সবার সমান।

ওসব পরের কথা। এসব কথার গ্যারান্টি—ঘড়ির দোকানের গ্যারান্টির চেয়েও খারাপ। কবে ঋণ শোধ হবে, স্ব স্ব মান ভুলে সবাই সমান হবে, পেটের খিদে নিয়ে সে অপেক্ষায় বসে থাকা চলে না। বিশ্বেস না হয় একবেলা না খেয়ে থাকুন; কিংবা সকালের বাজারটা একটু দেরিতে করান দেখবেন ছেলে পিলে হৃদয় বিদীর্ণ করে গগণভেদী না হউক কর্ণ-ভেদী চিৎকার শুরু করেছে।]

তাই দু'চার দিন 'এদোর ওদোর' করার পর প্রাইমারী শিক্ষক মশায় ঝিম খেয়ে পিয়নের চাকুরী নিলেন। এ তেমন কিছু নয়। চোখ বুঝে কুইনাইন খাবার মত। কোন রকমে গিলে ফেল্লেই হল। এখন তিনি পিয়ন। কিন্তু মাইনে শিক্ষক হিসেবে যা পেতেন তার পাঁচ গুণ বেশী পাচ্ছেন। তদুপরি উপরি কিছু আছে কিনা ভদ্রতার খাতিরে তা জিজ্ঞেস করিনি। দু-মুঠো খেয়ে ছেলে পিলে সবার চোখে মুখে কি তৃপ্তি! ছেলেপিলেতে বেহেস্তের পারিজাত। কিন্তু ঠিকমত খাওয়াতে না পারলে পারিজাতরা শুকিয়ে অমনি মন্দার কাঠ হয়ে যায়। 'হাসি' 'খুশী' নাম রাখলেই তারা হাসি খুশীতে থাকে না। কতক্ষণ পর পর কিছু খাওয়াতে হয়। সবাই খেতে পাচ্ছে। বাস! নোবেল প্রফে-শানের কপালে তিন শ' ঝাঁটা।

কিন্তু জনাব অত সহজে দুর্গতির শেষ হয় না। সেক্সপীয়রের কথা অমৃত

সমান। শুনুন যত পণ্যবান। (পুণ্যবানরা বহু শুনেছেন এবং শুনিয়েছেন। এখন পণ্যবানদের পালা।) তিনি বলেছেন, দুঃখ কখনও একা আসে না। হয়ত এই ভেবে যে একা আসলে দুঃখকেই না আবার কোন দুঃখে পড়তে হয়! তাই দুঃখ তার দল বল নিয়ে জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মেদিনী কম্পিত করে জোর কদমে অগ্রসর হয় আপনার উদ্দেশে উদ্দেশ্য। আপনি চারদিক থেকে যেদিন সর্বশান্ত হবেন, দুঃখও সেইদিন হবে শান্ত।

মাষ্টার সাহেবের নিয়োগ পত্রে নির্দ্দেশ ছিল যে, এক নির্দিষ্ট দিনে তাঁকে এক ইনস্‌পেক্টার সাহেবের কাছে গিয়ে কাজে যোগ দিতে হবে। তিনি ঠিক সময় গিয়ে হাজির। ইনস্‌পেক্টার তো তাকে দেখে অবাক, একেবারে হতবাক। এযে তাঁর ভক্তিভাজন ওস্তাদ সাহেব। দু'হাতে তিনি তাঁকে কদমবুচি করলেন। তাঁর কাছেই তিনি শিখেছেন—'গুরুজনকে ভক্তি করিবে।' পিয়নের বেশে এসেছেন বলে তিনি কি তার হুজুরকে অবহেলা করতে পারেন?

তবে তাঁকে তিনি পিয়ন হিসাবে রাখতে পারেন না। অসম্ভব কথা, তার হুজুরের কি করে তিনি হুজুর হবেন? তাঁর শ্রদ্ধার পাত্রকে দিয়ে তিনি কি ভাবে কাগজপত্র গোছাবেন বা বাসনপত্র মাজাবেন? তিনি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ালেন তাঁরও বড় হুজুর অর্থাৎ সুপারের কাছে। সুপার বললেন, ঠিক আছে। আপনার মাষ্টার আমার পিয়ন হিসাবেই কাজ করবে।' ইনসপেক্টার আল্লার দরবারে শোকরিয়া জানালেন। আল্লাহ কত গোনাহ থেকে তাঁকে বাঁচালেন।

যৌবনে যিনি ছিলেন শিক্ষক, প্রৌঢ় বয়সে তিনি হলেন পিয়ন। একে আবর্তন, বিবর্তন, প্রবর্তন, যা খুশি বলুন!

শিক্ষকের পেশাকে ইংরেজীতে 'নোবেল প্রফেশান' বলা হয়। এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ইংরেজীতে অতি গম্ভীরভাবে ঘোড়াকেও 'নোবল এনিমল বলা হয়। এসব কথা অতি পুরাতন, জরাজীর্ণ হয়েছে এমন কথা এখন বলবেন না! কাগজ সস্তা হলে বিস্তৃতভাবে বলা যাবে।

নানা দেশের নানা কথা পড়েছি। কথা শুনেছিও। আজকাল শুনতে বড্ড সুবিধে! পাকিস্তানের উন্নতিকল্পে বিদেশ যাবার হিড়িক পড়ে গেছে। শুধু প্রাইমারী শিক্ষক সম্পর্কে যে যে দশসালা পরিকল্পনা (কল্পনাপ্রসূত মনে করবেন না।) তার বাস্তব রূপায়ন এর উদ্দেশ্যেও কত জনকে বিদেশ পাঠান হল। স্বদেশের উন্নতির জন্যে বিদেশে গিয়ে এলেম হাছেল করা কতবড়

হুওয়াবের কাজ। তবে থিওরীতে বহুত আরাম। প্রাকটিসেই যত ব্যারাম। বিদেশ যাবার সময় তাঁদের ব্যস্ত সমস্ত ভাব দেখলে ছোটবেলার "মৌমাছি, মৌমাছি কোথা যাও নাচি নাচি"—কবিতাব কথা মনে পড়ে যায়।

নানা দেশের কথা শুনলে কি হবে? এখনও কোন দেশে এমন কি আফ্রিকার বনজঙ্গলেও প্রাইমাবী শিক্ষক নিছক অর্থনৈতিক কারণে পিয়ন হয়েছেন একথা শুনিনি। আমাদের দেশ (অবশ্যি, পৃথিবী পঞ্চম বৃহৎ রাষ্ট্র একথা সপ্তম সুরে তাবে বেতারে যথেষ্ঠ বলা হচ্ছে) এক আজব দেশ। ভাবলে তাজ্জব হতে হয়। এদেশ সে দেশ, যে দেশে প্রাইমারী স্কুল বোর্ডেব ঝাড়ুদাব পায় মাসে চল্লিশ টাকা আর সে বোর্ডের অধীনে প্রাইমাবী শিক্ষক পায় নিম্নতম মাসিক সতের টাকা। এদেশ সে দেশ, যে দেশে যারা ক্ষেতে কাজ করে তারাই খেতে পায়না। এদেশ সে দেশ, যে দেশেই ফ্লাসম্যান হোটেলে দৈনিক খাই খরচ ১৮৲ আঠার টাকা, আব প্রাইমারী শিক্ষকের নিম্নতর মাসিক মাহিনা ১৭৲ সতের টাকা। এদেশ সে দেশ, যে দেশে সব জিনিসের দাম চড়া কিন্তু একটি জিনিসের দাম অতি সস্তা। সে হল মানুষের জীব।

কয়েকটি কমলালেবু

আলাউদ্দিন আল আজাদ

খান সাহেবের গলি থেকে বেরিয়ে সেণ্ট্রাল জেলের প্রাচীর ঘেঁষে রমনার দিকে চলে যাওয়া রাস্তাটায় এসে পড়লো মুর্তাজা। হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসরির দেওয়াল ঘড়িটায় দেখে, প্রায় চারটে বাজে। সে জোরে পা চালিয়ে দেয়। সাড়ে চারটেয় হাসপাতালের দরজা খুলে দেয়া হয় রোগী দর্শনার্থীদের জন্যে। একটু আগে গেলে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলার সুযোগ পাওয়া যায়। ডান পায়ের স্যাণ্ডেলে বুড়ো আঙুলের ফিতেটা ছিঁড়ে, হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে, কিন্তু তবু পথচলার গতি এতটুকু কমে না ওর। গত রাত্রে তিনটে পর্যন্ত জেগে থাকায় চোখদুটো লাল হয়ে আছে চশমার কাচের ভেতরে, চুলগুলো উড়ু উড়ু, গতকাল থেকে গোসল করার সুযোগ হয়নি। কাপড়চোপড় ও সারা চেহারাটা মলিন। কিন্তু ঘামে ভেজা মুখে একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তি। কেননা সে তার কথা রাখতে পেরেছে। এখন তার ডান হাতে রুমালে বাঁধা কয়েকটি কমলালেবু।

এই কমলা কয়টি যোগাড় করতে যথেষ্ট কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে তাকে। এখন সে কষ্টের কথা আর মনে নেই। ভেতরটা ঝলমল করছে খুশীতে।

গত পরশু লাইফ ক্লাসে কাজ করবার সময় পাশের বন্ধুর মুখে একটা নাম শুনে ও জিজ্ঞেস করেছিলো, 'সত্যি, ছাড়া পেয়েছে? তুমি কার কাছে শুনেছ?'

'ছাড়া পায়নি। শুধু চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে থাকবার অধিকার পেয়েছে। ছ'মাসের জন্যে।'

'অসুখটা খুব সিরিয়স নাকি ?'

'ডাক্তাররা বলছে, বাঁচবে কিনা সন্দেহ। পেপটিক আলসার। পাকস্থলীতে ঘা হয়েছে। এর একমাত্র রেমিডি হচ্ছে অপারেশন। শরীরে মোটেই রক্ত নেই। অপারেশন চলবে কি করে ?'

তুলিতে রং নিয়ে মুর্তাজা সাগ্রহে বলে, 'কাল দেখতে যাব।'

পরদিন সকাল নটায় ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দিকে চললো। অনেকদিন তার নাম শুনে আসছে। তার সাহসের কথা ভেবে বিস্মিত হয়েছে। এখন তাকে দেখবার এমন সুযোগ হারানো যায় না।

এসে দেখে, তার বেডের কাছে লোকের ভিড়। চার-পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছে, আর একজন একটু ঝুঁকে কি আলাপ করছে। দুজনের ফাঁক দিয়ে মুর্তাজা চেয়ে দেখলো, মুখটা ভীষণ ফ্যাকাশে। রক্ত নেই বললেও হয়। শরীরে হাড় কখানা সার। কোটরে বসে যাওয়া বড়ো বড়ো চোখদুটো মেলে কথা বলছে মৃদু গলায়।

পিছন দিকের বারান্দায় রেলিঙের কাছে গিয়ে মুর্তাজা দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। একে একে সবাই চলে যাওযার পর সে এগিয়ে এলো বেডটার কাছে। কোনো কথাই ওর মুখে আসে না। অথচ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না কোনো। দেখতে যখন এসেছে, দু'একটা কথা না বলে গেলে নিজের কাছেই খারাপ লাগবে। সঙ্কোচ কাটিয়ে এক সময সে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার শরীর এখন কেমন ?'

'ভাল নয়। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়ি।'

'ডাক্তার কেমন কেয়াব নিচ্ছে ?'

'মোটামুটি ভালই। তবে শরীর খুব দুর্বল কিনা, অপারেশন চলবে না।'

মুর্তাজা জানতে চায়, 'আপনার ডায়েট কি ?'

'কিছুই পেটে সহ্য হয় না। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যায়।'

'কিছুই খেতে পারেন না ?'

'কমলালেবুর রস খেতে পারি একটু একটু।'

'আচ্ছা আমি কাল কমলালেবু নিয়ে আসবো।'

কথাটা বলে চলে আসার সময় মুর্তাজা দেখতে পেলো তার পাণ্ডুর মুখে একটা করুণ ম্লান হাসি।

বাড়ি ফেরার পথে ও ভাবতে থাকে, এখন পয়সা কোত্থেকে যোগাড়

করা যায়? গণ্ডা দু'য়েক কমলালেবু না নিয়ে যাওয়া যায় না। তার জন্যে এই বাজারে কমপক্ষে লাগবে দেড়টি টাকা। গত কাল রং আর তুলি কেনার জন্যে বাসা থেকে দশ টাকা নিয়েছে। আব্বা কিংবা আম্মার কাছে কোনো অজুহাতেই টাকার কথা আর তোলা যাবে না। ওরা রেগে উঠবেন। সংসারটা কিভাবে চলছে তার ভাবনা নেই বলে গালাগালি করবেন। অবশ্য আগে জানলে রং-তুলি কেনার টাকা থেকে কিছু বাঁচানো যেতো। আপাতত দু'এক পদ রং না কিনলেই চলতো।

বাসায় এসে মুর্তাজা নিজের কামরাটায় ঢুকলো। কোনো সময় কোথাও পয়সা রেখেছে বলে মনে পড়ে না। তবু একবার খুঁজে দেখা যাক, ভুলে হয়তো রেখেও থাকতে পারে কোনো জায়গায়।

প্রথমত সে একটা করে শার্টের পকেটগুলো খুঁজতে লাগলো। আশায় ওর বুক দুলছিলো; হয়তো পেয়েও যেতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনটে ফুটো পয়সা ছাড়া কিছুই মিলল না। শার্টগুলো বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে টেবিলের ড্রয়ার টেনে হাতড়াতে থাকে অসহিষ্ণুর মতো। কাটা পেনসিল, রবার, প্যাস্টেল, ছেঁড়া কাগজ সবই সেখানে আছে, শুধু একটা পয়সাও লুকিয়ে নেই। এরপর আর কি দেখবে? আরে, বিছানাটা রয়েছে যে। তার মাসিক বরাদ্দ টাকা থেকে কিছুটা বাঁচলে বিছানাটা উলটিয়ে তা ফেলে রাখা ওর অভ্যাস। মাঝে মাঝে অনেকদিন চলে যায়, পয়সা-গুলো মোটেই চোখে পড়ে না। আবার হঠাৎ কোনদিন পেয়ে যায়। পেয়ে যায় এমন সময়ে যখন এক টাকাই লাখ টাকার শামিল। তখন অমনোযোগিতার জন্যে নিজের প্রতি খুশী হয়ে ওঠে নিজেই! কিন্তু আজ কি হলো? বিছানার নীচটা একেবারে খালি। তার দরকার আছে জেনেই যেন পয়সাগুলো জোট বেঁধে পালিয়েছে।

বিরক্তিতে পানসে হয়ে যায় মুর্তাজার মুখটা। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে নতুন কোনো উপায় উদ্ভাবনার জন্যে চিন্তা করতে থাকে। তাকে দমে গেলে চলবে না।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সোজা হয়ে বসলো চেয়ারে। একটা ভালো বুদ্ধি খেলেছে ওর মাথায়। আজকে বাজার করার অনুমতিটা যদি কোন প্রকারে আম্মার কাছ থেকে আদায় করতে পারে, তাহলে অতি সহজেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সঙ্গে অন্য কাউকে না নিলেই হলো।

'আম্মা আমি বাজার করতে যাব।' রান্নাঘরে বসে বলে মুর্তাজা।

তিনি মুখ তুলে জিজ্ঞেস করেন, 'কিসের বাজার রে ?'

'কিসের আবার। বাসার ?'

'সেকি রাত্রের জন্য ?'

মুর্তাজা জানতে চায়, 'কেন দুপুরের বাজার হয়ে গেছে ?'

আম্মা বলেন, 'কি আবোল-তাবোল বকছিস ! এক্ষুনি খেতে বসবি, আর বাজার হয়নি ?'

মুর্তাজা ভাবে, তাইতো। ও হাসপাতাল থেকে আসার সময়ই যে সাড়ে দশটা বেজেছিলো ; আর এখন বারোটার কম নয়। আজ শুক্রবার কিনা ? আর্ট স্কুলের সাপ্তাহিক ছুটি, তাই বুঝতে পারেনি।

ফরিদার কাছে একটু খোঁজ নিলে কেমন হয় ? মায়ের কাছ থেকে আসার সময় কথাটা মগজে খেলতেই মাঝখানকার কামরাটার উদ্দেশ্যে সে চললো। ফরিদা ওর পিঠোপিঠি। এজন্যেই হয়তো সামান্য কারণে ওর সঙ্গে ঝগড়া বেঁধে যায়। এখন বয়সে কিছু বেড়েছে বলে ফরিদা আনকটা গম্ভীর হয়েছে, কিন্তু তবু মন কষাকষিকে অনেক সময় ঠেকানো যায় না। ফলে এমনো হয়, চার পাঁচদিন কথা বলে না দু'জনে। মুর্তাজা ফাইনাল ইয়ারে পড়লে কী হবে, ও এখনো ছেলেমানুষ থেকে গেছে। বিশেষ করে ছোট ভাই-বোনদের কাছে। বয়সের দাবিতে সে ওদের কাছে মোটেই পাত্তা পায় না। গতবার একজিবিশনে অয়েল পেন্টিংএ সে গবর্ণর্স্ প্রাইজ পেয়েছিলো, কাগজে কাগজে ছাপা হয়েছিলো ওর নাম ; কিন্তু ফরিদা তাকে আমলই দেয়নি।

ওর ওখানে যেতে ইতস্তত করে মুর্তাজা। ছোটবেলা থেকে তার যেমন ছিল ছবি আঁকার শখ, তেমনি ফরিদার ছিলো গানের। ওর জন্যে একজন টিউটর রাখতে হয়েছিলো। এতদিনে মোটামুটি দখল এসেছে ওর। মুর্তাজার বিবেচনায় একেবারে মন্দ গায় না। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গেয়ে শহরে একটা সুনাম অর্জন করেছে। কিন্তু যত প্রশংসা করা হয়, ততটুকু পাওয়ার যোগ্য মোটেই নয়। সেদিন সকালে হারমোনিয়ামের সঙ্গে একটা গান রেওয়াজ করছিলো ফরিদা। প্রান্তিক পরিষদের নববর্ষ দিবসে গাইতে হবে। মুর্তাজা একটা কম্পোজিশনে হাত দিয়েছিলো, কাজ শুরু করার পর নতুন নতুন কল্পনা জাগতে থাকায়, তখন রীতিমত রোখ চেপে গেছে ওর। পাশের

কোঠায় হারমোনিয়ামের পোঁ পোঁ। ও গটগট করে এসে গলা ফাটিয়ে বললো, 'বন্ধ কর, তোর চেঁচানো বন্ধ কর। কি আমার মিষ্টি গলারে, আবার গান শেখা হচ্ছে।'

রাগে ফরিদার চোখ ফেটে পানি পড়ার যোগাড়। কিন্তু এ অপমান ও নীরবে সহ্য করবে কেন? ও মাথা ঝাড়া দিয়ে বললো, 'বন্ধ করবো না, তোমার কী।

'আমার কি? হারমোনিয়ামটি ছুঁড়ে ফেলবো বাইরে।'

'ইস। ফেলো তো দেখি কেমন বুকের পাটা।'

মর্তাজা ভ্রূকুটি করে ফিরে যেতে যেতে বলে, 'ফেলে দিতে পারতাম, কিন্তু এখন ফেলবো না, ছবি আঁকছি।

'অমন ছবি আমি বাঁহাতে আঁকতে পারি।' ফরিদা ছাড়বার পাত্রী নয়।

সেদিন থেকে ওদের মধ্যে যে কথাবার্তা বন্ধ হয়েছে'এরপর আর বোঝা-পড়া হয়নি। মুর্তাজা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে থাকে। ওর কাছে পয়সাকড়ি থাকার সম্ভাবনা অনেক। শত হলেও মেয়ে তো? ওর স্কুলের মাইনে ও বাসের টাকাটা বাবা নিজে দিয়ে আসেন, কাজেই সেখান থেকে হাতসাফাই করতে পারে না। কিন্তু টিফিনের পয়সা? টিফিনের জন্যে অবশ্য রোজ পাঁচ ছ' আনার বেশী পাওয়া যায় না, তবু এই পাঁচ ছ' আনাব ওপর অন্য কারো হাত নেই এ কথা ঠিক। মুর্তাজার মনে হয়, টিফিনের জন্যে একটি পয়সাও খরচ করে-না ফরিদা, খিদের পেটে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিতে পারে। আর এভাবেই না সেলাইয়ের কাসকেটটা কিনেছে।

মুর্তাজা ঘরে ঢুকে ছোট টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তার মুখে ফুটেছে দেখনহাসি। এতদিন যেন ওর ওপর বিনা কাবণে অন্যায় করে এসেছে। রাফ খাতায় এলজেবরার একটা সলিউশন করছিলো ফরিদা, মুখ নিচু করে। কে এসেছে টের পাওয়া সত্ত্বেও চেয়ে দেখবার প্রয়োজন বোধ করলো না। মুর্তাজা তাকে খুশী করতে চায়, 'একটা ভাল খবর আছে ফরিদা।'

ও জবাব দেয়না কোন। নিচু হয়ে পেনসিল দিয়ে লিখতেই থাকে।

মুর্তাজা আবার বলে, 'একজনের মুখে তোর গানের প্রশংসা শুনলাম। খুব গুণী লোক। পারতপক্ষে কাউকে আমল দেন না! অথচ উনি আমাকে ডেকে বললেন, তোর গলার কাজ বেশ সুন্দর।

'তাতে তোমার কি হয়েছে ?' ফরিদা রাগে গর গর করে ওঠে।

'তোর রাগ এখনো আছে দেখছি।'

'থাকবে না ?'

মুর্তাজা অজুহাত দিতে চায়, 'না হয় ভুলই করেছি। এজন্য এমনভাবে থাকতে হবে ? বড় ভাইয়ের সামান্য কথাটা মাফ করাতে পারছিস না ?'

'থাক। আর বড় ভাই ফলাতে হবে না।'

'আমাকে মাফ করে দে। আর শোন, একটা জরুরী কথা আছে।' ওর খাতার ওপর হাত রেখে মুর্তাজা বলে, তোর কাছে গোটা দেড়েক টাকা হবে ?'

এতক্ষণ কেন ও তোয়াজ করছিলো, এইবার বুঝতে পারলো ফরিদা। বলে, 'না!'

'আমার নিজের জন্যে নয়। তুই বুঝতে পারছিস না কত দরকার।'

মুর্তাজা টাকা চাওয়ার কারণটা বিশদভাবে বুঝিয়ে-বলে। খুব কম সময়েই ছোটবোনের কাছে সত্য কথা কয়, কিন্তু আজকে একটি কথাও বাড়িয়ে বললো না। কথাগুলো শোনার পর রাগ-অভিমান সব ভুলে যায় ফরিদা, তার মুখে গাম্ভীর্য ফুটে ওঠে। চিন্তিতভাবে বলে, 'কিন্তু আমি যে আজকে উল আনিয়ে ফেলেছি।'

'একটা টাকাও নেই ?'

'না!'

হতাশায় মুর্তাজার চেহারাটা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। বলে, 'তাহলে কি হবে ? আমার কাছ থেকে আদায় করতে পারিস না কিছু।'

'কিভাবে ? অনর্থক গালাগালি শুনতে পারব না।' কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ফরিদা উৎসাহিত হয়ে বললো, 'এক কাজ করলে হয়! সুতো দিয়ে আমি যে পাখটা তৈরী করেছি, তা বিক্রি করতে পারলে—।'

চশমাটা খুলে শার্টের খুঁট দিয়ে মুছতে মুছতে ভাবে মুর্তাজা।

ফরিদা জিজ্ঞেস করে, 'পারবে তুমি ?'

'তা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।'

মুখে বললেও মনটা সায় দিচ্ছে না। নকশাটা দেখতে ভালই লাগে, সদর-ঘাটে নিয়ে গেলে হয়তো বেশিক্ষণ লাগবে না পাখাটা বিক্রি করতে। কিন্তু এ কেমন করে সম্ভব ? যদি জানাশোনা কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলে, লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। খোলা রাস্তায় জিনিস বিক্রি করতে যাওয়াটা

গ্লানিকর ব্যাপার। লোকে চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবে, সে ফেরিওয়ালা নয়, অথচ কেন একটা সুতোর পাখা বিক্রি করতে এসেছে তার আসল কারণটা জানতে পারবে না। ভাববে, অভাবে পড়েই বোধ হয় বাড়ির জিনিস বেচতে এসেছে।

ফরিদা তৎক্ষণাৎ ব্যস্ততার সঙ্গে শোবার ঘরে গিয়েছিলো। মাকে লুকিয়ে বেতের বাকস থেকে পাখাটা এনে খবরের কাগজ দিয়ে মোড়ালো। মুর্তাজার হাত দিয়ে বললো, 'সাবধানে বেরিয়ে যাও।'

মুর্তাজার মুখটা তখন দ্বিধায় দ্বন্দ্বে চুন হয়ে আছে। তার মনে হচ্ছে, মাথায় বাড়ি দিলেও এ কাজ সে করতে পারবে না। তবু ফরিদা যখন পাখাটা হাতে এনে দিলো, সে আপত্তি জানাতে পারলো না। যাতে বাসার জন্য কেউ দেখতে না পায়, তেমনি সতর্কতার সঙ্গে বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

অনেকদিন খেটে ফরিদা পাখটা তৈরি করেছিলো বাবার জন্য। তিনি আপনভোলা লোক, নিজের সুখ-সুবিধের দিকে মোটেই খেয়াল রাখেন না। এমন কি অসুখ হলেও, তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে তার অসুখ করেছে। দিনরাত পড়াশুনা নিয়েই পড়ে থাকেন। তিনি বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ যারা, সেই ছেলেমেয়েদেব পড়ানোটা হেলা-ফেলার কাজ নয়। ওদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বীজটা ঠিকমতো ঢুকিয়ে দিতে হবে, আব সেজন্য একজন প্রফেসরের হওয়া চাই রীতিমতো কর্মী। যে মালী চারাগাছকে মহীরুহে পরিণত করতে চায়, তাকে ঢিলেঢালা হলে চলে না। অবশ্য অধ্যাপনা করে ক'শ টাকাই আর পাওয়া যায়। সে টাকায় ছয় সাতজন খোরপোষের একটা সংসার চালানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবু পয়সাটাই দুনিয়াতে চরম জিনিস নয়, যদি হোত, তাহলে হয়তো এতদিনে দুনিয়াটা শেয়াল কুকুরের রাজ্য হয়ে দাঁড়াত। আব্বার এসব মতামতের জন্যেই তাকে খুব ভালো লাগে ফরিদার। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, আম্মা সব সময় তার দিকে নজর রাখতে পারেন না। তাই উনি যতক্ষণ বাসায় থাকেন, ফরিদা যথাসম্ভব কাছাকাছি থাকে। ডাক শুনলেই ছুটে যায় তার কাছে। মাঝে মাঝে তিনি ভীষণ চটে ওঠেন, কিন্তু এ নেহাৎ বাইরের ব্যাপার।

দু'দিন আগে পাখাটার কাজ শেষ হয়েছে। ফরিদা ভেবে রেখেছিলো, সুস্থির সময়ে সেটা নিয়ে গিয়ে আব্বাকে একদম অবাক করে দেবে। কিন্তু তা আর হলো না।

তবু ভাবনার কারণ নেই। আরেকটি নতুন পাখা সে তৈরি করবে শিগগিরই।

ছোট ভাইবোন নিয়ে গোসল করতে যাওয়ার জন্যে ফরিদা তৈরি হচ্ছিল, এমন সময় ঘরে ঢুকলো মুর্তাজা। ও জিজ্ঞেস করে ওঠে, এত শিগগিরই বিক্রি হয়ে গেল? কত পেয়েছ?'

মুর্তাজার চেহাবাটা বিমর্ষ। পাখাটা সমেত হাত তুলে বলে, 'বিক্রি আর হলো কোথায়! এই তো।'

'কেন, কেউ কিনতে চাইলো না?'

'আমি বিক্রি করতে যাইনি।' মুর্তাজা ব্যাখ্যা করে জানায়, 'বাইরে গিয়ে মনে হলো আমার এক বন্ধুর কাছে গেলে, টাকা পেতে পাবি। তোব এত কষ্টের জিনিসটা বিক্রি করবাব দরকার নেই।'

ফরিদা বুঝলো, এ বাজে অজুহাত মাত্র। ভাইটির চরিত্র ওব নখদর্পণে আঁকা। এত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে জিনিসটা বিক্রি করতে লজ্জা হচ্ছে, এছাড়া ফিবে আসাব কোন কাবণ নেই।

'যদি পাও তবে তো ভালোই।' ফরিদা পাখাটা হাতে নিয়ে বলে, তাহলে ওখানে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ এক্ষুণি যাচ্ছি।

ছোট বোন ওব মনের ভাবটা বুঝে ফেলছে ভেবে খারাপ লাগে ওর। বাইরে থেকে ফিরে আসার সময় ভেবেছিলো গোসল করে খেয়েদেয়ে বেরুবে। কিন্তু এখন আর সম্ভব নয়। এক গেলাস পানি খেয়ে ও বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে দিলো।

বন্ধুবান্ধব কম নয়। সম্ভব হলে সবার কাছে গিয়েই একবার করে ঢু মারতে হবে। প্রথমেই মনে পড়লো, আখতারের কথা। খোশমেজাজী দিলখোলা ছেলে। ওর কাছে থাকলে কয়েকদিনের জন্য দেড়টি টাকা ধার দেবেই। কিন্তু যে হারে সিগারেট ফোঁকে তাতে ওর পকেটে কিছু থাকাটাই বিচিত্র। বিবেচক ছেলে এমন উচ্ছৃঙ্খল চলাফেরায় কোনো কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তিরস্কার করে, আর ও শুনে হো হো করে হেসে ওঠে। ও বলে দুনিয়াতে আকবর বাদশাকেও মরতে হয়েছে, হেসে খেলে জিন্দগীটাকে সিগারেটের ধোঁয়ার মত উড়িয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অবশ্য এজন্যে কর্তব্যকে অবহেলা করবেন না, কেননা মনের মতো কাজের মধ্যে রয়েছে আনন্দ, আর আনন্দই

হচ্ছে জীবন। মা বাড়িতে আছেন, ছোটভাইটা য়ুনিভার্সিটিতে ইকনমিকসে অনার্স পড়ছে, নিজের কথা না ভেবে ওদেরকে দেখা শোনা করার মতো যোগ্যতা অর্জনের জন্যেই সে আর্টস্কুলে ভর্তি হয়েছিলো। ল্যাণ্ডসক্যাপ আর পটারীতে ওর হাত ভাল।

আস্তানাটা অনেক দূরে, শান্তিনগর বাজারের কাছে দিয়ে যে রাস্তাটা বেইলী রোডের দিকে চলে এসেছে, তারই ধারে। টায়ার ফেটে সাইকেলটা অচল হয়ে আছে, মুর্তাজাকে হেঁটেই যেতে হবে এতদূরে।

কড়া দুপুর রোদ মাথায় নিয়ে ও যখন ভার্সিটি ষ্টুডেণ্টস লজে'র বারান্দায় এসে উঠলো, তখন তার সারা শরীর বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। কাঠের বেড়া দেওয়া টিনের একটা চৌচাল। সে হিসেবে নামটা বেশ ভারিক্কি চালের উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো এই যে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র থাকেনা। কয়েকজন কেরানী, আর আখতার, এরাই হচ্ছে এই ঘরের বাসিন্দা। রান্নাবাড়ার জন্যে একটা চাকর রাখা হয়েছে।

মুর্তাজা ঘরে ঢোকবার আগেই দক্ষিণ দুয়ারের কাছে শুনলো আখতারের গলা, 'আমার ভাত কোথায়?'

'আপনার চাল দেওয়া হয়নি।'

'দেওয়া হয়নি মানে? আমি উপোস থাকব নাকি?'

'তার আমি কিছু জানিনা।' চাকরটা জানালো, 'ম্যানেজার সাবকে বলেন।'

মেসের ম্যানেজার সাহেবকে জিজ্ঞেস করার পর বললো, 'কদ্দিন আর চালাবো বলুন। সাতদিন আগে আপনার টাকা দেয়ার কথা ছিলো।'

'আমি পালিয়ে যাব টাকা নিয়ে?'

'পালাবেন না। কিন্তু আমাদেরও তো একটা সাধ্যি আছে। কত টাকা আর মাইনে পাই।'

মুর্তাজা ঘরে ঢুকে ওর খাটের ওপর গিয়ে সটান শুয়ে পড়লো। ওখান থেকে ফিরে এসে তাকে দেখতে পেয়ে অন্য সবকিছু ভুলে যায় আখতার। নিমেষে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

তার বন্ধুদের অনেকবার অনুরোধ করেছে আসতে, কিন্তু দূরের পথ বলে কেউ আসেনি এ পর্যন্ত। মুর্তাজারও এখানে প্রথম পদার্পণ। আখতার ওর সামনে সিগারেটের প্যাকেটটা খুলে দেয়।

'তারপর, হঠাৎ কি ভেবে এলি ?'

'এমনি। আজকে তো ছুটি।'

'ও।' আখতার একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'কতকগুলো নতুন পট করেছি, দেখবি ?'

'একটু জিরিয়ে নিই।'

ওদের কথাবার্তা শুনে মুর্তাজার মনটা দমে গেছে। তাহলে, এখানেও কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। চশমাটা খুলে রাখার পর সিগারেট ধরিয়ে সে ধোঁযার রিং বানাতে লাগলো মুখের ওপরে।

এরপর কি করা যায় ? বন্ধুদের একটা নাম ধরে সম্ভাবনার কথা সে চিন্তা করতে থাকে। কিন্তু কেউ দিতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। তা হলে, এরপর কি করা যায় ? তাকে গর্বের সঙ্গে জানিয়ে দিতে এসেছে। একটা উপায় খুঁজে বার করতেই হবে।

'শাজাহানপুরের ওদিকটায় কয়েকটি ভাল জায়গা দেখে এসেছি। স্কেচে বেরুবি বিকেলে ?' কথাটা জিজ্ঞেস ক'রে আখতার ওর মুখের দিকে তাকালে।

'রাখ তোর স্কেচ।' এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে মুর্তাজা বললো ঠাণ্ডাগলায়, ছবি আঁকার চাইতে জীবনটা অনেক মূল্যবান।'

'হঠাৎ এ কথা কেন ?'

'এমনি বললাম আর কি। যদি আঁকতেই হয় ছবি আঁকতে হবে মানুষেব। ন্যেচারের নয়। দিনের পর দিন মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকছে, বেঁচে উঠছে, তাই ফোটাতে হবে রঙে রেখায়। ন্যেচাব আসবে সেখানে, তবে মুখ্য হয়ে নয়। বিছানা থেকে উঠতে উঠতে মুর্তাজা বলে, 'যাক। এখন চলি।'

'চলি মানে ?' বিস্মিত হয আখতার। একসঙ্গে এসে মিললে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেখানে কাটিয়ে দেয়, এখন এত শিগগির উঠে পড়ার কোন কাবণ খুঁজে পায় না।

'একটা জরুরী কাজ আছে।'

'কি কাজ ?'

'তোকে জানালে বিশেষ ফায়দা হবে না।

'কেমন করে বুঝলি ?' আখতার জিজ্ঞেস করে ক্ষুণ্ণগলায়।

'এমনি, অনুমানে।' মুর্তাজা বললো 'তবু যখন পেপীড়াড়ি করছিস, বলছি। গোটা দুয়েক টাকা ধার দিতে পারিস ? বিশেষ দরকার।'

'ও, এই কথা ?' শার্টা গায়ে দিতে দিতে আখতার বললো, 'চল।'

'কোথায় ?'

'একটু বাইরে যেতে হবে।'

রাস্তার ওপাশে চালাঘরে একটা ছোট চায়ের দোকান। শুধু চা বেচে বোধ হয় পোষায় না, তাই মনোহারী জিনিসপত্রও রাখা হয়েছে। ওরা দুজনে টুলের মধ্যে এসে বসলো। খিদে পেয়েছে দু'জনেরই। দোকানদার ছোকরাটাকে অর্ডার দেয় আখতার, 'এই কি খাওয়ার আছে, দে। আর চা দে দু'কাপ।

ছোকরাটা জানতে চায়, 'আগের টাকা এনেছেন ?

'এনেছি বাবা এনেছি। এখন যা বলছি দে।

ওর কথা পুরোপুরি বিশ্বাস না হলেও, ছেলেটা একটা বাসনে কতকগুলো নোনতা বিসকুট ও কুকিস নিয়ে ওদের সামনে বেঞ্চিতে রাখলো। এরপর চুলোতে পাখা করতে চলে গেল সে। ওরা বাইরের দিকে চেয়ে বিসকুট চিবোতে থাকে চুপচাপ।

আধ ঘণ্টার মধ্যে চা খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লো ওরা। রুমালে মুখ মুছে ছোকরাটার কাছে এগিয়ে যায় আখতার। জিজ্ঞেস করে, 'আমার আগে না কত হয়েছিলো ?

পাওনার অঙ্কটা ওর মুখস্থ। বলে, 'আট টাকা।'

'আট টাকা আর এখন হলো আট আনা। সাড়ে আট টাকা। তাহলে দে, দেড়টা টাকা আমাকে। দশটাকা পুরো হয়ে যাক।'

ছেলেটা বলে, 'নোট দেন।

ব্যস্ততার সঙ্গে পকেট হাতড়িয়ে ও বলে, ও তাইতো। ভুলে ফেলে এসেছি। অন্য শার্টে রয়ে গেছে। দেড়টা টাকা দিয়ে দে, একবারে দশ টাকার নোটটা দিতে আমার সুবিধে হবে।'

'আগে নোট না দিলে আমি পারব না। তাহলে মালিক এসে মারবে।'

রাস্তায় এসে আখতার জিজ্ঞেস করে, 'তোর টাকার খুব দরকার, নারে ?'

'দরকার না হলে কি দুপুরবেলায় এদ্দুরে হেঁটে আসি ?'

'তাহলে এ ব্যাপারেই এসেছিলি আমার কাছে ?'

মুর্তাজা জানায়, 'হ্যাঁ, এ ব্যাপারেই।'

'চল তো দেখি।' বিপরীত পাশে একতালা দালানটার দিকে চলতে চলতে বলে, 'ইন্সপেক্টর সাব দুটো পট এনেছিলেন। দাম দেননি। পেলে সুবিধে হবে।'

কিন্তু ইন্সপেক্টরের বাড়িতে এসে ডাকাডাকি করার পর একজন এসে বলে গেলো, খেয়েদেয়ে উনি ঘুমিয়ে আছেন। এখন আসতে পারবেন না।

এরপর আখতারকে বিদায় দিয়ে মুর্তাজা হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলো শহরে। চা খাওয়ার পর খিদেটা মরছে কিন্তু এসেছে একটা অসহ্য ক্লান্তি। শার্টের পিছনটা ভিজতে ভিজতে পিঠের সঙ্গে আটকে গেছে। ঘাম জমেছে সারা মুখে, গলায় তার মধ্যে রাস্তার ধুলো লেগে ঘিনঘিন করছে শরীরটা।

এইভাবে বিকেল হলে সদরঘাটে গিয়ে পশ্চিমদিকের একটা পাকায় বসলো মুর্তাজা। সূর্য ডুবেছে বুড়িগঙ্গার পানিতে আলতা ঢেলে দিয়ে, নৌকাগুলো পড়ে যাচ্ছে ছায়ায়। দেখবার ইচ্ছা থাকলে আরো অনেক দৃশ্য রয়েছে, ভালো ছবি আঁকবার মতো, ষ্টাডি করার মতো। কিন্তু সেদিকে ওর মন নেই। এখন ভাবছে, টাকা হলে মানুষের গোটা অস্তিত্বটাই যেন অর্থহীন। অথচ কোনদিন একে এত গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে শেখেনি।

নদীর ঝিলিমিলি স্রোতের দিকে চেয়ে থাকতে এক সময় মাহবুব কেমিক্যাল ওয়ার্কসের কথা ওর মনে পড়লো। ম্যানেজার তিনদিন আগে বাসায় এসে বলেছিলো, তাদের নতুন তেলের লেবেলটা এঁকে দিতে। মুর্তাজা ভূমিকা না করেই জবাব দিয়েছিলো, 'আমি কমার্শিয়াল কাজ করি না।'

কেবল মুখের কথা নয়, গোড়া থেকেই এ ছিলো তার প্রতিজ্ঞা, কমার্শিয়াল আর্ট করবে না। ক্রিয়েটিভ আর্টিষ্ট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আগ পর্যন্ত যদি দু'তিনদিন এক নাগাড়ে না খেয়েও থাকতে হয়, তবু সে ওই ধরনের শিল্পচর্চার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। এগুলো করলে সৃজন প্রতিভা দিনে দিনে কেমন করে নষ্ট হয়, তা মোটেই টের পাওয়া যায় না। ব্যবহারিক শিল্প নয়, সৃজনী শিল্পকেই সে করতে চায় পেশা, যদিও এখনও তা আকাশ-কুসুম কল্পনা। এ ব্যাপারে ওর মত হচ্ছে, আত্মত্যাগ না করলে পরবর্তী জেনারেশনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না;

কিন্তু সে যেন তার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবে না। ওর মন বলছে, এখন গেলেও সে কাজটা পাওয়া যেতে পারে। বাড়ন্ত ফার্ম, পয়সা নেহাৎ কম পাওয়া যাবে না।

এতক্ষণে যেন সমস্যার সত্যিকারের সমাধান খুঁজে পেলো। মুর্তাজা উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি চলতে থাকে। ভবিষ্যতে কি হবে না হবে তার জন্যে এত মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

চকবাজার ছাড়িয়ে একটা গলিতে এসে দেখলো, দোকানটা খোলাই আছে। ম্যানেজার তাকে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার ? এত রাত্রে যে ?'

'আপনাদের লেবেলের কাজটা আমি করব।'

'তাতো দিয়ে দিয়েছি অন্যজনকে। আপনি তখন আপত্তি করলেন।'

মুর্তাজা জিজ্ঞেস করে, 'কাকে দিয়েছেন ?'

নাম বলতেই সে দেখলো ও লোকটি তার বন্ধু। একটু ভেবে নিয়ে জানতে চাইলো, 'আচ্ছা, আমি যদি ওর কাছ থেকে কাজটা নিতে পারি তা হলে আপনার কোন আপত্তি নেই তো।'

'আমার আর কি আপত্তি। কাজ হলেই হলো।'

'কাল সকালে এসে দিলে টাকা দেবেন তো ?'

'জিনিস পেলে কেন দেবো না।'

ওখানে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সে যখন রশিদের কাছে এলো, তখন রাত নয়টা বাজে। ওখানে হাজির হলো, জিনিসটা বুঝে নিলো, এরপর বেরিয়ে এলো। রশিদকে একটা কথা বলার সুযোগ দিলো না।

ফরিদা উদ্বিগ্ন হয়ে একেকবার দরজার দিকে চাইছিলো। এখনো সে বাইরে থেকে ফেরেনি কেন ? বাবা-মা রেগে গেছেন। এই রাগের পিছনে একটা গভীর কারণ আছে। বড় ছেলে মুনীর রাজনীতি করতো, গত ভাষা আন্দোলনের সময় জেলে গেছে। গত দু'বছর ধরে ও কোথায় থেকেছে কখন বাড়ীতে এসেছে, কখন আসেনি, বাপ-মা কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারতেন না। যেদিন ধরা পড়লো, সেদিন ওরা বুঝতে পারলেন, তলে তলে এই ব্যাপার। এর বিশেষ করে ছেলেদের ওপর হুকুম, বিকেলে যেখানেই যাক, সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসায় ফিরতে হবে নাহলে মারের চোটে পিঠের চামড়া থাকবে না।

কথাটা যে মুর্তাজার মনে ছিলো না এমন নয়, কিন্তু তবু এ-ব্যাপারে সে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয় না! কেননা, এ পর্যন্ত অনেকবারই বাধ্য হয়ে এই আদেশ অমান্য করতে হয়েছে। ঠিক সন্ধ্যার সময় কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে বাড়িতে থাকা সম্ভব না-কি ?

ও ঘরে ঢুকতেই ফরিদা জিজ্ঞেস করলো 'কি হলো ? এনেছ ?'

'না, তুই শুনে যা।'

কানে ফিসফিস করে কি বলতেই ফরিদা চলে গেল অন্য ঘরে। মুর্তাজা হারিকেন হাতে নিজের কোঠায় এসে রং তুলি ঠিক করতে থাকে।

ডাল তরকারী দিয়ে রান্নাঘর থেকে এক থাল ভাত, আর এক গেলাস পানি নিয়ে হাজির হলো ফরিদা। বললো 'নাও আগে খেয়ে নাও।'

সাড়া পেয়ে মা এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি ?'

'এখানেই তো। কাজ করছিলাম '

'এখানেই কাজ করছিলি ? মায়ের সামনে মিথ্যা কথা বলতে বাধলো না ?' তুই আজকাল বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছিস। সাবধান হ'। না হলে কপালে দুঃখ আছে।'

আম্মা চলে যাওয়ার পর তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিয়ে মুর্তাজা কাজ করতে বসলো। হারিকেনের একটা দিক খাতা দিয়ে আড়াল করে রেখেছে। অনেক রাত পর্যন্ত আলো জলছে দেখলে বাবা চটাচটি করবেন।

আম্মাকে দেখাবার জন্যে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিলো ফরিদা। কিন্তু তার চোখে ঘুমের আঁচটুকুও নেই। জেলের ঘণ্টায় একটা বাজতেই সে আস্তে আস্তে উঠে এলো। এমনভাবে দরজা খুললো যাতে কেউ টের না পায়।

শোওয়ার আগে সে ষ্টোভ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ঠিক করে রেখেছিলো। ষ্টোভটা জালিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কদ্দুর হয়েছে ?'

'আরো ঘণ্টা দুই লাগবে।' মুর্তাজা বললো, 'শিগগির চা দে তো।

তিনরঙা লেবেলটা এঁকে শেষ করার পর রাত তিনটে বাজলো। এর মধ্যে তিন কাপ চা পান করতে হয়েছে। ফরিদা আর বসে থাকতে পারছে না, ওর চোখের পাতাদুটো একেবারে বুজে যায়! তুলিটা ধরে টেবিলের ওপর রেখে মুর্তাজা বললো, 'তুই যা। ঘুমিয়ে পড়গে।'

আজ সকাল আটটায় ঘুম থেকে উঠে কখন দোকান খুলবে তার জন্যে অপেক্ষা করলো না। ম্যানেজারের বাসার ঠিকানাটা ও টুকে এনেছিলো। লেবেলের আঁকাটা হাতে নিয়ে চললো মুর্তাজা। ওখানে জিনিসটা বুঝিয়ে দিয়ে পাঁচ টাকার নোটটা হাতে নিলো। এই টাকাতেই অনেকক্ষণ বেছে বেছে ফলের দোকান থেকে বেশ তাজা দুই গণ্ডা কমলালেবু কিনে এনেছে।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে ফিমেল ওয়ার্ডে চার নম্বর বেডটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো মুর্তাজা। জোরে হেঁটে আসায় শরীর দিয়ে ঘাম ছুটছে। যাক, তবু সময় মতো আসতে পেরেছে সে। এখনো লোকজন এসে ভিড় জমায়নি।

'আমাকে চিনতে পারছেন তো ?'

'হ্যাঁ, কালকে এসেছিলেন না ?' কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আবার নারী কণ্ঠের ক্ষীণ আওয়াজ, মাথাটা বড্ড ঘোরে। হঠাৎ কাউকে দেখলে চিনতে পারি না। বুকটাও ভীষণ জ্বালা করে। আজকে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।'

মুর্তাজা কমলালেবু বাঁধা রুমালটা সামনে রাখলো। সেগুলো দেখে তার রক্তহীন পাণ্ডুর মুখে আবার সেই করুণ ম্লান হাসি ফুটে উঠলো। এই হাসির পিছনে কি লুকিয়ে আছে কেউ জানেনা, মুর্তাজাও নয়। সে কি দীর্ঘ কারাবাস ও নির্যাতনের বেদনা, না অন্য কিছু ? মুর্তাজা একদৃষ্টে চেয়ে দেখে তার দুই চোখের কোণ বেয়ে মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে এসেছে, সে যেন নিজের রক্তের স্পন্দনে শুনতে পাচ্ছে তারই অস্পষ্ট পদধ্বনি। সে মনে মনে শিউরে ওঠে। কি বলবে খুঁজে পায় না কিছুই। কি বলবে ? কি বলতে পারে ?

'তবু একথা ঠিক, আমি মরব না।' জানালার বাইরে অনেক দূরে চলে যায় ইলা মিত্রের দৃষ্টি। সে দৃষ্টি স্থির, অচঞ্চল। গলার আওয়াজটা আগের চেয়ে আরো স্পষ্ট হয়, আর বেঁচে উঠলে আপনাদের কথা আমার মনে থাকবে।'

মুর্তাজা কোনো কথা বলতে পারে না। বিদায় নিয়ে ফিরে আসার সময় একটা ছবির পরিকল্পনা ওর মাথায় খেললো। ও মনে মনে ঠিক করে নিলো, আজকে বাসায় ফিরে গিয়ে রাত্রেই একটা ষ্টীল লাইফ কম্পোজ করবে। কম্পোজ করবে মানুষের মাথার একটা খুলির সঙ্গে কয়েকটি কমলালেবু দিয়ে।

শেষ কোথায়

গোপাল বিশ্বাস

সন্ধ্যার দিকে বান্ধবীর চায়ের আমন্ত্রণ সেরে রাবেয়া তাড়াতাড়ি ফিরে এলো। অনেক কালের পুরোনো বন্ধুত্বে সান্নিধ্যের নতুন অবকাশ, আর আবেগঘন সুখানুভূতির মাঝপথে ইতি টেনে ফিরে আসতে হয়েছে তাকে।

অন্ততঃ স্কুলের মিস্ট্রেস্গিরির একঘেয়েমির পর, ঘর-সংসারের শত ঝামেলা থেকে বাঁচা যায় কিছুক্ষণের জন্যে বাইরের আবহাওয়ায়। প্রাণখোলা মুখর আলাপে-প্রলাপে, শত কথার স্মৃতি মন্থনে মনটাকে স্নিগ্ধ করে তোলা যায় এমনিতর দূরের পরিবেশে।

শুক্রবারের ছুটির দিনে স্কুলের সবকজন মিস্ট্রেস মিলে গল্প-গুজবের মহড়ায়, মাতামাতি হুল্লোড়ে রাবেয়া সবাইকে ছাড়িয়ে যেতো। এমনি বাইরে বেড়াতে যাওয়া ওর কাছে একটা নেশার মতো। আর প্রায় সে যায়। যাবেই সে। নিঃশঙ্ক, বিনা-দ্বিধায়।

ওর বান্ধবীরা, সহকর্মীরা বলতো, ওর মনের রঙ এতো চড়া তাই সে এতো কথা বলতে পারে। প্রাণ খুলে হাসতে পারে উচ্ছ্বসিত। লুটোপুটি খেতে পারে খুশীর আতিশয্যে।

কিন্তু ওর সগর্ব জীবন যাত্রায় কবে থেকে মেঘ ঘনালো যেন। একটু একটু করে কালো মেঘ ফরসা আকাশটাকে যেমন করে ঘিরে ধরে। ওর নিজেরই অলক্ষিতে একটু একটু করে নিস্পৃহতার ছায়া নেমে এলো কবে থেকে যেন। আজকে কোনোখানে যাবার মন ছিল না ওর। তবু যাওয়া-না-যাওয়ার দ্বিধাটুকু সরিয়ে যাওয়াটা যখন সত্যি হয়ে উঠলো, হাঁফ ছেড়ে বেঁচে গিয়েছিলো সে। কিন্তু গিয়ে এতো তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হলো বলে

মনটা ওর ভীষণ ভারাক্রান্ত। একটা বিরক্তিকর বোঝায় মনটা ওর ছেয়ে থাকে যেন।

রিক্সা থেকে নামলো রাবেয়া। মনটা ওর সন্ধ্যেবেলার আকাশটার মতো গুমোট। চোখের কোণে কিসের যেন স্তিমিত আড়ষ্ট ছায়া।

ব্যাগ থেকে পয়সা গুণে রিক্সাওয়ালাকে বাড়িয়ে দিল। একটুও না তাকিয়ে দ্রুত পা চালালো সে।

সন্ধ্যায় আবছায়া গলি পথটাতে। দু'পাশে ঘন গাছ পালা। ঝুঁকেপড়া গাছের ডাল-পালার গুমোট অন্ধকার। পথটুকু পেরিয়ে বাসার দিকে পা বাড়াতেই রাবেয়া দূর থেকে শুনতে পেলো ঘরের কামরার মধ্যে কিসের যেন দাপাদাপি গোলমাল।

বাব্লু আর রুবি কাঁদছে। কান ফাটা চিৎকারে ছোক্‌রা চাকর মোসলেম সামাল দিচ্ছে ছেলে-মেয়ে দুটোকে। শাসাচ্ছে ওদের। আমিনুর কাশছে।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো ওর। গা কাঁপছে। বুক কাঁপছে ওর। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা দুরন্ত আগুনজ্বলা ক্ষোভ।

বুক কাঁপছে ওর। বাইরের অন্ধকার বারাণ্ডাটা দ্রুত পেরিয়ে গেল। ঝড়ের বেগে কামরাটাতে এসে ঢুকলো। ঢুকলো শুধু দরজা অবধি পর্দাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে। থমকে দাঁড়িয়ে গেলো সে ওইখানটাতে। নড়লো না। হাতের মুঠোয় শক্ত করে পর্দার খানিকটা গুটিয়ে ফেললো।

ঘরে আলো জ্বালা হয়নি এখনো।

ছায়া মূর্তির মতো অন্ধকারে বাব্লু আর রুবি জড়াজড়ি করছে বিড়ালছানা নিয়ে। দু'জনেরই অঝোর ক্ষুব্দ কান্না। বিড়ালছানাটাও আর্তশব্দ করছে কচি হাতের বেসামাল চাপ খেয়ে। তক্তপোষটার ওপর আধছায়ার মতো আমিনুর। আধ-শোয়া অবস্থায় কঁকাচ্ছে। কাশছে থেকে থেকে।

মোসলেম ভুতের মতো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কোন্‌দিক সামাল দেবে দিশেহারা তাকাচ্ছে।

ঠোঁট কাঁপে রাবেয়ার ক্ষোভে, উত্তেজনায়। চিবুকটা কুঁচকে আসছিলো দুর্বোধ্য কান্নার আবেগে। তাকিয়ে থাকলো সে অনেকক্ষণ অন্ধকারে—।

ঠোঁট কামড়ে জমে ওঠা ক্ষোভ সামলে নেবার চেষ্টা করছিলো। কঠিন শক্ত হয়ে ওঠার মতো ব্যঞ্জনা ওর মধ্যে ফুটে উঠতে চাইলো। যেন সব কিছু সে সহ্য করে যাবে, একটি কথাও বলবে না সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে দেখলেও।

রুবি আম্মার ফিরে আসার আভাস পেয়ে নালিশের বোঝা নিয়ে কান্নার মধ্যে দুর্দাড় পা ফেলে ছুটে এসে আম্মাকে জড়িয়ে ধরতে গেল। অন্ধকারে পা ফসকে পড়ে গেল সে।

কান্না উচ্ছল হয়ে ওঠে রুবির। কেউ ওকে তুললো না তবু।

আমিনুর কঁকাচ্ছে। নিঃশ্বাস ফেলছে দ্রুত সজোরে। বিরক্তিতে আমিনুর বলে, মোসলেম, ওকে চুপ করা! নিয়ে যা এখান থেকে—।

মোসলেম আমিনুরের পাশ থেকে সরে গেল। রুবিকে সামলাতে থাকে। বাব্লু আম্মাকে দেখে খানিক অনুযোগ আর খানিক কান্নার আমেজ নিয়ে বলে, 'ভাত খাবো আম্মা! আম্মা—!'

রাবেয়ার কানে কিছুই যেন পৌঁছায় না। কিছুতে সাড়া জাগাবে না যেন ওর মধ্যে। ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে ওর সারা গা।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ পরে রাবেয়ার মুখ দিয়ে কথা সরলো, ধীর আমেজহীন একটুখানি শুধু জিজ্ঞাসা, আলো জ্বালাস্নি কেন, মোসলেম।

শঙ্কিত জবাব দেয় মোসলেম, 'জী, সাহেব মানা করলেন—'

অনেকটা হালছাড়া সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস নেমে এলো রাবেয়ার। না, আর সওয়া যায় না। ওর জীবনের সবটুকু সুখ নিঃশেষ হয়ে গেছে একেবারে। আর সইতে পারে না সে।

ধীর পায়ে এগিয়ে গেল কান্নারত রুবিকে পাশ কাটিয়ে। টেবিলটার ধারে গিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে খুঁজে নিতে গেল দিয়াশলাইটা। কাঠির ঘর্ষণে পলকের জন্যে ঘরের অন্ধকারটুকু কেঁপে উঠ্লো।

টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বালতেই ঘরের নগ্ন বাস্তবটুকু আরো যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। ল্যাম্পটার শিখা চড়িয়ে দিতে দিতে চকিত উদাস, গম্ভীর দৃষ্টিতে রাবেয়া জিজ্ঞেস করে ছোক্‌রা চাকরটিকে, বার্লিটুকু গরম করে দিয়েছিলে মোসলেম?

গলার স্বর যেন আটকে আসে রাবেয়ার। দ্বিধাজড়িত কম্পিত সুর কেটে কেটে যায়। সন্ত্রস্ত, মর্মাহত মোসলেম বলে, 'জী, এত করে বললাম, সাহেব তবু কিছুতে খাবেন না!'

রাবেয়া ঢোক গিলে, চকিত দৃষ্টি ফেরায় টেবিলের ওপরে। রেকাবিতে দুধ বার্লিটুকু ঠাণ্ডা জমাট হয়ে আছে, স্পর্শ করেনি আমিনুর।

ক্ষোভে তোলপাড় হয়ে যায় রাবেয়ার ভেতরটা। চোখদুটো দুরন্ত জ্বালায়

চক্ চক্ করে। চোখে পানি বেরিয়ে আসে। চিবুকে কম্পনের আতিশয্য। দৃষ্টিতে ক্রোধের চকিত বহ্নির ঝিলিক।

যত ঝামেলা এসে জুটবে ওরি ওপরে। অষ্টপ্রহর যদি ওকেই শুধু ঝামেলা পোহাতে হয়, সবদিন সবকিছু ওর পক্ষে করা সম্ভব হবে তা কে বলেছে। না, পারবে না সে। কিছুই করতে পারবে না রাবেয়া। স্কুলের মাষ্টারিটা ওর আছে বলেই ঘর সংসার এখনো টিকে রয়েছে। খওয়া পরা চলছে। ওই চাকরিটাও ছেড়ে দিয়ে রাবেয়া হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে এবার থেকে। পৃথিবীটা ওলট পালট হয়ে যেতে দেখলেও ফিরে তাকাবে না।

আমিনুর অস্পষ্ট কাকে ডাকলো। ওকে নয় রাবেয়া তবু এগিয়ে গেল কাছে। আমিনুর কপালটাতে আলগোছে হাত দিয়ে দেখতে গেল। চমকে উঠলো প্রচণ্ড উত্তাপের স্পর্শে। জ্বর। দ্বিধা নিয়ে শুধালো, 'শোনো, খারাপ লাগছে বেশী।....একটু খাবে কিছু?'

আমিনুর সাড়া দেয় না। চোখদুটো বোজা। জ্বরতপ্ত দ্রুত শ্বাস পড়ে সশব্দে। রাবেয়ার বাধো বাধো গলাটা আরোও সতেজ করে বলে আবার,

'একটু খাবে? বার্লি গরম করবো?'

আধেক শোনা যায় কি যায় না, এমনি একটুখানি অস্ফুট আভাস ফোটে আমিনুরের মুখ দিয়ে, খাবে না কিছু।

রাবেয়ার ক্ষুব্ধ ঠোঁট কাঁপে। হয়তো ওরই ওপরে যতো রাগ আমিনুরের না খেতে চাওয়ায় প্রকাশ পাচ্ছে।

তবু ক্ষোভ জমে উঠতে দেবে না রাবেয়া নিজের মধ্যে। শক্ত আমেজহীন স্বরে বলে সে, 'না কেন। সারাদিন কিছু খাওনি—'

আমিনুর ফিরে শোয়। কিছু বলে না।

রাবেয়া ঝুঁকে পড়ে সামনে, নরমভাবে বলে এবার, 'একটু খাও, আমি বার্লি আনি, এঁ্যা!'

আমিনুর চুপচাপ পড়ে থাকে। জবাব দেয় না।

রুবির কান্না তখনো থামেনি। মোসলেমের কোল থেকে নেমে গিয়ে আম্মার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসে। পায়ের কাছে এসে জড়িয়ে ধরে। কোলে উঠ্তে চায় সে। তীক্ষ্ণ চিৎকারে কাঁদছে কোলে উঠতে না পেরে।

বিরক্ত কুঞ্চিত চোখ করে আমিনুর বলে, 'বললাম সরিয়ে নিতে ওকে! আমার সহ্য হয় না বললাম—!'

রাবেয়া এখনো কাপড় ছাড়েনি। মেয়েকে কোলে করলো না। মেয়েকে একপাশে সরিয়ে দিল খানিকদূরে। রাবেয়া সাহস নিয়ে আবার শুধায়, 'খেতে বলছি একটু বার্লি, খাবে!'

রুবি কাঁদছে তবু। আমিনুর হঠাৎ চিৎকার করে বলে, 'ওকে থামাও, নয়তো বাইরে ফেলে দাও!'

'আচ্ছা নিচ্ছি···আনবো বার্লি। এঁ্যা, আনি—'

আমিনুর কঁকাতে থাকে। থেকে থেকে চাপা কষ্টকর কাশি। কাশিব আওয়াজ শুনলে রাবেয়ার দম আটকে আসতে চায়।

মেয়েটা তবু আসে না। হামা দিয়ে আম্মার কাছে ফিরে আসে। আমিনুর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে মেয়েটার পিঠে সশব্দে কিল মেরে বসলো। রুবির কান্না আকাশ ছাপিয়ে ওঠে।

রাবেয়া কোলে তুলে নেয় অগত্যা রুবিকে। ভালো শাড়ীটা নষ্ট হলো বলে বিরক্তিতে নাক কুঁচকে ওঠে রাবেয়ার।

আমিনুর মরিয়া হয়ে জোর চিৎকারে বলে, 'সরাও ওকে, নয়তো বাইরে ফেলে দাও!'

রাবেয়া বিপদগ্রস্তের মতো তাকাতে থাকে, 'অমন করছ কেন?'

আমিনুর ঝাঁজ নিয়ে বলে, 'আমার অসুখ। কারো যদি একটুখানি কাণ্ডজ্ঞান থাকে। ওদের কাউকে আমার কাছে আসতে দিও না বললাম—!'

রাবেয়া মেয়েকে শান্ত করাতে থাকে। বাবলুটা রান্নাঘরে মোসলেমের পিছু নিয়েছে এবার। ওর ভাত খাবার সময় হয়ে গেছে। শেষে হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে না খেয়ে। রাবেয়া ডাকলো মোসলেমকে, 'রুবিকে একটু ধর তো। কাপড়টা ছাড়ি আমি। ভাত হয়েছে? না—! আচ্ছা, বার্লিটুকু তুই গরম করে এনে দে—'

ক্লান্তি আর উদ্বেগে ছাওয়া রাবেয়ার মুখটা।

টেবিল-ল্যাম্প্‌টা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল পাশের ছোট্ট কামরাটাতে। আলনায় কাপড় ভাঁজ করে রাখতে গিয়ে অনেক দুর্ভাবনায় তোলপাড় হয়ে যায় ওর মনটা। কি শক্ত অসুখে পড়লো কে জানে। একে টাকার টানাটানি। তার ওপর মাসের শেষ। ডাক্তার ডাকাতে হবে। কে জানে কতদূর গড়াবে ব্যারামের ধকলটা।

ওর ভাবনা চিন্তা গুলো এলোমেলো হয়ে যায়। বোবা ভয়ার্ত এক দৃষ্টি ফেরায় আমিনুরের কামরাটার দিকে।

আঁচলটা কাধে ফেলে রাবেয়া আমিনুরের পাশটিতে এসে বসলো।

'শোনো, ডাক্তার ডাকি। এঁ্যা!'

ওর সংযত সুর অনেকটা মিনতির পর্যায়ে উঠে আসে। ডাক্তারের কথা বারবার উল্লেখ করলো। আমিনুর কিছু বলে না। থেকে থেকে জ্বরতপ্ত ক্লিষ্ট শ্বাস ফেলে।

'তুমি বলো, আমি ডেকে আনি।'

ঘন দ্রুত শ্বাস ফেলে আমিনুর। মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, না, ডাক্তার ডাকাতে হবে না।

'না! না কেন—! টাকার জন্যে ভাবছো!' রাবেয়া মাথা নোয়ায় আরো কাছে।

'টাকার জন্যে ভেবো না। টাকা আমার আছে।'

আমিনুর নিঃশব্দে মাথা নাড়ে। সুদীর্ঘ না ছাড়া আর কোনো প্রত্যুত্তর নেই ওর কাছ থেকে।

অধৈর্য হয়ে ওঠে রাবেয়া। কী উপায় ঠাওরাবে সে এখন। আমিনুরের অসম্মতি ঠেলে একটা কিছু করার মতো পরিস্থিতি নেই আজকাল, একটুখানি ফাঁকও কোনোখানে পায় না রাবেয়া আমিনুরের অনিচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছেটাকে চালিয়ে নেবার।

মোসলেম বার্লিটুকু গরম করে নিয়ে এলো।

'একটু বার্লি খাও, ওঠো!'

আমিনুরের মাথায় হাত রাখে রাবেয়া, ওকে জোর করে ওঠাতে মোটেই সাহস পায় না। বলে, 'ওঠো, একটু খাও!'

'না।'

তীব্র বিতৃষ্ণায় মাথা ঝাঁকায় আমিনুর। ও খাবে না।

'একটু শুধু! যে টুকুন্ ইচ্ছে করে খাবে।'

আমিনুরের মুখের কোল ঘেঁষে আসে বার্লির বাটিটা! সজোরে ঠেলে সরিয়ে দিল আমিনুর সেটাকে। আচমকা ছিটকে পড়ে গেল বাটিসুদ্ধ বার্লি একাকার হয়ে মেঝেয়।

রাবেয়া স্তব্ধ বিমূঢ় তাকিয়ে থাকলো গড়ানো বালিশটুকুর পানে। ঝড়-ক্ষুব্ধ আবেগে ফেটে পড়লো, 'তবে যাও, আমি আর কিছু বলবো না। তোমার যা ইচ্ছে, করো—'

চোখ দিয়ে পানি গড়াতে দেবে না রাবেয়া কিছুতে, তবু চোখদুটো ছেয়ে পানি গড়িয়ে নামলো। শক্ত কঠিন হয়ে উঠবে সেও। তীব্র কঠিন দৃষ্টি মেলে আমিনুরের পানে তাকায়। হঠাৎ কিছুরি ভ্রূক্ষেপ না করার মতো গাটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জানালার কাছে সরে এলো।

এতো নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে আমিনুর আজকাল।

উদভ্রান্ত আবিষ্টতার মধ্যে রাবেয়া ফুঁসে ওঠে এক একবার। দুর্ভাবনায় থেকে থেকে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

বদ্, নিষ্ঠুর!

অথচ আমিনুর এ রকমটি ছিল না কোনোদিন। কী উদগ্র আশা নিয়েই না রাবেয়া ঘর বাঁধতে চেয়েছিল এককালে। সব কিছু খতিয়ে দেখার মতো রাবেয়া আগেকার সবকিছু মনে করতে থাকে।

ওদের বিয়ে হওয়া অনেকে পছন্দ করেনি। আত্মীয়-স্বজনের তরফ থেকে বাধা।

লোকে বলতো, ভালবাসা-বাসির বিয়ে কোনকালে স্থায়ী হয় না, হতে পারে না। দু'দিনের মৌতাত। তারপরই চোরাবালির ধস্ নামবে।

আমিনুরের একটি বিদেশী ফারমে নতুন চাকরি। নতুন জায়গায় চলে এলো ওরা। ঘর বাঁধার নতুন উৎসাহ দু'জনের চোখে। নতুন উদ্দীপনা।

স্বামীর উৎসাহ, অনুরোধে রাবেয়া মেয়েদের স্কুলে মিস্ট্রেসের চাকরি নিল।

ওরা দু'জন আর বাবলু। আর অল্পদিনের রুবি। এই নিয়ে ছোট্ট সংসার ওদের। ঝামেলা নেই কোনো।

রঙীন স্বপ্ন নয়। বাস্তব ছোঁয়া হাসি-খুশি আর পরিতৃপ্তির মধ্যে ওদের দিন গুলো ছন্দে কেটে যাচ্ছিলো।

ছন্দ কেটে গেল মাঝপথে। সুর কেটে গেল জীবনটায়।

রাবেয়া যেন অস্পষ্ট অনুভব করতে পারে কবে থেকে।

আমিনুরের চাকরিটা চলে গেল হঠাৎ। চাকরি না থাকার গ্লানি থেকেই হোক্ আর অন্য কোনো কারণেই হোক, আমিনুর একদিনের তরেও খুলে বলেনি

কিছু। বিমর্ষ ভারাক্রান্ত, উস্‌কো-খুস্‌কো চেহারা। গুম্‌ হয়ে বসে থাকে আমিনুর। রাবেয়াকে বলে না কিছু।

'অফিস নেই?'

'না, নেই—' এমনি ছোট্ট ম্লান জবাব ফুটতো আমিনুরের। রাবেয়া অত ভাবতে পারতো না। নিজের মাষ্টারির ধান্দায়, আর হাসি-খুশির উছলতায় ওর দিন কেটে যায়।

মাস পেরোয়। মাসের শেষে টাকায় টান পড়ে। আমিনুর চাকরি খোয়াবার কথা তবু জানালো না।

আবো মাস যায়। আমিনুর অফিসে যাবার মতো করে ঘড়ির কাঁটা দেখে বেরিয়ে যায়। কোনোদিন আবার তারো আগে বেরিয়ে যায় না খেয়ে। জিজ্ঞেস করলে বলে, অফিসে অত্যন্ত কাজের চাপ, তাই সকাল সকাল গিয়ে সারতে হচ্ছে কাজ। দুপুরের খাওয়া বন্ধুর ওখানে সমাধা করবে। রাত্রিবেলায় ফিরে আসাব মধ্যেও কোনো নিয়ম-ছন্দ নেই। হয়তো অনেক রাত করেই ফিরে এলো। গভীর ক্লান্তিতে ছাওয়া কোটবাগত চোখ। চোখের নীল ধূসরতার মধ্যে জ্বলজ্বলে রুক্ষতার আভাস।

রাবেয়ার অনুযোগ, অভিমানটুকু আমিনুরের গাম্ভীর্যের ঊষরতার মধ্যে বীজ বুনতে পারে না। স্নিগ্ধ শ্যামলতার কোনো ছায়া বিস্তার করতে পারে না। সব যেন হারিয়ে যায়, শুকিয়ে যায়।

ওদের স্কুলের এক সহ-কর্মীনীর কাছ থেকে রাবেয়া শেষে সবটুকু ব্যাপার জানতে পারল। টিফিন ছুটির দিকে সহকর্মীনীটি ওর গলা জড়িয়ে ধরে শুধিয়েছিল, 'কিরে মুখটা অত ভার হয়ে আছে কেন বলতো?

'কৈ নাতো।'

'চুপচাপ কোণায় বসে আছিস্‌ যে বড়ো?'

তারপর সহানুভূতির দৃষ্টি হেনে সহকর্মীনী জিজ্ঞেস করেছিল, 'চাকরি জুটলো আমিন-সাহেবের?'

'তার মানে?' বিস্মিত প্রশ্ন করে রাবেয়া।

'বা রে, তোর স্বামীর চাকরি নেই, ভাইয়া আফসোস করছিল সেদিন। আরো কয়েকজনের নাকি চাকরি গেছে এক সঙ্গে ওই অফিস থেকে। এ নিয়ে নাকি কত ষ্ট্রাইক-ফ্রাইক্‌ হয়ে গেল। তুই জানিস না! আমরা তো তাই শুনে আসছি!'

'না তো, আমি জানিনা।'

চমকে ওঠা ব্যাথাতুর জবাবটুকু ফুটে বেরিয়েছিল রাবেয়ার মুখ দিয়ে।

ওর জবাব শুনে সহকর্মীনীদের মধ্যে বিস্ময়ের চমক ফুটেছিল শুধু নয়, অনেক আলাপ প্রলাপের চাপা স্রোত বয়ে গিয়েছিল সেদিন। রাবেয়ার দাম্পত্য-জীবনের গূঢ় রহস্যের হদিস খুঁজে খুঁজে ওদের চাপা বাক্যালাপ খেই হারিয়ে ফেলে ক্রমে। রাবেয়া ওদের অনেক কথার ভিড় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল স্কুলের সীমানার নির্জন একান্তে।

নিষ্প্রাণ ফ্যাকাশে দৃষ্টি ছেয়ে চোখের ধারা গড়িয়ে নেমেছিল ওর। কারো সঙ্গে কথা বললো না। ক্লাস নিতে এসে চুপচাপ কাটিয়ে দিল।

স্কুল থেকে ফিরে এসে রাবেয়া আমিনুরকে চেপে ধরল।

'চাকরি চলে গেছে, কেন আমার কাছ থেকে লুকিয়েছ? কেন গোপন করলে সবকিছু!'

রাবেয়ার বাষ্পাচ্ছাদিত টস্‌টসে্ চোখ দুটোর তীক্ষ্ণতার সামনে আমিনুর প্রথমে একবারটি চমকে উঠ্‌লো। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। ক্রমে যেন অসহায়তার নিস্তব্ধ গভীর অতলে নিজেকে হারিয়ে বসে থাকলো কিছুক্ষণ।

রাবেয়া ওকে নিশ্চুপতায় ঝিমিয়ে যেতে দেয়নি। একান্ত কাছ ঘেঁষে আবেগ-ক্ষুব্ধ দৃষ্টিকে আমিনুরের মুখের ওপরে জাঁকিয়ে রাখে। ক্ষুব্ধ অভিমানে বলে, 'কি অপরাধ করেছিলাম বলো!' কারো কাছে আমি মুখ দেখাতে পারিনে। বলো কেন গোপন কবেছিলে—!'

আমিনুর সাড়া দেয় না। আপন গ্লানিটুকু স্বীকার করে যেতে কোথায় যেন বাধে ওর!

আত্মাভিমানে কোথায় যেন ঘা পড়তে থাকে। খানিক যেন ঔদ্ধত্যের ব্যঞ্জনা নিয়ে আমিনুর বলে একবার,'বলিনি বেশ তো, এখন যখন জানলে ফুরিয়ে গেল, ব্যস্!'

'না, এতে ফুরিয়ে যায় না!'

রাবেয়ার ক্ষুব্ধ আবেগটুকু আমিনুরের নির্মম ঔদ্ধত্যের চড়ায় এসে যেন ব্যাহত হয়ে যায়।

আমিনুরের হাতটা সে ধরে থাকে। বলে আবার, 'তুমি আমার কাছে এতো মিথ্যে বলেছ। আর—'

'আর!' চাপা বিদ্রূপে মেশা আমিনুরের প্রশ্ন।

'আর, সেদিন ওই লোকটার সঙ্গে তোমার তর্কতর্কির ব্যাপারটা। আমি যেন বুঝতে পারি না কিছু। লোকের কাছ থেকে টাকা ধার করেছ। আমাকে না জানিয়ে টাকা ধার করতে কেন গেলে তুমি?'

হাতটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছাড়িয়ে নেয় আমিনুর। বলেছিল সুর চড়িয়ে, 'টাকা আমি নিজ দায়িত্বে ধার করেছিলাম। নিজে শোধ করবো! তোমার অত মাথা ব্যথা কেন?'

'বেশ তো, টাকা শোধ করো গে।' রাবেয়াও তেমনি শক্তভাবে বলে গেল।

আমিনুর উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলেছিল, 'হ্যাঁ, শোধ করা না করা সে আমার ব্যাপার, তোমার নয়।'

এরপর থেকেই ওদের দাম্পত্য জীবনের ওপরে বিষাদের কালো ছায়া নেমে এসেছিল। দিনে দিনে দাম্পত্য জটিল মনের বিক্ষেপ আরো জটিল হয়ে ওঠে।

আমিনুর চাকরি খোঁজে। চাকরি, পায় না। চাকরির জন্যে রোখ চেপে যায় আরো। তবু না।

রাবেয়ার ওই স্বল্প আয়টুকুর ওপব সংসারের সমস্ত খরচের ভারসাম্য বজায় রাখা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবু সে যতটা সম্ভব আমিনুরকে না খাটাবার চেষ্টা করে এসেছে। ওর আত্মমর্যাদায় ঘা লাগতে পারে এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব যাতে না হয়, তারি চেষ্টা করে এসেছে।

আগেকার দিনগুলো থেকে এখনকার দিনগুলো যেন কতো ভিন্ন, কত পৃথক। চাকরি জীবনের একঘেয়েমি থেকে ফিরে এসে, রাবেয়া ঘরের আব-হাওয়াটুকু আপন রঙ এ-রসে, মাতিয়ে তুলতে পারতো। ঘর-সংসারটুকু আরো সুষ্ঠু এবং সুন্দর করে তোলার জন্যে দু'জনের উদ্দীপনার যেন সীমা থাকতো না। রাবেয়ার বাইরে বেড়ানোর বাতিক শুধু একা নিজেকে নিয়েই ওর মিটতো না। স্বামীকে পাশে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে সে যেন নতুন কিছুর আস্বাদ পেতো, বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে সে যেন এক নতুন মর্যাদার আসন দখল করে বসতো। কিন্তু আজকাল যেন ওদের মাঝখানে একটি সূক্ষ্ম গণ্ডি আঁকা হয়ে গেছে।

আমিনুর আজকাল দিনের বেলায় কোথায় কোথায় যেন ঘুরে বেড়াবে। আর রাত করে ফিরবে ঘরে। আবার রাত জেগে আমিনুর কী সব বই পড়বে। আমিনুরের এতো বই পড়ার মধ্যে রাবেয়া কোনো অর্থ খুঁজে পায় না। আবার

এমনও হয়েছে ওকে পাশ কাটিয়ে আমিনুর অনেক বন্ধুর ভিড়ে আত্ম-সমাহিত রেখেছে নিজেকে।

রাবেয়া যেন উপলব্ধি করতে পারে, সব কিছুই যেন ওর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রাচীর দাঁড় করানোর চেষ্টা আমিনুরের। চাপা বেদনায় রাবেয়া গুমরে মরতো। সময়ে সময়ে আমিনুরের বন্ধুদের ওপর একটা আক্রোশের ভাব চাড়া দিয়ে উঠতো ওর মনে। যেন ওরা সব কজনে মিলে ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পরামর্শ চালাচ্ছে। যেন ওদের কুমন্ত্রণায় আমিনুর ওর কাছ থেকে অনেকদূরে সরে যাচ্ছে। আমিনুরের চাকরি যাবার পেছনে ওদেরি-বা কারসাজি নেই, তাও বা কে বলতে পারে। আমিনুর ঘুরে বেড়াবে ওর বন্ধু হামিদ সাহেবের সঙ্গে। ওই বন্ধুটাই যেন আমিনুরের সব চেয়ে আপন। লম্বা মতো লোকটার পাতলা গোঁফ-ওঠা মুখের সলজ্জ নির্দোষ ভাব রাবেয়ার কাছে মনে হতো ভিজে বোড়লের নির্দোষিতার মতো। তীব্র কোপ-কটাক্ষে লোকটাকে সে নিঃশব্দে জানিয়ে দিয়েছে অনেকবারই, ওর যাওয়া-আসা রাবেয়ার পছন্দ নয়। আবার অনেক সময় দিশেহারা বিহ্বলতায় ভেবেছে, ওই লোকটার মধ্যে খারাপ কিছু তো নেই।

রাবেয়া অনেকদিন ভেবে শুধু একটা জিনিস টের পায়, ওর অস্তিত্বকে আমল না দিয়েই যেন আমিনুর দিন কাটিয়ে যাবে।

ক্ষোভে দুঃখে, দুঃসহ মনোবেদনায় রাবেয়ার দিন কাটতে চায় না।

আমিনুর কিছুই জানাবে না ওকে। জানতে দেবে না।

ওর শরীর খারাপ যাচ্ছে কতদিন থেকে, ওকে তাও জানতে দিলো না।

আজ বিকেলে স্কুলের খাটুনী থেকে ফিরে এসে আমিনুরকে শুয়ে থাকতে দেখে রাবেয়া একবার জিজ্ঞেস করেছিল শরীর খারাপ লাগছে কি না। আমিনুর জবাব দিয়েছিলো, এমনিতে শুয়ে আছে। মোসলেমের কাছ থেকে জানলো, সারাদিন কিছুই খায়নি। ভাতটুকু পড়ে আছে। আমিনুর অল্প-সল্প কাশছিলো, গায়ে একটু যেন উত্তাপের লক্ষণ। হয়তো তেমন কিছু নয় ভেবে, দুধ বার্লির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো রাবেয়া।

আবার বান্ধবীর কড়া অনুরোধটুকু ঠেলে ফেলা অসম্ভব জেনে বাইরে চলে গিয়েছিলো। ফিরে এসে দেখে এই বিপর্যস্ত কাণ্ড।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বিহ্বল ভাবনার মধ্যে অস্থির হয়ে ওঠে রাবেয়া। ভাবনার রেশটুকু হঠাৎ ছিঁড়ে যায়।

আমিনুর ছট্‌ফট করছে। কাশির দমক যেন থেকে থেকে বাড়ছে।

খোলা জানলা দিয়ে দমকা হাওয়া সবেগে প্রবেশ করছে ঘরে। আকাশ খানিক যেন মেঘলা।

রাবেয়া জানলাটা বন্ধ করে দিলো।

আমিনুরের কাছ ঘেঁষে বসলো তারপর। ধীরে, অতি সতর্ক কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলো। আমিনুরের কপালে হাত দিয়ে দেখে একবার জ্বর বেড়েছে।

রাত অনেকক্ষণ হয়েছে হয়তো। রুবি না খেয়ে খালি মেঝেয় ঘুমিয়ে গেছে।

'মোসলেম।' রাবেয়া একবারটি ডাকলো।

মোসলেম বাবুর্চি-খানায়, বাবলুও ওরি সঙ্গে।

'শুনছো!' রাবেয়া আমিনুরের গাটাকে নাড়া দেয়। আমিনুর নিঃশব্দ, চুপচাপ। রাবেয়া বলে গেলো, 'আমার মন কিছুতেই মানছে না, একবার ডাক্তার ডাকি!'

রক্তিম উদ্‌ভ্রান্ত চোখ করে আমিনুর তাকায়। দ্রুত শ্বাস পড়ে জ্বরের আধিক্যে।

'তুমি বলো একবার!' রাবেয়া শুধায় আবার।

'না'

'না, কেন?'

'ডাক্তার ডেকে কিছু কাজ হবে না।' ঝিমিয়ে যায় যেন আমিনুর বলতে গিয়ে।

'তবে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে আমিনুর বলে, 'এখানে কিছুই হবে না। রোগটা শক্ত বলেই বল্‌ছি।'

'তার মানে!' আঁৎকে ওঠে রাবেয়া।

'মানে আর কিছু নয়, এই সাধারণ চিকিৎসায় হবে না।' দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠা নামার সঙ্গে বলতে গিয়ে মর্মান্তিক একটা কিসের ইঙ্গিত দিয়ে গেল যেন আমিনুর। নির্মম বাস্তবটুকু উচ্চারণ করে যাবার মতো আমিনুর থেমে থেমে বলে গেল।

সে এখানে কিছুতে থাকবে না। হস্‌পিট্যালে ভর্তি হবে। দুর্ভোগে ভুগতে যদি হয় তবে সে একাই ভোগ করবে। আর কাউকে সে ওরি সঙ্গে ভুগতে দেবে না, জড়াতে দেবে না।

'তবে ডাক্তার ?' রাবেয়ার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসবে।

'বলছি তো, দরকার নেই ডাকার !' উস্কোখুস্কো চুলের অস্থির ঝাঁকুনিতে আমিনুর বলে।

রাবেয়া সরে এলো। 'টেবিলের ওপর থেকে একটুকরো কাগজ খুঁজে নিলো। দ্রুত অস্থিরতায় কলম চালালো তার ওপর। ওটাকে ভাঁজ করে হাতের মুঠোয় নিয়ে বাবুর্চিখানার সামনে এসে মোসলেমকে ডাকলো।

'তুই হামিদ সাহেবের বাসাটা চিনিস্ ?'

মোসলেম কয়েকবার ওখানে গেছে আমিনুরের বই, চিঠি বা কিছু নিযে। জানালো সে, হ্যাঁ, চেনে।

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবে যেন রাবেয়ার, হাতের ছোট্ট চিঠিটা বাড়িযে দিয়ে বলে, 'যতো তাড়াতাড়ি পারিস্ ডেকে নিয়ে আসবি হামিদ্ সাহেবকে। দেরি করবিনে কিন্তু !'

রাত কতো হয়েছে কে জানে।

বাইরে জোর হাওয়া দিচ্ছে। গত কয়েকদিনের ঝিব্ঝিরে বৃষ্টি। আজকের আকাশটাও কালো-গুমোট।

বাবলু আর রুবিকে বিছানায় শুইযে দিলো রাবেয়া। রুবিটাকে কিছু খাওয়ানো গেলো না আজ।

বারেবারে অধৈর্য হয়ে ওঠে রাবেয়া, আমিনুবেব বন্ধুটি কখন এসে পৌছায়। বাবুর্চিখানায় একবার ঘুরে আসে। নিবু নিবু উনানটাতে এক কেটলী পানি চড়িয়ে দিয়ে ফিরে আসে।

আমিনুরের বন্ধুটি এলো। লম্বা চেহারা। পাতলা গোঁফের নিচে অলজ্জ মৃদু হাসি।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন রাবেয়া।

'আসুন !'

অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে কথা যেন আটকে যায় রাবেয়ার। চেয়ারটা টেনে বসতে ইঙ্গিত করল দৃষ্টির ইশারায়। দৃষ্টি অনেক কথার ভারে মুখর, ছল ছল। যে লোকটিকে আগে কোনোদিন পছন্দ করেনি, হয়তো আজ তাকেই ওর সবকিছু খুলে বলতে হবে। রাবেয়ার হঠাৎ নজরে পড়লো, ঘরটা কী ভীষণ নোংরা, এলোমেলো হয়ে রয়েছে। মেঝেটা আঠালো পিচ্ছল হয়ে আছে সন্ধ্যেবেলার গড়িয়ে পড়া বার্লিতে।

বন্ধুটি আমিনুরের উত্তাপ অনুভব করে।

'জ্বর তো প্রচুর!'

রাবেয়ার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে প্রশ্ন করলেন একবার, 'কবে থেকে হয়েছে?'

মৌনতায় ছেয়ে রাখে রাবেয়া নিজেকে অনেকক্ষণ। তারপর ইশারায় আমিনুরের বন্ধুটিকে ডেকে নিয়ে গেলো বাইরের বারাণ্ডায়। বিপর্যস্ত সুরে রাবেয়া বলে, 'আমাকে জানতে দেয়নি কিছু। কোনোদিন কিছু জানাবে না আমাকে!'

রাবেয়া শুনিয়ে গেলো আজকের ঘটনা।

বিগত অনেক ইতিবৃত্ত বলার স্রোতে এসে মিশ খায়। অনেকক্ষণ অনর্গল বলে গেলো সে।

ক্ষুব্ধ উচ্ছ্বাস ওঠে নামে ওর। ঠোঁট দুটো ফুলে ফুলে ওঠে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে ওঠে চাপা অশ্রুর বন্যায়।

বন্ধুটি ধীর গলায়, চিন্তার ছাপ নিয়ে শুনিয়ে গেলো অনেককিছু।

আমিনুরের চাকরি নেই। বেকার, হতচ্ছাড়া—এই গ্লানিতেই ওকে খেয়েছে। রাবেয়া হয়তো জানে না, চাকরির আশায় কী অশ্রান্ত ঘোরাঘুরি করেছে আমিনুর বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন অফিসে। পরিবারের সচ্ছলতা না বাড়িয়ে নিজেই সমগ্র পরিবারের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দুর্বিসহ গ্লানি ওর মনটাকে কুরে কুরে খেয়েছে। স্বামীত্বের আত্মমর্যাদায় বাধে বলে হয়তো রাবেয়াকে খুলে বলেনি সবকিছু। তাছাড়া, বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে, ফিরিয়ে দিতে না পারার গ্লানি। দু'একটা টুইসানিও করেছে। রাবেয়াকে হয়তো তাও বলেনি। জীবনের ব্যর্থতার গ্লানি থেকেই আমিনুর রাবেয়াকে হয়তো বা এড়িয়ে চলতে চাইতো।

রাবেয়া ক্ষুব্ধ উচ্ছ্বাসে বলে, 'ও অমানুষ হয়ে গেছে, নিজের ছেলে-মেয়ে-দুটোকে পর্যন্ত ওর সহ্য হয় না। আর আমার কথা বাদ দিলাম।'

বন্ধুটি বলে, 'আমিনুর শুধু একা নিজের ওপর গ্লানি চড়িয়ে গুমরে মরছে। ও যদি একটু তলিয়ে দেখতো, তবে বুঝতো। দেশ জুড়ে এমনি বেকারিত্বের ভয়াবহতা আজকে। ওর মতো অনেকেরি ভাগ্য এমনি। তবে এর জন্যে আমিনুর দায়ী নয়, ওরা দায়ী নয়। দায়ী আর কেউ—।'

ঢোক গিলে রাবেয়া বলে, 'কি জানি। আর দেখুন—'

রাবেয়া নিজেকে অনেকটা শক্ত করে নিয়েই বলে, 'ও ধরে নিয়েছে, টি. বি. জাতীয় এমন শক্ত কোনো রোগ ওর হয়েছে। আমাকে ডাক্তার দেখাতে দিচ্ছে না। আর বলে—'

'ওকি, কাঁদছেন কেন। আন্দাজে তো কিছু বলা যায় না—'

রাবেয়া উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগে বলে, 'আমি সইতে পারিনে আর! কে জানে এর শেষ কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে—'

ওরা ঘরের মধ্যে ফিরে এলো।

আমিনুরের বন্ধুটিব সান্ত্বনা প্রবোধ রাবেয়ার জীবনে যেন একমাত্র পালের হাওয়া।

রাত অনেকটা গড়িয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ডাক্তার নিয়ে এলেন হামিদ সাহেব।

ডাক্তার পরীক্ষা করে যান।

'কাশিটা।'

রাবেয়া এক নিঃশ্বাসে বলে গেলো, 'গাদা গাদা বিড়ি টানে। আগে সিগারেট টানতো। আমি কতোদিন না করেছি।'

ডাক্তাব পরীক্ষা চালিয়ে যান। থেকে থেকে বাবেয়ার বক্তব্যে কান দেন।

'খাওয়া দাওয়া করে কেমন?'

'খাওয়া দাওয়ার কোন ঠিক নেই। চা গিলতে পাবলে যেন সব চেয়ে খুশী—'

ডাক্তাব বলেন, 'না—গোস্ত, আণ্ডা, দুধ এ সব!'

রাবেয়া ম্রিয়মান বলে শুধু, 'খায় তো!'

পরীক্ষা চলে, বুকে পিটে সশব্দ আঘাতে।

রাবেয়া তাকায় অধৈর্যে। আর ক্ষণে ক্ষণে বকে যেতে থাকে, 'বুঝলেন ডাক্তার সাহেব, আমার কোনো কথার যেন দাম নেই। কিছু শুনবে না! আমি কোনদিক সামলাবো বলুন তো।'

পরীক্ষা চলে। জবাব দেয় ডাক্তার।

চাপা অধৈর্যে রাবেয়া শুধায়, 'গুরুতর অসুখ কিছু নয়তো।'

ডাক্তার পর্যবেক্ষণের অতল গভীরতার মধ্যে মাথা নাড়েন। রাবেয়া বুঝে উঠ্‌তে পারে না কিছু। বললেন শেষে ডাক্তার, না, গুরুতর কিছু নয়। সাধারণ নিউমোনিয়ার লক্ষণ। কয়েকদিনের মধ্যে সেরে যাবে।

বাইরে প্রশান্ত হাওয়াটুকু এসে রাবেয়ার বুকটাকে যেন স্বস্তিতে ভরিয়ে তুললো।

বেশ কিছুদিন লাগলো ভালো হয়ে উঠতে।

ঘরের চেহারার পরিবর্তন এসে গেছে অনেক। তক্তপোষটা আগেকার জায়গায় আর নেই। জানলার কাছাকাছি আলো-হাওয়ার অবাধ সঞ্চরণের জায়গাটুকুতে সরিয়ে নেয়া হয়েছে ওটাকে। টেবিলটাও সরিয়ে নেয়া হয়েছে আর একপাশে, পারিপাট্য ও রুচির সাম্য বজায় রেখে। ফুল-দানিটায় কিছু ফুল সাজানো।

জানলা দিয়ে সকাল বেলাকার রোদ দূরের ডাল পালার ছায়া বুকে নিয়ে ঘরের মেঝেয় লুটোপুটি খায়।

খোলা জানলাটার কাছাকাছি দেওয়ালের পিঠে বালিশে হেলান দিয়ে আমিনুর বিছানায় পা ছড়িয়ে দিয়েছে। রুবিকে কোলের ওপর বসিয়ে নাড়াচাড়া করছে। আধো মিষ্টি কথার খৈ ফুট্‌ছে রুবির মুখ দিয়ে।

বাবলু মেঝেয় বসে রঙচঙে ছবি-ওয়ালা প্রথম পাঠের পৃষ্ঠা ওলটাচ্ছে এলোমেলোভাবে। থেকে থেকে মাথা দুলিয়ে বই-এর থেকে শেখানো ছড়া কাটছে আপন খেয়ালে। রাবেয়া একগ্লাস হর্‌লিক্‌স নিয়ে এগিয়ে এলো আমিনুরের পাশটিতে।

'নাও ওঠো।'

আমিনুর বলে, 'মেয়েটার কেমন বুদ্ধি দেখো। আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলো, আব্বা বিস্‌কিট খাবে। ওকে জিজ্ঞেস করলে বলে—না, ও খাবে না!'

রাবেয়া বলে, 'পাছে আমি বকি, তাই—'

'কোথায় রেখেছো, দাও ওকে একটা।'

'এক্ষুনি দিয়েছি। আর আছে মাত্র কটা।'

রাবেয়ার হাত থেকে গ্লাসটা বাড়িয়ে নিতে গিয়ে আমিনুরের চোখ এড়ায় না।

'হাতের চুড়ি কটা কি করলে?

রাবেয়া খালি হাত দুটো আলতোভাবে জড়িয়ে নেয়, আর বলে, 'খুলে রেখেছি।'

আমিনুর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় রাবেয়ার পানে। শান্ত গলায় বলে, 'বড্ডো খারাপ দেখায় ও কটা না থাকলে।'

'তা দেখাক্—'

সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় রাবেয়া।

আমিনুর জানে চুড়িগুলো কোথায় তলিয়ে গেছে। উদাস অন্যমনস্কতার মধ্যে আমিনুর গ্লাসে চুমুক দেয়।

নিঃশেষিত গ্লাসটা মেঝেয় নামিয়ে রাখলো।

রাবেয়া মেঝেটা পরিষ্কার করতে থাকে। গ্লাস সরিয়ে রাখে।

অন্যমনস্কতার মধ্যে আমিনুর শুধায়, 'আজ স্কুলে পড়াতে যাচ্ছো তা হলে ?'

রাবেয়া আঁচ করতে পারে আমিনুর একটা কিছু বলবে বলে মনটাকে তৈরী করে নিচ্ছে। আমিনুর জিজ্ঞাসাটুকুর জবাব দেয়,'কী জানি, দেখা যাক্—'

'না, যেয়ো আজ থেকে। আর—'

'আর-কি !'

'আর আমারও খারাপ লাগছে এমনিভাবে পড়ে থাকতে। ভাবছি বেরোবো আজ থেকে।'

'আর কটা দিন যাক্।' রাবেয়া বলে।

আমিনুর কিছু বললো না।

আর কটা দিন বাদ দিয়েই আমিনুর বাইরে বেরোলো !

সেদিন রাবেয়া স্কুল থেকে ফিরে আসতেই, আমিনুর ওকে আদরে সোহাগে বিপর্যস্ত করে তুললো। অবাক করে দিল ওকে' যা সে অনেকদিনই আমিনুরের কাছ থেকে পায়নি।

এতো খুশীর ব্যাপার কী থাকতে পারে। রাবেয়া বুঝে উঠ্তে পারে না। এতো সোহাগ আর আদরের ভার কী ভাবে সে বুক পেতে নেবে।

'বলো না, কি ব্যাপার ?

'একটু বসোই না কাছে, বলছি একটু পরে।'

'না, বলো !'

আমিনুর উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগে বলে গেলো, ওদের অফিসে ষ্ট্রাইক সুরু হয়ে গেছে। ওরা দাবি তুলেছে, যাদের ছাঁটাই করা হয়েছিলো তাদের আবার কাজে বাহাল করতে হবে।

এর মধ্যে আশান্বিত হবার কারণ কিছুই খুঁজে পায় না রাবেয়া। কিন্তু আজকের দিনে আমিনুরের আদর সোহাগটুকু ওর কাছে সব চেয়ে বড়ো কিছু পাওয়ার মতোই। আমিনুরের বুকের কাছে মুখ গুঁজে সন্ধ্যার আবহাওয়ায় অনেকক্ষণ নিঝুম হয়ে থাকে রাবেয়া।

পুঁইশাক

আতোয়ার রহমান

ইস্কুল নিয়ে এতো কাণ্ড। অথচ সবাই নির্বিকার।

বাঘবন্দী খেলাটা জমে উঠেছে টুনু আর সানির মধ্যে। চারপাশে গোল হয়ে বসেছে আর-আর ছেলেমেয়েরা। সানি হারছিলো বাঘ নিয়ে। ঘুখো খাচ্ছে এখন, ছোঃ, ও খাবার একটা বাঘ নাকি? মরা কেঁদো। ছাগলের গুঁতোতেই ত্রিভুবন পার।

এরই মধ্যে একবার পেছনের দিকে চেয়ে নিয়ে হঠাৎ রাণু বলে উঠলো, ত্রিভুবন পার করাচ্ছে, দাঁড়াও! ছাগল-খেকো শাক আস্‌ছে!

চক্ষের নিমেষে ভেল্‌কি খেলে গেল। বাঘ-ছাগল এক সাথে ছিট্‌কে পড়লো বাইরে। টুনু-সানি খক্ খক্ করে থুতু ফেলে মুছে ফেললো ছকটা। দলের সবচেয়ে হ্যাংলা ছেলে রাশু ছেঁড়া 'বর্ণ পরিচয়', প্রথম ভাগ খুলে সুর ধরে দিলো, হ্রস্ব-ই ট ই-ট, হ্রস্ব-উ ট উ-ট।

ফ্রকের কোণটা মুখের ভেতর গুঁজে দিয়ে মিট্‌মিটিয়ে রাণু বললো, দিল বলে? পুঁইশাক আজ চিবিয়ে খাক তোদেরই।

সব কটি চোখ একবার ওঠা-নামা করলো। না, পুঁচকে ছুঁড়িটাকে আর জব্দ করবার সময় নেই। পুঁইশাক এখন আঙিনার মধ্যে।

পুঁইশাক অর্থাৎ জমীর পণ্ডিত এসে পড়লেন। মাঝারি গোছের আধমোটা, গৌরবর্ণ মানুষটি। মুখে একরাশ সাদা দাড়ি। বড়ো বড়ো চোখ দুটি শুকতারার মতো দপ্ দপ্ করে। সাধারণতঃ সবাই ডাকে 'পণ্ডিত সাহেব' বলে। চাষী ঘরের ছেলেমেয়েরা সংক্ষেপে বলে, 'পন সাব'। এর থেকে কবে যেন, ঠিক মনে পড়ে না এখন আর, কোন্ দুষ্টু ছেলে শ্লেটের

আড়ালে মুখ লুকিয়ে উপনামটা প্রথম উচ্চারণ করেছিলো, প'ন সা'ব না, পুঁইশাক।

জমীর পণ্ডিতকে দেখে পড়তে পড়তেই উঠে দাঁড়ালো সবাই। চোখ তুলে চাইলো একবার। ভাঁজ-ভাঙা পুরোনো কোট, ক্ষারে-কাচা সাদা লুঙ্গি। কাঁচা চামড়ার পানাইয়ের বদলে পায়ে আজ মোটর টায়ারের স্যাণ্ডল। চোখ আর নামতে চায় না কারো।

একবার এদিক-ওদিক চেয়ে নিয়ে ধমকে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, পিট্ পিট্ করে দেখছিস কি, উদ্‌বেড়ালের দল? দরজা খোল্। সেকেণ্ড পণ্ডিত আসেনি এখনো?

ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে রাশু সবিনয়ে বললো, চাবি, প'ন সা'ব।

চাবি দিতে গিয়ে একেবারে আঁতকে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, এ্যাঁ, করেছিস কি, গাধার দল? সাকুল্যে মোটে তেরোজনে? বলি, আমি কি শেয়াল-পণ্ডিত যে, ইন্‌স্‌পেক্টর-কুমীরকে তিরাশিজন দেখিয়ে দেব? বেরো, হতভাগারা। বেরো এখান থেকে।

বেরুলো না কেউ। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। শেয়াল-কুমীরের গল্পের প্রসঙ্গে হাসি আসছিলো ওদের। ধমক শুনে সেটাও চেপে যেতে হল।

পণ্ডিত 'হায় হায়' করেই চলেছেন, সব গেল, স-ব। নিজেও ম'লো, আমাকেও মারলো। ঘুণ লাগুক এমন ইস্কুলে।

রাশুই উঠে দাঁড়ালো সাহস করে, পা'ন সা'ব, যাই না, বাড়ী বাড়ী থেকে ধরে আনিগে। টুনুও যাক আমার সাথে।

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন পণ্ডিত। তারপর আবেগের সাথে জড়িয়ে ধরলেন রাশুকে। হাত বুলিয়ে আদরে আদরে ভরে দিলেন মাথাটা, আহা-হা, বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। আমার চুল-দাড়ির মতো পরমায়ু দিক তোকে আল্লা। বড়ো ভালো বুদ্ধি বার করেছিস। শীগ্‌গির যা। আঁটকুড়ের বেটা খাবার বেলা একটার মধ্যেই এসে পড়তে পারে। আর, দেখবি তো, সেকেণ্ড পণ্ডিতের কি হল?

রাশু-টুনু বেরিয়ে গেল এক দৌড়ে।

পণ্ডিত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাক দিলেন, রাণু, শীগ্‌গির বাক্‌স খোল্। নামের খাতা বার করিসনি এতক্ষণও?

রাণুর দোষ নেই। চাবি পায়নি। কিন্তু জমীর পণ্ডিতের আজ আর

তর সইছে না। না সইবারই কথা। চল্লিশ বছরের ইস্কুল। এর প্রতিটি দিনের স্মৃতিতে স্বাক্ষর রয়েছে জমীর পণ্ডিতের। মা যেমন শিশুকে মানুষ করে তোলে, তিনিও তেমনি তৈরী করে তুলেছেন এই ইস্কুলকে। একে কি ছাড়া যায়, না ভোলা যায়? অথচ ষড়যন্ত্র চলেছে তারই।

আইন হয়েছে নতুন, জমীর পণ্ডিত শুনতে পান,—সক্রোধে বিদ্রূপ করে বলেন, আইন নয়, পাগলা বাইন মাছ ছাড়া পেয়েছে, আচড়ে বেড়াচ্ছে,—ঘন ঘন পাঠশালা রাখা চলবে না, কোনো এলাকায়, যদি না ট্রেনিং পাওয়া শিক্ষক থাকে। সাহায্য করা দুঃসাধ্য, ব্যবস্থাও অনিয়ন্ত্রণীয়। সুতরাং দুটো-চারটে এবার উঠিয়ে দিতেই হবে।

বাজারে গুজব,—রটিয়েছে ওই নতুন পাড়ার ছোঁড়াগুলো, যারা হুজুগ করে একটা পাঠশালা খাড়া করেছে এই সেদিন, যতো রাজ্যের বোকাগুলোকে ধরে এনে বিনে পয়সার মাষ্টার বানিয়েছে,—হ্যাঁ, বাজারে গুজব, জমীর পণ্ডিতের ইস্কুল এবার উঠেই যাবে। কারণ, পণ্ডিতের মতো ইস্কুলও এখন জীর্ণ। চৈত্রের পদ্মায় পাড়ির নীচে হাওয়া লেগে ঝুর ঝুর করে বালি ঝরে পড়ে, গাঙশালিকগুলো বেগতিক দেখে গর্ত ছেড়ে উড়ে পালায়। ওই উপমাটাই লোকে ইস্কুলের উপর প্রয়োগ করে! দেয়ালের বালি ঝরছে তো ঝরছেই হাওয়ায়, হয়তো বা পণ্ডিতের বিশ্বাসেও। ছেলেমেয়েরা সরে পড়ছে একে একে। পণ্ডিত সাহেব,—গ্রামীণ সংক্ষিপ্ত রূপ 'প'ন সাব,'—এবার আপনিও সরে পড়ুন,—আড়াল-আবডাল থেকে দুষ্টুলোকের কথা শোনা যায়,—বাতের ব্যথাটা আর বাড়াবেন না এই বয়েসে ইস্কুলে বসে থেকে। এদেরই নাকি ষড়যন্ত্র,—ইন্‌স্‌পেক্টর পাঠিয়ে তদন্তের নামে একটা শাক-দিয়ে-মাছ-ঢাকা কাণ্ড করা। কিন্তু দেখে নেবেন জমীর পণ্ডিতও, কার পেটে কটা 'ক'। অমন অনেক ইন্‌স্‌পেক্টর তাঁর দেখা আছে। অনেক ঘুঘু দেখেছেন তিনি। আজকালকার এরা আবার জানেই বা কি!

চিন্তায় থম্‌থম্ করে পণ্ডিতের মুখখানা। রাণু-টুনুকে আদর করতে দেখে ছেলেমেয়েরা সাহস পেয়েছিলো একটু। আবার ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে। পড়াশোনায় অবধি ভুল হয়। কিন্তু জমীর পণ্ডিত সামান্যধমকটিও দেন না।

ইস্কুলের সামনে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ। ফসল নেই এখন, চষা-মাটির বুকে ছড়িয়ে রয়েছে শুধু ছোটো-বড়ো মাঝারি ঢেলা। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়

বেলে পাথরের চাঁই পড়ে রয়েছে বুঝিবা। মাঝে মাঝে বাবলা আর শিমুল গাছ। দূরে,—বেশ খানিকটা দূরে পদ্মার ধু-ধু চর। আশ-পাশের গায়ের মানুষের আশাপীঠ ওই মাঠ আর চর। চাষ করে ছেড়ে দিয়ে গেছে। কি ফসল ফলাবে, কে জানে!

ইস্কুল-ঘরের দিকে তাকিয়ে জমীর পণ্ডিতের মনে হয়, এটাও যেন একটা মাঠ। কতদিন থেকে জ্ঞানের চাষ করে আসছেন তিনি এখানে। আশা করেছেন মানুষের 'ফলন' আনবেন। মাঠ এতদিন ফসল দিয়েছে, ইস্কুলও। কিন্তু এবার কি হবে? ইস্কুল সম্বন্ধে এবার এ-চিন্তা তাঁর মাথায় ঢুকেছে বিশেষ করে ইন্‌স্‌পেক্টর আসার পর থেকে।

ঃ পণ্ডিত সাহেব, কি করছেন?

চিন্তায় বাধা পড়লো জমীর পণ্ডিতের। চকিতভাবে পেছন ফিরে দেখলেন, জানলার পাশ থেকে উঁকি দিয়ে কথা বলছে ওপাড়ার হাশিম। নতুন পাঠশালার এক নম্বর পাণ্ডা। প্রশ্নটা বিদ্রূপের মতো মনে হল তাঁর কাছে। বললেন, গরু চরাচ্ছি। ইস্কুলে আর কি করে লোকে?

হাশিম একটু অপ্রস্তুত হল; কিন্তু সামলে নিল পর মুহূর্তেই, তওবা, তওবা, কি যে বলেন আপনি। ছেলেমেয়ে কাউকে দেখছিনে কিনা। তাই, ভাবছিলাম,—

একটু থেকে আবার প্রশ্ন করলো, তা আজকাল আর বুঝি কেউ আসে না? সেকেণ্ড পণ্ডিত সাহেবকেও দেখছিনে।

ইন্‌স্‌পেক্টর আসার পর থেকে একটু সকাল-সকালই আসেন জমীর পণ্ডিত। আশা এই, বেশী করে খেটে ইস্কুলটাকে ভালো করে তুলবেন। কিন্তু অবস্থা খারাপ দেখে সেকেণ্ড পণ্ডিত প্রায়ই ছুটি নিয়ে বাড়ীতে বসে থাকেন আজকাল। আর, ছেলেমেয়েরা আসে সেই আগের মতোই দেরি করে। পাড়াগাঁয়ের ছেলেমেয়ে, বাড়ীর কাজ-কর্ম যথাসম্ভব সেরে তবে আসে। ধমক দিয়ে লাভ হয় না, দেওয়া উচিতও নয়। সংসারের অভাব-অনটন উপেক্ষা করে, কাজের চাপ লাঘব করে ওরা যে ইস্কুলে আসতে পারে শেষ পর্যন্ত, এই-ই তো অনেক। কিন্তু এসব কথা রাগ দেখিয়ে শোনানো চলে না হাশিমকে। বললেন, আসেনি এখনো, আসবে। সময় হলে তবে আসবে। ইস্কুল চালাচ্ছো হৈ রৈ করে, আর, এটুকুও জানো না।

হাশিম এবার মুখ-চোখ করুণ করে বললে—সহানুভূতিতে, পণ্ডিত

সাহেব, ভুল বুঝছেন কেন আমায় ? আপনার চেয়ে বেশী বুঝি, এমন কথা বলে বেয়াদপি করতে চাইনে। এই ইস্কুলটা উঠে যাক, একি আমরা কামনা করতে পারি ? হাজার হলেও একই গ্রামের ইস্কুল তো ! ইস্কুল যতো বেশী হবে, লেখাপড়াও ততো বেশী শিখবে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা। গাঁয়েরই উন্নতি হবে।

জমীর পণ্ডিত তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করলেন, ইন্‌স্‌পেক্টর তোমাদের ওখানে গিয়েছিলো, না ?

ঃ হ্যাঁ, আপনার এখানে কি বলে গেল ?

ঃ বলবে আর কি ? এ কি আর কানে কানে বলবার কথা ? যা বলবে, সবাই জানতে পারবে।

জওয়াব দিয়ে জমীর পণ্ডিত ভাবলেন, এ মন্দ হল না, জওয়াব দেওয়াও হল, এড়িয়ে যাওয়াও হল। ইন্‌স্‌পেক্টর যে কি বলবে, তা এখনও জানা যায় নি। ভালো কিছু যে রিপোর্ট দেবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত না হলেও খারাপ কিছু যে বলবে না, এমন আশা তিনি করতে পারেন। তার কারণ, ইন্‌স্‌পেক্টরটিকে অত্যন্ত ভদ্র মনে হয়েছে তার। কাজও জানে। যতোক্ষণ ইস্কুলে ছিলো, রীতিমতো সশ্রদ্ধ এবং সহানুভূতিময় ব্যবহার করেছে তাঁর সঙ্গে। পাকিস্তানী আমলের হঠাৎ প্রমোশন পাওয়া ইন্‌স্‌পেক্টরদের মধ্যে এতোগুণ তিনি এর আগে আর দেখেননি।

অবশ্যি, একটা বিষয়ে খটকা রয়েছে তাঁর মনে। ইন্‌স্‌পেক্টররা এসেই চা-নাশতা চেয়ে বসে এখন। সে জন্যে এবার আগে থাকতেই চা আনিয়ে রেখেছিলেন রাণুদের বাড়ী থেকে। ইন্‌স্‌পেক্টর খাতাপত্র দেখবার সময় জমীর পণ্ডিতের ইঙ্গিত মতো রাণু এগিয়ে দিয়েছিলো মিষ্টি, ফল মূল আর ফ্লাস্কের চা। কাপে মুখ লাগিয়ে অন্যমনস্কভাবে ইন্‌স্‌পেক্টর বলেছিলো, বেলের সরবৎ গরম কেন ?

রাণু মেয়েটি মুখরা। স্মিতমুখে চট করে বলে উঠেছিলো, না, সার, এখো গুড়ে পানা।

এক মুহূর্ত রাণুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে ইন্‌স্‌পেক্টর হেসে বলেছিলো, তা'হলে তো ছোবড়া বেছে খেতে হবে। আখ মাড়াইয়ের কলটা বোধহয় ভালো ছিলো না। তুমি দেখোতো এবার, একটা ছাকনি পাও কিনা।

বলেই সে আবার কাজে মন দিয়েছিলো।

কাপের মধ্যে সত্যি সত্যিই চায়ের একটা পাতা ভাসছিলো। রাণু সেটা উঠিয়ে নিয়েছিলো অতি সাবধানে, সন্তর্পণে।

শুধু এই ঘটনাটির জন্যেই ইন্‌স্‌পেক্টরের মন-মেজাজের নিশ্চিত ব্যাখ্যা করে উঠতে পারেন নি আজও জমীর পণ্ডিত।

হাশিম আবার সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললো, ওপরে একটু খোঁজ-খবর নিলে হত না?

জমীর পণ্ডিত কি উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, থেমে গেলেন। রাণু এবং আরো কয়েকটি ছেলেমেয়ে এসে ঢুকলো ঘরে। এই ওদের স্বভাব,—নানান দলে আসা। একা আসতে পারে না। ভালো লাগে না। বাড়ী থেকে বেরিয়ে বন্ধু-বান্ধব একে-ওকে ডাকাডাকি করে দল বানিয়ে তবে আসে।

দেরি করে আসায় লজ্জিত বা অপ্রতিভ হল না। ছেলেমেয়েরা চুপচাপ বসে গেল নিজের জায়গায়। শ্লেট বার করে হাতের লেখা লিখতে শুরু করলো। হাতের লেখা না দেখানো পর্যন্ত পড়া নেয়া হয় না কারো।

পেছন থেকে হাশিম বললো, আচ্ছা, আসি এখন, পণ্ডিত সাহেব। আপনি পড়ান।

জওয়াব দিলেন না জমীর পণ্ডিত, ঘুরে দেখলেন যদিও। অপস্রিয়মান মানুষটির পিঠ থেকে তুলে নিঃসাড় দৃষ্টিটা পেতে দিলেন ঢেলা-ভরা দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠের ওপর।

ভেতরে-বাইরে মাঠ। এবার কি ফসল ফলবে, কে জানে!

গুজব রটেছে গাঁয়ে, পুরোনো ইস্কুলটাই উঠে যাবে, থাকবে নতুন পাড়ারটা।

জমির পণ্ডিত পাকড়াও করেন গিয়ে চৌধুরী সাহেবকে, এর একটা বিহিত করতেই হবে। এতোদিনের পুরোনো ইস্কুল। গাঁয়ের যতো শিক্ষিত ছেলে, সব বেরিয়েছে এখান থেকে। পুঁচকে ছোঁড়াদের জ্বালায় এখন উঠে যাবে নাকি আপনারা থাকতেই?

চৌধুরী বেশীর ভাগ সময়ই শহরে পড়ে থাকেন মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে। গাঁয়ের দিকে তাকানোর অবসর কম। বললেন, কি করতে বলেন?

বলবেন আর কি? করতে যা ইচ্ছে হয় জমীর পণ্ডিতই জানেন। দোর্দণ্ড প্রতাপে ইস্কুল চালিয়েছেন প্রায় সারা জীবন। নতুন ইস্কুলের পাল্লায়

পড়ে এখন তাঁর ইস্কুলে ভাঙন ধরেছে। তারই সুযোগ নিয়ে বাড়ী বয়ে গিয়ে অপমান করে আসে হাশিমের মতো মানুষ। চাপা রাগে গর্জে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, ছ্যাঁচড়াদের ধরে 'চৌদ্দো-পো' করে দাঁড় করিয়ে রাখুন সত্তর দিন, ইস্কুল বাঁচাবার ব্যবস্থা করুন। আমার ছেলেমেয়ে পড়ে না ওখানে, পড়ে আপনাদেরই ছেলেমেয়ে।

চৌধুরী ভয়ে ভয়ে বললেন, কিন্তু ইন্‌স্‌পেক্টরের রিপোর্ট—

ঃ রিপোর্ট বেরোয়নি এখনো; কবে বেরুবে, খোদাই জানে। আপনি টাউনে খোঁজ নিন। দরকার হলে আমি গাঁয়ের লোককে দিয়ে দরখাস্ত করাবো।

ওই এক ভরসা আছে জমীর পণ্ডিতের। গাঁয়ের অনেক লোকই এখনো তাঁর পক্ষে। এমন কি, ইস্কুল দু'টিকে কেন্দ্র করে রীতিমতো দুটি দল গড়ে উঠেছে। পথে-ঘাটে তাদের ঝগড়া শুনতে পান তিনি অহরহ। জিনিসটা তাঁর ভালো লাগে না। লেখাপড়া পবিত্র কাজ। তার জন্যে ঝগড়া হবে; এ তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয়। আর ঝগড়া করবার আছেই বা কি! তিনি তো চান না যে, নতুন পাড়ার ইস্কুল উঠে যাক। ইস্কুল যত বাড়ে, ততোই ভালো। নতুন পাড়ার লোকেরাও কি তা বোঝে না? বোঝে, তবু আলগা ফুটোনি করে তাঁকে ঠাট্টা করে এলো সেদিন হাশিম। সরকার শিক্ষক দিতে পারবে না? সাহায্য দিতে পারবে না অতো? বয়ে গেছে তাতে। এতো দিনই বা সরকার কি করেছিলো, সাত টাকা করে সাহায্য দেওয়া ছাড়া? ছয় মাস, এক বছর পর পর সেই সাতটা টাকা পেয়েও যদি ইস্কুল চলতে পারে, তাহলে এমনিতেও চলবে। শিক্ষক যদি ওপরওয়ালারা দিতে পারে, ভালোই। তিনি সানন্দে ছেড়ে দেবেন ইস্কুল। না দিতে পারে, দোষ নেই তাতেও। সে-রকম দুর্ঘটনা ঘটলে,—জমীর পণ্ডিত আজকাল প্রায়ই ভাবছেন,—নিজেই চালিয়ে যাবেন ইস্কুল, যতো দিন বাঁচেন। আল্লার ইচ্ছে থাকলে খরচের জন্যে কাজ আটকে থাকবে না। ইস্কুলের ভবিষ্যত সম্বন্ধে যারা সন্দেহ প্রকাশ করেছে, তাদের তিনি জানিয়েও দিয়েছেন সে কথা। এ সব কি বোঝে না হাশিম? বোঝে, গাঁয়ের লোকেও বোঝে। তবু ঝগড়া করে।

এ সব ঝগড়া খারাপ লাগে জমীর পণ্ডিতের। কিন্তু আবার ভরসাও আসে এরই মধ্যে থেকে। গাঁয়ের লোকের মতামত স্পষ্ট করে দিচ্ছে এই

ঝগড়া। জানিয়ে দিচ্ছে, তাঁর মতামতটা একেবারে খেলো নয়। ট্রেনিং বা উচ্চশিক্ষা পাননি বলেই তাঁর এতোদিনের অভিজ্ঞতাও সরকারী মাপকাঠিতে রাতারাতি কুঁচিয়ে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে না। ইস্কুলে যে ছেলেমেয়ে বেশী আসতে পারে না, সেও তো তাঁর দোষ নয়। ওটা একেবারে আলাদা জিনিস। ছেলেদের ইস্কুলে দেওয়ার মতো পেটের ভাত কয়জনের বাকী রয়েছে? ছাত্রের অভাব ঘটেছে বলে যারা ইস্কুল তুলে দিতে চায়, তারাই বা কয়জন খোঁজ রাখে এসবের? আশ্চর্য,—জমীর পণ্ডিত মনে মনে বলেন,—আশ্চর্য এই মানুষগুলো!

চৌধুরী বললেন, আচ্ছা, আমার সাধ্যে যতোদূর কুলোয়, তার ত্রুটি হবে না। আপনি ব্যস্ত হবেন না, পণ্ডিত সাহেব। চা খাবেন একটু? দাঁড়ান। রাণু, চা নিয়ে আয়তো, মা, কাপ দুয়েক।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন জমীর পণ্ডিত, একটা গোলমাল শুনে থেমে গেলেন। বাড়ীর পাশেই কোথায় যেন একদল ছেলে চেচামেচি করছে। কান পেতে শুনতেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো একটা ছড়া,—

পুরোন পাড়ার পাঠশালা,—
পুঁই-মাচানে আটচালা!
বেঞ্চিগুলো সরু সরু,
ছাত্রগুলো আদত গরু!

সঙ্গে সঙ্গে টিটকারীসহ আরেক দলের উত্তর এলো,—

নতুন পাড়ার পাঠশালা,—
চালে খালিই বারজালা, *
মাষ্টারগুলো বকের ঠ্যাং,
ছাত্র ডাকে ঘ্যাঙর ঘ্যাং!

খোঁচা-খাওয়া বাঘের মতো লাফিয়ে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, কি! এতো দুর আস্পর্দ্ধা! শিক্ষার নামে এতো নোংরামি শিখছে সব! এক্ষুনি দিচ্ছি ঠাণ্ডা করে!

চোখের পলকে উঠে দাঁড়ালেন হারেস চৌধুরীও। তাঁর মোটা কোমরটা জড়িয়ে ধরে বললেন, পণ্ডিত সাহেব, কি করছেন?

---

* বারজালা—ফুটো।

না, না, ছেড়ে দিন আপনি, শীগগীর ছেড়ে দিন। এ-নোংরামির শাস্তি দিতেই হবে।

বুড়ো মানুষের গায়ে অসীম শক্তি। দোর্দন্ত প্রতাপ চেহারা,—যা দেখেই বাড়ীর লোক থেকে শুরু করে ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তটস্থ হয়ে ওঠে, যা ফেটে আবার আকস্মিকভাবে গড়িয়ে পড়ে স্নেহের ধারা,—অতএব যে-চেহারা ভয়ংকরভাবে রহস্যময়, সেই চেহারা থেকে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। দাড়ি-গোঁফ যেন সেই আগুনেরই শিখা। ভয় পেয়ে গেলেন হারেস চৌধুরী নিজেও। এ-মানুষকে ছেড়ে দেওয়া চলে না কখ্খনো। প্রাণপণে কোমর টেনে ধরে বললেন, জোড় হাত করছি, পণ্ডিত সাহেব, দোহাই আপনার—

রাণু এসে পড়েছে ইতিমধ্যেই। কিছুই বুঝতে পারেনি সে। বাপের দেখাদেখি শুধু চেঁচাতে লাগলো, যাবেন না, পণ্ডিত সাহেব। নতুন পাড়ার ওদের ছড়া শুনেই তো এরা ছড়া বেঁধেছে। যাবেন না আপনি—

দোহাই শুনে থেমে গেলেন জমীর পণ্ডিত। বেগতিক বুঝে পক্ষ-বিপক্ষের সমস্ত ছেলেও ততোক্ষণ সরে পড়েছে। চৌধুরীর দিকে ফিরে তিনি বললেন, কি জঘন্য বেয়াদব! আমি ওদের মুরুব্বী নই? ওদের পড়াইনে? ওদের বাপ চাচাকে পড়াইনি?

ঃ কাজটা ওদের নিশ্চয়ই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু ছেলেমানুষ সব। অতো জ্ঞানই যদি থাকবে, তাহলে আর লেখাপড়ার কি প্রয়োজন ছিলো? আপনি ব্যস্ত হবেন না। ইস্কুলেও তো বলে দিতে পারবেন। কিংবা বাপ-মাকে—

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই করবো। বাপ মাকে সুদ্ধ আমি আবার টেনে আনবো ইস্কুলে। দেখে নেবেন আপনি।

পেছন ফিরে চৌধুরীর দিকে তাকাতে গিয়েই চোখে পড়ে গেল রাণু। অমনি প্রচণ্ড ধমক লাগালেন তাকে, কি দেখছিস, হতভাগী মেয়ে? যা, পড়গে যা!

হন হন করে বেরিয়ে পড়লেন তারপরই। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উঠলেন বাড়ীতে। পুত্রবধূ উঠোনে ধানে পা দিচ্ছিলো আস্তে আস্তে। নেহাৎই নতুন বউ, বিয়ের পর এই প্রথম এসেছে শ্বশুরবাড়ী। তাকেও ধমকে উঠলেন, খেলা করা হচ্ছে?

চমকে উঠে বেচারী পা চালিয়ে দিলো অসংযত জোরে। উঠোনময় ধান ছড়িয়ে পড়লো।

পড়ানোর শেষে বহুদিন পর আজ গল্প বলছিলেন জমীর পণ্ডিত। সেকেণ্ড পণ্ডিত আগেই ছুটি নিয়ে চলে গেছেন। সমস্ত ছেলেমেয়ে জড়ো হয়ে এসে বসেছে। শুনছিলোও উৎসাহভরে। কিন্তু গল্প শেষ করবার আগে হঠাৎ চোখে পড়ে গেল পেছনের বেঞ্চির দিকে। দেখলেন, রাশু ঘুমিয়ে পড়েছে।

অনেকদিন আগে—যখন ইস্কুল নতুন খোলা হয়, সেই সময়—তাঁর প্রথম অভ্যেস হয় পড়ানো শেষে গল্প বলা, সহজ কথার ছলে কঠিন জিনিস বুঝিয়ে দেওয়া। মন তখন তার স্বপ্নে বিভোর, আদর্শের উন্মাদনায় মাতাল! কান পেতে শুনতো সবাই, তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য সত্ত্বেও। ইস্কুলের প্রতি, পণ্ডিতের প্রতি তাতে টান বেড়েছিলো ছেলেমেয়েদের। কিন্তু বেশী দিন সেই গল্প বলা চলেনি। একদা আকস্মিক পরিদর্শনে এসে কোনো ইন্‌স্‌পেক্টর তাঁকে দেখে ফেলেছিলেন গল্প বলতে। ইস্কুলের তখন জোর সুনাম। তাঁরই মেহনতের গুণে। সুতরাং কারো কিছুই হল না, হল শুধু গল্প বন্ধ।

আজ আর এক কারণে ধমক দেওয়ার প্রবৃত্তিও হল না জমীর পণ্ডিতের। সবাই শত্রুতা করেছে তাঁর সঙ্গে। কিন্তু তাই বলে অধৈর্য হলে তো চলবে না। বাণুকে ইঙ্গিত করলেন শুধু।

রাণু চোখ রগড়ে সোজা হয়ে বসতেই বললেন, তোদের বড্ড কষ্ট হচ্ছে, না? আচ্ছা, এবার থেকে সপ্তাহে একদিন করে ছুটি দেব ডাংগুলি খেলার জন্যে।

সত্যিই নিরেট মাথা বাণুর। বিদ্রূপটা বুঝলো না। পিট পিট করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কাল ছুটি থাকবে প'ন সা'ব?

হাল ছেড়ে দিলেন জমীর পণ্ডিত। ছুটি দেওয়ার শেষ আয়োজনে সারা দিনের জমানো নালিশ শুনতে চাইলেন এবার, থাক ওসব, কার কি নালিশ বল দেখি এখন।

নালিশ নিয়ে এলো রাশুই প্রথম প'ন সা'ব, কাল হাটে ফরিদ আমার আধসের সিম ভেঙে নষ্ট করে করে দিয়েছিলো।

নৈতিক দায়িত্বে ঘরে-বাইরে সমস্ত বিচারের অধিকার নিয়েছেন জমীর পণ্ডিত। কিন্তু নালিশের ধারা দেখে শিউরে উঠলেন! ইস্কুল উঠে গেলে এদের কি হবে? সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করলেন, কার সিম রে, ফরিদ?

উত্তরও দিলো রাশুই, আমার সিম, প'ন সা'ব। বেচতে গিয়েছিলাম।

বাজার-দর যাচাই করে পণ্ডিত জরিমানা করলেন ফরিদকে, দুটো পয়সা এনে দিবি কাল।

বিচার শেষ হতেই নজরে পড়লো, কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার ওপাশে। মিটি মিটি হাসছেও বুঝিবা। গম্ভীর গলায় হাঁক দিলেন, কে?

এগিয়ে এলো ফরিদের বাপ। মাথা চুলকে বললো, একটা কথা ছিলো প'ন সা'ব। ফরিদের—

ঃ কি হয়েছে ফরিদের ?

ঃ জী, গেরস্থ ঘরের ছেলে,—কাজ-কর্ম বেড়ে গেছে এখন—

এক মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল জমীর পণ্ডিতের কাছে। তিক্তকণ্ঠে বললেন, এ-গাঁয়ের আর কোনো গেরস্থর ছেলে লেখা-পড়া শেখেনি ?

ফরিদের বাপ আবার মাথা চুলকে শুধু বললো, জী—

নিজের কাজের কথায় এসে এবার জমীর পণ্ডিত পাল্টা আক্রমণ চালালেন। হারেস চৌধুরী তদবির করছে শহরে। গ্রাম থেকে একখানা দরখাস্তও লেখা হয়েছে। সেখানা সকালবেলা ফরিদের বাপের হাতেই দেওয়া হয়েছিলো সই নেবার জন্যে। তারই ফলাফল জানতে চাইলেন এখন, সই নেওয়া শেষ হয়েছে ?

ফরিদের বাপ ভয়ে ভয়ে বললো, জী না। দিতে চায় না। বলে—

ঃ দিতে চায় না ! কি বলে ?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন জমীর পণ্ডিত। ভয়ানক অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো ফরিদের বাপ, ইতস্ততঃ করে একবার ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালো। তারপর মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বলে যেতে লাগলো, বলে যে, উনি আর পড়াবেন কি করে ? বুড়ো মানুষ, মাথার ঠিক নেই। তার ওপর বাতের রোগী। নামাজ পড়ার সময় সেজদা দিয়ে উঠে সোজা হয়ে বসতেও পারেন না। হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। সারা জীবন ছাত্রদের 'নীল ডাউন' করিয়ে এসে এখন প্রায়শ্চিত করছেন—

ঃ কি—কি বললে ?

ধমক দিলেন বটে জমীর পণ্ডিত। কিন্তু পরেই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

ফরিদের বাপ কি যেন বলতে যাচ্ছিলো আবার। কিন্তু বাধা দিয়ে চীৎকার করে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, থাক, থাক, আর বলতে হবে না।

ভুল আমারই হয়েছে। হবে না? খত্তার কাজ নরুন দিয়ে হয় কখনো? কোথায় সে-দরখাস্ত? বার করো, বার করো শীগগীর।

ফরিদের বাপ হাতের মুঠো থেকে একখানা মোচড়ানো কাগজ বার করে দিলো। হঠাৎ ইস্কুলের ছুটি দিয়ে জমীর পণ্ডিত বেরিয়ে পড়লেন।

ইস্কুলের সিমেন্ট ওটা বারান্দায় পায়চারি করছেন জমির পণ্ডিত। পায়-চারি করছেন বেলা নয়টা থেকে। এখন হয়তো বারোটা বাজে। ভাবছেন, এতো বেলা হল। তবু ছেলেমেয়েরা আসছে না কেন? সময়-জ্ঞান আর এদের কোনো দিন হবে না, দেখছি। না কি, বাড়ী বাড়ী গিয়ে ধরে আনতে হবে সকলকে?

ভাবতে ভাবতে চকিতে একটা সন্দেহ দেখা দিলো মনে। অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। তবে কি—গাঁয়ে খবর রটে গেছে, এ-ইস্কুল সত্যি সত্যিই উঠে যাবে। ইন্‌স্‌পেক্টরের অফিস থেকে খোলাখুলি কোনো চিঠি অবশ্য এখনো আসেনি। হারেস চৌধুরী চিঠি দিয়েছেন কয়েকদিন আগে তিনিও পরিষ্কার করে কিছু জানাননি। কিন্তু যা আভাস দিয়েছেন, তাও ভরসাজনক নয়। এদিকে নতুন পাড়ার ইস্কুলে নাকি খবর এসে গেছে, তাদের ইস্কুল থাকবে। তার মানেই হল—

গাঁয়ের পথে বেরুনো এখন দায় হয়ে উঠেছে তাঁর পক্ষে। নতুন পাড়ার দল তো আছেই। তার পর, যারা এতোদিন ছিলো তাঁর পক্ষে, দরখাস্ত বিফল হওয়ায় তারাও সরে পড়েছে। চক্ষুলজ্জায় সই দিয়েছিলো বোধহয় তখন কেউ কেউ আবার নানান ছলে নতুন পাড়ায় ইস্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠাতে শুরু করেছে। যেমন ফরিদের বাপ। কেউ কেউ বা মুখের ওপরই পষ্টাপষ্টি বলে নিয়েছে, তখনই তো বলে ছিলাম, প'ন সা'ব, লাভ হবে না দরখাস্ত করে।

কিন্তু লাভ যে হবে না, তাই বা কে জানে! সত্যি খবর তো কেউই জানে না এখনো। যদি জানবেই, তাহলে এদিকে আট-দশদিন ধরে কেন কতকগুলো লোক ছেলেমেয়েকে আসতে দিচ্ছে তাঁর ইস্কুলে? ইচ্ছে করে তো কেউ নিজের ছেলে মেয়ের মাথা খেতে চায় না।

তাহলে? তাহলে খবরটা সত্যি নয়। সিদ্ধান্তটায় পৌঁছতেই নতুন শক্তি পেলেন জমীর পণ্ডিত। নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তাঁর মনটা। ঠিক হয়েছে। ইস্কুল, তাঁকে চালাতেই হবে। যারা তুলে দিতে চায় ইস্কুল তাদের

দেখিয়ে দেবেন, ইচ্ছে করলেই এ ইস্কুল তুলে দিতে পারে না কেউ। গোমূর্খ সব! স্বাধীন হলে কি হবে? শিক্ষার মর্ম এরা এখনো বোঝেনি। রসুলুল্লাহ্‌কে একবার কি যেন জিজ্ঞেস করেছিলো, ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে হবে কতো বছর বয়েস থেকে? হজরত জওয়াব দিয়েছিলেন, তাদের জন্মের পঁচিশ বছর আগে থেকে। অর্থাৎ তাদের বাপ-মাকে আগে লেখাপড়া শেখাতে হবে। গোমূর্খরা কি আর কখনো এ হাদীসের মর্ম বুঝেছে? বোঝেনি। কিন্তু তিনি এবার বোঝাবেন।

অদ্ভুত একটা আত্মবিশ্বাস জাগলো পণ্ডিতের মনে। আনন্দে বুকখানা ভরে উঠলো। ভাবলেন, না, কোনো ভয় নেই। ছেলেমেয়েরা আজ দেরি করছে, তাতে কি হয়েছে? এমন দেরি তো ওরা বরাবরই করে। এই তো বছর খানেক আগে একদিন কেউই আসেনি মোটে। ছেলেমানুষ সব। হয়তো বা কোনো কাজে আটকেই পড়েছে। পড়া আর কাজের চাপে কতো পাচ্ছে ওরা। আবার শুনতে পান, তাঁকে দেখে ওরা ভয়ও পায়। আহা, আসুক না আজ। আজ আর পড়াবেন না, গল্প শোনাবেন। আর,—মৃদু হাসি ফুটে ওঠে পণ্ডিতের মুখে,—গোটা কতো ইটের কুচিও কুড়িয়ে রেখে দেওয়া যাক। ফাঁক পেলে একবার বাঘবন্দীও খেলে নেবে ওরা। প্রশ্রয়ের চোখে লুকিয়ে লুকিয়ে কোনো স্নেহভাজন শিশুর দুষ্টুমি দেখছেন যেন, এমনিভাবে মুখ টিপে হাসতে হাসতে আলতো হাতে কুচি কুড়োতে থাকেন তিনি।

কুচি কুড়োনো শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় সহসা পেছন থেকে ডাক শোনা গেল প'ন সা'ব।

পেছন ফিরে সলজ্জ চাপা আনন্দে প্রায় নেচে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, রাশু? এসেছিস? এতো দেরি কেন রে?

রাশু বিষণ্ণ মুখে জওয়াব দিলো, আসার আসাতো নয় প'ন সা'ব। তাই, সময় করতে দেরি হয়ে গেল। কপালে নেই আমার লেখাপড়া। খোদা মাথায় কিছু দেয়নি। নিজের পড়াশোনা বন্ধ হলে দুঃখ নেই। কিন্তু বাপজান বলছিলো,—

মড়ার মুখের মতো বিবর্ণ হয়ে গেল জমীর পণ্ডিতের মুখ। ধরা গলায় বললেন, কি বলছিস রে?

এক মুহূর্তে তাঁর মুখের দিকে চেয়েই মুখ নামিয়ে নিলো রাশু, ওদের ইস্কুলে খবর এসে গেছে, প'ন সা'ব। আমাদের শেষ দলের কয়েকজনও গিয়ে জুটেছে দেখলাম।

অর্থহীন চোখে চেয়ে পণ্ডিত শুধু বললেন, এ্যাঁ ? কিন্তু রান্নু, বিশু—

কথা আর শেষ করতে পারলেন না জমীর পণ্ডিত। রাশুও কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

অনেকক্ষণ পর পণ্ডিত অসমাপ্ত কথাটা শেষ করলেন, রান্নু, বিশুরা কি আর পড়বে না।

ঃ রান্নু নাকি টাউনের ইস্কুলে পডতে যাবে।

ঃ কই আমাকে তো কিছু বলেনি। একবার বলেও গেল না—ইস্কুলটা—

রাশু একবার ইতস্তত করে বললো, রান্নুকে ডেকে নিয়ে আসবো, প'ন সা'ব ?

জমীর পণ্ডিত নীরবে ঘাড় নামিয়ে সম্মতি জানালেন।

বাড়ী কাছেই। অল্পক্ষণের মধ্যে রান্নু এসে পড়লো। মুখখানা করুণ। বললো, কাল টাউনে চলে যাবো, পণ্ডিত সাহেব। আব্বা বলেছে, খালা-মাদের বাড়ীতে থেকে পড়তে হবে এবার।

জমীর পণ্ডিত বহুক্ষণ সাড়া দিলেন না। তাঁর মন তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে আর এক দুনিয়ায়। ইস্কুলটা একবার চোখের সামনে ভেসে উঠলো যেন। তিরিশ বছর আগের সেই চকচকে দেওয়ালটা। চাষীঘরের তাজা তাজা, ধুলোবালি-মাখা ছেলেমেয়েগুলো দল বেঁধে বেঁধে আঙিনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু—কিন্তু এরা যেন—এদের যেন পথ চলতে চলতে আজকেও দেখছেন, মনে হচ্ছে, আর,—আর, ইস্কুলের আঙিনাও যেন এইটা নয়, দুটো, নাকি, আরো বেশী ? হয়তো। উঁহুঁ, ঠিকই। সারা গাঁয়েই খেলা করে বেড়াচ্ছে ওরা পণ্ডিত শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছেন।

দলগুলো ছড়িয়ে পড়েতে পড়াতে এক সময় মিলিয়ে গেল। জমীর পণ্ডিত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। সাদা দাড়ি গোঁফের ফাঁকে ভাঁজ পড়া মুখের রেখাগুলি কঠিন হয়ে উঠলো দুই-একবার। সংশয়ের দৃষ্টিতে ইস্কুল-ঘরটার দিকে তাকালেন কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র। ছবিটা আবার ফিরে আসতে লাগলো তারপর। আর ফিরে এলো—স্পষ্ট হয়ে—আর একটি জিনিস, যেটা এতোদিন অস্পষ্টভাবে ঘোরাফেরা করছিলো তাঁর মনের মধ্যে। নিজেকে সংযত করে এবার স্বাভাবিক গলায় বললেন, তোরা কাল কখন্ যাবি, মা ?

বলতে বলতেই রান্নুকে কোলের কাছে টেনে নিলেন তিনি।

ঃ নটার গাড়ীতে।

ঃ চ, আমিও যাবো তোদের সাথে।

রাণু, রান্নু দুজনেই বিস্মিত হয়ে বললো, আপনি কোথায় যাবেন ?

জমীর পণ্ডিত হাসলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলেন, বেটারা ভেবেছে কি ? পুঁইশাকের কতো ডগা কেটে খায় লোকে। তাই বলে কি গাছ মরে ? এক খোঁচা খেয়েই আমি ইস্কুল তুলে দেব ? দেখে আসি, দাঁড়া, একবার ইন্‌সপেক্টরের অফিসটা। আর, না হয় তো নিজেই মাইনে দিয়ে একটা মাষ্টার ধরে আনি কোথাও থেকে।

ঈষৎ উত্তেজিতভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে একটুখানি থামলেন জমীর পণ্ডিত। তারপর আদেশের সুরে রাণুকে বললেন, শোন, তোর বাপের ওসব বাহানা। তুই পড়াশোনা নষ্ট করিস্‌নে। নতুন ইস্কুলেই ভর্তি হয়ে যা। আর, রান্নু, তুই টাউনের যা, হ্যাঁ, টাউনেই,—এখন বাড়ী যা—তোরা—

কিন্তু আদেশেব সুর ক্রমে ভেঙে এলো, গলার মধ্যে কোথায় যেন একটা বিপর্যয় ঘটছে। রান্নুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জমীর পণ্ডিত আবার বলতে চেষ্টা করলেন, হ্যাঁ, যা,—যা, —তোরা—

হাতখানা এবার রান্নুর মাথা থেকে নেমে কাঁধের পাশে ফ্রকটা চেপে ধরলো। পণ্ডিতের মনে হল, এদের যদি একেবারে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে রাখা যেতো। নইলে যে সাদা গোঁফের তলায় ঠোঁট দুটিকে এতোক্ষণ পর আর বাগ মানানো যায় না।

প্রাণের চেয়ে প্রিয়

শহীদ সাবের

ওরা এসেছে। হ্যাঁ নিশ্চয় ওরা। আনন্দে তোলপাড় করল বুক। কত দিন ওদের দেখিনি, আজ তিন তিনটে বছর ওরা আমার চোখের অন্তরাল। অনেক অনেকদিন পরে দেখা হবে ওদের সঙ্গে। আব্বা, আম্মা, বাচ্চু, মুন্নি—আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরা। তাই আপিস থেকে যখন সাক্ষাৎকারের 'স্লিপ' এলো, তখনই অধীর আগ্রহে উন্মুখ হয়ে উঠেছে মনটা। হবারই কথা। যে আসন্ন মলিন মুহূর্তে শুরু হয়েছিলো আমার বন্দী জীবন, তারপর হতে দিবা-রাত্রির কক্ষ থেকে ঝরে পড়েছে, খসে পড়েছে পাকা ফসলের মত, উড়ে গেছ কালের মহাশূন্যে।

এই তিনটে বছর কেটেছে আমার চতুর্দেয়ালের এই পাষাণপুরীতে; আত্মীয়স্বজন প্রিয়জনের দর্শন বঞ্চিত এক জীবন। এই দীর্ঘদিন ধরে যে সব ছবি আমার মনের পটে আনাগোনা করেছে, সেতো তাদেরই, আমার একান্ত প্রিয়জনদের। দিন ও রাত্রির দুঃসহ মুহূর্তগুলিতে যখনই তাদের কথা ভেবেছি, তখনই ভুলে গিয়েছি সকল দুঃখ ও লাঞ্ছনা। এখন ৫৩ সালের শুরু, আমি জন্মেছিলুম সেই তিরিশ সালের ডিসেম্বর। সেদিন সেলের বারান্দায় বসে আমি ভাবছিলুম এই পেরিয়ে আসা জীবনের মাইলখণ্ডগুলির কথা। আর হিসেব করেছি সে দিনগুলি কাটলো এই বদ্ধদুনিয়ায়। তিন বছর আগে কলেজের ফর্মপূরণ করতে গিয়ে বয়স লিখিয়েছিলাম কত কম। সুতরাং ভুলতে পারিনি অভাব অনটনের মধ্যেও প্রিয়জনদের হাসিমাখা মুখ, আব্বা আম্মার স্নেহময় দৃষ্টি, ভালবাসা ঃ আমার অতি স্নেহের বোন মুন্নি বাচ্চু কাউকেই নয়।

জেল অফিস যাবার পথে ভাবছিলাম, দীর্ঘদিনের না দেখার পর আজকের

এই প্রথম সাক্ষাৎকার কি ধরনের হবে। আব্বার গম্ভীর মুখেও কি একটুখানি হাসি ফুটে উঠবে না? আম্মার মুখের ছবিটা কি হয়ে উঠবে না পিকাসোর সেই ছবির মতো। আজ দীর্ঘদিন পরে অন্ধকার ঘরটাতে তাদের প্রথম দর্শনে হয়ত আমাকে একটু বিব্রত মনে হতে পারে। না, আমি হাসবো। তাঁদের দেখেই হাসবো। কান পর্যন্ত বিস্তৃত প্রশান্ত হাসি। সে হাসি হবে অদম্য। তারপর মুন্নি, গভীর আদরে দু'হাত দিয়ে ওকে টেনে নেব নিজের কাছে। ওর একটুখানি পায়রা মুখটা তুলে বলবো: 'মুন্নি' !—

'ভাইয়া', বলে সে আঁকড়ে ধরবে আমাকে। ওরই মধ্যে বলা হয়ে যাবে অনেক অনেক কথা। আমাদেব শৈশবের আর বাল্যের অনেক কথা যা কেবল আমরা দুই ভাই বোনেই জানি। আব্বা আম্মা চেয়ের ইবেন হাসিমুখে। জেল আপিসের কপালে সতর্ক প্রহরীর দৃষ্টির মতো দুটো বিজলী বাতি ঝকঝক করছে রোদে। সঙ্গের সান্ত্রী বললে, 'চলুন ভাই, একটু তাড়াতাড়ি চলুন।'···কাঠের বড় দুয়ারের বুকে ছোট্ট দুয়ারটা গেল খুলে।

যে ঘরে আমায় নিয়ে যাওয়া হোল, সেখানে আগেই ওরা বসেছিলেন। আব্বাকে দেখেই চিনলাম, অনেক বদলে গেছেন আব্বা। আগের সেই চেহারাই আর নেই। জেলের ডিপুটি বললেন, আপানার ইণ্টারভিউ; আম্মা আসেন নি; কেবল আব্বা বাচ্চু মুন্নি। আব্বার দিকে চেয়ে আমি হাসলাম, হাসতে গিয়েই মনে হোল এ যেন সেই অর্থহীন হাসি। আবার হাসলাম, বড় মলিন ও হাসি।

পা ছুঁয়ে আব্বাকে সালাম করেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লাম। আব্বা বললেন, 'শরীর তো খুবই খারাপ হয়ে গেছে দেখছি।'

'খুব খারাপ আর কোথায়', আমি বললাম, 'ভালো স্বাস্থ্য আমার কোন কালেই ছিল না। আজকাল এক আধটু ব্যায়াম করছি। শরীর তো আমার আজকাল ভালোই যাচ্ছে। আমার স্বাস্থ্যের জন্যে আপনারা ভাববেননা মোটেই।'

ছোঠভাই বাচ্চু তার বড় বড় চোখদুটো তুলে ধরে বললো, 'ভাইয়া তুমি আর আমাদের বাড়ি যাবে না!'

'তোমাদের বাড়ী?' আমি হেসে ওর গালে একটা চুমো খেয়ে বললাম, 'কি করে যাব ভাই? আমি কি নিজের ইচ্ছেয় এখানে রয়েছি।' ওর থুতনিটা নেড়ে দিলাম আমি। আমার কথাগুলো সে বুঝতে পারে নি, তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আবার পরিষ্কার করে বললাম, "আমাকে যে ধরে রেখেছে ভাই।'

'কারা ?' গভীর প্রশ্নবোধক চিহ্ন ফুটে উঠলো ওর দুচোখে।

'কারা ?' জবাব দিতে গিয়েই দেখলাম প্রশ্নটা কত বড়। কারা আমার বন্দীত্বের জন্যে দায়ী। আমাব বন্ধুদের মধ্যে হয়তো এ নিয়ে ঘণ্টাব পব ঘণ্টা বক্তৃতা চালাতে পারি, এই বন্দীত্বের সাথে সম্পর্ক দেখাতে পারি সাবা দেশের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তির প্রশ্নেব। কিন্তু আমাব শিশু ভাইয়েব প্রশ্নের জবাব দেওয়া কি শক্ত। কয়েকমুহূর্ত আমার মুখ দিয়ে কোন জবাব বেরুলো না। শেষে অদূবে উপবিষ্ট গোয়েন্দা অফিসারটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, 'ওই ওরা।

আমার আঙুল অনুসবণ করে বাচ্চুর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো যথাস্থানে। একটি ভয় ও ঘৃণামিশ্রিতভাব ফুটে উঠলো ওর চোখে। অত্যাচারীকে সামনে পাওয়া নিরস্ত্র মানুষের মুখের মতোই ফ্যাকাশে হয়ে গেল বাচ্চুব মুখ। ও তাকিয়ে রইলো সেদিকে। এই সুযোগে আমি মুন্নির দিকে নজব দিলাম। মুন্নি দাঁড়িয়ে আছে আমার চেয়ারের হাতল ধরে।

'মুন্নি', আমি ওকে ডাকলাম, হাত বাড়িয়ে দিলাম সেই আগেব মুন্নিকে নেবার জন্যে। কিন্তু কতো বড় হয়েছে মুন্নি। সেই আগের মুন্নিই যেন আব নেই। আমার মনের মধ্যে মুন্নির যে ছবিটা গত তিন বছর ধবে পুষে রেখেছি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সেটা। আমার প্রাসাবিত হাত গুটিয়ে নিলাম।

'ভাইয়াকে সালাম করলে না তোমারা। বড় ভাইকে সালাম করতে হয় না ?' আব্বা বললেন ওদের। আমার পা ছুঁয়ে সালাম করতে গেল মুন্নি। আমি ওকে মাঝপথেই ধবে ফেললাম, আর সংকোচে এতটুকু হয়ে গেল মুন্নি। বুঝলাম শুধু দেহেই নয়, মনেও বেড়ে উঠেছে সে।

কিন্তু এই কি সেই মুন্নি যার কচি মুখখানি আমার দুঃসহ বন্দীজীবনে অহরহ মনে পড়েছে। ওর মনটাও কি ঠিক এমনি বদলে গিয়েছে ? ওর মনের মধ্যে আমার জন্যে অমন ভালবাসা কি এখনও রয়েছে বেঁচে যা ছিল আশেপাশের বাপ-মায়েদের কাছে, তাদের ছেলেমেয়েদের কাছে উদাহরণের বস্তু।

'ভাইয়াকে মনে ছিল তোমার মুন্নি, আমি জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

সরমে রাঙা হয়ে উঠলো মুন্নি, চোখ নামিয়ে ঘাড় নেড়ে বললো, ছিল।'

আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মুন্নির বয়স কত হোল আব্বা ?

'বয়স তো কারো পড়ে থাকে না বাবা। আমরাও তো বুড়ো হয়ে গেলাম। তোমারও তো এখন পরিণত বয়স। তুমি ছিলে আমাদের আশা ভরসা। তা তুমিই রইলে জেলে বসে। তোমার এই ছোট ছোট ভাইবোন। তা হবে বই কি ওর বয়েস—বারো তো হয়ে এলো। মেয়েছেলে বাড়তে দেরি লাগে না। আর দুদিন পরেই তো বিয়ের বয়েস হবে। এদের শিক্ষা, ওর বিয়ে শাদী এসবের দায়িত্ব তো তোমারও। 'একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন আব্বা।

বিয়ের কথায় আমি যেন চমকে উঠলাম। যতই বয়স হোক, বিয়ের বয়স হতে ওর এখনো ঢের দেরি। ততদিন দুনিয়াই পালটে যাবে। আব্বার যতো কথা। কিন্তু আব্বার ইঙ্গিতটা আমি বুঝলাম। আর তুমি আছো জেলে বসে কথাটি মনে মনে বার বারই আবৃত্তি করলাম আমি। কিন্তু চুপ করে রইলাম।

'মুন্নি তুমি এখন কোন ক্লাসে পড় ?' আমি ওকে জিজ্ঞেস করি।

'সিক্স ভাইয়া,' মুন্নি বললে।

'সিক্স! অনেক পড়ে ফেলেছো তুমি।' আমার আম্মার পড়াশুনা নাম-লেখা অবধি। গোঁড়া পবিবারে মার জন্ম। আমার নানা নানী যদিও 'শিক্ষার জন্য চীন দেশেও যাবে, রসুলুল্লার এই বাণী জানতেন, তথাপি তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখবার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। আজকাল তো লেখাপড়া না জানা মেয়েদের 'দুলা'ই জুটবে না। তাই মুন্নিরা কিছুটা এগিয়েছে বই কি! ছোটবেলাতেই আমি আব্বাকে বলতাম, বড় হয়ে আমি উকিল হব আর মুন্নি হবে লেডী ডাক্তার। আমার উকিল হওয়াব পথে বাধার দেওয়াল। কিন্তু মুন্নিই কি পারবে লেডী ডাক্তার হতে ?

হঠাৎ মুন্নির দিকে তাকাতে কত কথাই না আমার মনে পড়ে যায়! বাল্যের অসংখ্য স্মৃতি আমার মনের দুয়ার খুলে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়তে চায় যেন!

আচ্ছা মুন্নি, আমাদের কাকাতুয়াটা আছে তো!

'না ভাইয়া ওটা মরে গেছে অনেক আগে।' পাখীটা মরে গিয়েছে। মরে যাওয়াটা অসম্ভব কোন ঘটনা নয়। একটুও দুঃখ হোল না আমার শুনে। অথচ ছোটবেলা থেকে পাখী আমার কতো প্রিয়। গাছের ফুল, উড়ন্ত পাখী আর সবুজ গাছপালা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে উঠতাম আর জেগে উঠতো আমার মধ্যে এক অনন্ত জিজ্ঞাসা।

মনে পড়ে যায়, আমার ছিল পাখী পোষার দুরন্ত খেয়াল। গাছে গাছে সারাদিন পাখীর ছানা খুঁজে বেড়াতাম আমি। কত পাখীশিশুকেই না আমি সংগোপনে হরণ করেছি নীড় থেকে, মাতৃহীন করেছি তাদের আর পুষে রাখতে চেয়েছি খাঁচায়। কিন্তু বাঁচে নি একটাও। একবার মনে পড়ে, কোত্থেকে একটা শালিকের বাচ্চা নিয়ে এলাম ধরে। তারপর দিন আমার পাখী নিয়েই কাটে। আগে মুন্নির সঙ্গে যেখানে দিন কাটতো, সেখানে পাখীর ছানা ভাগ বসালো। আমাদের রান্না ঘরের পেছনে ছোট্ট এক ফালি বাগান করেছিলেন আব্বা। সেখানে আহার দিতাম পাখীটাকে। দুধের সঙ্গে রুটির টুকরো মিশিয়ে পাখীটাকে খাওয়ানাতেই আমার সারা পড়ার সময়টা কাটতো। কিন্তু পাখীটা গেল মরে। খুবই আঘাত পেয়েছিলাম সেদিন। তারপর বহুদিন আব কোন পাখী পুষিনি। একদিন শেষে ভোরবেলায় ছুটতে ছুটতে নিয়ে এলাম একটি পাখীর ছানা। বাড়ীতে ঢুকেই ডাক দিলাম : 'মুন্নি, মুন্নি—'

মুন্নি দৌড়ে এলো, পাখীটা দেখে ওর মুখটা হয়ে গেল এতটুকু।

'খুশি হলিনে বুঝি ?' আমি ওকে বলেছিলাম। মুন্নি জবাব দেয়নি।

আমি ওকে বললাম, 'যা শিগগিরি পানি নিয়ে আয়।' মুন্নি দৌড়ালো পানি আনতে।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল তবু মুন্নি আর আসে না। আমি ওকে গাল পেড়ে ডেকেছিলাম, 'অ হাবামজাদী মুন্নি, এতক্ষণ কি করছিস ?'

মুন্নি জল নিয়ে এলো মুখ ভার করে। পাখীর ছা'টা ওর হাতে দিয়ে আমি বললুম, 'তুই ধব আমি রুটি মেশাই। হঠাৎ মুন্নি আমাকে বলল, আচ্ছা ভাইয়া তোমার কষ্ট হয় না। খালি পাখী এনে বেঁধে রাখো। একটুও দয়া মায়া নেই তোমার।'

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললুম, 'তুই তো বলবিই। মেয়েছেলে যখন, তোর তো হবেই কষ্ট।'

কথাটা শুনে সে চুপ করে রইল। শেষে বলল, 'তুমিত খালি ঘুরে বেড়াও। পাখীর বাচ্চাটাকে বেঁধে রাখলে তার কষ্ট তুমি বুঝবে কি করে ? তুমি যদি থাকতে ওই খাঁচার মধ্যে তবেই বুঝতে।

'মানুষ আবার খাঁচায় থাকে নাকি ?' আমি বলেছিলাম, 'তোকে আর বেশী মুরুব্বিগিরি করতে হবে না। তুই—।' কথাই আর শেষ হোল না হঠাৎ দেখি পাখীর বাচ্চাটা ওর হাত থেকে বেরিয়ে এসেই ছুটতে শুরু করেছে। ভাল

করে তখন উড়তে শেখেনি। পিছু নিলাম। কিন্তু দেখতে দেখতে পাখীটা বাড়ীর পেছনে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর পাওয়া গেল না তাকে। রেগে মারতে শুরু করেছি দুমদাম। শেষে ওর কান্নায় মা এসে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। রাত্রে আব্বার কাছে নালিশ। আব্বা বললেন, 'তোদের একটা 'কাকা' আনিয়ে দেব।' সেই কাকাতুয়া।

আব্বা চেয়ারটা আমার দিকে ঘুরিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'এবার আমার কথা শোন।' কথাটা বলেই আব্বা থামলেন, যেন তার কথাগুলি গুছিয়ে নেবার জন্যেই। 'দেখ, তুমি হচ্ছ আমাদের বড় ছেলে। বাপ মায়ের মনে বড় ছেলেকে ঘিরে কত আশা-ভরসা থাকে সেটা তোমাকে বলে দেবার দরকার নেই। আজকে আমি শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করতেই আসি নি। আমি এসেছি তোমার কাছে শেষ আরজ নিয়ে।' আব্বা থামলেন। বেদনায় মুখটা কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে তাঁর।

'তোমার জন্যে তোমার মা পাগলের মতো হয়ে গেছে! ওর মুখে দিনরাত কেবল তোমার কথা। তোমার ভাইবোনদের দিনরাতের জিজ্ঞাসা আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আর আমার স্বাস্থ্য তো দেখছোই, এভাবে চললে আর বেশীদিন বাঁচবার ভরসা নেই। সে ক্ষেত্রে কবরের এপারে তোমার সাথে সাক্ষাতের সম্ভাবনা নেই। বসে নিশ্চিন্ত সময় কাটানোর সময় নেই। বাবা হয়ে আমি আজ তোমার কাছে আরজ গোজার করেছিঃ তুমি ফিরে এসো। এ পথ নয়। যাদের সংস্থান আছে, তারাই করবে রাজনীতি। আমার সম্বল চাকরি। আমাদের ওসব পোষায় না। তোমার মা বোনের দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে।' আব্বা আবার চুপ করলেন। ধরে আসা গলাটা একটু যেন বিশ্রাম দিলেন, নচেৎ হয়তো বাঁধ মানবে না।

'আমি কর্তৃপক্ষের কাছে গেছিলাম। তারা বললেন, তুমি রাজনীতি করবে না লিখে দিলে সহজেই মুক্তি পেতে পার। তোমার কাছে এ আমার অনুরোধ আরজ। আমার শেষ আপীল। তোমার মধ্যে আমাদের জন্যে এক ফোঁটা দরদও যদি থাকে তবে তুমি একথা রাখবে। লিখে দাও তুমি।' আব্বা চুপ করলেন।

আব্বার কথাগুলি আমার বুকেও তুফান তুলেছে। আব্বার এক একটি শব্দ এক একটি হাতুড়ীর ঘা হয়ে পড়লো আমার বুকে।

চুপ করে রইলাম তবু। আব্বার কথায় জল এসে গেছে মুন্নির চোখে। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলল : 'চল না ভাইয়া, আমাদের সঙ্গে চল না।'

বাচ্চু এখন ঘুরে ঘুরে বোধহয় অফিসটা দেখছিলো। আব্বার কথা সে শোনে নি। কেবল মুন্নির কথাই ওব কানে গিযেছে। হঠাৎ সে বলে উঠলো : 'ও মা, আপা কিস্‌সু জানে না। ভাইয়াকে ধরে রেখেছে, যাবে কি করে!'

ভারী ভাল লাগল বাচ্চুর কথাটা। হৃদয়ের মধ্যে আমাব যে অশান্ত ঝড় বইছে, তার মধ্যে আমার বক্তব্য কিভাবে কতখানি পেশ করা যায় তাই আমি ভাব-ছিলাম। আব্বার কথার জবাবে আমি বলতে যাচ্ছিলাম আমার কথা, আব্বার মতোই আবেগমাখা কণ্ঠে। বাচ্চু যেন আমার হয়েই কথা বললো। বাচ্চুকে কাছে টেনে নিয়ে মুন্নির দিকে চেয়ে বললাম : 'ওরা আমাকে ধরে রেখেছে। কি কবে যাব তোমাদের সঙ্গে।' কথাটা বললাম, কারণ আব্বাও বুঝবেন আমার বক্তব্য।

আব্বা আমার অপ্রত্যক্ষ উত্তরটা গ্রহণ কবলেন।

'আমি জানি, তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে,'। আব্বা বললেন, 'তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি অন্য দশটা ছেলের চাইতে একটু বেশীই। তোমাকে আমি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে আসি নি।' আব্বা চুপ করলেন। আব্বার চিঠিগুলির কথা আমার মনে পড়ে যায়। তাঁর চিন্তাধারা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে বেরুতো চিঠি-গুলি থেকে। আব্বার প্রত্যেকটি কথার জবাবে আমিও চিঠি লিখেছি।

'যুক্তি দিয়ে তোমাকে বোঝাব সে আশা আমার নেই। আমি কেবল বলতে এসেছি যে তুমি আমাদের বড় ছেলে। আমাদের সমস্ত আশাভবসা তোমাকে নিয়েই। আমাদের সমস্ত পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে তোমাব খামখেয়ালীতে। তোমার মা বাবাই যদি মরে গেল, তবে কি হবে বাজনীতি দিয়ে। পলিটিক্স তোমাকে ভাত দেবে, না কাপড় দেবে।'

ভাবতে লাগলাম কি বলি। আব্বার জীবনটা কি কষ্টেব তা আমি জানি। তার জীবনের ব্যর্থতার বেদনা আমায় ভাবায়। অশেষ দুঃখ ও বেদনার মধ্যেও আব্বা কোনদিন একটা মিথ্যে বলেন নি। অনেক লোভ এবং প্রলোভনের মধ্যেও আব্বা সাত্বিকের জীবনযাপন করেছেন। আব্বাকে চিঠি লিখতে গিয়েও একটি কথা আমার কেবলই মনে হয়েছে : আব্বা ও আমার মধ্যেকার সম্পর্কটা যেন সমস্ত ঝড় ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করে অটুট থাকে। আব্বাকে কষ্ট দিতে আমার কখনো ইচ্ছে হয় নি। আজও ভাবতে লাগলাম কি জবাব দেওয়া যায় আব্বার

কথার। ইচ্ছে হল বলি ঃ পলিটিক্সের জন্যে মানুষ জন্ম নেয় নি। মানুষের জন্যেই পলিটিক্স। যে রাজনীতি মানুষের জন্য, একান্তভাবে মানুষের জন্য, সেই রাজনীতির একজন ছাত্র হচ্ছি আমি। মানুষের সুখ আর সমৃদ্ধি, শান্তি জীবনের ওপর থেকে বাধার পাষাণ পাথর সরিয়ে দেওয়াই তো মানুষের রাজনীতি। বলতে গেলাম আব্বাকে সাধারণ কথার মধ্য দিয়ে।

'দয়া করে রাজনীতি আলোচনা করবেন না ঃ তাহোলে কিন্তু আমাকে 'ইন্টারভিউ' বন্ধ করে দিতে হবে।' অফিসারটি বললে। আমি আব্বার দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

'এখনি তোমার কোন জবাব আমি চাই নি। আমার কথাগুলো তুমি একটু অন্তর দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করো। আজই তুমি একটা কথা বলে দেবে সেটা আমি চাই না। সেটা আমি আশা করেও আসিনি। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি তোমার আম্মাকে নিয়ে আসবো। তখন যেন না ক'রোনা।'

বুকের মধ্য থেকে একটা বিরাট বোঝা নেমে গেল যেন। তবুও যে কথাটা বলবার জন্যে মনের মধ্যে তৈরী করে রেখেছি, সেটা বলতে না পারার অতৃপ্তি রয়েই গেল মনেব মধ্যে। ভাবলাম ভাল করে ভেবে চিন্তে চিঠি লিখবো আব্বাকে।

'তোমার পড়াশুনা চলছে কেমন? আব্বা শুধালেন। বিষয়ান্তর আমার ভালই লাগলো। উৎসাহের সাথে বললাম, ঃ 'খুব ভাল নয়; সুযোগ সুবিধের বড় অভাব।'

'তোমার প্রতি সবারই খুব আশা ছিল যে পড়াশুনায় তুমি খুব উন্নতি করবে, সবার মুখ আলো করবে।'

আব্বার মনের গোপনে আমাকে নিয়ে কত আশা আকাঙ্ক্ষাই না ছিল। আব্বা জানেন, পঁচিশ বছর কলম-পেশা বৃত্তির পর মৃত্যুর সময় তার উত্তরাধিকারীদের জন্য কোন খড়কুটোই রেখে যেতে পারবেন না। সে ক্ষেত্রে আমিই ছিলাম আব্বার ভরসার যষ্ঠি। তার সন্তান সন্ততিদের জন্য জীবন্ত ওয়াসিয়ৎনামা।

জবাব দিলাম না কোন। 'বইপত্রের দরকার আছে?' আব্বা শুধালেন।

'না, 'বললাম, 'আপনি যা পাঠিয়েছেন তাতেই হবে।'

বাচ্চু এতক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে আব্বার কথাগুলি গিলছিল। কি বুঝছিল, তা সেই জানে। হঠাৎ তার দিকে চাইতেই ভারী লজ্জা পেয়ে গেল সে।

আব্বাকে জিজ্ঞাসা করলাম ; 'বাচ্চুকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন তো আব্বা ?'

আব্বা বললেন : 'হ্যাঁ।'

'কোন স্কুল ?'

'বাচ্চু, ভাইয়াকে তোমার স্কুলের নাম বলো না।'

'আমি বলতে পারি না,' বাচ্চু বলল।

মুন্নিসহ আমি হেসে উঠলাম ওর কথায়।

'ওমা কি বোকা ছেলে তুমি, বাচ্চু, নিজের স্কুলের নামটাও জান না।

লজ্জা পেয়ে বলল, 'জানি।' বোকা আখ্যা নিতে সে রাজী নয়। বলল 'আমি জানি, বলবো না, না।'

আমি হেসে উঠলাম। এবার আব্বা একটুখানি হাসলেন। অবস্থা অনেকখানি হালকা হয়ে গেল।

আমার চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়ালো মুন্নি। আমার দিকে এক নজর চেয়েছিল। মুখটা মলিন ব্যথা ভরা। ওর দিকে তাকালেই আমার কথা মনে পড়ে যায়। কৈশোরের দিনগুলি আর আসবে না।

'কি, কথা বলছিস না যে বড়ো ?' আমাদের পুবাতন 'তুই' বলা আবাব এসে গিয়েছে।

'কি বলবো ?'

বুঝতে পারি, কথা বলার মত ভাষা আজ ওর নেই। অনেকদিন পর প্রথম দেখার প্রাথমিক সংকোচ কেটে গিয়েছে। কেবল ওর বড় বড় নীল চোখ দুটি বিস্ময়ে ব্যথায় তাকিয়ে আছে। ও যেন কত কথাই ভাবছে। মানুষেব জীবনে সে কথার অনেক দাম আছে।

আব্বা ইতিমধ্যেই জেল অফিসারের সঙ্গে আমাদের খাওয়া পরা, পড়াশুনার সুযোগ সুবিধা নিয়ে আলাপ জুড়েছেন। হয়তো আমাদের ছেলেমানুষি কথা বলার সুযোগ দেবার জন্যেই। নিরিবিলি পেয়ে আমি ওর কাছ থেকে খবর নিতে শুরু করলাম।

'আমার জন্যে তোর মন কাঁদে না ?'

মুন্নি একটু লজ্জা পেল। প্রশ্নটা ঠিক এভাবে করা উচিৎ হয়নি।

বাচ্চু বললে, 'জানো ভাইয়া, মুন্নি আপা খালি তোমার জন্যে কাঁদে। কান্না

ছাড়া আর কিস্সু জানে না। ও যতো কাঁদে আম্মা ওকে আরও বেশী ভালবাসে। আমি কাঁদিনা কি না, তাই আম্মা আমাকে—।'

মুন্নি বাধা দিয়ে বলল, 'বাচ্চু,। অতটুকু ছেলে, এতকথা শিখেছে ভাইয়া। খালি বুড়োমী করবে।'

বাচ্চু প্রতিবাদ করলো: 'বারে, আমার কি দোষ? তুমি কাঁদ না? আল্লার কসম ভাইয়া—'

মুন্নিকে লজ্জার হাত থেকে রেহাই দেবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম 'আচ্ছা বাচ্চু, তুমি কাঁদ না যে!'

'আমি যে ব্যাটা ছেলে!'

ওর কথার ধরণ দেখে এবার মুন্নিও না হেসে পাবল না।

'তুমি কেঁদ না কখনো। কাঁদলে মনটা ছোট হয়ে যায়। যারা কাঁদে তারা বড় হতে পারে না।'

বাচ্চু বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল: 'আমি জানি।'

আমি হেসে ওকে বললাম, 'বাচ্চু তুমি আব্বার কাছে যাও তো।'

কিছু বুঝতে না পেরে একবার মুন্নির দিকে তাকিয়ে আব্বার চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

ও চলে গেলে আমি মুন্নির হাত ধরে বললাম, 'কাঁদিস কেন মুন্নি?'

মুন্নি হঠাৎ সত্যি কেঁদে ফেলল।

'আহা আবার কান্না' আমি বললাম, 'ছি বোন কাঁদিস না।'

'ভাইয়া আমার বদদোয়ার জন্যেই তুমি জেলে গিয়েছ।' মুন্নি কাঁদতে কাঁদতে বললে।

'তোমার বদ দোয়ায় জন্যে?' অবাক মানি।

'সেই যে তুমি আমার চুলের ঝুঁটি ধরে মেরেছিলে তোমার বন্ধুকে বাড়ী নেই বলে ফিরিয়ে দিয়েছি বলে—তখন তো আমি আল্লার কাছে মোনাজাত করেছিলাম তোমার যেন জেল হয়।'

আমার বিস্ময়ের মাত্রা বাড়ে।

অতীতের কথা ভাবতে চেষ্টা করি। বাড়ীতে আমাদের গৃহবিবাদের মধুর স্মৃতিগুলি মনে করবার চেষ্টা করি।

আমি গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনে পুরোপুরি অংশ নিচ্ছি। বাড়ীতে আমার ছাত্রবন্ধুরা আসতো প্রায়। এটা কেউ পছন্দ করতেন না। সাদা

পোষাকের লোক এসে বাড়ীর লোকদের মনে আমার সম্পর্কে সন্দেহজনক সব কথা বলে যেত। তাই এক একবার আমাকে নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হতো বাড়ীতে। তিরস্কার শুনতে হতো, দেখানো হতো ভয় ;—'তোর তো জেল হবে', 'কোনদিন এসে ধরে নিয়ে যাবে পুলিসে,—এ সব কথা স্বাভাবতই বাড়ীব সবার সামনেই হতো। ছোটরাও বাদ যেত না। মুন্নি জিজ্ঞেস করতো 'আচ্ছা ভাইয়া তোমার জেল হবে কেন? তুমি চুরি কর? চোরেরাই তো জেলে যায়। আমি বলতাম, 'আজকাল যারা চোর ধরে তারাই যায় জেলে।' কিন্তু আমি জানতাম না কবে আমার জন্যে আল্লার কাছে মোনাজাত করেছিল। আর সে আজও মনে রেখে দিয়েছে। সেটা মনে করে ওর শিশু মনে ব্যথার অন্ত নেই, চোখ থেকে বর্ষণের অন্ত নেই।

ওর দিকে চেয়ে দেখলাম। চোখের জল ইতিমধ্যে শুকিয়ে গেছে। কিন্তু কান্নার ভাব মুখময়। আব্বাও চেয়ে আছেন মুন্নির দিকে। বললেন; 'মুন্নি মা, কেঁদনা। ছি এত লোকের সামনে বুঝি কাঁদে?'

তারপর আবাব মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। ভাবখানা এমনি যেন বলতে চান কাঁদুক। কেঁদে কেঁদে পাথর ছেলেটার মনে যদি একটু মায়ামমতার সঞ্চার করতে পারে তো মন্দ কি?

আমি ওকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বলি, 'তোমার মেনোজাতের জন্যেই আমি জেলে গিয়েছি, একথা বলল কে?'

'আমি জানি', মুন্নি বললে, 'আম্মা বলেন, ছোটবেলার দোয়া আল্লা শোনেন।

আমি ওকে কি করে বোঝাই যে ওব মোনাজাতের কোন হাতই নেই এ ব্যাপারে।

ঘড়িতে তখন পাঁচটা বেজে গেছে। অফিসারটি তাকালো ঘড়ির দিকে। আব্বাও তাকালেন।

'আর তো সময় নেই,' আব্বা বললেন।

'হ্যাঁ', অফিসারটি সায় দিল।

বুকের ভেতরটা আমার ধ্বক করে উঠলো। বেশ তো ছিলাম, বেশতো লাগছিল। মুন্নি আব্বার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। আব্বা পকেট থেকে রুমাল বের করে ওর চোখ মুছে দিলেন।

বললেন, 'পরের বারে তোমার আম্মাকে নিয়ে আসবো। তোমাদের কদ্দিন অন্তর দেখা করবার অনুমতি দেয়?

মুন্নির চেহারা অনেকক্ষণ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। বাচ্চু আমার চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

আব্বাকে বললাম : 'আম্মাকে আমার সালাম বলবেন। বলবেন আমি ভাল আছি ; যেন আমার জন্যে চিন্তা না করেন।'

'ভাল যা আছ তাতো দেখতেই পাচ্ছি। আমি ভাবছি তোমার এই চেহারা দেখলে তোমার মা শেষে কি-ই না করে বসেন।'

'আবার আসার সময় আমার বাহার নানীকে নিয়ে আসবেন।'

অফিসারটি আবার ঘড়ির দিকে চাইল।

বিশ মিনিট পার হয়ে গেছে, সাক্ষাৎ শেষ। কতদিন পরে দেখা! আর মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের জন্য। হঠাৎ মুখ দিয়ে কথা ফোটেনা। আত্মসম্বরণ করতেই পাঁচ মিনিট যায় কেটে। বিশ মিনিটের সাক্ষাৎ করে এখনি আবার ফিরে যেতে হবে, 'নতুন বিশে'।

'সায়েব এবার তো উঠতে হবে।' অফিসার তাগিদ দিলে, 'আরো ক'জনার ইণ্টারভিউ করাতে হবে। তারা তো এসেই গেল।

আমি আব্বার দিকে তাকালাম।

মুন্নি আর বাচ্চু আমার দুই হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

মুন্নির পিঠে হাত রেখে বললাম, 'কাঁদিস না বোন। চিরদিন তো আর এরা ধরে রাখতে পারবে না আব্বা উঠলেন। এগিয়ে এলেন আমার কাছে। মাথা নীচু করে পা ছুঁয়ে সালাম করলাম তাঁকে। উঠে দাঁড়াতেই দেখি আব্বার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়েছে ফোঁটা ফোঁটা পানি।

আব্বা বাচ্চু আর মুন্নির হাত ধরলেন।

বাচ্চু আব্বার আচ্‌কানের কোণা ধরে টানতে টানতে বলতে লাগলো, 'আমি যাব না। আমি ভাইয়ার সঙ্গে থাকবো।'

আব্বা ওর কথায় কান না দিয়ে বলতে লাগলেন, 'তিন তিনটে বছর কেটে গেল, তুমি আমাদের মধ্যে নেই। ওরা বলছে রাজনীতি করবেনা বললেই ওরা ছেড়ে দেবে। তোমার একগুয়েমিই কি বড় হবে? বাপ মায়ের প্রাণের কষ্ট একটুও বুঝবে না? যে মা দশ মাস তোমাকে পেটে ধরেছেন, কেঁদে কেঁদে তার চোখ অন্ধ হয়ে গেল তার দিকে চাইবে না তুমি?'

মুন্নি নীরবে কাঁদছে।

বাচ্চু বলছে : 'আব্বা আমি যাব না ; আমি ভাইয়ার সঙ্গে থাকবো।'

আব্বা আবার বলতে লাগলেন, 'আজ আর সময় নেই, অন্যদিন যখন আসবো, তখন যেন না কোরো না।

আব্বা আমাকে বুকে জড়িয়ে বললেন, 'আল্লা আমাদের জন্যে তোমার প্রাণে একটু রহম দিন।'

অফিসারটি উঠে দাঁড়িয়েছে, বললে, 'মৌলবী সাহেব, এবার তো—'

আব্বা আর একবার আমার দিকে চেয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। আব্বা হাত দিয়ে ধরেছেন মুন্নি ও বাচ্চুকে।

বাচ্চু তখনও কাঁদছে, 'আব্বা আমি যাব না। যাব না; ভাইয়ার সঙ্গে—'

মুন্নি কেঁদে উঠলো, 'ভাইয়া আমি কিন্তু সত্যি তোমাব জেল চাই নি। কেবল রাগের মাথায় বলেছিলাম।'

আব্বা ওদের কথায় কান দিলেন না। দু'হাতে দুজনকে ধরে এগিয়ে গেলেন। তারপব আমার দৃষ্টির সামনেই জেলখানার বড় গেট খুললো! ওরা তখনো কাঁদছে, আব্বা আমি যাব না; ভাইয়ার সঙ্গে থাকবো।' রিক্‌শাটা কখন অদৃশ্য হয়ে গেল টেরও পাইনি। বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইল কান্না। ওদের দিকে চেয়ে চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করলো— আব্বা তুমি আমার ভুল বুঝনা। আম্মা, মুন্নি, বাচ্চু তোমরা আমায় ভুল বুঝনা। তোমারা প্রিয়জন। প্রাণের চেয়ে প্রিয়, প্রাণ দিয়ে ভালবাসি তোমাদের। ইচ্ছে হল হৃদয়ের পুঞ্জীভূত সমস্ত আবেগ দিয়ে বলি: মুন্নি, বাচ্চু তোমাদের ভালবাসি। মুন্নি কেঁদনা।' কিন্তু বলতে পারলাম না কিছুই। ধীরে ধীরে ফিরে এলাম আমাদের কুঠরিগুলিতে। আমাকে ঘিরে দাঁড়াল আমার বন্ধুরা, অনেক অনেক বন্ধু তারা। তাদের দিকে চেয়ে আমার মনে হল, আমি একা নই। একা নয় আব্বা ও আম্মারা। বাচ্চু মুন্নিরা একা নয়। অনেক আব্বা অনেক আম্মা, অনেক বাচ্চু। তাদের প্রাণভাঙা কান্নায় আল্লার আসন যদি নাও টলে ওঠে, তবু তাদের শোক থেকে যে বহ্নির উদ্‌গিরণ হবে তা গ্রাস করবে এই বন্দী দুনিয়াকে। তারপর সেই ধ্বংস ও প্লাবনশেষে আমরা আবার মিলিত হবো। মিলিত হবে আব্বা, আম্মা, বাচ্চু, মুন্নি, আমরা সবাই আর সেই মিলনের আনন্দে, সেই সত্যিকার মিলনের পরম মুহূর্তে আমাদেব সবার মুখেই ফুটে উঠবে হাসির রোশনাই। সেদিন আমরা প্রাণভরে হাসবো।

মুন্নি, সে দিন আমি হাসবো। বাচ্চু, সেদিন তুমি হাসবে।

খেলনা

জাহাঙ্গীর খালেদ

ভাত খাইয়া উঠিতেই ছোট্ট মেয়েটি গামছা আগাইয়া দিল। হাসিয়া হাত মুখ মুছিলাম। তাহার পর সস্নেহে তাহার ঝাঁকড়া চুলগুলি নাড়িয়া দিতে দিতে কহিলাম—কিরে আজ স্কুলে যাবি না? স্কুল নেই?

ও মাথা নাড়িয়া জানাইল, স্কুল ঠিকই আছে। তবে সে নিজে আজ ঠিক নাই, অর্থাৎ আজ সে স্কুলে যাইবে না। কেন যাইবে না তাহা সে বলিল না।

বলিলাম—কেন রে?

যেন অনেক আকাশ পাতাল ভাবিয়া চিন্তিয়া ও কাচুমাচু মুখে কহিল—পেট ব্যথা বাবা। ভীষণ কিন্তু। একেবারে......

—পেট ব্যথা! আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম—সে কি! তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিস কি ভাবে? এ্যাঁ?

ও মুখ ঝাঁকাইয়া কহিল—তুমি একদম বোকা বাবা। কিছু বোঝ না।

—ঠিক। ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলাম। স্বীকার করিবার সঙ্গত কারণও আছে। ওর মাও বলে আমি নাকি বোকার হদ্দ। শুনিতে শুনিতে আমার নিজেরও এতদিনে তাহা বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে।

ঘরে আসিয়া কাপড় চোপড় পরিলাম। দুই তালি দেওয়া জুতা জোড়া, লোম ওঠা ব্রাস দিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘষা মাজা করিয়া যখন হতাশাভরে দেখিলাম, যেমন চাকচিক্য ছিল, তেমনিই আছে, তখন নিতান্ত উপায়ন্তর না দেখিয়া তাহাই পরিলাম।

জুতা ব্রাস করিতে করিতে, যে বিন্দু বিন্দু ঘাম কপালে জমিয়াছিল, তাহা মুছিবার জন্য লং ক্লথের শার্টের পকেট হইতে মার্কিনের রুমালখানা বাহির

করিয়াই তাহার অপূর্ব্ব রঙ দেখিয়া কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া গেলাম। তাহার পর তটস্থ হইয়া যেই তাড়াতাড়ি তাহা পুনর্বার লুকাইতে গেলাম, দেখিলাম দুয়ারে দাঁড়াইয়া সেলিমা তীব্র ভ্রুকুটি সহকারে সেই রুমালখানা পরীক্ষা করিতেছে। চোখটা পিট পিট করিয়া কহিল—ইস্!

ইহারই ভয় করিতেছিলাম। আর সেই জন্যই রুমালখানা তাড়াতাড়ি লুকাইতে গিয়াছিলাম। সেলিমা দেখিবে, নাকটা জোর করিয়া বিস্ফোরিত করিবে, একটা ছোট্ট বেয়াড়া মন্তব্য করিবে, তাহার পর চূড়ান্তভাবে মত প্রকাশ করিয়া বসিবে—তোমার মত বোকা মানুষ দুনিয়াতে···

আর মেয়েটাও যে কি হইয়াছে, সেও মাতার সমর্থনে মাথার ঝাঁকড়া চুল নাড়িয়া বলিবে—ঠিক!

সেলিমাকে কোন মত প্রকাশের সুযোগ না দিয়াই নিতান্ত অপ্রস্তুতের মত কহিলাম—রুমালটা একটু দয়া করে ধুয়ে দেবে ?

সে চটিয়া গেল। তিরিক্ষি কণ্ঠস্বরে কহিল—কোন জিনিসটা আমি তোমার না ধুয়ে দিই ? ও ভাবে তুমি বেয়াড়া কথা বল কেন ? তুমি একটা···

বুঝিলাম 'দয়া' বলাতে ও চটিয়া গিয়াছে।

তাহার দেওয়া পানটা মুখে পুরিয়াই টের পাইলাম পানটাতে সুপারীর মাত্রাতিরিক্ত অনাধিক্য। কিন্তু তাহাতে আর্থিক বিপর্যয়ের লঘু সত্য প্রকাশ পাইবে ভাবিয়া আমি আর কিছু তাহাকে ভয়ে কহিলাম না।

সিঁড়ির দোর গোড়ায় আসিতেই মেয়েটা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ও কিছু কহিবে ভাবিয়া কহিলাম—কিছু বলবি আমায় ?

একটু ইতস্তত করিয়া সে কহিল—একটা খেলনা আনবে বাবা ? একটা পুতুল। ও বাড়ীর হাসিনার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব। আনবে ?—

বলিয়া সে মাতার মুখের দিকে চাহিল। আর এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে সে যাহা আশা করিতেছিল, তাহাই ঘটিল। সেলিমা ধমক দিয়া কহিল—পিছু ডেক না দিকু, কতদিন না তোমায় বলেছি।

তাহার পর আমার দিকে তাকাইয়া, সেই সমান ওজনের একটা ধমক দিয়া কহিল—মেয়েটাকে তুমি দিন দিন নষ্ট করছ। দেখো আবার পয়সা খরচ করো না। তুমি ত' আবার···

কথাটা শেষ হইবার আগেই আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম তাহার অন্ত কোথায়। তাই তাহাকে সম্পূর্ণ শেষ করিতে না দিয়াই কহিলাম—তা ঠিক।

—কি ঠিক ? কথাতে বাধা পড়ায় ও তীব্র ভ্রুকুটি করিয়া তাকাইল।

—এঁ্যা!—না—না—ও কিছু নয়। বলিতে বলিতে অবস্থা বেগতিক দেখিয়া তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে বারে বাবে মেয়েটার আব্দার মনে পড়িতে লাগিল। ধুসব কোটটাব পকেটে একটা ছোট্ট সিকি বারে বারে যেন ডান হাতে খোঁচা দিয়া সেই কথাটাই মনে করাইয়া দিতে লাগিল। মেয়েটা একটা মাত্র খেলনা চাহিয়াছে। কি করিয়া তাহাকে হতাশ করি ? অথচ সম্বল মাত্র ঐ এক সিকি। তাহা হইতে আবাব বিকালে এক আনা খরচ করিয়া সেই চকে মেয়ে পড়াইতে যাইতে হইবে। আড়াই মাইল রাস্তা তখন আর হাঁটিয়া যাওয়া আমাব পক্ষে সম্ভব হইবে না।

থমকাইয়া দাঁড়াইলাম। বড় দোকানটার শো' কেসে এক রাশ সম্ভ্রান্ত জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় দুইটা পুতুল আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দূর হইতেই তাহাদেব চাকচিক্য আর কারুকার্য আমার চোখ ধাঁধাইয়া দিল। কৌতুহল বশে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। চকচকে পালিশ করা পুতুল দুইটা। দিকু ইহাব মত একটা পুতুল পাইলে না জানি কত খুশী হইত। কিন্তু পাশে চাহিলাম—একখানা ছোট্ট পিস বোর্ডের কাগজে একটা পুতুলের যে দাম লেখা বহিযাছে, তাহা দেখিয়া রীতিমত চমকাইয়া উঠিলাম। মুখ হইতে হুট কবিয়া বাহিব হইযা গেল—একটা পুতুলের দাম বারো টাকা সাত আনা!

পাশে আরো একজন ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া বুঝি তাহাই দেখিতেছিলেন। তিনি আমাব দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন—শুধু বারো টাকা সাত আনা কেন ? পনেবো টাকাব আছে, পঁচিশ টাকার...

দ্রুত পা চালাইলাম পথে। ভদ্রলোক যে ভাবে হড় হড় করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হইয়াছিল। আর কি। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম।

—শুনছেন সাহেব, ও সাহেব। শুনছেন ?

—এঁ্যা!

তাকাইয়া দেখিলাম, সেই ভদ্রলোক হন হন করিয়া আমার দিকে আসিতেছেন আর আমাকে ডাকিতেছেন।

ভীত হইয়া উঠিলাম। ভদ্রলোক যে ভাবে আমার দিকে তাড়িয়া আসিতেছেন, তাহা আপত্তিজনক। গুণ্ডা বদমাস নয় ত'। শেষে আবার...

ভদ্রলোক দূর হইতেই চিৎকার করিয়া কহিলেন—এ্যাই যে, পালাবেন না কিন্তু আপনি। দাঁড়ান একটু।

পালাইব! ব্যাস্, গুণ্ডা ছাড়া আর কিছু নয়। বাঁ পাশে যে ছোট্ট গলি পথ ছিল, ধা করিয়া তাহাতে সিধাইয়া গিয়া দ্রুত পা চালাইলাম। বেঘোরে প্রাণটা যাইবে দেখিতেছি।

পেছনে তাকাইয়া দেখিলাম, তিনিও দ্রুত পদে আসিতেছেন। ডাকিতেছেন—আরে সাহেব দাঁড়ান। পালাচ্ছেন কেন?

দৌড় দিব কিনা ভাবিতেছি, হঠাৎ দেখি রাস্তা একটা বাড়ীর ভিতর সোজা সিধাইয়া গিয়াছে। শেষে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া মার খাইব নাকি। এই গলিতে ঢোকাতেই ভুল হইয়াছে।

ভদ্রলোক কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন। কহিলেন—শুনেন না কেন একটু।

চিৎকার করিয়া কহিলাম—দয়া করে কাছে আসবেন না। দূর থেকেই যা' বলবার বলুন।

—কেন? ভ্রূ কুচকাইয়া ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন।

—কেন আমার কান নেই, শুনতে পাব না দূরে থেকে?

—ও। ভদ্রলোক দাঁত বাহির করিয়া হাসিলেন। তাহার পর আমার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আমারই মত একটা রুমাল বাহির করিয়া তিনি মুখ মুছিলেন। তাহার পর কহিলেন—অর্ধেকটা শুনেই চলে এলেন, তাই বাকীটা শোনাতে এলুম। শুধু বিশ টাকাই নয়, এর পর আছে পঁচিশ টাকার, ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ, তারপর···

—দয়া করে আর বলবেন না। হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিলাম।

প্রবল বেগে মাথা নাড়িতে নাড়িতে ভদ্রলোক কহিলেন—না, না। একটু সহ্য করুন। এ্যাই ত' হয়ে গেল। মানে—পঞ্চাশ টাকারও পুতুল আছে।

—বাপরে।—আর্তনাদ করিয়া উঠিলাম।

ব্যস্ত হইয়া ভদ্রলোক সহানুভূতির স্বরে কহিলেন—ব্যথা পেলেন?

ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলাম—না।

—একটা বিড়ি খেয়ে নিন। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কাতরকণ্ঠে কহিলাম—আচ্ছা।

আবার পথে নামিলাম। কিন্তু মেয়েটা চাহিয়াছে—অন্ততঃ একটা সস্তা দামের পুতুল ত' দিতে হইবে।

সদর রাস্তাটা পার হইয়া এদিকে আসিতেই ফেরিওয়ালার ঠেলাগাড়ী চোখে পড়িল। উৎসুক নেত্রে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কহিলাম—খেলনা আছে? পুতুল, ছোট্ট পুতুল হবে তোমার কাছে?

—হোগা সাব। ঠাইড়িয়ে?

হরেক রকম পুতুল সে আমার সামনে দিল। গড় গড় করিয়া হরেক রকম দামও বলিল। কোনটাই আমার পকেটের সাথে মিল খাইল না। তবু ইহাদের মধ্য হইতে একটা বাছিয়া লইয়া কহিলাম—দাম কত এর, এঁ্যা?

—উস্‌কা?—সাড়ে পাঁচ আনা। লেকিন উতো ঝুটা রদ্দি মাল হ্যায়। মাত্‌ লিজিয়ে। ইয়ে দেখিয়ে, ইয়ে আচ্ছা হ্যায়।—সে কহিল।

রদ্দিমাল! আমার পকেটটাও যে এখন প্রায় রদ্দি রদ্দি। কহিলাম—তা' হোক। এটাই নেব আমি।

চোখ দুইটা পিট পিট করিয়া সে কহিল—তো লিজিয়ে সাড়ে পাঁচ আনা।

—সাড়ে পাঁচ? একটু কম হয় না? এই মানে তিন আনা?—বাস ভাড়া। এক আনা হাতে রাখিয়া দর কষিলাম।

—নেহি সাব। পুতুলটা সে আমার হাত হইতে লইয়া রাখিয়া দিল।

মনে করিলাম, বিকালে না হয় হাঁটিয়াই পড়াইতে যাইব। কিন্তু চার আনায় কি পুতুলটা পাওয়া যাইবে? ভয়ে ভয়ে কহিলাম—চার আনায় হবে? চার আনা?

ও একটু যেন চিন্তা করিল। তাহারপর পুতুলটা আমার হাতে দিতে দিতে কহিল—আচ্ছা লে যাইয়ে।

মনে মনে সান্ত্বনা পাইলাম—মেয়েটার মুখে যদি একটু হাসি ফোটে, তা না হয় কষ্ট করিয়া বিকেলে একটু হাঁটাই যাইবে।

পাশের দোকানের বড় ঘড়িতে চোখ পড়িতেই আঁতকাইয়া উঠিলাম। দশটা সাত। এই রে সর্বনাশ। আজ নির্ঘাৎ মারা যাইব।

প্রায় ছুটিতে ছুটিতে চলিলাম। তবু অফিসে যাইয়া দেখিলাম প্রায় পঁচিশ মিনিট লেট। হাজিরার খাতায় সই করিতে যাইতেই চোখ ঘোঁচ করিয়া সাহেব তাকাইলেন—আধ ঘণ্টা আজ লেট, আলি সাহেব।

সমস্যায় পড়িয়া গেলাম। আমার ঘড়িটা খারাপ এই কথা বলিব, না মেয়ের

জন্য একটা খেলনা কিনিতে দেরি হইল, এই কথা বলিব? কোনটা কার্যকরী হইবে।

একটু ইতস্তত করিয়া কহিলাম—মেয়ের জন্য একটা খেলনা, মানে একটা পুতুল কিনতে দেরি হয়ে গেল। তাই আমি……

—খেলনা! কিঞ্চিৎ যেন বিস্মিত হইলেন সাহেব। কহিলেন—দেখি কি রকম?

কুণ্ঠিত মুখে দেখাইলাম। মুখটা ঘোঁচ করিয়া তিনি কহিলেন—বাজে। এর জন্য এত দেরি হয়ে গেল? যান।

কাচু মাচু মুখে বাহির হইয়া আসিতে আসিতে মনে মনে কহিলাম—তাত তুমি বলবেই সাহেব। কে কত মায়না পায়, খেয়াল করেছ?

নিজের চেয়ারে আসিয়া বসিতেই সহযোগী ঘাড় আলগা করিয়া কহিলেন—এই যে সাহেব? এত দেরি?

কৃতার্থের হাসি হাসিয়া কহিলাম—মেয়েটাব জন্য একটা পুতুল কিনতেই….

—পুতুল! দেখি দেখি?—

পুতুলটা হাতে লইয়া সহযোগী অনেকক্ষণ পর্যন্ত নাড়িয়া চাড়িয়া, ঘোরাইয়া, ফিরাইয়া, টিপিয়া, ঠুকিয়া, টোকা দিয়া শেষে মন্তব্য কবিল—নাহে। তুমি ঠকেছ দোকানীর কাছে। মালটা সত্যি বাজে।

দারুণ মুষড়াইয়া পড়িলাম। সত্যি জিনিসটা কি বাজে? এতক্ষণ মনে হইতেছিল—দোকানী বেশী দামের জিনিস গছাইবার জন্য ঐ পুতুলটাকে রদ্দি বলিয়াছিল। আর সাহেবও ঐ বারো টাকা সাত আনাব জিনিস কিনেন বলিয়াই হয়ত পুতুলটাকে রাবিশ বলিয়াছিলেন। মনে আশা ছিল, হয়ত বা জিনিসটা ভালই। কিন্তু এখন এই সহযোগী, যে আমাব মতই মায়না পায়, সেও যখন বলিল যে জিনিসটা একদম বাজে, তখন আর সন্দেহ নাই যে সত্যি জিনিসটা রদ্দি মাল!

মনটা খারাপ হইয়া রহিল। সন্ধ্যা হইতেই সেই আড়াই মাইল রাস্তা হাঁটিয়া পড়াইতে আসিলাম। ভরাক্রান্ত মনে চেয়াবে বসিতে বসিতে পুতুলটা মেয়েটার হাতে দিয়া কহিলাম—দেখ ত' বাণী। কেমন পুতুলটা।

একটা অপরূপ মুখ ভঙ্গি করিয়া বাণী পুতুলটা দেখিতে লাগিল। তাহার পর বাঁ চোখটা একটু ছোট্ট করিয়া কহিল—একদম পচা জিনিস মাষ্টার সাহেব। গায়ে সাড়ী নেই, কোমরে কলসী নেই…

মর্মাহতভাবে কহিলাম—একদম বাজে?

ও মাথা নাড়িল—হ্যাঁ।

অসহায়ভাবে পুতুলটা পকেটে রাখিলাম। বাণী আর দিকু প্রায় সমবয়সী। বাণী যখন পুতুলটাকে বাজে বলিয়া অপছন্দ করিল, তখন নিশ্চয়ই তাহা দিকুর পছন্দ হইবে না। চিন্তাটা মন হইতে দূর করিতে পারিলাম না। কিন্তু পুতুলটাকে যে ফেলিয়া দিব, তাহাও আমার সাধ্যে কুলাইল না। এত কষ্ট স্বীকার করিয়া চার আনা দিয়া পুতুলটা কিনিয়াছি। কি করিয়া তাহা একদম ফেলিয়া দেই ?

ক্ষুধা আর চিন্তা আমাকে একদম ভাঙিয়া দিয়াছিল। অসহায়ভাবে তাই বাসায় ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করিলাম। ঘরে ঢুকিয়া আরো মুষড়াইয়া পড়িলাম। সেই রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্ত দিকু আমার জন্যে জাগিয়া মায়ের কোলে বসিয়া রহিয়াছে। রোজ এই সময় আসিয়া আমি দিকুকে ঘুমন্ত অবস্থায় পাই। আজো তাহাই আশা করিতেছিলাম। কিন্তু বুঝিবা ও পুতুলের জন্যই এত রাত অবধি জাগিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

আমার কাছে আসিয়া কহিল—এনেছ বাবা ?

কুণ্ঠিতভাবে পুতুলটা তাহার হাতে দিতে দিতে কহিলাম—এনেছি মা।

সেলিমা রাগিয়া গিয়া কহিল—তোমায় না বাজে জিনিস কিনতে আমি···

সেলিমা কি কহিতেছে তাহা আমার কানে গেল না। ভীষণ দুরু দুরু বুকে আমি দিকুর দিকে চাহিয়াছিলাম। সে বাণীরই মত একটা অপরূপ মুখ ভঙ্গি করিয়া পুতুলটা নিরীক্ষণ করিতেছিল। সহসা তাহার মুখটা একটু কুঁচকাইয়া আসিতেই এক অজ্ঞাত ভয়ে আমি অন্য দিকে চাহিলাম।

আর সাথে সাথে দিকু চিৎকার করিয়া উঠিল—কি সুন্দর বাবা।

চমকাইয়া উঠিয়া তীব্র কণ্ঠে কহিলাম—কি বললি ?

ও ভয় পাইয়া কাঁপা কাঁপা গলায় কহিল—কেন বাবা, সুন্দর ত' !—দারুণ আবেগে মেয়েটাকে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিলাম। মনের অজ্ঞাতে কোন এক দুর্বল জায়গায় আঘাত পড়ায়, বুঝিবা দুই ফোঁটা পানি চোখ হইতে গড়াইয়া পড়িল।

চোখের পানি মুছিবার জন্য হাত তুলিতেই দেখি, এক রহস্যময় দৃষ্টি লইয়া সেলিমা আমার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে !

অপ্রস্তুতের হাসি হাসিলাম।

দিকুর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে পুনর্বার লক্ষ্য করিলাম যে, তেমনি আশ্চর্য রহস্যময় দৃষ্টি লইয়া সে আমার দিকে তাকাইয়া আছে।

তাস

সৈয়দ শামসুল হক

দু'খানা দশহাত বারোহাত কামরার সামনে এক চিলতে বারান্দা আর বিঘৎরকমের ছোট এক দরোজা এক জানালা নিয়ে রান্নাঘর। রান্নাঘর বলতেও ওই, ভাঁড়ার বলতেও ওই। শোবার ঘর দুটো তাই তৈজসপত্র এটাসেটায় এত গাদাগাদি যে নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গাটুকু খালি নেই। পথ থেকে ডান-ধারের কামরায় আবার পার্টিশন দিয়ে হরেদরে একটা বসবার ঘরের মত করা হয়েছে। বারান্দার নিচে হাত তিনেক ঢালু জায়গা, তার অর্ধেক আবার এক কুয়োয় আটকানো। বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে কখনও আকাশ দেখা যায়। জানালা দিয়ে মুখ ফেরালে পথটুকু। বাসা বলতে তো এই। ঘষেমেজে সাফসুৎরো করবার কোন কথাই ওঠে না। তবুও কি মা দিনরাত কম চেষ্টা করেন একটু ছিমছাম করে তোলবার জন্য? কিন্তু হলে হবে কি, আশপাশের আবহাওয়াই এমনিতর যে, সব সময়েই মনে হয় বাসাটা যেন মুখ ভার করে রয়েছে। এত করেও কিচ্ছু হয় না।

তবুও আজ মার যেন কেমন ছায়া-ছায়া অন্ধকার বলে সব মনে হলো। মনে হলো কে যেন পুরু করে সারা বাসায় মেখে দিয়েছে গা ছমছম করা নির্জনতা। অথচ সকলেই তো রয়েছে বাসায়। সন্ধ্যে হয়েছে একটু আগেই। কিন্তু কেমন যেন পুরু অন্ধকার করে এসেছে চারদিক এখনই। বারান্দায় চালভরা 'কুলো' হাতে করে মা ভাবলেন, সালেহা রান্নাঘরে, বুলু-টুনু-বেবী ওইতো বাঁ ধারের ঘরেই তো রয়েছে, হয়ত পড়ছে। আর খোকন—। তবু মার যেন বড্ড একেলা মনে হলো! মনে হলো, অন্ধকার কোন এক পাথারে তিনি একা।

নিঃসঙ্গ।

কেউ নেই।

পা দুটো মার থরথর করে কেঁপে উঠলো। হয়ত দুর্বলতায়। তাড়াতাড়ি তিনি 'কুলো' হাতে করে বসে পড়লেন। তারপর আনমনে যেটুকু আলো এঘর ওঘর থেকে বারান্দার অন্ধকার মুছে দিচ্ছিল তাতেই তিনি চাল বাছতে বসলেন।

বারান্দার উত্তর কোণে দাঁড়িয়ে বাঁ ধারের কামরায় দেয়াল ঘড়িটা স্পষ্ট দেখা যায় দরোজার ফাঁক দিয়ে।

কেমন বড় আর অদ্ভুত এই পুরোনো ঘড়িটা। সেকেণ্ড থেকে শুরু করে মিনিট থেকে ঘণ্টা অবধি এমন কি মাসের আজ কত তারিখ সব তুমি ঘড়ি দেখে বলে দিতে পারবে। একটুও কষ্ট হবে না। সেই কবে যে ওটা কেনা হয়েছিল তা মা নিজেই বলতে পারবেন না। এতদিন ওটা দেশের বাড়ীতে বড়ঘরে, পেছনের দেয়ালে, খুঁটিতে ঝোলানো ছিল। খোকন যখন শহরে চাকরি পেল, তিনিই তো তখন ওটা ছেলেকে বলে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর থেকে সেই একজায়গাতেই ঘড়িটা রয়েছে। একটুও নড়চড় হয়নি।

বেশ মনে পড়ে তাঁর, বিয়ের পর পাঁচগাঁ থেকে যখন কদমতলি শ্বশুর বাড়ীতে এলেন তিনি স্বামীর হাত ধরে, তখন, উৎসবের অত কোলাহল আর নিজের নিদারুণ লজ্জায় যখন বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছিল, তখনও তিনি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলেন, বড়ঘর থেকে অদ্ভুত গম্ভীর সুরে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজলো। এক দুই তিন করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে শুনেছিলেন তিনি।

তারপর রাতে শোবার পালা। কারা যেন হাত ধরে তাঁকে টেনে বড়ঘরে নিয়ে এসে কানে কানে বলেছিল কি যেন, ভালো করে মনে নেই। একথা সেকথায় স্বামী হাত ধরে আরো কাছে এনে মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঘড়ি দেখতে জানো তুমি?

এখনও তিনি চোখের সামনে দেখতে পান স্বামীর বাঁ হাত ঘড়িটার দিকে তুলে ধরা। তর্জনীর দৃঢ় সৌষ্ঠব আজও তিনি ভোলেননি।

তারপর হাত ধরে ধরে কেমন তৃপ্তস্বরে স্বামী তাঁকে শিখিয়েছিলেন ঘড়ি দেখা।

আর ওই যে পেতল রঙ সরু কাঁটা দেখছ, ওটা মাসের আজ কত তারিখ তা বলে দেয়।

আশ্চর্য, হুবহু মনে পড়ে তাঁর। একটা হারিকেনই বুঝি মৃদু আলোতে ঘর ভরে দিয়েছিল সে রাতে।

সেই থেকে এইতো সেদিন অবধি কতবার যে ঘড়ি দেখে সময় জেনেছেন, তারিখ পেয়েছেন, তার তো আর লেখাজোখা নেই।

নির্জন দুপুরবেলায় গোটা পৃথিবী যখন অলস হয়ে পড়ে, যখন বাসায় কেউ থাকে না, তখন বিধবা মেয়ে সালেহার পাশে বসে এটা সেটা কথা কইতে কইতে তিনি পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ঘড়িটার দিকে তাকান। চোখ ফিরিয়ে আনতে পারেন না।

স্বামীর স্পর্শ যেন এখনো লেগে রয়েছে ঘড়িটার গায়ে। এখনো ঘড়িটা যখন ঢং ঢং করে বেজে ওঠে তখন মাঝে মাঝে কিশোরী বয়সের সেই লজ্জা আর চঞ্চলতা ভিড় করে এসে তাঁকে বিমূঢ় করে দেয়।

ঘড়িটার চারধারে ফ্রেম ঘুণ ধরে খেয়ে ফেলেছে আর চকচকে কালো বার্নিশতো কবেই উঠে গেছে, তার খোঁজ কে রাখে।

স্বামী মারা গেছেন আজ প্রায় পাঁচ বছর। এরপর থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে তিনি নিজহাতে দম্ দিয়েছেন ঘড়িতে। আর খোকনের সাথে শহরে যখন এলেন তখন তিনি ছাড়া আর কেউ কি ঘড়িটার দিকে এতটুকু নজরও দিয়েছিল। কটা বাজে? খোকন ফস্ করে বাঁ হাত ওঁচায়। হাতঘড়িগুলো দু'চোখে দেখতে পারেন না তিনি। এত বড় একটা ঘড়ি থাকতে ঘরের মধ্যিখানে, খোকনের কাছে সবাই সময় জানতে হুড়মুড় করে পড়ে কেন, মা ভেবে পান না। অবশেষে কি করে যে নিজের ওপরেই শেষকালে দুঃখ হয় তা তিনি নিজেই বুঝতে পরেন না।

জানালাটা খুলে দাঁড়ালে এবড়ো-খেবড়ো খোয়াওঠা পথ চোখে পড়ে। কেমন এঁকে বেঁকে মুদি দোকানের সুমুখ দিয়ে, ক-একটা হালকা একতালা বাড়ীকে ডানহাতিতে ফেলে তারপর মোড় নিয়ে কোন সড়কে উঠেছে, কে জানে? জানালার ধারে কতদিন পথ দেখতে দেখতে মা ভেবেছেন: রাজার মত লোক ছিলেন খোকনের বাবা। দুধের বাটীতে হাত ডুবিয়ে ননী দেখে

তবেই না একচুমুকে সবটুকু খেয়ে ফেলতেন। সে কথাতো আজও ভোলেননি। এলোমেলো খাপছাড়া সব স্মৃতি মার মনে এসে ভিড় করে।

অসহায়ের মত তিনি ভাবেন, বাবাকে খোকন ওরা কেউ ভালবাসে না, একটুও শ্রদ্ধা করে না। নইলে আজ ক-এক সপ্তাহ ধরে, মার জীবনে এই প্রথম, ঘড়িটা বেঠিক চলছে। ভুল সময়ে বেজে ওঠে ঢং ঢং। অথচ খোকনের এতটুকু ভ্রূক্ষেপই নেই। কতবার বলে বলে হদ্দ হয়ে গেলেন, কই খোকন তো কোনো গরজ দেখায়নি। ওরা কি জানে, ঘড়িটা বেঠিক চলায়, তারিখের কাঁটা অন্ধকারে পথ চলার মত এলোপাথাড়ি চলায় তাঁর মন কেমন করে ওঠে? কেমন এক দম আটকানো কান্না তাঁর গলার কাছে এসে পাথরের মত আটকে রয়েছে, ওরা তার কি জানবে? ভারী কান্না পায় মার। হয়তো তিনি কাঁদবেনও। নইলে হঠাৎ কেন তিনি আঁচল খুলে চোখ মুছতে যাবেন?

এটা হয়তো মার বাড়াবাড়ি। স্বামীকে তিনি ভালবেসেছিলেন সত্যি-কারের। দেবতাব মত তাঁকে করেছের্ন শ্রদ্ধা। আর দেবদাসীর মত করেছেন সেবা। তাই না স্বামীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব আজ অবধি তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে নিবিড় ছায়ার মত।

কেমন যেন তার ভালো লাগে ভাবতে, সারাটা জীবন ভেবেছেনও, স্বামীকে তিনি ছাড়া আর কেউ আপন করে দেখেনি। তাই কেউ যদি ওকে আপনার বলে দাবি করে, শ্রদ্ধা জানায় তাহলে তাঁর চোখ অবিশ্বাসে ভরে ওঠে। তিনি ভাবেন এটা ওদের কর্তব্য, তাই করে গেল। আজও স্বামীর স্মৃতিকে তিনি একলাই একটু একটু করে সম্পূর্ণ উপভোগ করতে চান। কিন্তু লজ্জা এসে দেখা দেয়, দ্বিধা জাগে। ভয় হয়, পাছে কেউ জেনে ফেলে। তাই ভেতরে ভেতরে গুমরে মরেন তিনি। ভালো করে খোকনকে বলতে পারেন না, আদেশের কথা তোলাই থাক, অনুরোধও করতে কেমন সঙ্কোচ দেখা দেয়। কিন্তু এ তিনি কেমন করে ভাবেন যে তাঁর নিজের ছেলেরা অবধি ওকে ঠিক মত শ্রদ্ধা করে না, যতটুকু করে তাও হয়তো লৌকিকতা। এটা হয়তো মার বাড়াবাড়ি।

কেন আজকেই তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই খোকন বলেছে, মা, আজ মাইনে পাবার তারিখ। আজকেই ভালো মেকার নিয়ে আসব'খন দেয়ালঘড়িটা ভালো করাতে।

তারপর একটু চোখ তুলে বলেছিল, কদিন মাত্র ঘড়িটা বেতালা হয়েছে আর দেখো দিকি।

কি মনে করে মা ফস করে বলে বসেছিলেন, কিন্তু অল্পের জন্য কি এতদিনের পুরোনো ঘড়িটা নষ্ট হয়ে যাবে ?

সহসা তাঁর দৃষ্টি শঙ্কাতুর হয়ে উঠেছিল গভীরভাবে। কিন্তু কি ভাগ্যি, খোকনের চোখে পড়েনি। খোকন বলেছিল, ধেৎ, তুমিও যেমন, কালকের সকালের ভেতরই দেখবে কেমন নতুন হয়ে গেছে ঘড়িটা। ভাবছি এক পোঁচ রঙ করাব এবার ফ্রেমে। আচ্ছা মা, কোন রঙ হলে মানাবে ভালো বলোত ?

ঘুণে ধরা কাঠে আবার রঙ দিয়ে শুধু শুধু—তার চেয়ে আগে ঠিক হোক তো ঘড়িটা।

খোকন সহসা মিষ্টি হাসে।

ঠিক হয়েছে, মেহগনি রঙ করাব। গাঢ় মেহগনিতে পুরোনো জিনিস ভারী মানায় কিন্তু।

আগে ঘড়িটা তো ভাল কর, তারপর ওসব দেখা যাবে !

খোকন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে বিছানায় শুয়ে। মা চলে যেতে চান কিন্তু পারেন না। শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থেকে কি করবেন ভেবে পেলেন না।

মা, চা হলো ?

একটা ছুতো পেয়ে মা চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

সালেহা মুড়ি-তেল মাখাচ্ছে। আমি নিয়ে আসছি, তুই উঠে বোস। খেতে খেতে চা হয়ে যাবে'খন।

এক দমে কথাগুলো বলে মা বেরিয়ে যান।

সালেহার দিকে তাকিয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে খোকন ভাবে, সালেহার বিয়ে দিয়েছিলেন বাবা বড় আদর করে। অনেক খরচ করে। কিন্তু টেকেনি সে সুখের সংসার। খোকন চাকরি পাবার কিছুদিন বাদেই নিরাভরণ সালেহা এসে পা দিয়েছিল এই বাসায়। আর তার চোখ পানিতে ভরে উঠেছিল। বাবা বেঁচে থাকলে দুঃখ পেতেন অনেক। হঠাৎ তার মনে পড়ল মাসখানেক আগে ও একখানা চুলপেড়ে ধুতি চেয়েছিল তার কাছে। মিহি জমিন হলে ভাল হয়, কত সময়ে লাগে, এমনি কি কি যেন বলেছিল সালেহা। কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল সে। জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা সালেহা, কাপড় চেয়েছিলি না তুই ?

সালেহা কোন উত্তর করে না।

কাপড় চাইতেও তোর লজ্জা? একেবারে ছেলেমানুষ তুই। যা দরকার চাইবি, চাইবি বৈকি।

খুব বেশী দরকার নেই তো আমার।

মিছে কথা। আজকেই আনব'খন। দেখিস তুই।

দাঁড়াও বেবীর পড়া বলে দিয়ে আসি।

হুঁ।

পড়তে জানেনা মোটে, তুমি জোরে ভর্তি করে দিয়েছ, এখন ভুগছে দেখছ তো।

সালেহা কথা বলতে বলতে বাঁদিকের কামরায় ঢোকে। এঘরে বসেও স্পষ্ট বুঝতে পারে সে, সালেহা চুপ করে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়াল। জানালাটা দিয়ে পথ দেখা যায়।

কেমন এক অদ্ভুত মানসিকতায় মা ভাবতে শুরু করেন, কিইবা প্রয়োজন ছিল খোকনের আপিস থেকে ফিরবার পথে রিকৃশ করবার। কেন, অন্যদিনের মত বাসে করে এলে কি এমন শাস্ত্র অশুদ্ধ হতো? মা ঠিক জানেন না রিকৃশর ভাড়া আপিস থেকে কত? কিন্তু এটা তো ঠিক জানেন মিছেমিছি কতগুলো পয়সা খোকন অপব্যয় করলো।

কিন্তু খোকন যখন সন্ধ্যের একটু আগে বাসার দরোজায় রিকৃশ থেকে নাবলো তখনও তো মার মন এক সামান্য অপব্যয়ে বিচলিত হয়ে ওঠে নি।

খোকনের এটা অনেক দিনের অভ্যাস। মাইনে পেয়ে ফিরতি পথে কোনদিনই সে বাসে কিংবা হেঁটে ফেরেনি। পুরানা-পল্টনের মোড় থেকে একটা রিকৃশ করে ফেরা অন্ততঃ সেদিনের জন্য প্রয়োজন বলে মনে করেছে।

মাইনে নিয়ে সে আজ একটু সকাল সকালেই আপিস থেকে বেরিয়েছিল। পথে এটা সেটা কিনে যখন বাসায় ফিরল তখন সন্ধ্যে হতে আর বড় বেশী বাকি নেই। মা এসে দরোজা খুলে দিলেন। ঘরে এসে চৌকির ওপর বসলো খোকন। বুলু, টুনু, বেবী আর সালেহা কাছাকাছি ভিড় করে এসে দাঁড়ায়। মা একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

সালেহা, এই নে' তোর মিহি জমিন কাপড়। দেখতো কেমন হয়েছে?

খোকন কাগজের মোড়ক খুলে কাপড়টা ওর দিকে ছুঁড়ে দিল।

দাম যদিও নিয়েছে পনেরো টাকা আটআনা, কিন্তু জিনিস ভালো। আর

মা, এই নাও তোমারও কাপড়। তুমি তো আর কোনোদিনই চাইবে না কিছু। নাও।

মা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে কাপড়খানা হাতে তুলে নেন। কিন্তু ক্রমেই তিনি অধৈর্য হয়ে পড়ছেন, আজকেইতো খোকনের কথা ছিল ঘড়িওলাকে নিয়ে আসবার। কই খোকন তো কোন কথাই বলছে না সে নিয়ে। ভাবলেন তিনি একবার জিজ্ঞেস করবেন, পরমুহূর্তেই আবাব সেই লজ্জা এসে তাঁকে ঘিরে ধরল। বুলু, টুনু, বেবীর জন্য খাতা কলম মার্বেল এটা সেটা আরো কত কি কিনেছে ও। হাতে ধরে তুলে দিচ্ছে। তবুও এক অদ্ভুত অতৃপ্তি মাকে ক্রমে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

বুলু, এই দ্বিতীয়বার তোমায কলম কিনে দিলাম, এবারও যদি হারাও তাহলে আর রক্ষে নেই। যাও সন্ধ্যে হযেছে পড়তে যাও, যাও।

ওরা সবাই চলে গেল। মাও নিঃশব্দে পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলেন।

তারপর মা অস্থির অশান্ত হৃদয়ে বার ক-এক উঠোনে পায়চারি করলেন। দু'একটা তারা ফুটে উঠেছে আকাশে, তাকিযে দেখলেন খানিক। অবশেষে যখন মোড়ের মসজিদ থেকে বুড়ো মোযাজ্জিনেব আজান ভেসে এল তাঁর কানে তখন চমক ভাঙল। কুযোর পাড় থেকে 'ওজু' করে এসে বারান্দার এক কোণে পাটী বিছিযে মনকে শান্ত সংযত করে বসলেন মগরেবের নামাজ আ'দা করতে।

খোকন বিমুগ্ধ হয়ে গেল। মায়ের এমন মূর্তি সে কোনোদিন দেখেছে বলে মনে পড়লো না তার। কি সৌম্য সংযত মার মুখখানি। আর কি তন্ময়তা তাঁর প্রতিটি মুহূর্তে। খোকন বিস্মিত হয়ে গেল। মাকে খুঁজতে এসে সে দেখল মা নামাজ আ'দা করছেন। হাতমুখ ধুয়ে সে পথের দিকের দরোজা খুলে চেয়ারে এলিয়ে পড়ল।

পেছন ফিরে থেকেও খোকন স্পষ্ট বুঝতে পারল, মা হাঁটছেন বাবান্দায। ডাকলো, মা।

মা এসে ঘরে ঢুকলেন। খোকন পেছন ফিরে মার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে উঠে দাঁড়াল। শার্টের পকেট থেকে টাকাগুলো বের কবলো। তারপর এক দুই করে দশটাকার নোট দশখানা গুণে মার হাতে তুলে দিয়ে বললো, এই নাও এ মাসের বাজারের টাকা। ওতেই হবে বোধ হয়, তাই না?

ওদের স্কুলের বেতন কালকে আমিই দিয়ে দেব'খন। আর শোন, বাড়ীওলা এলে সন্ধ্যের পর আমার সাথে দেখা করতে বোলো।

মা টাকাগুলো হাতে নিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়, নিতান্তই অপ্রত্যাশিতভাবে পাশের ঘরে দেয়ালঘড়িটা বোকার মত ঢং ঢং করে তিনটে বেজে চুপ হয়ে গেল। মা চকিতে পাশের কামরার দিকে তাকালেন। তিনিও আশা করেননি ঘড়িটা এমন বেমওকা বেজে উঠবে। খোকন যেন ঘড়ির ঘণ্টার প্রতিধ্বনি করেই বলল,ঐ যাঃ। দেখেছ, একেবারে ভুলে গেছি। আসবার সময়, সেই কোনসকাল থেকে মনে করে রেখেছি, চাঁদ মিয়া মেকারকে ধরে আনবো ঘড়িটা নিয়ে যেতে—দেখো তো কাণ্ড। এমন ভুল মানুষের হয় কখনো ?

মা অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলেন, এমন ভুল মানুষের হয় কখনো। কিন্তু শোনা গেল না। কি আশ্চর্য, একটু পরেই তিনি ছোট্ট হাসি হেসে নোট ক'খানা নাড়তে নাড়তে বললেন, সন্ধ্যে বেলায় না ডেকে ভালই হলো, কাল সকালেই সব বুঝে-সুঝে নিতে পারবে। কালকে এলেও হবে।

সেই ভালো।

খোকন একটু উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কিন্তু মিইয়ে পড়েন মা। চুপসে যান তিনি একেবারেই। তিনি আশা করেননি খোকন এত ছোট্ট জবাবে দায়মুক্ত হবে। ভেবেছিলেন সে তার কথায় প্রতিবাদ না হোক অমনি একটা কিছু করবে। তাই খোকনেব ওই উত্তরে তিনি মুষড়ে পড়লেন বৈকি।

মা ভেবে কোন থৈ পান না, খোকন এত জরুরী কথাটা ভুলে গেল কি করে ? কি করে ভুলতে পারে সে ? এত আজেবাজে জিনিস কিনতে তো কই তার এতটুকু ভুলে যাবার কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। বরঞ্চ না চাইতেই তো ও সব কিছু নিয়ে এসেছে। নাকি খোকন খরচের ভয় করছে ? হবেও বা। হয়ত তার মন সেকেলে একটা জবুথবু দেয়াল ঘড়ির পেছনে খরচ করতে সায় দেয় নি। কিন্তু রিক্‌শ করে খোকন যে খরচ করলো সেটার সার্থকতাই বা কোথায় ? মাসের তিরিশ দিন বাসে এসে একদিন রিক্‌শ করলে কিই বা এমন লাভ ? পর মুহূর্তেই ভাবেন, ক্ষতিটাই বা কি ? এতোগুলো টাকা ও রোজগার করে সংসারে ঢালছে, দুটো পয়সা নিজের জন্য ব্যয় করলে কিইবা এমন দোষের হয় ? আনমনে চৌকির পাশে খোকনের ছোট্ট টেবিলটায় মা হাত বুলোতে থাকেন। এক সময় কিসে যেন হাত ঠেকতেই তিনি চমকে ওঠেন। মসৃণ

আর ঠাণ্ডা। চোখ ফেরান। কিছুই নয়, দেখে তাঁর বুঝতে একটুও কষ্ট হলো না, এক প্যাকেট তাস। আনকোরা নতুন, করকরে। মা অজ্ঞাতসারে প্যাকেটটা হাতে তুলতেই খোকন তড়বড় করে বলে উঠলো, কিছু না মা রেখে দাও তুমি। আসবার পথে কি খেয়াল হলো কিনে ফেললাম।

ও!

মা তাসের প্যাকেটটা নামিয়ে রাখেন টেবিলে, কিন্তু চোখ ফিরিয়ে আনতে পারেন না। কেমন নীল রঙ আর অদ্ভুত ছন্দ প্যাকেটটার গায়ের নকশায়। ছোট্ট, এতটুকু, কিন্তু চোখ ফেরানো যায় না ঐটুকুর জৌলুসেই। মা যেন সম্মোহিত হয়ে পড়লেন। ক-একবার নাড়াচাড়া করে তিনি একসময় হাত টেনে আনেন। খোকন বলছে, মা, শুনছো?

কি?

আজ রাতে ওরা আসবে বলেছিল—

মা কি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন? না মার মনে এই মুহূর্তের চিন্তাধারা সহসা প্রকাশ হয়ে পড়ল? একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন তিনি।

কারা?

খোকন একটু অপরাধজড়িত সুরেই বলে, না, ওসমানরা, মানে আমার ক-একজন বন্ধু আসবে বলেছিল, আসে না কিনা অনেকদিন—

ও।

তাই কষ্ট করে একটু চায়ের যোগাড় হয়তো করতে হতে পারে। মানে—

খোকনের কথা শেষ না হতেই মা সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন, আচ্ছা।

'কুলো' হাতে করে সেই কখন মা চাল বাছতে বসেছেন এখনও শেষ হয়নি। এলোপাথাড়ি ভাবতে ভাবতে তাঁর হাত যে কখন থেমে গেছে তা তিনি নিজেই টের পাননি। সালেহা রান্নাঘর থেকে বলে, কই মা, চাল বাছা এখনো হয়নি তোমার? এদিকে তো চুলো খালি যাচ্ছে।

তাইতো। মা যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সাথে চাল বাছা শেষ করেন।

সালেহা খক্ খক্ করে কেশে উঠলো। কাশবে না? রান্নাঘরে একটা জানালা ফোটানোর জন্য কত বার মা বলেছেন খোকনকে, অভিমান হলো মার, ধোঁয়া আটকে দম বন্ধ হয়ে মরুকগে' তার কি? তার কি এসে যাবে?

চালের হাঁড়িটা চুলোর ওপর ভালো করে বসিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। এত ঘেমেছেন কখন তিনি ?

বাইরে বসবার ঘরে পদশব্দ। খোকনের বন্ধুরা এসেছে, বুঝতে পারলেন। সালেহা মলিন মুখে প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টিতে মার দিকে তাকালো। মা জানেন কারা এল, কিন্তু কোনো উত্তর করলেন না।

মা জানেন খোকন মিছে কথা বলেছে। ওরা এসেছে তাস খেলতে। নিশ্চয়ই আপিস ফিরতি পথে খোকন ওদের বলে এসেছে, নইলে নতুন তাস কেন ওর টেবিলে। আর ঘড়িটার কথা বেমালুম ভুলে গেল খোকন ? মিছে কথা। কিন্তু কি করবেন তিনি, কি করতে পারেন ? অসহায় শিশু বৈত তিনি আর কিছু নন। আক্রোশে অভিমানে মার মন ভরে উঠল। গলা ধরে এল। তিনি চোখ বুজলেন।

কেমন যেন অন্ধকার ঠেকছে চারদিক। আলো নেই, বাতাস নেই, শুধু বদ্ধ আবহাওয়া। বিমর্ষতার ভারে যেন নুয়ে পড়েছে বাসাটা। আর মার বুকখানা ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু কাউকেও বুঝতে দিতে চান না তিনি, তাই সালেহাকে প্রায় এককোণে ঠেলে নিজেই রান্নায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এখনো তা মাছ চড়েনি, তার ওপর ভাজা চচ্চড়ি তো পড়েই রয়েছে।

বাইরের ঘর থেকে শোনা গেল খোকন বলছে, বুলু, দেখগে' ঘরে টেবিলের ওপর চকোলেটের বাক্সের নিচে প্যাড রয়েছে, নিয়ে আয়তো।

বন্ধুরা হাসি বন্ধ করে বলল—হুঁ। রান্নাঘর থেকে মা দেখতে পেলেন বুলু লেখাব প্যাড দিয়ে এল ও ঘরে। ফিরতি পথে এসে মাকে বলল, মা, চা চাইছে বড়ভাই।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, ক'কাপ ?

কেন, চার কাপ।

বুলুই আবার চা নিয়ে দিয়ে আসলো। মা কানখাড়া করে শুনতে চেষ্টা করেন বাইরের ঘরের প্রতিটি কথা, প্রতিটি ধ্বনিতরঙ্গ।

বিস্ময়, আনন্দ, উল্লাস, বিমর্ষতা, স্তব্ধতা, সব কিছু একের পর এক রেখা কেটে চলেছে ওই চারটি লোকের মনে। স্তব্ধতা। আবার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। আবারও। মাঝে মাঝে খোকনের গলা শোনা যাচ্ছে। আরো কারা যেন। কিন্তু কোনো কথাই তাদের বুঝতে পাবছেন না তিনি। একবর্ণও না।

মনে হলো, এ ভাষার সাথে বুঝি পরিচিত তিনি নন। অদ্ভুত এর বাক্য-বিন্যাস ভঙ্গী আর বিচিত্র এর ধ্বনিতরঙ্গ। কেউ বুঝতে পারে না সে ভাষা।

খোকন এক সময়ে ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরে চাপা অথচ উত্তেজিত সুরে বলে, ধেত্তর ছ্যাঁকছ্যাঁকানি। বলি ভাজা পোড়ায় এত গন্ধ ওঠে কেন? বাইরে লোক বসে, তোমাদের খেয়াল হয না। যতসব। গজ গজ করতে করতে খোকন আবার চলে যায। মার যে কি হয়েছে আজ, খালি কান্না পাচ্ছে।

কিন্তু খোকন তাস কিনতে গেল কেন? খেলতে? ও ছাই খেলে কি লাভটাই বা হয়? আর যদি খেলতেই হয তবে পুরোন তাসে দোষ করল কি? তাস পুরোন হয়ে গেছে বলেই কি ফেলে দিতে হয়? হঠাৎ আবার ঘর থেকে দেয়াল ঘড়িটা ঢং করে বিগত তিরিশ মিনিটের সংকেতধ্বনি করে চুপ হয়ে গেল। নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতা।

গোটা গলিপথটা ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত এখন অনেক। নিবিড় অরণ্যের মত একটানা রাত। ছেদ নেই, যতি নেই এ তমিস্রা প্রপাতের।

শুধু রাত।

চুলে চুলে ঘষলে কেমন এক মিহি আওয়াজ বেরোয়, সূক্ষ্ম অথচ গভীর, তেমনি ছন্দময় যেন এ ছায়ারাত।

অস্বচ্ছ আকাশে গুটিকয় তারা। মা খোলা জানালা দিযে দেখলেন তাকিয়ে।

হারিকেনটা জ্বলছে ছোট হয়ে আলনার পাশে। ছোট আর বিষণ্ণ। খাওয়া-দাওযা সেই কখন হয়ে গেছে। খোকন ও ঘরে বুলুকে নিয়ে শুযে পড়েছে। এ ঘরে মার পাশে টুনু। আর ওপাশের চৌকিতে সালেহা বেবীকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমে অকাতর। ঘুম আর ঘুম। সবাই ঘুমিযে পড়েছে। শুধু ঘুম নেই মায়ের চোখে।

গোটা পৃথিবী যখন ঘুমে অচৈতন্য, যখন রাত কুটিল সরীসৃপের মত শুধু বাড়ছে, তখন মার মনে সারাদিনের সেই অদ্ভুত, পরস্পর-বিরোধী চিন্তাগুলো এসে ভিড় করে দাঁড়াল। একে একে মনে পড়ল খোকনের কথা, নতুন তাসের

প্যাকেট আর দেয়াল ঘড়িটার কথা। ঘড়িটা চলছে। টক্ টক্ টক্। অনেকক্ষণ তন্ময় হয়ে শুনলেন প্রতিটি সেকেণ্ডের গম্ভীর পদশব্দ।

সময় বয়ে যাচ্ছে—যাচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে। চোখ বুজে মা স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে, শিয়রে স্বামী দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ খুলে তাঁকে হারাতে চান না। তাই তিনি চোখ বুজেই রইলেন নিঃসাড় হয়ে। এক সময়ে স্বামীব মুখখানা অস্পষ্ট হয়ে এল। তারপর তিনি তাঁর সেই দগ্ধ আবেগ সামলাতে না পেরে দু'হাতে বিছানার চাদর আঁকড়ে ধরলেন শক্ত মুঠিতে।

তারপব এলোমেলো কত কথা কত স্মৃতি তাব মনের পটে নতুন করে ভেসে উঠলো ছায়াময় অশরীরী রহস্যময় হয়ে। এক সময়ে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে জানালার পাশে দাঁড়ালেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল।

তারপর কি ভেবে পা টিপে টিপে খোকনের ঘরে গিয়ে পা দিলেন। দুটো কামরার মাঝের দরোজা সব সময়েই খোলা থাকে, তবু কত সতর্কতা প্রতিটি পদক্ষেপে। কি করবেন তিনি' ও ঘরে যেয়ে? কি করতে চান? হারিকেনের আবছা আলোয় ঘর ভরে রয়েছে। মা গিয়ে টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন।

ভয়, দ্বিধা আর সঙ্কোচ। তবুও দু'হাতে তাসের প্যাকেটটা তুলে নিলেন। তেমনি মসৃণ আর ঠাণ্ডা। ইচ্ছে হলো তাসগুলো কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলেন। চিহ্নমাত্র রাখতে চান না তিনি। সন্ধ্যে থেকে যে আক্রোশগুলো মনের অন্ধকার কোঠায় গুমরে মরছিল তারা যেন সব ছাড়া পেয়ে দল বেঁধে তাসের প্যাকেটটার ওপর নাবলো। আঁচলেব আড়ালে লুকিয়ে ফেললেন ওটা। তিনি ছিঁড়ে ফেলবেনই। আর দ্বিধা নয়। আর সঙ্কোচ নয়।

সহসা ঘুমন্ত খোকন পাশ ফিরে মায়ের দিকে মুখ করলো। আর মা ভীত হয়ে তাড়াতাড়ি প্যাকেটটা নামিয়ে বাখলেন টেবিলের ওপর। আবার ভয় এসে তাঁকে ভর করলো।

ছোটবেলা থেকেই খোকনের মুখ দিয়ে লালা পড়তো, এখনও পড়ে মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে। মা তাকিয়ে দেখলেন লালায় ভরে গিয়েছে বালিশের কোণাটা আর খোকনের ডান গাল। তিনি চোবের মত এগিয়ে এসে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন লালাটুকু। খোকনের মুখখানা কি সুন্দর আর কেমন মিঠে। মা দেখেন আর দেখেন ছোট বেলার সেই কচি আদলটুকু এখনও ওর মুখ থেকে উঠে যায়নি। তেমনি মাংসল গালদুটো আর প্রশস্ত কপাল। দু'এক

গোছা চুল এসে কপালে ছড়িয়ে পড়েছিল, তিনি আলতো করে সরিয়ে দিলেন। কপালে হাত বুলোতে মার ভারী ভালো লাগলো। কতদিন মা খোকনকে ছোটবেলার মত এত আপন করে পাননি। তিনি ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগলেন কপালে, মুখে আব সারা গায়ে।

আবার সেই চিন্তাগুলো তাঁর মনে এসে আছড়ে পড়ল উন্মাদের মত। তিনি শুধুমাত্র বিব্রত হয়ে পড়লেন।

খোকনের ঘুম গাঢ় হয়ে নেমে এসেছে দু'চোখে। কেমন তৃপ্তি-গাঢ় ঘুম।

আবছা আলোতেও তাসের নকৃশাগুলো চকৃচকৃ করছিল। তিনি চোখ ফিরিয়ে দেখতে পেলেন।

সহসা তাঁর সারা অন্তর মথিত করে একটা কথা ঠোঁট থেকে গড়িয়ে পড়ল—না, না, তিনি পারেন না, অসম্ভব। দু'হাতে মুখ ঢেকে চোখ বুজে এক দৌড়ে তিনি নিজের শোবার ঘরে এসে ঢুকলেন।

সান্নেহা তেমনি ঘুমুচ্ছে।

ঘুমুচ্ছে বেবী আর টুনু। প্রতিটি মাংসপিণ্ড তাঁরই দেহের রক্ত দিয়ে তৈরী। তিনি এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। তারপর জীবনে এই প্রথম, সর্বপ্রথম তিনি বিছানার ওপর ঝড়েব মুখে ছিঁড়ে যাওয়া লতার মত অসহায় হয়ে উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলেন।

মা কাঁদছেন !!

মেহের জানের মা

মির্জা আ, মু, আবদুল হাই

ফাঁকা একটা প্রথম শ্রেণীর কামরার ভিতর দিয়া আসিয়া জমিলা রকীবাকে ছোট্ট একটা কুঠুরীর ভিতর প্রায় ধাক্কা দিয়া ঢুকাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। রকীবার পেটে পিঠে শাড়ীর নীচে চটের থলিতে সুপারী বাঁধা। হাতে মবিলের টিন। দেওয়াল ধরিয়া দাড়াইয়া সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। নিজের পেটের দিকে নজর পড়িতে মনে হইল যেন আট নয় মাস। মেরা-জান যখন পেটে আসিয়াছিল, তখনকার কথা রকীবার মনে পড়িল। অনেক—অনেক দিন আগের কথা। বুকের দুরু দুরু ভাব ছাপাইয়া কেমন যেন একটা শরমরাঙা অনুভূতি তাহার মনের অতলে শিহরণ জাগাইল।

দশটার গাড়ী ঝক্ ঝক্ করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে।' মানুষের হালে বাঁচিয়া থাকার জন্য এই নূতন জীবিকার পথে নামিয়া পড়ে। শুধু আজকের জন্য বাঁচিয়া থাকা, কালের ভরসা কাল। গরীবের শুধু দিনের দিন বাঁচা, ভবিষ্যৎ ত শুধু বড়লোকের। রকীবার অন্তরলোকের চিড় খাওয়া ভাবনা।

রকীবার বুকে হাতুড়ি পেটার আওয়াজ। প্রাপ্তির হিসাব পাঁচটার গাড়ী নাভারণে ফিরিলে, এখন শুধু ভয়, মার ধোর আর জেলফাটকের ভয়।

জমিলারই মুখে শুনা 'সব বেটাই না কি দুপয়সা করে খাচ্ছে'—তা সাহেব সুবা-ই-হোক, আর মজুর ফকির-ই হোক। মনকে যুক্তি দেখায় রকীবা।

বেনাপোলে অনেকক্ষণ গাড়ী থামে। থামাব কিছু পরেই জমিলা আসিয়া বলে, নেমে একটু হাঁটাহাঁটি কর!

রকীবা বলে—ভয় করে, যদি ধরে?

ধরবার হলে কি আর আমি-ই নামতাম? আর ধরলেই বা কি? ওষুধ জানা আছে। চার আনা, আট আনা, বড়জোর এক টাকাই নিল! আর তাই বা নেবে কেন? খেপে খেপে যে পেট ভরাই তাই বা কি এমনি নাকি। ধরবে কোন শালা!

প্রতি মুহূর্তেই রকীবা ভাবে এই বুঝি একটা বিপত্তি বাধে।

গাড়ী থামিয়াছে ত থামিয়াই আছে। নড়িবার নাম করে না। ধরা যদি পড়ে ত কি হইবে? খুব নাকি মার ধব করে। কিন্তু কতজনকে মার ধর করিবে? জমিলাই দেখাইয়া দিয়াছে—উরা সবাই। জমিলার মত প্রৌঢ়া ত আছে-ই, বুড়া বুড়ি, ছেলে মেয়ে জোয়ান অগুণতি। ইহাদের ভরসাই বা কম কিসেব।

গাড়ী ছাড়িবার আগেই জমিলা বলিয়া দিল—দেখ, ঘাটে ঘাটে গাড়ী থামবে, আমাদের দরকার মতই থামবে। এখান থেকে ছাড়ার পব, পয়লা দু'বারে নামবি না, তার পরের বার, বুঝলি?

রকীবা মাথা নাড়ে। এত বড় কলের গাড়ী যাহা গাঁয়ের পিসিডেন্ট কিম্বা থানার বড়বাবু ও নাকি থামাইতে পারে না তাহাকে নিজেদের কথা মত থামাইতে চালাইতে পারে যাহারা নিজেকে তাহাদের-ই একজন ভাবিয়া রকীবা গর্ব অনুভব করিতে লাগিল।

তৃতীয়বার গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে রকীবা টিন হাতে করিয়া নামিয়া পড়িল।

ফাঁকা মাঠ। অনেকগুলি নানা বয়সের মেয়ে পুরুষ নামিয়া ত্রস্ত পায়ে মাঠের মধ্য দিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ছোট বড় সবগুলিকেই যেন মনে হয় ভরপেট। হাতে টিন।

রকীবা স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাড়াইয়া রহিল। হঠাৎ পিছন হইতে জমিলা তাহার কনুই চাপিয়া ধরিয়া বলিল—চল, দাড়ালে চলবে না।

বনগাঁয়ে জিনিস বেচাকেনার কারবারটা নির্ঝঞ্ঝাট নয়। ভোগান্তি অনেক। যাহাদের মহাজন সঙ্গে—তাহাদের ত পোয়াবারো। আর যাওয়া আসার হাঙ্গামা যতটুকু রকীবা আঁচ করিয়া রাখিয়াছিল—আসলে তার সিকিও নয়। ভয় শুধু মনেই।

পাঁচটার গাড়ীতে রকীবা যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার কোমরে গোঁজা কিছু-টা খুচরা পয়সা, আর টিনে ভর্তি সের চারি সরিষার তেল।

সেরে কমসে কম দেড় টাকা। রকীবা শুধু হিসাব করে। আঙুলের আঁকে আঁকে গুণিতে গিয়া তাল-গোল পাকাইয়া ফেলে।

ঘরে ফিরিবার সময় রকীবা যেন আর হাঁটিতে পারে না। অভূতপূর্ব একটা উত্তেজনা। দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান বা শুধু পেট-ভাতে রাতদিন গৃহস্থের বাড়ী খাটুনি, পান হইতে চুন খসিলে অকথ্য অত্যাচার সব কিছু যেন অনেকদিন আগেকার দেখা দুঃস্বপ্নের মত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। হাওয়ালাদার বাড়ীর সেই কঞ্চী সেকার ঘা'টা পিঠের উপর অনুভব করিতে চেষ্টা করিল রকীবা। না, জ্বালা আর আছে বলিয়া মনে হয় না। দুই এক দিন পরেই সে মেরাজানের জন্য একখানা দশহাত শাড়ী কিনিয়া আনিবে। একটুকরা তেনা পরিয়া থাকে মেয়েটা। ভাল করিয়া পরিলে নয় হাতে হইবার নয়। আর যা বাড়ন্ত গড়ন। পাড়ার বদ ছোকরারা এখন হইতেই বদ-নজর দিবার চেষ্টায় আছে। বুকে বুকে আগলাইয়া রাখে রকীবা। মান ইজ্জত-ই যদি রাখা না যায় তবে দুনিয়ায় থাকিয়া কি লাভ ?

বজলটাকে লইয়াও চিন্তা কম নয়। ময়লা একটুকরা নেংটী পরিয়া সারাদিন টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ঘরে থাকিলে রকীবার প্রাণে শান্তি থাকে। মেরাকে দেখিবার একটা লোক থাকে। হোক না দুধের ছেলে। খোদাতালা যখন মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, বজলের জন্য একটা লাল শার্ট আর একটা পেণ্ট। পেটের দায়ে মেরাকেও ঘরে রাখা যায় না। একটা লোকের বাড়ী এটা সেটা কাজ কর্ম করিতে হয়। বাঁধা ধরা কিছু নয়, তবু রকীবার ভয় কাটে না! গায়ের ড্যাকরাগুলার যা রকম সকম'।

মেরাজানের শাড়ী হইয়াছে। মাথায় নারিকেল তেল লাগিয়াছে। বজলের পেণ্ট শার্ট সব কিছু।

দিন গড়াইয়া চলে। ধুকিয়া ধুকিয়া বাঁচার দিন নয়, পেট ভরা, বেশ হাসি খুসীর দ্রুত চলমান দিন।

কয়েকদিন যাইতেই, রকীবা একদিন কালের পিছন ফিরিয়া তাকায়। নিজের কাছেই বিস্ময়কর মনে হয়। ভাল করিয়া যেন বুঝিতে পারে না কি করিয়া বজল ও মেরা দুই জনেই মায়ের সঙ্গে কারবারে নামিয়া পড়িয়াছে। নেহাৎ যেন একটা গতানুগতিক ব্যাপার। তাহার প্রথম অভিযানের মত ইহাদের আসায় কোন বৈচিত্র নাই। মনে রাখিবার মত কিছু নয়।

তিনজনেই ভিন্ন ভিন্ন মহাজনের সঙ্গে ভিড়িয়া পড়িয়াছে। ঠিকা কাজে হাঙ্গামা যেমন কম, লাভও সেই অনুপাতে কম। তাই বা মন্দ কি, ঝক্কি সাত মহাজনের ঘাড়ে।

নয় দশ বছরের বজল। ভয়ানক চটপটে। টিন হাতে সরিষার তেল আনাটা যেন তাহার ধাতে সয় না। দুই একদিন টিন লইয়া চলিয়াছিল, কিন্তু তারপরই বাদ দিয়াছে, হয়ত মহাজনের নির্দেশে। ফিরিবার পথে লবণ লইয়া আসে। দ্বিতীয় বা মধ্যম শ্রেণীর বেঞ্চের তলায়—সের কয়েক লবণ বিছাইয়া দিয়া সরিয়া পড়ে। ধরা পড়িবার প্রশ্নই উঠে না। যায় ত শুধু মালই যাইবে। গাড়ী যখন চলে বজল তখন গাড়ীর তলায়, একটা লোহার রডের উপর অনেকগুলি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বসিয়া বিড়ি টানে। লাল পাট সিল্কের একটা রুমাল গলায় বাঁধা, হাতে পিতলের একটা আংটি। কানে আধপোড়া বিড়ি। রকীবা যখন প্রথম শুনিল যে বজল গাড়ীর তলায় বসিয়া চলা ফিরা করে, ভয়ে তখন সে প্রায় কঁকাইয়া উঠিয়াছিল। বলা যায় না কখন কি হয়। বজল মায়ের কাছে কসম করিয়াছে যে গাড়ীর ভিতর বসিয়াই সে যাওয়া আসা করিবে। কিন্তু গাড়ী যখন চলে তখন গাড়ীর নীচটা দেখিবার সুযোগ থাকে না বলিয়াই রকীবা ভাবে—মা-অন্ত প্রাণ ছেলে নিশ্চয়ই মায়ের কথা রাখিতেছে।

মেরাজানকে রকীবা চোখে চোখে রাখিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সম্ভব আর হয় কই। বেনাপোলে গাড়ী থামিলেই রকীবা মেরাকে খবর করে। রকীবা প্রায়ই স্মরণ করাইয়া দেয়—দেখিস, ঐ ছোড়াগুলির সঙ্গে মিশবি না কিন্তু, বুঝলি?

মেরা বুঝিয়াছে বলিয়া মাথা হেলায়।

আর শোন, ঐ যে সেপাইগুলো, তা বেনাপোলেরই হোক, আর বনগায়েরই হোক, বুঝলি, সব বেটাই বদমাসের ধাড়ী। এই লাইনে সব শেয়ালের এক রা। খবরদার বলে দিলাম।

উঠতি বয়সের মেরাজান বুঝে সব কিছুই।

সরসপুর হইতে নাভারণ—অনেকখানি পথ। প্রত্যেকদিন এতটুকু পথ হাটিয়া গাড়ী ধরা সোজা কথা নয়। তাহা ছাড়া বৃষ্টি পড়িলে, রাত্রে ঘুমানো যায় না। ঝর ঝর করিয়া পানি পড়ে।

মেরা বলে—এখন ত আর সে রকম অভাব নেই, ঘরটাকে মেরামত কর।

সময় কোথায়? লোক লাগালে দু তিন দিন কামাই দিতে হয়। রকীবা নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে জবাব দেয়।

সন্ধ্যার দিকে আর রকীবা ঘর হইতে বাহির হয় না। মাঝে মাঝে মোল্লা পাড়ার মজিদ আসে। অবস্থা মন্দ নয়। টিং টিং-এ চেহারা, শেয়ালের মত পিট পিটে ধূর্ত চোখ। সারা গায়ে পাঁচড়া নাকি, লোকে বলে খারাপ ব্যারাম। কোন জন্মের কুটুম্বিতা নাই, যেন্নাই করিয়াছে হয়ত এতদিন, এখন বলে—চাচি আছ কেমন? আর আড়চোখে মেরাজানের দিকে তাকায়।

রকীবার হুকুম আছে—ঐ ছোকরা মজিদ আসলে, খবরদার বলে দিলাম,—ঘোমটা তুলবি না।

মেবা ঠোঁট বাঁকাইয়া বলে—তা এই খেয়োটাকে ঘরে ঢুকতে দিস কেন?

এই মজিদেরই জ্বালায় আর ঝর ঝরে পচা চালের দৌলতে একদিন মেয়ে ও ছেলের হাত ধরিয়া, রকীবা নাভারণের তালেব মিয়া মহাজনের বারান্দায় আসিয়া উঠিল। তালেব মিয়ার-ই কাজ করে সে। এই লাইনে যাহারা কাজ করে তাহারা অনেকেই থাকে ইষ্টিশনে, প্লাটফর্মে কিম্বা কোন দোকানের বারান্দায়, বকীবাই ছিল দূরে। গরীব বলিয়াই শুধু—গ্রামে এত লোকের মাঝে, নিজের ভিটায় থাকিয়াও ছিল নির্বান্ধব। ইহাদের মাঝে আসিয়া সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। চারিদিকে শ'য় শ'য় যেন আপনার লোক। জমিলা, নন্দ, কুদরতের মা, জৈতুন এবা সবাই যেন কতকালের আত্মীয়। ব্যবসায়ীরা নাকি মিলিয়া মিশিযা থাকিতে পারে না অথচ আশ্চর্য, তাহারা সকলে একই কারবার করে কিন্তু অভিন্ন আত্মা। সুখে দুঃখে খবর কবে, লাইনে কোনদিন কোন অফিসার চলে, কোথায় কিভাবে টিপলে কি ফল পাওয়া যায়, সবাই সবাইকে বলে, দীল খুলিয়া আলাপ আলোচনা করে। আশে পাশে সারা রাতই প্রায় বাতি জ্বলে। খোলা বারান্দা, তবু যেন ভয় নাই আর। গাড়ী ধরারও নাই তাড়াহুড়া।

বয়স যেন আর তাল রাখিতে পারিতেছে না। মেরার শরীরেব গড়ন বয়সকে যেন পিছনে ফেলিয়াই আগাইয়া চলিয়াছে।

বেনাপোলে বনগাঁয়ে ঠোঁট লাল করিয়া পান খায় মেরাজান। রকীবার

একদিন চোখে পড়িয়া গেল। দুইজন সেপাই মেরাজানের খুব কাছাকাছি দাঁড়াইয়া আছে। একজন বনগাঁয়ের আর অন্যজন বেনাপোলের। প্রায় সব সেপাইরই মুখ চিনে রকীবা। ইহাদের পাকিস্তান হিন্দুস্থান নাই, সব এক। একজন সেপাই হাত বাড়াইয়া কি যেন দেওয়া নেওয়া করিল মেরাজানের সাথে। সেপাই দুইটি সরিয়া যাইতেই রকীবা জোর পায়ে আগাইয়া গিয়া খপ করিয়া মেরাজানের চুলের মুঠি ধরিল।

মেরাজান চমকাইয়া উঠিল।

হিড় হিড় করিয়া লোহার বেড়াটার কাছে টানিয়া আনিয়া রকীবা চাপা গর্জন করিয়া উঠিল—হারামজাদী, এই সেপাই ষণ্ডা দুটোর সঙ্গে কি করছিলি ?

মুখের উপর কোনদিন মেরা উত্তর দিত না, কিন্তু আজ দিল—তোর সব তাতেই সন্দ'। এত লোকের মাঝে চুল ধরে টানাটানি কবিস না বলছি।

রকীবা যেন কিছুটা থতমত খাইয়া গেল।

মেরাজান ততক্ষণে সামলাইয়া লইয়াছে।

—বুড়ি হয়ে গেছিস, তাল মান টের পাস না। এদের সঙ্গে খাতির রাখতে হয়।

—তোর খাতির ধুয়ে পানি খা গে, যা। হাজার বার করে মানা করেছি হারামজাদীর কানে যায় না। ওই ড্যাকরা হাত বাড়িয়ে তোকে কি দিচ্ছিল ?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মেরা বোধ হয় উত্তর ঠিক করিল।—বাঃ রে, ও আবার কি দেবে! পান কিনেছিলাম, ওরাই বলল পান খাওয়াতে। তাই দিয়ে দিলাম একটা। আমিই ত দিলাম। পুলিসের লোক আবার কাউকে কিছু দেয় নাকি কোনদিন ?

—কাজ নাই বাপু পান খাওয়ানোর। একটু বুঝেসুঝে চলিস! রকীবা দরদ মিশাইয়া বলে।

মাঝে মাঝে, মাসে দুই মাসে, অনেকগুলি সেপাই আর বোর্ডার পুলিসের বড় সাহেবরা আসিয়া হানা দেন। ধর পাকড় হয়, মারধর লাগে, কিন্তু কপাল গুণে রকীবার কিছুই হয় নাই। একদিন ব্যবস্থাটা হইল বড় কড়ারকমের। অন্যান্য দিন আগে হইতেই কিছুটা আভাস পাওয়া যাইত, কিন্তু সেই দিন হঠাৎ যেন পৌষের অকোশে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। গাড়ীর পিছন দিয়া নামিতেই, লোহার

বেড়ার ওপর পাশের জঙ্গল হইতে অনেকগুলি সেপাই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। কয়জন বেড়া টপকাইয়া প্লাটফরমের ভিতর আসিয়া পড়িল। হাতে লাঠি, যাহাকে ধরে, তাহাকেই দুই এক ঘা লাগায়। হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। রকীবা স্তম্ভিতের মত পেটে বাঁধা সুপারীর থলিটার উপর হাত রাখিয়া পথ খুঁজিতে লাগিল। হঠাৎ নজরে পড়িল একজন সেপাই বজলকে দৌড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার পা-টা যেন বেড়ার মাথা অল্প স্পর্শ করিল মাত্র। রকীবার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল, বজল ততক্ষণে বেড়ার অপর পাশে জঙ্গলের সাথে তালগোল পাকাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। হতভম্ব রকীবা পাগলের মত বেড়ার দিকে দৌড়াইল কিন্তু পরক্ষণেই তাহার পিঠের উপরে লাঠির একটা প্রচণ্ড ঘা অনুভব করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া গেল।

সেই দিন আর রকীবার বনগাঁও যাওয়া হইল না। সুপারী, তেলের টিন, ট্যাকে যা কিছু ছিল সর্বস্ব দিয়া সে নিস্তার পাইল। রকীবার মাথা টন টন করিতেছে। পিঠে জ্বালা। হাত দিলে টের পাওয়া যায় পিঠের চামড়া যেন বাইন মাছের মত হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। প্লাটফর্মের উপরই সে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল।

ফিরতি গাড়ীতে যাহারা বেনাপোলে নামিল তাহাদিগকে দেখিয়া রকীবার মনে হইল কেইই কমে নাই। অন্যান্য দিনের মত পুরা দলটাই যেন ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাদের সঙ্গেই মেরাও বজল গাড়ী হইতে নামিল।

রকীবা ছুটিয়া গিয়া বজলকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। পিঠে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—কোথাও লাগে নি ত রে?

কানের আধপোড়া বিড়িটা ধরাইতে ধরাইতে বজল জওয়াব দিল—দুর, লাগবে কেন? দেখেছিলি না কি—আমার লাফ দেওয়াটা? বাবা, কত পেট্রিস করে শিখেছি! পুলিসের বাবার সাধ্য আছে ধরবে!

নাক দিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া বীরের মত ভঙ্গী করে বজল।

ছেলের বীরত্বে রকীবাও যেন কিছুটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

মেরা মায়ের কাছে আগাইয়া আসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বলে, দেখি মা তোর কোথায় লাগল?

মায়ের পিঠে হাত বুলাইয়া সমবেদনায় যেন ককাইয়া উঠে।

রকীবা চুপ করিয়া থাকে।

কিছুক্ষণ পর, মেরা আগুনের গুগা হইতে বাড়তি চুন টুকু দাঁতে কাটিয়া লইয়া, ঠোঁটটাকে একটু বাঁকাইয়া বলে—মা, তোরও যেমন, বললে ত শুনবি না বলেছিলাম না, খাতিরে কাজ হয়। দেখলি, ধরতে পারল আমাকে!

রাগ করে রকীবা—ঝাড়ু মারি অমন খাতিরের মুখে। মুখপুড়ী, দাঁত কিটকাবি না বলছি।

তেরছা করিয়া হাসিয়া মেরা বলে—তা হলে পড়ে পড়ে মার খা। যেমন আক্কেল।

বাড়ন্ত শরীরে একটা ঝাকানি দিয়া মেরা টিন হাতে লইয়া সরিযা পড়ে।

তালেব মিয়া মহাজনের বারান্দায় শুইয়া শুইয়া রকীবা পিঠের ব্যাথায় ককায় আর ষ্টেশনের দিকে চায়। ঘুম আসে না। বজল পাশে শুইয়া নাক ডাকাইতেছে। মেরাজান আজ আর ফিরে নাই। সেই যে বেনাপোলে দেখিল আর পাত্তা নাই। জমিলা, জৈতুন ইহাদের প্রায় সকলেব কাছেই রকীবা খবর লইয়াছে কিন্তু সঠিক খোঁজ কেহই দিতে পারে নাই। যে ব্যাপাবীর ঠিকায় মেরা কাজ করে তাহার লোকজনের কাছেও খবর লইয়াছে। মেরা নাকি নন্দর কাছেই বেনাপোলে মাল সমঝাইয়া দিয়া কোথায় সরিয়া পড়িযাছে। নন্দকেও খুঁজিয়া পায় নাই রকীবা। সে নাকি কিছুটা বাড়তি লবণ আনিয়াছিল তাহাই লইয়া একেবারে যশোর চলিয়া গিয়াছে। নাভারণের কাজটা ঠিকমতই সারিয়া দিয়া গিয়াছে। বেশ লেখাপড়া জানা ছেলে নন্দ, কিন্তু কেমন যেন পাগলাটে পাগলাটে।

রাত যতই বাড়িতে লাগিল, পিঠের ব্যাথা ছাপাইয়া ততই মেরাজানের জন্য রকীবার দুশ্চিন্তা বাড়িতে লাগিল। যদি খারাপ লোকের পাল্লায় পড়িয়া থাকে; কাষ্টমের অফিসারগুলি একদিক হইতে মন্দ নয়। ইহাদের লইয়া বড় মাথা ঘামায় না। তাহারা আছে তাহাদের তালে। গাড়ী শুধু তাল্লাশীই করে। কি যে পায় তাহারাই জানে। খুব ভাল লোক কি না তাই বা কে বলিতে পারে? সন্দেহ জাগে রকীবার মনে। ব্যাপারী দালালদের সঙ্গে হযত যোগসাজস আছে, তাই কিছু করে না। কিন্তু ঐ যে সেপাইগুলি, তা বনগাঁয়েরই হউক আর বেনাপোলেরই হউক ভালোর ভালো আর খারাপের খারাপ। দুই দেশের হিন্দু মুসলমানে এত যে মারামারি কাটাকাটি, ইহাদের কাছে তাহা কিছু নয়। কেমন মিল ঝিল। খাও দাও আর স্ফুর্তি কর, মাঝে মাঝে শুধু ছটাবরদারী

আর পয়সা কুড়ানো। কোন মেয়ের গতরটা একটু ভাল তাই খোঁজ নেওয়া ; তা এপারেই হউক আর ওপারেই হউক। অবশ্য সাতে সতেরয় একদিন বড় সাহেবরা আসিলে তোড়জোড় করিয়া লাঠির কেরদানী দেখানো, ইহাদিগকে বিশ্বাস করা যায় না। বদমায়েসের হাড্ডি সব। বিয়ে শাদী একটা মেরার না দিলে, মানইজ্জত আর রাখা যাইবে না। বিবাহের প্রশ্নে যেন রকীবার মনে অনেকটা স্বস্তি জাগে। দুই একদিন কথাটা কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনাও করিয়াছিল কিন্তু এক নন্দ ছাড়া সবাই বলে আরও বড় হোক। ছেলেটা লেখাপড়া জানে মনে হয়, বড় বড় কথা বলে বোধ হয় বই পুঁথির শেখা কথা। একদিন নিজেই সে বলিয়াছিল—চাচি, তোর মেহেরকে বিয়ে দে। হিন্দু মুসলমান যাই হোক, ছেলে একটা হলেই হল। আমাদের আবার জাত বেজাত কি ? আগের কালে হিন্দুদের কাজ দিয়ে জাত ঠিক হত। কিছুদিন পর দেখবি—বনগা বেনাপোলের আমরা সবাই একজাত হয়ে গেছি। আমার ছেলে বা নাতির নাম হবে—অমুক চন্দ্র স্মাগ্‌লার। এমনি সব পাগলাটে কথা। সব কথা গুছাইয়া রকীবার মনে পড়ে না। কিন্তু যে যাহাই বলুক মেয়ের শাদী বলিয়া কথা—জাত বেজাতের প্রশ্ন আসে বৈ কি ! জাতধর্ম ত আর দেশ হইতে উঠিয়া যায় নাই, এখনও চান্দ সুরুজ উঠে। রকীবা ভাবে নন্দর সঙ্গেই ব্যাপারটা লইয়া কাল আরেকবার আলোচনা করিবে।

রাত তিনটার গাড়ীর ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রকীবা উঠিয়া ষ্টেশনের দিকে পা বাড়াইল। এই গাড়ীতেও মেরা আসিতে পারে।

আসুক হারামজাদি আজ। এত রাত বাইরে থাকা বার করছি। রকীবা মনে মনে গরজায়।

মেরা সত্য সত্যই গাড়ী হইতে নামিল। ঢুলু ঢুলু চোখ, শ্লথ গতি। কেমন যেন খোঁড়ার মত পা টানিয়া প্লাটফরমের বাহির হইয়া আসিল। রকীবা একটু অন্ধকার জায়গায় দাড়াইয়াছিল। মেরা বাহিরে আসিতেই খপ করিয়া খোপাটা চাপিয়া ধরিয়া চাপা গলায় গরজাইয়া উঠিল।

হারামজাদি, বল, কোথায় ছিলি ?

মেরা বোধ হয় এমন আক্রমণের জন্য প্রস্তুতই ছিল, ভড়কাইল না। বরঞ্চ বেশ তিক্ত গলায়ই জবাব দিল—যেখানেই থাকি, তোর কি ?

রকীবার মাথায় যেন খুন চড়িল। চটপট পিঠে মাথায় কিল চড় চালাইতে সুরু করিল।

হারামজাদী খান্‌কী, মান ইজ্জত আর রাখলি না।

মেরা ফোঁপাইতে ছিল, খোঁৎ করিয়া উঠিল—ও বড় ইজ্জতওয়ালীরে। চোরাই কারবার করেন—আবার মান!

কথা কইস না হারামজাদী, সারাদিন ছিনালী করে আবার তেজ দেখায়। খবরদার আমাকে আর মা বলে ডাকবি না। বারান্দায় আর উঠবি ত তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

দপ দপ করিয়া পা ফেলিয়া নিজের জায়গায় গিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। মেয়ের চরিত্রহীনতার অপমানে সারা অঙ্গে যেন সে বিছুটির জ্বালা অনুভব করিতেছে। এমন মেয়ে পেটে ধরিয়াছিল বলিয়া নিজের সত্বাটাই যেন অপবিত্রতার গ্লানিতে কালো হইয়া উঠিতেছে।

অনেকক্ষণ পর টের পাইল মেরা আসিয়া ছোট ভাইয়েব কাছে শুইয়া পড়িয়াছে। বকীবা চোখ মেলিল না, একটা বোবা করুণা যেন আবসাদের আকারে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া ঝিম লাগাইয়া দিয়াছে। সে নড়িতেও পাবিল না।

একখানা হাত বকীবাব পিঠে পড়িল। ফোলা জায়গাটায় মেরা হাত বুলাইতেছে। কাচের চুড়িগুলি টুন টান কবিয়া বাজিল। রকীবা নির্জীবের মতই চুপ করিয়া রহিল।

এই মা ঘুমিয়ে পড়েছিস?

বকীবা চুপ।

খুব লেগেছিল, নারে?

রকীবা উঃ করিয়া শব্দ করিল।

জানিস মা, ওই যে কপালে মোটা আঁচিলওলা সাদেক আর বনগ্রামেব সুবেন্দ্র,—তারা বলেছে আমাদের কোন ভয় নেই। বিপদে আপদে তারাই দেখবে।

পেট্রলের মধ্যে জ্বলন্ত দেয়াশলাইর কাঠি ফেলিয়া দিলে যে ভাবে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, রকীবার মগজও যেন সেইভাবে জ্বলিয়া উঠিল। অন্ধকাবে হাত নাড়ার সময় একটা আধ-পোড়া চেলার গায়ে হাত লাগিয়াছিল—নিঃশব্দে তাহাই তুলিয়া দমাদম মেরাজানের উপর চালাইতে লাগিল। চীৎকার করিয়া মেরা অন্ধকারের ভেতর যেন মিশিয়া গেল। ঘুমন্ত বজলের উপরও দুই এক ঘা পড়িয়াছিল, সেও কাঁদিয়া উঠিল। রকীবা সুর তুলিয়া অশ্রাব্য ভাষায়

মেবার উদ্দেশ্যে গালি পাড়িতে লাগিল। সোরগোলে লোকজন উঠিয়া পড়িয়াছিল, তাহারা আসিয়া জোট পাকাইল। রকীবাকে বোঝাইল সুঝাইল।

বাকী রাতটুকু রকীবা আর ঘুমাইতে পারিল না। বজলকে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিয়া পড়িয়া রহিল। চোখ দিয়া পানি পড়িতে লাগিল। কিসের দুঃখ তাহার? রকীবার নিজেব মনকেই যেন প্রশ্ন করে। যে মেয়ে মান ইজ্জতের ধার ধারে না, তাহাব সঙ্গে কিসের সম্পর্ক! সে যেখানে খুশী যাক রকীবা আব তাহার মুখ দেখিবে না। মেয়ের ইজ্জত বন্ধক দিয়া পয়সা রোজগার করিবার আগে যেন তাহার মরণ হয়। মেরাজান তাহার মেয়ে নয়। কোন খানকীব মেয়ে হয়ত ভুল করিয়া আসিয়া তাহার পেটে জুটিয়াছিল কে জানে! ভোরের দিকে রকীবার চোখ দুইটা জড়াইয়া আসিল।

চলতি গাড়ীতে বসিয়া প্লাটফরমে দাড়াইয়া সুখ দুঃখের কথা হয়। একদিন জমিলা বলে—মেবাকে কি সত্যি 'বিদায় করে দিলি নাকি? এ লাইনে এসব ধরলে চলে না। হাজার হোক পেটের মেয়েত! বত্রিশ নাড়ী ছেঁড়া ধন।

গুম হয়ে থাকে রকীবা কিছুক্ষণ, তারপর শান্তকণ্ঠে বলে—একটা কথা এতদিন তোকে বলেনি বু', মেরা আমার পেটেব মেয়ে নয়। বিন্নার ঝোপে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

শেষের কথাগুলি খুব কষ্টে উচ্চারণ করে রকীবা। গাড়ী চলার খট খট শব্দে গলার আওয়াজেব বিকৃতি হয় ত জমিলা ধরিতে পারে নাই।

শাড়ীর আঁচল দিয়া রকীবা দুই চোখ চাপিয়া ধরে। এক গাড়ী লোক। পায়ে পায়ে ঠাসা।

একটা ককাইয়া ওঠার শব্দ জমিলার কানে যাইতেই সে ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিল—কি হল রকীবা?

আঁচলের মধ্যেই মুখ রাখিয়া রকীবা জবাব দিল—কিছু না, চোখে কয়লা পড়েছে।

তালেব মিয়া মহাজনের বারাণ্ডায় শুইয়া রাতের আঁধারে বজলকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রকীবা চোখের পানি ফেলে। আঁচল আর চাপা দিতে হয় না। মেরা গেছে—যাক। বজল তাহার সোনা মানিক। ঘুমন্ত বজলের মুখটা নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরে। যেন কোলের শিশুকে দুধ খাওয়াইতেছে।

একদিন বেনাপোলের ডিষ্ট্যান্ট সিগনালের কাছে গাড়ীটা থামিতেই হৈ হৈ একটা রব উঠিল। একটি ছেলে কাটা পড়িয়াছে। নীচের রডে বসিয়া আরেকটি ছেলের সঙ্গে বিড়ি লইয়া ঝগড়া করিতেছিল ফল যাহা হইবার হইয়াছে। এতগুলি লোকের মুখে মুখে ছেলেটার পরিচয় তালগোল পাকাইয়া হোঁচট খাইতে খাইতে রকীবার কানে যখন পৌঁছিল তখন গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। শফিক, মনীন্দ্র না হয় বজল। এই তিনজনের মধ্যেই একজনের। ঘটনা ঘটিয়াছে দুই দেশের সীমানায় পাথরটার কাছে। তেলের টিনটা হাতে লইয়া রকীবা পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল। যে যাহার জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করিয়া উঠিয়া পড়িল। চলন্ত গাড়ী হইতে কয়েকটি কণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল—ও রকীবা, তাড়াতাড়ি উঠ্। জলদি কর।

রকীবা পাথর।

গাড়ীটা যখন অনেকখানি আগাইয়া গেল রকীবা তখন হাতের টিনটা সেইখানেই ফেলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে লাইন ধরিয়া বনগাঁয়ের দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

শুধু রক্ত আর রক্ত।

মানুষ বলিয়া চিনিবার যো নাই। থেতলাইয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছে। মনীন্দ্রেরও হইতে পারে, শফিকেরও হইতে পারে। হঠাৎ নজরে পড়িল একখানা অক্ষুণ্ণ হাত আর সেই হাতের আঙুলে পিতলের আংটি। রকীবা আর কিছুই টের পাইল না শুধু সমস্ত রেল লাইনটা যেন ঘুরিতে ঘুরিতে একটা রক্তের বন্যার মত আসিয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল!

পাশের গ্রামের একটা পড়ো দালানের দাওয়ায় অসুস্থ অবস্থায় কয়দিন পড়িয়া রহিয়াছিল রকীবা। হয়ত কোন সহৃদয় গ্রামবাসী লাইন হইতে উঠাইয়া আনিয়াছে। টের পায় নাই।

রকীবা ভাবে মেরাজান খবর পাইলে নিশ্চয়ই ছুটিয়া আসিত কিন্তু পরমুহূর্তেই মনের গলাটা টিপিয়া ধরিয়া ভাবনাটার দম বন্ধ করিয়া মারিতে চায়। না, না, মেহেরজান বলিয়া কেহ তাহার কোন দিন ছিলই না। ধুকিয়া ধুকিয়া মরিবে—সেও ভাল।

ট্যাঁকে যে কয়টা টাকা ছিল তাহাও আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এই কয়দিনেই যেন বয়স তাহার দশ পনর বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। পিঠটা বাঁকা হইয়া সামনের দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছে। ভর না দিয়া ভাল করিয়া চলিতে

পারে না। রাস্তার পাশ হইতে একটা বাঁশের টুকরা কুড়াইয়া লইয়া, রকীবা কোণাকোণি পথে ভিক্ষা করিয়া করিয়া তিনদিনে সরসপুরে আসিয়া পৌঁছিল।

নিজের ঘরটার শুধু ভিটার চিহ্ন আছে আর কিছুই নাই, একটা পোতা। ক্লান্ত রকীবা পোতার ওপর বসিয়া পড়িয়া বজলের মৃত্যুর পর এই প্রথম চোখের পানি ফেলিল।

কাজ লইবার আশায় বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ফিরিল। যেখানেই যায় সেই-খানেই প্রশ্ন হয়—বলি রকীবা, তোর মেরা আর বজল কোথায়?

নোংরা ছেঁড়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া রকীবা উত্তর দেয়—মরে গেছে।

আহা—হা, কি করে ম'ল?

গাড়ীতে কাটা পড়ে।

সবাই আহা-হা বলে, কিন্তু চাকুরী দেয় না কেহই। হয়ত বা সাত কলস পানি আর দুইটা ঘর লেপানোর বদলে দেয় আধ থালা পান্ত ভাত। মুখে রুচে না তবু ভুখের মুখে জোর করিয়া গিলে।

মজিদ একদিন বলে—ও চাচি, তুই যে বলিল মেরাজান মারা গেছে—তা যে সেদিন দেখে এলুম বনগায়ে। কি সুন্দর যে লাগল—কি করে বোঝাই, যেন ভদ্দরলোকের মেয়ে। তা ব্যাপারখানা কি, বল দিখি!

রকীবা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চায় যেন সে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পর সে উত্তর দেয়—তা বাবা, এতলোকের মাঝে কাকে কি দেখলে তার ঠিক নেই আর বলছ আমার মেরা। আমার মেরা যদি—

কথাগুলি বলিতে বুকটা ফাটিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ হাউ হাউ করিয়া রকীবা কাঁদিয়া উঠিল।

মজিদ থতমত খাইয়া রকীবার পিঠে হাত দিয়া বলিল—কেঁদে কি হবে চাচি, —আল্লার মর্জি।

মদিজ ভাবে হয়ত তাহার নিজেরই ভুল হইয়াছে। এত মেয়ে ছেলের মাঝে কোথাকার কাকে দেখিয়া সে হয়ত ভুল করিয়া বসিয়াছে।

শরীরটা যেন সারিয়াছে কিন্তু আগের মত যেন আর বল পাওয়া যায় না। বড় ক্লান্ত মনে হয়।

শুধু দুই মুঠো পান্তাভাতের বদলে এত খাটনী আর রকীবার সহ্য হয় না। না খাইতে পাইলে শরীর সারিবে কি করিয়া। তবু মরি বাঁচি করিয়া দিন কাটাইয়া দেয়! দীর্ঘ, ক্লান্ত, খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলা দিন।

শরীফ মোল্লাদের মস্ত বড় খামার। অর্ধেক রাত্রি জাগিয়া রকীবা তাহাদের প্রায় পনর বিশ টিন ধান একা সিদ্ধ করিয়াছে। পরদিন রৌদ্র উঠিতেই উঠানে মেলিয়া দিয়া সে লম্বা বাঁশে হাস মোরগ তাড়াইতেছে। সকাল হইতে পেটে কিছু পড়ে নাই তার উপরে ভ্যাপসা গরম। রকীবার একসময় ঝিমানি আসিল।

হঠাৎ মাথায় একটা প্রবল ধাক্কা অনুভব করিয়া ব্যাপারটা বুঝিবার আগেই টের পাইল পেটে পিঠে লাথি পড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর মালিকের তৃতীয় বউয়ের গর্জন—

বুড়ী মাগী, কাইর কাই ভাত খায় আর পড়ে ঘুমায়। নাক ডাকায়। রাজ্যের সব মোরগ এসে আমার সব উজার করে দিল সে হুস নাই।

রকীবার কপাল কাটিয়া তখন রক্ত চুয়াইতেছে।

শ্লথ পায়ে রকীবা বাড়ীর বাহিরে আসিয়া কাঠাল গাছটার নীচে স্তব্ধ হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। একটা লোক সমবেদনা জানাইল না বা ফিরিয়া ডাকিলও না। তারপর এক সময় রকীবা রাস্তা ধরিল। কপালের রক্তের ক্ষীণ ধারাটি যেন তাহাকে লোহার লাইন পাথর আর শ্লিপারের উপর ভাসিয়া যাওয়া কোন বৃহত্তর রক্তধারার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। বজল গিয়াছে—সেও যাইবে! কিন্তু মেরা গেল না কেন? সেও হয়ত গিয়াছে কে জানে? কথাটার নৈশব্দিক উচ্চারণেই যেন তাহার মন গোঙাইয়া উঠিল। বালাই, ষাঠ, মরিবে কেন—বাঁচিয়াই থাক! ছিনাল বেশ্যার পেশা লইয়া যদি পেট চালাইতে পারে— তবে তাহাই করুক। রকীবার তাহাতে কি? মেয়ে বলিয়া স্বীকার না করিলেই হইল। মেরা তাহার কে? কিছু না। বিন্না ঝোপে পাওয়া—পালিতা মেয়ে।

প্রথম যৌবনের প্রথম পোয়াতি রকীবা মেরাকে পেটে ধরিয়া যে অস্বস্তি অনুভব করিত তেমনি একটা উপলব্ধির স্মরণে তাহার চোখ ফাটিয়া পানি ছুটিল। কপালে হাত চাপা দিয়া সে ষ্টেশনের পথেই চলিতে লাগিল। নিশি পাওয়া পদক্ষেপে।

একটা পেট বইত নয়। না হয় মহাজনকে বলিয়া কহিয়া দুই তিন দিনে একবার খেপ দিবে। খোদার রাজ্যে বিচার যখন উঠিয়াই গিয়াছে, গতর থাকিতে যখন খাটিয়া ও মানুষের মত মোটা ভাতে মোটা কাপড়ে বাঁচিয়া থাকা যায় না তখন ওই চুরির পথই ভাল। যে পথে বজল গিয়াছে, সেই পথে

সেও যাইবে। পেট ভরা থাকিলে লাথিটা চড়টাও খাওয়া যায়। রক্ত যদি ঝরে, তবে চুয়াইয়া চুয়াইয়া ঝরিবে কেন—গল গল ধারেই ঝরুক। এক সঙ্গে সব শেষ হইয়া যাক। কিন্তু এই অবস্থা দেখিয়া মেরাজান যদি আগাইয়া আসে? বলে তোকে কিচ্ছু করতে হবে না, আমিই ত আছি। হাজার হোক পেটের মেয়ে ত। না-না, মেরা সম্বন্ধে কোন দুর্বলতাই সে মনে স্থান দিবে না। মেরা তাহার কেউ না—কেউ না, কোন দিন কিছু ছিলও না।

এই বারে আর নাভারণের তালেব মিয়া মহাজনের বারান্দা নয়। সেই খানে আর পা ফেলিবার জায়গা নেই। নূতন লোক জুটিয়াছে।

অনেক হাঁটাহাঁটি করিয়া কলিমুদ্দিনের সঙ্গে চুক্তি হইল। তাহারই পড়ো গুদাম ঘরটার পিছনের একচালার জায়গা পাইল।

নূতন মহাজনের ঘর হইতেই পাওয়া গেল মবিলের টিন। কিছুটা চট যোগাড় কবিয়া, সুচ সুতালি চাহিয়া আনিয়া থলিয়াও তৈয়ার হইল।

আবার সেই দশটায় গাড়ী।

প্রথম দিনেই বেনাপোলে চোখ পড়িল মেরাকে। চেনা যায় না যেন। নূতন লাল-সবুজ চেক শাড়ী, ছাপার ব্লাউজ। একপোচ পাউডার ও হয়ত লাগাইয়াছে পুষ্ট মুখের উপর। চাহিলে চোখ ফিরানো যায় না! রকীবা চোরের মত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চায়—বিদ্রোহী কড়া মনটা হয়ত পাহারা দিতেছে কখন ধরা পড়িয়া যায় কে জানে।

পুরানো পরিচিতরা ছেঁকিয়া ধরিয়াছে।

ছিলি কোথায় এ্যাদ্দিন?

এমন হোল কি কবে?

রকীবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জওয়াব দেয়—যাব কোন চুলায়! অসুখ করেছিল।

গাড়ীটা ছাড়িতেছে না। কাষ্টমের চেকিং শেষ হইয়া গিয়াছে তবু কেন দেরি করিতেছে কে জানে।

রকীবা প্ল্যাট ফরমের পিছন দিকে—রেলিংএর কাছে নুড়ি পাথরের স্তূপের উপর একা একা বসিয়া সুপারী চিবাইতেছিল। পিছন হইতে মেরা আসিয়া তাহার পিঠে হাত রাখিল।

রকীবা নিরুদ্বিগ্ন গতিতে মাথা ঘুরাইল।

এ্যাই মা।

প্রকম্পিত করুণ অথচ মিষ্টি দুইটা শব্দ। বহু বছরের পরিচিত।

অন্তরের নিরুদ্ধ মণিকোঠার গলা টিপিয়া রাখা অন্ধ মাতৃত্ব-টা যেন সশব্দে ঝলকাইয়া উঠিয়া অর্থ প্রকাশ করিল।

মেরা ?

কিন্তু পরমুহূর্তেই ঝটতি বেগে উঠিয়া দাড়াইয়া ফাটিয়া পড়িল—ছিনালীর আর জায়গা পাওনি—না ? মা ডাক গিয়ে যে বেবুশ্যে তোকে পেটে ধরেছিল তাকে। কোথাকার কোন আস্তাকুড়ের ময়লা—আমাকে বলে কি না মা !

রকীবা একটা বিচিত্র অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া সামনের দিকে হন হন করিয়া আগাইয়া গেল।

দুই একজন ব্যাপারটা দেখিয়া কিছুটা হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল, পিছন পিছন গিয়া রকীবাকে জেরা শুরু করিল। সে একটি প্রশ্নেরও জওয়াব দিল না। রেলিং ধরিয়া চুপ করিয়া দাড়াইয়া রহিল।

দশটার গাড়ীতে যাওয়া আর পাঁচটার গাড়ীতে ফিরিয়া আসা। জীবন সংস্থানের দুরূহ পরিক্রমা।

শরীরে যথেষ্ট বল হইয়াছে। আর কিছু না হোক, দুই মুঠা ভাত ত পেট ভরিয়া খাওয়া যায়।

আজকাল সকলের মুখে মুখে একটা কথা ঘুরিয়া ফিরিতেছে। সেপাইরা নাকি গুলি করিয়া চোরাকারবার বন্ধ করিবে। কাগজে নাকি লিখিয়াছে। কেউ বলে ধরিয়া নিয়া গুলি করিবে। কেউ বলে গুলি করিয়া ধরিবে। নানা মুখে নানা কথা। তবে গুলি যে করিবে এই সত্যটুকু সবার মুখেই এক—শুধু সময়ের তফাৎ। মহাজনেরা বলে করুক দেখি,—কত গুলি করতে পারে। বন্দুকের নালের মুখেও ছিপি আঁটা যায়—বুঝলি ! চান্দির ছিপি। তোরা কিছু ঘাবড়াবি না। আমরা আছি।

রকীবারও ভয় হয়, কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবে—করুক-না গুলি। চুইয়া চুইয়া ত রক্ত পড়িবে, না,—বজলের মত হয়ত লহমার মধ্যেই সব শেষ হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া এত শ'তে বিশতে যদি ভয় না পায় তবে সেই বা

পাইবে কেন। গুজবটা উঠার পর হইতে কমিয়াছে না কি কেউ? না লাইন ছাড়িয়া দিয়াছে!

কিন্তু সত্যই একদিন ঝামেলা বাধিল। বেনাপোলে গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গেই ধুম ধুম করিয়া শব্দ হইল। লোকজনের চীৎকারে প্লাটফরম মুখরিত হইয়া উঠিল! ছেলেমেয়ে বুড়াবুড়ী জোয়ান সকলেই প্রাণ হাতে করিয়া বিশৃঙ্খলভাবে ছুটাছুটি করিতেছে। হাটের মধ্যে একটা পাগলা মহিষ ঢুকিয়া পড়িলে যে বিক্ষিপ্ততার সৃষ্টি হয় তেমনি যেন একটা কিছু হইয়াছে। রকীবা গার্ডের গাড়ীর সঙ্গে লাগানো একটা কামরায় ছিল। মাটিতে নামিয়া হতভম্বের মত গাড়ীটার প্রান্ত ধরিয়া রহিল। সন্ত্রস্ত-চাপা গুঞ্জন ধ্বনিত কলরবের মাঝে 'গুলি, গুলি' শব্দের কাটা আওয়াজ। রকীবার বুকে আত্মরক্ষার আকুল মত্ততা। চোখে মৃত্যু-ভয়ের বিভ্রান্তি।

রেলিং যেখানে শেষ হইয়াছে সেই দিকে সেপাই-সান্ত্রী যেন অপেক্ষাকৃত কম। লোকজনও যেন সেই দিকে বেশী দৌড়াইতেছে না। এই কি সুযোগ? ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালনে হঠাৎ রকীবার নজরে পড়িল ইষ্টিশনের পাশে প্লাটফরমের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া মেবাজান একটি সেপাইর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কি আলাপ করিতেছে। মুহূর্তে রকীবার মনে পড়িল মেবার সেই কথাগুলি—"বিপদে আপদে তারাই দেখবে। আমাদের কোন ভয় নাই।"

না, না, মরণ,—সেও ভাল। পেটের মেয়ের যৌবন বেচিয়া থাকিতে চাই না।

ধুম ধুম করিয়া আরও কয়টা শব্দ হইল। কে একজন ছুটিতে ছুটিতে যেন পড়িয়া গেল। এমনিই কি সব লাল হইয়া যাইবে। সীমানার পাথরের কাছে লাইন স্লিপার, পাথরের মত? রকীবা হাতের টিন ফেলিয়া দিয়া উর্ধ্বশ্বাসে রেলিংএর মাথা ঘেঁষিয়া পাশের ঝোপের দিকে দৌড়াইল।

এক জায়গায় হোঁচট খাইয়া সে পড়িয়া গেল। না, উঠিয়া এই জায়গায় লুকাইয়া থাকিলেও হয়, কথাটা মনে পড়িতেই দেখিল একটি সেপাই তাহারই দিকে ধাওয়া করিয়াছে, হাতে লাঠি না বন্দুক কে জানে। রকীবা মরি বাঁচি করিয়া দৌড়াইতে লাগিল। পরনের কাপড় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন—কাঁটায়

লাগিয়া অনেক জায়গায় রক্ত ঝরিতেছে—কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। কয়েক পা যাইতেই ঝোপের ভিতর হইতে আরেকটি সিপাই তাহার দিকে যেন ঝাঁপাইয়া পড়ার মত আগাইয়া আসিল। লহমার মধ্যে রকীবা চিনিতে পারিল—কপালে সেই মোটা আঁচিল—কি যেন নাম তাহার! হাতে কি, বন্দুক!

রকীবা রুদ্ধনিশ্বাসে অতিকষ্টে যেন চীৎকার করিয়া উঠিল "আমি আমি মেরাজানের মা। চিনতে পারছ না?

গ্রামীণ

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

বৃষ্টির একটা সাদা আওয়াজ জলার চারধারে গেঁয়ো ঘরগুলোকে সম্মোহিত করে রেখেছে।

কোমর অবধি পানিতে দাঁড়িয়ে ধানপাতা থেকে 'গোছা' খুলে মাটির ডিবায় মাছ তুলছে গণি। বিঘৎখানেক সুতোর আগায় লত বাঁকিয়ে বঁড়শির মতো করা হয়েছে, তাতে কেঁচোর আদার গেঁথে ধানক্ষেতের একোণে ওকোণে বেঁধে রাখা হয়। এশার নামাজ পড়ে সকলে ঘুমুতে গেলে পর চুপিচুপি এসে 'গোছা' পেতে যেতে হয়, নাহলে, হারমাদরা কোনরকমে ঠিকানা পেলে 'গোছা' সুদ্ধ চুরি করে নিয়ে যাবে। বছরেব নওলা পানিভরা জলার ধান ক্ষেত ঠেলেঠেলে রাতে এসে 'গোছা' পাতা আর কাক মোরগের ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ভোরে এসে খুলে নেওয়া কম ঝামেলা নয়। নিজের নাও থাকলে পরোয়া কোন ছিল না তার, যখন খুশী তখন কাজ করা যেত সুযোগ সুবিধে মত। পরের কাছে নাওয়ের খোঁজে গেলে যদিবা দেয়, 'গোছা'র মাছ নিয়ে ফিরে এলে ছেলেকে দিয়ে বলে পাঠায়, চাচা মায় কইল দুইটা পোনা দিতে। এখন নিজের নেই বলে কি দুবেলা ভাতের উপায় করতে হবে না, হলেও বা সংসারে দুজনা, সে আর তার মা। 'গোছা'র মাছ গাঁয়ে না হলে আড়ঙ্গে বিকি দিয়ে রুজির সংস্থান করতে হয়, পুরো বর্ষার মওসুম জোড়াতালী করে তার কাটে।

একে বৃষ্টি তার উপর উজান বাতাস। পানিতে কাঁহাতক দাঁড়িয়ে থাকা যায়, 'হিক্কা' ওঠে গণির, অবশ, একেবারে অবশ লাগে শরীর। কোমরে জড়ানো শুধু একটা টেনি, খালি গায়ে চামড়া কুঁচকে আসে ঠাণ্ডায়। দশহাত বিশহাত দূরে দূরে এক একটা 'গোছা', ব্যাঙচাইর লতায় পা দুটি বারে বারে আটকে

যায় বলে সহজে এগনো যায় না, শাওন মাসের পুরু কালচে ধানপাতা কেটে বসে হাতের কয়েক জায়গায়, ঘাসফড়িং আঁচড় কাটে থেকে থেকে বুকে আর পিঠে। যা জ্বালা করে আঁচড়ে।

বাইশটি 'গোছার' বারটি খোলা হয়েছে। ছোট ছোট মাছ কই-শিংই বেশী, সেই কখন থেকে আদার খেয়ে মরে আছে, পচনের আগে যেমনটি হয়। ঢুটিতে মাছ আটক পড়েনি, 'গোছা'র কেঁচো পানিতে ভিজে ভিজে সাদা হয়ে গেছে, দেখতে গা কেমন ঘিনঘিন করে ওঠে। 'গোছা'র মাছ আবার গাঁয়ে যাদের ঢুটি তিনটি গোয়ালঘর, ডুমণী কোষানাও বারো মুনী ঢুসা নাও আছে, তারা নিতে আপত্তি করে, বলে, পচা মাছ খাওন ভালা না। ভরাপানির মওসুমে পুকুর আর জলা ডোবা আর খাল একাকার হলে সব মাছ ভেসে যায় বলে বাধ্য হয়ে নিতে হয়, শুধোলে গণি সাফ জবাব দেয়—'গোছা' দিয়ে মাছ ধরেনি। তাহলেই চুকে গেল, জেনেও নেবে শুনেও নেবে। আসলে পচনের কথা বলে দাম কত কম দেওয়া যায়, এ তারই ফিকির। পেলে 'গোছা'র মাছ কেন, বাজারে পচা পোকায় ধরা শুটকীতে বর্তে যায়।

গণি আপন মনে বলে, গুইয়া গড়ের মাছ খায় তায় ফের বাছুনী।

বৃষ্টির এমন একটানা আওয়াজ শুনে গণির কেমন একলা একলা লাগে, নজর তুলে তাকাতে ইচ্ছে করে না। মানুষ বলতে মানুষ, একটি গরুও নেই কাছারী ঘরের সম্মুখে, ফাঁকা একটা বিস্তৃতি ঘরগুলোর উঠোন থেকে জলা অবধি মুখ গুঁজে পড়ে আছে।

মেঘ না ধরলে বেরোবে না কেউ, ঘরে শুয়ে আছে নয়তো আলাপ করে কাঁথামুড়ি দিয়ে নয়তো পাটের দড়ি পাকায় হাঁটুর উপর কাপড় তুলে, নয়তো বিরস মনে খোরাকীর কথা ভাবে। এমনিতেই পানির মওসুমে লোকজনের আনাগোনা বড়ো কম, কজনের কটা নাও আছে, অভাবের টানাটানিতে সকলে দিশেহারা, যে দিন থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হয় ভাদুরে তালের মতো সেদিন থেকে যেন জিরোবার পালা, মরবার আগে যেমন হয়।

ডিবার মধ্যে কই মাছ রাখতে গিয়ে ভালো করে চেয়ে দেখে কইয়ের একটা কানকা কিসে জানি খেয়ে ফেলেছে। হয়তো পোকায় খেয়েছে, পানির ভিতর সাপের নাম মুখে আনতে নেই। খেয়েছিল, পুরো মাছটাই তখন খেয়ে নিলে হত। এখন এই আধকানকা মাছ কেই-বা কিনতে যাবে পয়সা খরচ করে, প্রতিদিন 'গোছা'র মাছ ঢুটি একটি করে সাপে খেয়ে নিলে তার পোষাবে

কেমন করে। 'গোছা'র জন্য কেঁচো ধরা, মাছফড়িং ধরা—এত কষ্টের ফল বরবাদ হলেও বিবাদ করা চলে না ত সরাসরি পোকার সঙ্গে। যদি জমিনে হত, মাছ খাওয়াটা দেখিয়ে দিত সে। বাপ-দাদার কথা—যেখানে যেমন সেখানে তেমন, এই বচন একেবারে বাতাসে ওড়া বাঁশপাতার মত উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

দুহাতে ধানের নাড়া ঠেলে ঠেলে গণি আপন মনে বলে ওঠে, রমিগো পাতলাটা নিয়া আইলে পারতাম, মেঘের তন মাথাটা বাঁচত। মনেও আছিল না, খাইতে না পারলে মাইনষের মাথা ঠিক থাকে কোনদিন। খাওনের বরাত আমাগো নাই, পেটে যার ভাত নাই তার আবার বরাত কি!

আলের কিনার ঘেঁষে কি একটা মাছ ঘাই দিয়েছে। ফিকে হলুদ বরণ পানি একটু থির হলে পর, এক ঝাঁক পোনা লাল শরীর ভাসিয়ে চলেছে, নিচে গরুই মাছটি, দেখতে পেয়ে আফসোসে জিভে টুক্‌টুক করে আওয়াজ করে গণি। হাতের কাছে 'ওছা' থাকলে ঝাঁকসুদ্ধ পোনা ধরা যেত, তেল-পেঁয়াজে পাকালে কি স্বাদ লাগে খেতে। নিজে না নিয়ে বিকি দিলে আট-দশ আনা পাওয়া যেত নগদ নগদ, পোনা মাছের জন্য গাঁয়ের সকলে পাগল, একটু বড়ো হয়ে গেলে পরে খাওয়ার স্বাদটুকু আর থাকবে না।

এখন বেলা কত হয়েছে? অভ্যাসমত গণি আকাশে নজর হানে, সূর্য নেই বলে বেলার ধারণা করা মুশকিল। বেলা বেশী হয়ে গেলে আধ মাইল দূরের আড়ঙ্গ গিয়ে পাওয়া যাবে না, যেতে যেতে লোকজন খালি হয়ে যাবে, বাদার দিনের আড়ঙ্গে এমনিতেই সোরগোল কম। আড়ঙ্গে গিয়েও বা কি হবে। মাছ বিকিয়ে পাবে হয়ত দশ আনা-বারো আনা। এক সের চালের দামও হবে না এতে। দশ আনা পেলে খালের মুখে বাঁধা ব্যাপারী নাও থেকে পাঁচ সের আলু কিনে আনলে সিদ্ধ করে আগুনে পুড়িয়ে পেটের আজরাইলী খিদে মেটান যাবে বেশ কয়েকদিন। কথায় না বলে হিসেব করলে কিতাব মিছে,—পুরু মাস ধরে ক বেলা ভাতের মুখ দেখেছে, হিসেবে অমনি দাঁড়ায়, ভাতের বদলে আলু খেয়ে জান বাঁচে কারো? এর ওপরে আলু কেনার পয়সাও বা মেলে কই? নি-উপোস দিনের কথা ভাবলে এখন যেন গুনা হয়, কলিজার রক্ত যেন জমাট বেঁধে যায় ডরে। গাঁয়ের ভিতরে মাছ কেনার মত অবস্থা আছে কার? দু তিন ঘর বাদে সকলের ঘরে টানাটানি, কার্তিক অঘ্রাণ মাস তক খোরাকী কারো গোলায় নেই। একবেলা ভাত আর বেলা আলু

শ্রাবণ ভাদ্র বড়ো জোর আশ্বিন অবধি খেতে পারবে, তারপরে আধপেটা উপোস দেওয়ার পালা। এদের ভিতর মাছ কিনে খাওয়ার মত শখ কারো নেই। আর ওর গোলা বলতে গোলা, দুবেলা খাওয়ার মত খোরাকীরও অভাব।

গণি বলে, মেঘ পড়তাছে আসমান ফুটা কইরা, থামনের নাম নাই—পরুক। চাইলের দর বারুক, গত হাটে তেইশ টাকার চাইল লাফ দিছে ছাব্বিশ টাকায়। আরো দিব। আমাগো পেট ত পাথথর, খিদা লাগে না, পিয়াস লাগে না! নয়া ধান নামতে নামতে আমরা মইরা যামু—হেতে কার কি?

পুবের কোণে কয়েকটি বাঁজা তালগাছ মেঘের আওয়াজে কালো একটি কাঁপুনি তুলছে, নড়বড়ে সাঁকোটার ওপরে বৃষ্টির পর্দা জোর বাতাসে ছিঁড়ে ফেলছে কয়েক খণ্ড করে, জলার মধ্যকার কুয়া তোবাব মুন্সীর পুরনো সাদা পিরহানের মত চারিধারের শামলা ধানক্ষেতে কেমন বেমানান দেখায়। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে গণির শরীরে, 'গোছা' খোলার মত বল যেন নেই আঙুলে। খেতে পেলে ত বল আসে শরীরে। গত পরশু পুরো উপোস দিয়ে কাল সারা দিন সারা রাতে আধ-পচা গুটিদুই আলু আগুনে পুড়িয়ে খেয়েছে মায়পোয় মিলে। বুড়ির আবার আলু সয় না, পেটই খারাপ হয়ে গেছে খেয়ে, উথালপাতাল করেছে রাত ভর শুয়ে শুয়ে কেবলি; নিজের কপাল নিয়ে নালিশের অন্ত নেই খোদার দরবারে। আজরাইলেও কি নেয় না বুড়িকে! উপোসে মানুষ টুপ করে মরে না, আস্তে আস্তে কবরের দিকে এগোয়, কি একলা আর যন্ত্রণাকর চোখ মেলে নিরূপায়ে মরণ বরণ করে।

এখনো "আটটি" গোছা' খোলা বাকী। সেকান্দার খোনকারের বারো গণ্ডায় পাঁচটি আর জিন্নত আলীর ন'কড়ায় তিনটি 'গোছা' খোলা এখনো বাকী রয়েছে। বারোগণ্ডা খালের ধারে বলে মাছ উজায় বেশী। আর কি ধান হয়েছে, সার দেওয়া জমিনে ভালো নিড়ানি পেয়ে ফুলে উঠেছে কালা গরুর ওলানের মতো। আউসে পউসে মিলিয়ে এবার খেতি করেছে খোনকার। পানির শুরুতেই পেকে গিয়েছিল আউস ধান, কেটে নিয়ে যায়নি তাড়াহুড়া করে, তবুও চারিধারে আকালের মত, কে জানে ধান কেউ 'উধার' চেয়ে বসে যদি, না দিলে বদনাম করে যদি। ধনজন হয়েছে এখন কপালে দাগ দেবে কে? এককালে গাঁয়ে তাদের বাড়ী ছিল, নামী বাড়ী। দাদাদের আমলেই

জায়গা সম্পত্তি আস্তে আস্তে বেহাত হয়ে পড়ে খোনকারদের কবলে। তাদের বাড়ীর নাম অবধি বদলে যায়। আগে ছিল 'পরধান' বাড়ী, হয়েছে এখন ব্যাপারী বাড়ী, দশঘরের ভিতর চার ঘর ব্যাপার করে বলে। তাদের ধনে মোনদারগোষ্ঠি বড়ো হয়েছে, বরং তারাই মোনদারদের জমিনে এখন জন খাটে। এই বারো গণ্ডা তার বাপের থেকে সেকান্দরের বাপ কিনে নেয় কবালার পণে। বাপ বেঁচেছিল যতদিন এই জমিতে কোর্ফা প্রজা হিসেবে ততদিন চাষ দিয়েছিল। বাপের মরার পরে উচ্ছেদ করে তাকে জমিন এনেছে মোনদার আপন খাস দখলে। এখনো বারোগণ্ডার ফলনের কথা মনে হলে কলিজাটা গুরগুর করে উঠে।

খালের কিনার ঘেঁষে 'গোছা' পাতা হয়েছে। খেতের পানি বেরোবার নালার মুখ বলে গহীণও খুব, সোতের টানেও জোর। 'গোছা'টিতে জাগুড় মাছ আটকে মরে আছে। গণি আস্তে আস্তে মাছটি খুলে ডিবায় রাখে, 'গোছা'র সুতো লতের ডগে পাকিয়ে গুটলী করে। বেশী নয়, গুটিচারেক জাগুড়মাছ পেলে কম করে দেড়টাকায় বিকোবে। জাগুড় মাছদের ভিতব রাজা গোজের, দেখতে সুখ, খেতেও আরাম। জামকাবা কচুরী পানার উপর থেকে একটা সবুজ ছোট ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ে ডিবার ভিতরে, মাছের ডিবায় ব্যাঙ লাফিয়ে পড়া শাহী কপালের লক্ষণ, জমিতে পুঁতে বাখা তলতা বাঁশের কচি আগা তুলে গণি পানির ওপর সপাং সপাং আওয়াজ করে—ডিবার ভিতর আরো কয়েকটি ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ুক। পরের 'গোছা'টিতে আদারই নেই। লতের বঁড়শি ধানের নাড়ায় জড়িয়ে রয়েছে। বিরস হয়ে যায় তার মন, কাহিল লাগে একেবারে শরীর। একটু আগে যা দেখেছে সেকি মিছে, চোখের ভুল ? মাছের ডিবায় ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ার মানে যে আরো মাছ পাওয়ার নিশানা।

গণি বলে ওঠে, গরীবের ফাটা কপাল জলনীও তামাশা করে—করুক মানীরা যখন কপাল লইয়া ঘুরায় গরীবের তখন দশা হইব কি। মানীর মান রুখতে গিয়া আমরার পিঠের ছাল উইট্যা যাউক, এমন বিচার কোন দেশত আছে ?

একটা অন্ধ জানোয়ারের বুনো একরাশি কেশরের মত চারিধার আচ্ছন্ন করে আবার বৃষ্টি ঝরতে শুরু করেছে জোরে। আড়ঙ্গ পাবার আশা নেই আজ মোটেও। মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে বেলা নয়তো রাঙা আলোয় দশদিক উজ্জ্বলা হয়ে উঠত এতক্ষণে। আড়ঙ্গে অথবা গাঁয়ে মাছ

বিকোন যাক আর না যাক যেতে হবে ত, মানুষ কাহাতক উপোস দিয়ে থাকতে পারে একটানা। ভরসা আছে একটি। 'গোছা'র মাছের দাম সেকান্দর মোনদারের কাছে পায়। বুধে বুধে সাতদিন পেরিয়ে গেল, দাম দেয়নি এখনো, বাহানা করে কেবলি; রাজ্যসুদ্ধ সবকাজ সমাধা হয় তার, কিছুতেই কিছু ঠেকে থাকার জো-ই নেই, শুধু তার মত গরীবের পাওনা দেবার সময় গাজী ওজুহাত, দেশবিদেশের অভাব আর অনটনের বলন, বারোশিঙ্গে জৌলুষের কমতি এতটুকু নেই তবুও।

গণি আপন মনে বলে, এই ত উপোস দিতে দিতে পেটে আমার বেদনা ধইরা গেছে। আমার দামটা দিয়া দেন না কইলে চাইল এক সের দিয়া দেন। গোলায় আপনের তেইত্যা সনের ধান মওজুদ, আপনের কি। উজান কথাবার্তা কোন সময় কইলাম—কেন? নেওনের কালে টনটনাইয়া গরজ আপনের, দেওনের বেলায় খালি পোড়ানি। দাম দিবেন না ক্যা—কন। উপাস খালি আমরাই দিমু, পেটে খিল ধইবা উপাস দিতে—আপনেগো শুনতে ভালো লাগে—না।

খালি-'গোছা' ডিবার মধ্যে রেখে বলে, আবার, আরে আরে আমার মাথা কি খারাপ হইয়া গেছে, কার লগে কথা কইতাছি একলা একলা।

আসলে মানুষটা সে মুখচোরা। সেকান্দার মোনদার কেন যে অমন করে তা অজানা নয় একেবারে, এর মানে হলো দেশ গাঁয়ের লোকে জানুক গণি ব্যাপারী মোনদারের তাঁবে খাটে, মোনদারের ইচ্ছার উপর তার ওঠা বসা। তবে মোনদারের সামনা সামনি কখনো কিছু বলেনি। ডর লাগে বলে নয়, বুকে কথা জমা থাকা সত্ত্বেও বলার সময় তালগোল পাকিয়ে যায় সব। মনের এই জ্বালা তুষের আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলে—তাদেরই সব কিছু বেহাত করে বড়ো মানুষ হয়েছে মোনদার আর তাদেরই মানুষ বলে মোটেও গণ্য না করা। কালে কালে কতই হলো পুটিমাছের লেজ বেরোল। তার মা মোনদারের ঘরের ভিটি লেপে দিয়ে আসে পেটের দায়ে, সে মাছ নিয়ে আসে খোরাকীর টানাটানিতে, সেই জোরে কি মোনদার গালাগাল করবে মা-বাপ তুলে শুধু শুধু পাওনা না দিয়ে হয়রাণ করবে তাকে? মোনদারের মানের দিকে চেয়ে এতদিন কিছু বলেনি, ইজ্জতউল্লার রাখা ডাকের বচন। কিন্তু পরের ইজ্জত রাখতে গিয়ে নিজের ইজ্জত যাবে উপোস দিয়ে থাকবে, এমন কি হয় কখনো?

নিজে সে মুখচোরা। মেয়ে মানুষের মতো লাজুক, নিরিবিলি জলায় মেঘে আকাশে মুখোমুখি বলে কথা ফুটেছে তার, তাই বলে মোনদারের কাছে গিয়ে কিছু শুধাতে পারবে না, তেমন মনের জোর তার নেই। সঙ্গে নিয়ে যাবে তার বাড়ীর সকলকে, তারপরও যদি না দিতে চায় বাহানা করে, সকলে মিলে যা হয় ভাল মন্দ একটা কিছু করবে।

গণি আপন মনে বলে, মাইনষের লহু আমাগো শিরায় এইটা ভুলুম কেমনে পৃথিবীর বুকের ভিতরকার কথাটি যেন চিরকালের স্বপ্নোচ্চারণের মত বাতাসের গতিময় করাঘাতে মেঘের অন্ধকার থেকে আরো দূর গ্রামান্তরে অন্ধকারে চলে গেল।

উপকথা

সরদার জয়েন উদ্দীন

আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর আগের কথা।

সময়মত মালগুজারী না হওয়ায় দুলাই পরগনা নীলাম হয়ে গেছে। নতুন জমিদার আদালতের ফরমানসহ নাজির নিয়ে এসেছে ঢোল সহরত করে জমিদারীর দখলনামা জারি দিতে। পাইক-পেয়াদা, বরকন্দাজ, নায়েব গোমস্তা আরও লোকজন কত।

বিরাট পরগনা। মাঝখানে বিল, চারপাশ দিয়ে বসতি। কোন কালে নাকি এক ইংরেজ সাহেব শিকল ফেলে ফেলে কাঁটা-কম্পাস ধরে এই বিল জরিপ দিয়েছিল। সেই জরিপেই নাকি লেখা আছে, বিল গাজনা দৈর্ঘে সাড়ে দশমাইল এবং প্রস্থে সাড়ে সাত। তাই নায়েব গোমস্তা আদলতের নাজির এরা সব ঘোড়ায় চড়া। ঘোড়া গুনতিই প্রায় এক শ। ঢালী-ঢুলি এ সব দিয়ে এক হাট লোক। হৈ হৈ করছে আর কিলবিল করে পথ চলছে। মাঝে মাঝে ঢোল-নাকাড়াগুলো কড়া আওয়াজ দিয়ে উঠছে, ঢুম্, ঢুম্, ড্রিম—ড্রিম—ড্রিম।

গাঁয়ের লোকজনের কিন্তু এ-দিকে বিশেষ দৃষ্টিনাই। কেউ দাঁড়ায়, দু'কথা কান পেতে শুনে আবার নির্বিবাদে নিজের কাজে চলে যায়। বউ ঝিরাও অমনি যে যার কাজ কাম নিয়ে ব্যস্ত। ঢেঁকির পাড় থামিয়ে ঢোলের আওয়াজ একটু কান পেতে শুনে তারপর আবার ঢেঁকি চালায় ঢিপ্—ঢিপ্—ঢিপ্।

বুড়ো ওসমান খাঁ বৈঠকখানায় শুয়ে ছিল ঢোলের আওয়াজ শুনে মাথা উঁচু করে ঘাড় বাঁকিয়ে বাইরের দিকে একটু চেয়ে টেনে টেনে বললো, হ্যাঁরে ছোঁড়ারা, এ ঢোল বাজনা কিসের রে?

ওসমান খাঁর বয়স ঠিক কত তা সে নিজেও গুছিয়ে হিসেব করে বলতে পারে না। তবে অনুমানে বলে, একশ দশ কি এগারো। 'খোদাবক্স' খুনের বছরে সে নাকি বিশ বাইশ বছরের জোয়ান ছিল। সেবার লাঠি-সোটা ঢাল-শড়কী নিয়ে চৌধুরী জমিদারের লোক লস্করের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সেও শরীক হয়েছিল। শুধু শরীক হয়েছিল না, তার শড়কীর ফলা চৌধুরী জমিদারের অনেক সিপাইয়ের পেটের গভীর তলদেশ পরীক্ষা করে করে ফিরে এসেছিল। এমন কি 'খোদা-বক্সে'র শুঁড় কাটা পড়েছিল ওসমান খাঁর তলোয়ারের ঘা লেগেই। তখন মাথায় ছিল কুহেলী বাবরী, মেঘ-গম্ভীর কেশদাম। শরীরে ছিল জোয়ান হাতীর তাকত। আর আজ শয্যা শায়িত থুথুড়ে বুড়ো, পাশ ফিরতে আর একজন মানুষের সাহায্য নইলে চলে না। মাথার সে অনিন্দ সুন্দর কেশদাম কালের পেষণে ক্ষয়ে ক্ষয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, বিড়ালের শুভ্র গোঁফের মত দুই এক গাছা এখানে ওখানে মুখ নত করে পড়ে আছে। থুথু ফেললে ঠোঁট বেয়ে দেহ ভিজিয়ে দেয়। তবু কিন্তু ঢোলের আওয়াজ শুনলে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে ওসমান খাঁর। শরীরের ভিতরে ঘুমিয়ে পড়া হিমেল ঠাণ্ডা শোনিতধারা যেন চোখ মেলে চায়। বুড়ো তার ছেলেকে ডাকে, হ্যাঁরে মেনাজদি, অমন সুরে ঢোল বাজে না এ দেশে বহুদিন, আবার কি সেই ঢোলের উৎপাত শুরু হলো ?

কেউ বুড়োর কথার কোন জবাব দেয় না, জবাব দেওয়া প্রয়োজনও বোধ করে না। আপন মনে বুড়ো তো অনেক কথাই বলে, অনেকক্ষণ কথার জাবর কাটে, কে তার কয়টা কথার উত্তর দিতে পারে। তাই রোজকার মত আজও তার কথায় কেউ রা-টি পর্যন্ত করলো না। কিন্তু অন্যান্য দিনের মত আজ দুই একবার জিজ্ঞাসা করে জবাব না পেয়ে ব্যথিত হয়ে চুপ মেরে মনের দুঃখে পড়ে রইলো না সে। আজ আবার ডাকলো, মেনাজদ্দি, ওরে ও মেনাজদ্দি, ঢোল নাকারা বাজে অমন করে কোথায় রে ?

বুড়ো ওসমান খাঁর কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে বাতাসে মিলিয়ে গেল। দু'চোখ ভরা প্রত্যাশা নিয়ে জবাব শুনতে চেয়ে থাকে সে। কিন্তু কোথায়, একদিন যার মুখের কথায় হাজার হাজার লোক পাগলা হাতীর শুঁড় জড়িয়ে ধরতে এগিয়ে গিয়েছিল, যার ইঙ্গিতে কচুকাটার মত কাটা পড়েছিল জমিদারের সিপাই সান্ত্রী, আজ সে আর একজনের মুখ পানে তাকিয়ে থাকে একটুখানি কথা শুনবার জন্যে। হায়রে কাল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওসমান খাঁ, তারপর তার ইচ্ছে হয়, মরে যায় সে।

নীলাম জারির ঢোল একতালে বেজেই চলে, ঢিপ-ঢিপ-ঢিপ। বুড়ো ধৈর্য ধরতে পারে না। আবার ডাকে মেনাজদ্দি, ওরে—ও মেনাজদ্দি!

মেনাজদ্দি রুক্ষস্বরে জবাব দেয়, বলি ক্যা ডাকছো ক্যা?

মেনাজদ্দির জবাবটার সুর শুনে আর কিছু জনেতে ইচ্ছে করে না বুড়োর। কিন্তু তখনি কয়েকখানা বাড়ীর পর ড্রিম ড্রিম করে আবার ঢোল নাকাড়া বেজে ওঠে। বুড়ো আর স্থির থাকে পারে না। ভাবে মেনাজদ্দি আমার নিজের ছেলে হলে আমার গায়ের রক্ত মেনাজদ্দির রক্তের সাথে থাকলে, হয় তো সে এমন করে উত্তর করতে পারতো না। কি জন্যে যেন কিছুটা শুকনা বাতাস ওসমান খাঁর বক্ষ পিঞ্জর থেকে বেরিয়ে হাঁফ ছেড়ে চলে যায়, হয় তো ঐখানে যেখানে জয়ের বাজনা বাজছে ড্রিম—ড্রিম—ড্রিম।

বেহায়ার মত তাই আবাব জিজ্ঞাসা করলো ওসমান খাঁ, ও ঢোল সহরত কিসেব রে মেনাজদ্দি?

গুড়গুড় করে তামাক টানতে টানতে আনমনে জবাব দিল মেনাজদ্দি, চৌধুরী জমিদারের তুলাই পবগনা নীলাম হয়ে গেছে তাই নতুন জমিদার দখল জারি দিচ্ছে।

ব্যাধের শর খেয়ে যেমন বিহঙ্গ ছটফটায়, ওসমান খাঁব মনটা তেমনি ছট-ফট করে মরতে লাগলো। আবার নতুন জমিদার! আবাব বুঝি শোষণ আর শাসন, হত্যা আর ইজ্জত লুণ্ঠন, চক্ষু কোটরে ঘুলিয়ে যাওয়া মণি দু'টো তার মরু সাহারার পান্থপাদপেব মত সজল হয়ে ওঠে। রোগক্লিন্ন বয়োবৃদ্ধ ব্যাঘ্রের মত ওসমান খাঁর নিজের দেহের উপর একটুখানি চোখ বুলায় তার-পর ঝিম মেরে পড়ে থাকে। সে দিন তাব কোথায়? আজ নাকের ডগায় মাছি বসলে তাড়াবার তাকত পায় না, আর সেদিন সে নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে মত্ত হাতির সামনে কুঁদে পড়েছিল।

অবশ্য তখন এত আইন-কানুনেব বাঁধন ছিল না, সোনাধবী জমিন পড়ে আছে, ফসল ফলাও, পুত্র পরিজন নিয়ে পরম সুখে খাও। মাঝে মাঝে রাজার হিস্যে যে দিতে হতো না এমন নয়। ফসলের কিছুটা তারাও নিত। তাই বলে আজরাইলের মত জান নিয়ে টান ধরতো না।

সোনার বিল গাজনা, আহা মরি ফসল ফলতো। মায়ের বুকে যেমন দুধের দরিয়া আপনি উথলে ওঠে তেমনি যেন ঠিক গাজনার মাটির আঁসে আঁসে বীজ না ফেলতেই ফসলের দরিয়া ঢেউ খেলতো। আষাঢ় শাওনে লহর বেয়ে পানি

এসে ঠিক গাজনাকে সিনান দিয়ে দিয়ে ডুবিয়ে দিত। পাগলী মেয়ে যেন যৌবন জোয়ারে ক্ষেপে উঠতো, গাঢ় সহজ ধানের গাছে তার কি গভীর ঘন কেশের বাহার। তারপর শাওন-ভাদ্রে বাতাসের সাথে বেটির কি মাতামাতি হুড়োহুড়ি, যেই আশ্বিন এলো মা আমার সোনার ফসল বুকে নিয়ে দয়াময়ী অন্নপূর্ণার মত দু'হাত বাড়িয়ে মিষ্টি হাসি হেসে হেসে গাঁও-গেরামের লোকজনের মনপ্রাণ হাসিয়ে দিত। নাও খাও, যে যত পার। কার্ত্তিক-অঘ্রাণ মাস দুর্বাঘাসের মলিদা গায় দিয়ে বেটি ঘুমাত, অঘোরে ঘুমাত।

এমনি এক ঘুমের সময়ে সাদা সাদা গা, গাঢ় লালমুখো সব সাহেবরা এসে মাযের গায়ের উপর ঝপ্ করে শিকলী ফেললো। মা বোধ হয় চমকে উঠলো। তারপর কাঁটা কম্পাস কত কি যে ধরে ধরে আড়াআড়ি লম্বালম্বি কত রকম জরীপ হলো। হলো বন্দোবস্ত। যে জমি ছিল দশ গাঁয়ের দশের, তার মালিক হলো চৌধুরীরা।

শোনা শোন শোনা যায় চৌধুরীরাও এ দেশের মানুষ নয়। পুত্র-পরিজন নিযে ওরাও এসেছিল ব্যবসা করতে, তারপর ওদের সাথে সাহেবদের হয় দহরম মহরম। এমন কি এক সাহেব নাকি—ওদের বাড়ীতে মেয়েদের কাছে যাতায়াত করতো। সে কেলেঙ্কারী যখন ধরা পড়লো, তখন আর কি, সাহেব বলেছিল, "আই লভ হার এণ্ড সি লভস মী, ইসমে কিয়া হ্যায়?" চৌধুরীরা ইজ্জত ঢাকতে কত কি যে করলো, তারপর এই বন্দোবস্ত নিয়ে তাদের বাড়ীর সে মেয়েকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছিল।

পাইক-পেয়দা, লোক-লস্কর, হাল-হাতিয়ার নিয়ে হাতীর হাওদায় চড়ে চলে এলেন চৌধুরী জমিদার গোলাম আজগর। আরব দেশের তাজি ঘোড়া সারাদিন দৌড়িয়ে যতদুর ঘের দিতে পারলো সেই হলো তুলাই পরগনা। সারা গাঁয়ের লোক শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে চেয়ে রইলো, একি অবাক কাণ্ড, এমনটি কেন ঘটছে তার হদিস কেউ খুঁজে পেল না। মাঝ বিলের ভুতের ডাঙ্গায় কাছারী বসলো, তারপর একদিন কাড়া নাকাড়া বাজিয়ে এলো ঢুলী, সঙ্গে তার হাজার ঢালী, ঘোড়ার পিঠে কত আসোয়ার।

গাঁয়ের চাষীরা বলে উঠলো, একি অবাক ব্যাপার, বার বার সোনা-ফসল মাড়িয়ে তোমাদের একি হচ্ছে, কি চাই তোমাদের? ওসমান খাঁ এগিয়ে গিয়ে হাতীর সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, হেইও হাতিওয়ালা, থামাও হাতি।

তারপর কত বিনয় করে বলেছিল ম্যানেজার সাহেবকে, চাষী গৃহস্থের

আহার মেরে লাভ কি আপনাদের, এসব কি আজব রং তামাশা ? তখনও শিশুর মত সরল গাঁয়ের চাষীরা ভেবেছিল, এ বুঝি তাদের এক রকম খেলা।

ভ্রিম-ভ্রিম করে কাড়া নাকাড়া বেজে উঠলো, হাজার ঢালী জবাব দিলো, সামনেসে হট যাও, জমিন্দারী কি দখলী হোতা হ্যায়।

কার জমিন কে দখল করে, মুহূর্তে কি ভাবলো ওসমান খাঁ, তার কপালের চাম কুঁচকে এলো, তারপর মাতব্বর নোয়াব আলীকে কানে কানে কি যেন বললে সে। নওয়াব আলীর চোখ দিয়ে আগুনের হলকা নির্গত হতে লাগলো।

নওয়াব আলী সামনে এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে জানিযে দিলো, ফিরাও হাতী, দখলী নেহী হোগা, এ জমিন মেরা হ্যায়।

গর্জে উঠলো হাজাব ঢালী। জয় চৌধুবী গোলাম আজগর কি !

আলি আলি বলে লাখ চাষী হুঙ্কার দিযে জবাব দিলো, জান কবুল, জমিন নয। এলো লাঠি, শড়কী, লেজা তলোয়ার। সে কি উন্মত্ত লড়াই। বিশ বাইশটি বছর ধরে যে মাটির রসদ খেয়ে ওসমান খাঁর দেহে এসেছিল শাক্তির অফুরন্ত জোয়ার বেগ, সে মাটিরই রক্ষাকল্পে আজ সেঁ মহাশক্তির পরীক্ষা। ওসমান খাঁর কব্জি হত্যার নেশায় পাগল হয়ে উঠলো। শড়কীর ফলা রক্ত-পিপাসু ব্যাঘ্রের জিহ্বাব মত লক্‌-লক্‌ করে ফিরতে লাগলো। কচু-কাটার মত কাটা পড়লো সিপাইসান্ত্রী ; বিল গাজনা রক্তস্নাতা। লড়াই হেরে পিঠ দিয়ে পালিয়ে গেল পাইক-পেয়াদা, বরকন্দাজ ঢালী। কিন্তু জমিদার বাড়ীর হাতী খোদাবক্স আজ ক্ষেপেছে। সে কিছুতেই হটছে না। কেবল শুঁড় তুলে হুঙ্কার ছেড়ে এগিয়ে আসছে, যা সামনে মিলছে পায়ে দলে শুঁড়ে জড়িয়ে আছড়িয়ে একাকার করে দিচ্ছে। আর্ত চিৎকারে কৃষককুল দিগ্বিদিক কাঁপিয়ে তুলছে। শড়কী ফেলে হাতে তলোয়ার নিয়ে হাতীর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওসমান খাঁ। তারপর মুহূর্তে তলোয়ারের মাথা হাতীর শুঁড় ছুঁয়ে এলো। বিরাট চিৎকার দিয়ে উর্ধ্ব শ্বাসে ছুটে পালালো খোদাবক্স।

চৌধুরী জমিদার গোলাম আজগর এই সমাচারে প্রতিহিংসায় ফেটে পড়লেন, ক্রোধে-উন্মত্তের মত হয়ে গেলেন। এলো ইংরেজের গোরা পল্টন। তারপর কত রমণীর সতীত্ব কেঁদে কেঁদে খোদার দরগায নালিশ জানালো। আল্লাহ্‌ সতীত্ব যদি এত দামী করে দিয়েছিলে, তবে তা রক্ষা করবার জন্যে বড়কে এত জুলুমবাজ আর গরীবকে এত সহায়হীন করেছ কেন ?

বিল গাজনার চাষীরা মরেও যেন মরতে চায় না। এরা এক অদ্ভুত জীব। মাত্‌বর নওয়াব আলী ওসমান খাঁকে ডেকে পরামর্শ করে, সভা ডেকে সকলের সম্মতি নেয়। তোমাদের প্রতি আল্লার এ-পরীক্ষা। অনেকে তো মরেছে, অনেক মা-বোনের ইজ্জত তো লুঠ হয়ে গেছে, তাদের হারিয়ে আমরা সুখে বাঁচতে চাই না। ভাই সব, জান দিয়ে মাটিকে আগলে না রাখলে সে মাটি আপন হয় না।

এক একটা চাষী যেন এক একটা বিষধর কেউটের মত অনবরত ফোঁস ফোঁস করছিল, নিজের মাটি কামড়ে ধরে মরে যাবো, তবু মাথা নত করবো না। এ অন্যায়, এ অত্যাচার—এর শেষ একদিন হবে। নিজের মাটি আমরা আবার নিজের মত করেই ফিরে পাব। সোনার ফসলে ঝিলমিলিয়ে দেব। আজ না হয় কাল হবে এ পুরুষে না হয় আগাম পুরুষে হবে।

চৌধুরী গোলাম আজগর বুদ্ধির গোড়া হাতড়িয়ে দেখলেন, কৌশলে সিংহের জাতকেও খাঁচায় বন্দী করা যায়, কেউটে গোখরোকেও মাটির পাতিলে আবদ্ধ করে রাখা যায়। আর একি ছার বুদ্ধিহীন চাষা। তবে বৃথাই কেন শক্তির পরীক্ষা। তিনি খবর পাঠালেন, তোমাদের জমি তোমাদেরই থাক, আমায় কিছু করে খাজনা দাও। জমিটা যে আমি ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নিয়েছি। তবে এইটুকু শুধু, ফসল আমি চাই না। ফসল বিক্রী করে আমায় টাকা দেবে।

সরল সুন্দর চাষী, মাথার ঘোর প্যাঁচের ধার ধারে না। সবাই বললে আপস ভাল, মিল মহব্বত ভাল, সবাই মিলে-মিশে থাকাই শান্তি। সেদিন চিরদিনের জন্য বিল গাজনার চাষীরা কি যে হারিয়ে ফেললো তা তারা টেরও পেল না। নিজের জমি চ'ষে নিয়মিত বার্ষিক খাজনা পরকে যোগান দেওয়া শুরু হলো সেদিনই প্রথম।

লড়ায়ে চোট খেয়ে খোদাবক্সের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বিল গাজনার চাষী পাড়ার দিকে চেয়ে ক্ষুদ্র চোখের মণিতে তার জোনাকীর আলো ঝলকায়, মাথায় তার নানা ফন্দি-ফিকিরের ঝড় বয়, কোনদিন চাষী পাড়ার কলার বাগান চুপি চুপি শেষ করে দিয়ে আসে, কোন দিন ফলন্ত ফসলের ক্ষেত খেয়ে, গায়ে দলে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। কখনও বা শুঁড় তুলে তাড়া করে নিয়ে যায় নির্জনে কোনও সঙ্গীহীন চাষীকে পেলে। বছরের পর বছর গড়িয়ে চলেছে, খোদা-বক্সের অত্যাচারে চাষীকুল অস্থির হয়ে পড়েছে। কতবার তারা জমিদার

কাছারীতে নালিশ জানিয়েছে, এমন করে মারলে তো আর আমরা বাঁচি না হুজুর। কার নালিশ কে শোনে। নায়েব গোমস্তা হেসে বলেছে, তোমরা খাবে আর হুজুরের খোদাবক্স বুঝি উপোষ দিয়ে মরবে? যাও ভাগো হেঁয়াছে। তবুও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিনয় করলে, বরকন্দাজ দিয়ে হাঁকিয়ে দিয়েছে জমানবিস। নিরুপায় চাষী মাথা নত করে ফিরে এসেছে। হৃদয়ে কাল-বোশেখীর মেঘপুঞ্জ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। চোখে চোখে শঙ্কিত হয়েছে—তুষানলের তীব্রদাহ। এমন সময় হঠাৎ একদিন দেখা গেল নওয়াবআলী শেখ বিল গাজনাব মাটির সাথে মিশে গেছে। তাকে চিনে উঠবার উপায় নাই। হাড়-মাস একাকার হয়ে গেছে। সবাই বুঝতে পারলো এ খোদাবক্সের কাণ্ড, কিন্তু সাক্ষী নাই, সাবুদ নাই, কাছারীতে খুনের বিচার হলো না।

নওয়াবআলী শেখেব মৃত্যুতে সারা বিল গাজনার চাষী শোকে অভিভূত হযে পড়লো। সকলেরই চোখ দিয়ে অশ্রুধারাব বান বযে গেল। কাঁদলো না শুধু নওয়াব আলীর উনবিংশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা পরীবানু। পাষাণেব মত স্তব্ধ হয়ে বইলো সে, মনে হলো অসুব দলনে যাওয়াব আগে মা দুর্গা বুঝি নিজের মনকে এমনিরূপে পাষাণ করে তুলেছিল।

পরীবানুব জীবন ইতিহাস ঠিক আব সকলের মত নয়, কিছুটা বৈচিত্র-ময়। অঙ্ক দিয়ে হিসাব কষলে সে আর ওসমান খাঁ, কে কার চেয়ে বয়সে একটু কম বেশী হবে, সে হিসাব মিলানো যেতে পারে বটে, কিন্তু খুব ছোটবেলার পুতুল খেলা থেকে শুরু করে ওরা যে একেবারে সমবয়সী সেভাবেই পরিচিত হয়ে এসেছে। এই খেলাঘরের পুতুল খেলা দুটি মনকে কি করে যে এক কবে দিযেছিল, তার সন্ধান কেউ জানে না। আজও ওসমান খাঁব মনে আছে, পরীবানু একদিন গোপন পেয়ে তাকে বলেছিলঃ চল দু'জনে কোন দেশে পালিয়ে যাই।

সে হয় না পরী, তোমার আব্বার পাহাড়েব মত বিরাট মান-সম্মান ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে যে, সমাজের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না সে, জবাব দিয়েছিল ওসমান খাঁ। সে আবও বলেছিল। তোমার জন্যে আমি জান দিতে পারি, কিন্তু তোমার বাবার মান যে আমার জানের চাইতে অনেক দামী, পালিয়ে যেতে পারবো না। এও সত্য তোমাকে ছাড়া আর কাউকে কোনদিন আমি গ্রহণ করতে পারবো না। ওসমান খাঁ তা করেওনি কোনদিন।

পরীবানু একদিন অঘোরে কেঁদে কেঁদে মনটাকে এ গাঁয়ে ফেলে দশ মাইল

দূর হাবাসপুরে স্বামীর ঘর করতে চলে গিয়েছিল ; কিন্তু বুকের দুঃখ আর চোখের অশ্রু তার এয়োতীরূপ মুছিয়ে দিয়েছিল। পরীবানু বিধবা হয়ে ফিরে এসেছিল ছ'মাসের মধ্যে। তারপর থেকে সেই যে চৌধুরী গোলাম আজগর এদেশের মানুষের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, সে আগুন জ্বলছে আর জ্বলছে। নিজের কথা কেউ ভাবতেই পারে নাই। আজ তারই লেলিহান দাহ লেগে পরীবানুর বাবা নওয়াব আলী দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল।

পরীবানু ওসমান খাঁকে ডেকে পাঠিয়ে নানা কাজে মন দিতে চেষ্টা করলো, কিন্তু কেন যেন তার মনের মধ্যে কতদিনের কত কথা মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠতে লাগলো। লজ্জায় চোখের পাতা দুটো কেঁপে কেঁপে ছোট হয়ে আসতে চায় ; মুখখানা রাঙা জবার মত লাল হয়ে ওঠে।

ওসমান খাঁ এসে দেখলো, বারান্দার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে পরীবানু, চোখে মুখে তার অপূর্ব দৃঢ়তা। ওসমান খাঁকে চোখের ইঙ্গিত দিয়ে ডাকলো পরীবানু, ঘরে উঠে এস।

একদিন তুমি আমাকে তোমার জান দিতে চেয়েছিলে মনে আছে ? বললো পরীবানু, আজ দুলাই পরগনার অধিবাসীদের জন্যে প্রয়োজন হলে আমি সেটাই চাই। বল তুমি আমায় দেবে কিনা ?

ওসমান খাঁ দ্বিরুক্তি না করে জানলো, তোমার অনুরোধ আমি মনে রাখবো।

অনুরোধ নয়, আমার আদেশ, এ-দুলাই পরগনার জনসাধারণের মনের ইচ্ছা। ওসমান খাঁ শির হেলিয়ে জানালো, তাই হবে। তারপর সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওসমান খাঁ সারা দুলাই পরগনায় ঢোল-সহরত করে জানিয়ে দিয়েছিল, ভাইসব, যে জমিদার শুধু অত্যাচার, অনাচার আর জুলুমের পরিবর্তে চায় খাজনা, আমরা তাকে খাজনা দেব না। চৌধুরী কাছারীর খাজনা বন্ধ করো।

চৌধুরী গোলাম আজগর সে খবর শুনে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছিলেন। ঘোষণা করেছিলেন, ওসমান খাঁর শিরের পরিবর্তে পুরস্কার, পাঁচশত রৌপ্যমুদ্রা।

তাই সেদিন থেকে সত্যই আর কেউ কাছারীতে খাজনা দিতে এলো না। সেদিন চৌধুরী জমিদার হুকুম দিলেন, জ্বালিয়ে দাও ওসমান খাঁর বাড়ীঘর, হয় জ্যান্ত না হয় মৃত অবস্থায় পার ওসমান খাঁকে আমার চাই। তার দেহের গোস্ত আমি কুকুর দিয়ে খাওয়াব।

হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে হাজার চাষী কোমর বাঁধলো, রণসাজে সাজলো কত সিপাই পাইক বরকন্দাজ। ওসমান খাঁর আদেশে পিপীলিকার সারি দিয়ে বিল গাজনার পাড়ে গিয়ে জমায়েত হয়েছিল সারা ছুলাই পরগনার বাসিন্দা।

লাঠিতে লাঠিতে আগুন ছুটলো। মত্ত হয়ে উঠেছিল ওসমান খাঁ। কখনও বা শড়কী কখনও বা হাতে নিয়েছিল তলোয়ার। বিল গাজনার জমিন রক্তের স্রোতে সিনান দিয়ে উঠেছিল। খোদাবক্স পায়ে দলে পিষে মেরেছিল কত জোয়ানকে। তারপর এক সময় তলোয়ার হাতে ওসমান খাঁ খোদাবক্সের সামনে ভিড়েছিল। পলকের মধ্যে খোদাবক্সের শুঁড় কেটে মাটিতে গড়িয়ে পড়েছিল। চৌধুরী জমিদারের কাছারী জলেছিল দুদিন ধরে। সে আগুন নেভানোর পর্যন্ত কেউ ছিল না সেখানে। নিরুপায় গোলাম আজগর ইংরেজ সরকারকে স্মরণ করেছিলেন। হাজারও লাল পাগড়ী আর হ্যাট টুপি মাথায় লালমুখো সব সাহেবরা এসে বাড়ী ঘর ঘিরেছিল. পুরুষদের বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল শহরে, অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছিল মেয়েদের উপর। পরীবানুকে ধরে নিয়ে কোথায় গায়েব করে দিয়েছিল তার ঠিক ঠিক হদিস পাওয়া যায় নাই। কেউ বলে, অত্যাচারে অত্যাচারে তার মৃত্যু হয়েছিল, কেউ বলে, না, গোরা পল্টনদেরকে চৌধুরী ভেট দিয়েছিল। তারা নিয়ে গিয়েছিল কোলকাতা না কোন শহরে, আর তার খোঁজ খবর পাওয়া যায় নাই। ওসমান খাঁর কারাদণ্ড হয়েছিল যাবজ্জীবন। তারপর কোন এক সময়ে রাজার দয়ায় যখন সে ছুটি পেয়েছিল, পৃথিবী তখন অনেক বদলে গেছে। নিজে সে বুড়িয়ে গেছে। আইনের প্যাঁচে চৌধুরীদের জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। আর ছুলাই পরগনার চাষীরা এখন প্রজা, জমিদারকে নিয়মিত খাজনা দিয়ে বসত করে। তাদের সুখের জীবন সুখের হাসি কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে।

কি থেকে কি হয়ে গেছে, ওসমান খাঁ সে সব গুছিয়ে ভাবতেও পারে না। পরাণটা কেমন আউনি হয়ে কাতরায়, ভাবনাগুলো আগোছালো হয়ে যায়। তবু ভাবছিল, ভাবতে চেষ্টা করছিল, আচ্ছা এই মানুষই জমিদার হয়, না জমিদাররা আলাদা জাত ? পরাণ যেন বার বার বলছিল। জমিদাররা আলাদা, আলাদা। আমাদের চাষা জাতের সাথে ওদের কোন মিল নাই। এমন সময় দ্রিম দ্রিম করে আবার কাড়া নাকাড়া বেজে উঠলো। ওসমান খাঁ চিৎকার

করে উঠলো, মেনাজাদ্দি, মেনাজাদ্দি আমার শড়কি লাও, লাঠি লাও হটাও জমিদার।

চিৎকার শুনে মেনাজাদ্দি দৌড়িয়ে এলো। কি হলো বাজান, হলো কি তোমার ?

মেনাজাদ্দির ডাকের কোন জবাব ফিরে এলো না, ওসমান খাঁর দেহ নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে। যে জীবনের মৃত্যু হয়েছিল প্রায় ৯০ বছর আগে, তার আজ কবর হলো।

ওসমান খাঁ গেলে কি হবে, দুলাই পরগনার মায়েরা কিন্তু এ কাহিনী ছেলেদের গল্প বলে এখনো শুনায়। বলে, এ জমিন আমাদের ছিল, আবার আমাদেরই একদিন হবে, তাই তো বুড়ো বলে গেছে।

আশ্চর্য দুপুর

আনিস চৌধুরী

এক কাপ চা গিলতে তিন ঘণ্টা সময় লাগার কথা নয়। তবে শুধু এক কাপ চা নয়। কাঁটা চামচ বিঁধিয়ে আস্ত ছ' আনার একটা চপ্ সাবাড় কোরছিলাম। ঘটনাটা অবশ্য নিছকই আকস্মিক। পকেটে যার সাড়ে তের আনা পয়সা মূলধন, তার কাছে ত বটেই।

তাঁতীবাজার থেকে হেঁটে আসছিলাম। সেপটেম্বরের ক্লাসিক্যাল রোদ। বিত্তবানদের চকচকে গাড়ীর চাকা চরকার মত ধাবমান হোচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে। কম পয়সাবান আয়েসী সায়েবরা রিকসার হুড্ তুলে মাথায় টোপ লাগিয়েও চোখ বুজে ফেলছেন। আর তারই মধ্যেই হন্তদন্ত হোয়ে সঙ্কীর্ণ রাস্তায় অতি উৎকণ্ঠ সাইকেলগুলো সলি সর্পিল কোরে নিচ্ছিল আমি কেবলই হাঁটছি সেই এগারোটা থেকে। আবলুশ রাস্তার পৈশাচিক প্রতিফলন আর ধূলোয় চোখ দুটো বয়লারের মত জ্বলছে।

শো কেসে রাখা জিনিস দেখছি। জুতোর নাকি টাকাপ্রতি এক পয়সা কাটখোট দাম কমেছে। কোথাও বকমারী তৈরী শার্ট পথচারীর গায়ে চড়াও হবার জন্যে আকুতি জানাচ্ছে। ছাতার নূতন প্লাষ্টিকের বাঁটটায় নির্মাতার কারসাজির সুস্পষ্ট ছাপ। শুভ্র স্বচ্ছ একটা অন্তরঙ্গতা কাল কাপড়ের ভাঁজে কেমন উন্মোচনের একটা অধীর আগ্রহ জন্মায়। এমন কি লে লে বাবু ছয় আনা-ওয়ালা উদ্যমী ফিরিওয়ালাদের চীৎকারটা অবধি কিছুমাত্র কমেনি।

রোদ চড়লেও ব্যবসায় চলে। একটা এ্যারিষ্টোক্রেট দোকানের আলম্বিত করোগেট শেডের তলায় এসে জিরোলাম। এই অপূর্ব রোদের সর্বাত্মক

আক্রমণ থেকে সযত্নে রক্ষিত তিনফুট জায়গা—আদিগন্ত উত্তাপের মরুভূমিতে ওই একটু শেতল পাটির প্রলেপ। হঠাৎ এক গুচ্ছ কথা ভেসে এল কানে। উৎকর্ণ আগ্রহে শুনলাম ঃ ব্ল্যাকে ছাড়া পাবেন না। আমিত তেত্রিশ দিচ্ছি। আরে রাখুন কনটোল।

সীসের পাইপ নিয়ে উৎকট দরাদরি। এতক্ষণ দেখিনি তাকিয়ে, এটা ছিল হার্ডওয়ারের দোকান, হোমি আদিয়ালার হেড অফিস।

আমার দরকার স্রেফ পাঁচটা টাকা। এখান থেকে বংশাল যাব। আলিমকে যদি নাও পাই বোসব। শুনেছি ও বিয়ে করেছে। বাড়ীঘর যখন আছে, নিশ্চয়ই রাস্তায় দাঁড়াতে হবে না।

তবু এই অগাধ প্রয়োজনের দুপুরটা কেন এসে বসলাম রেস্তোরায়। কি জানি একটু বিজলী পাখার স্পর্শকাতর ছোঁয়া না মূল্যবান পৃথিবীর সর্বনিম্ন পানীয়ের আস্বাদন লোভ। বোলতে পারব না তা ছাড়া ভেবে দেখলাম দুপুরে আলিমকে না পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কলিয়ারীর কনট্যাক্টটা নাকি ওর হাতে এসেছে ইদানিং।

ভিনিগারে পেঁয়াজটা ভিজিয়ে নিলাম। অন্ততঃ পেঁয়াজ ভিনিগার আর লবণের জন্য বাড়তি পয়সা দিতে হবে না। অদ্ভুত লাগে—অদ্ভুত পরিশ্রান্ত হোয়ে একটা চপ কাটতে—পকেটে যখন মাত্র সাড়ে তের আনা—অথচ পেতে হবে পাঁচ টাকা।

ধুপ কোরে একটা পোর্টফোলিও ব্যাগ এসে পড়ল টেবিলের ওপর। লোকটা চেনা চেনা মনে হোল। তবু সংশয় ছিল, যদি আর কেউ হয়।

শওকতই কথা বোলল প্রথম, শিণ্টু না ?

বোললাম, এত তাড়াতাড়ি—কথাটা সঞ্চিত সাহস নিয়েই বোললাম। পেঁয়াজটা আরেকটু বেশী ভিনিগারে ভিজিয়েই বোললাম। বোধ হয় গলাটা ভেজাবার জন্যেই।

শওকত দেখলাম রীতিমত লজ্জিত বোধ কোরল, না না এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছি বোলছ। না না। তবে তোমার ত চশমা জোড়া ছিল না। গোঁফ জোড়াও আগে দেখেছি বোলে মনে হোচ্ছে না।

দুজনে হেসে উঠলাম। সত্যি কথা বোলতে কি পাঁচ টাকা প্রাপ্তির আরব্ধ সংগ্রাম শেষ হোতে এখনও অনেক বাকী। কথাটা মনে হোলে অত জোরে কিন্তু হাসা যেত না।

উদ্বিগ্নতা দেখিয়ে বোললাম, চা ?

শওকত হাত নেড়ে বোলল, ছাটস্ অল্ রাইট। আমি বোলে দিয়েছি।

বাঁচলাম, অন্ততঃ আরও ছ'টা পয়সা যেত।

বিলক্ষণ আলাপ হোল।

শওকত হারান গ্লাস ফ্যাক্টরীর কমিশন-এজেন্ট। ঐ ধরনেরই কিছু একটা আশা করেছিলাম। নিজে থেকেই বোলে ফেলল, আমাদের ফ্যাক্টরীর তৈরী কোয়ালিটি গ্লাস—লাগলে বোল।

মনে মনে বোললাম, মাটির হাঁড়ি নিয়ে যাব কারবাব চীনেমাটির স্বপ্ন দেখে তাব লাভ ?

একটু থেমে বলি, তা' পয়সা কেমন হচ্ছে ?

পয়সা—দেখ, আমাব কাঁধে ওব সবল হাত রেখে বোলল, পয়সা কোরতে জানলে আসে। এই দেখো না। কাল আমাদের কোম্পানীর পঁচিশ হাজার টাকার টেণ্ডারটা তুলতে পারলে একদম কেল্লা ফতে।

মনে মনে একটু আশান্বিত হোলাম। পঁচিশ হাজারের কনট্রাক্ট হোক না হোক, হাত পাতলে পাঁচটা টাকা নিশ্চয়ই দেবে শওকত। বড় বাঁচা যাবে তা হলে এ-যাত্রা। অদ্দুর হেঁটে আলিমের ওখানে যেতেও হবে না।

শওকত চা এসে গেছে।

কোথায় যেন একটু অস্বস্তি বোধ কোরছিলাম। পাঁচ টাকা যার দরকার সে কেন রেষ্টুরেন্টে বোসে সামন্ততান্ত্রিক চালের একটা চপ শেষ কোরছে, এ প্রশ্ন যদি একান্তই শওকতেব মনে উদয় হয়। প্রয়োজনের গুরুত্বটা যদিও সম্যক উপলব্ধি না করে।

কৈফিয়ৎ-এর সুরেই বোললাম, কিছু মনে কোর না। সকালে খেয়ে বেরুই নি। তা ছাড়া পকেটেও তেমনি—

দেখলাম আমার প্রসঙ্গ নিয়ে নয়, অন্য কথা ভাবছে শওকত, না তেমন লস্ হবে না। পাঁচ পারসেণ্ট কোরে ধোরলে কি বল—

চায়ের কাপে মুখ বুজে এবং না বুঝেই বোললাম, না তেমন আর কি ?

আরও হৃদ্যতা দেখালাম, শুনলাম বিয়ে কোরেছো ?

ও, হ্যাঁ সে আর বোল না ভাই। সবাই বোললে বিয়ে কর। অঢেল টাকা পাচ্ছ। কোথা দিয়ে কি হোয়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে বিয়ে কর।

তা' বেশ ত, একদিন চল না যাই। একদিন, হ্যাঁ হ্যাঁ এসো। উৎসাহ পেয়ে বোললাম, যদি ধর আজ এখুনি।

আমতা আমতা কোরে জবাব দিয়ে বোলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, এস মাত্র ত' দু' মিনিটের পথ।

মন্দ নয়। পরিচ্ছন্ন দুটো কামরা। স্বামী স্ত্রীর পক্ষে মনোরম। একটা বেতের চেয়ার টেনে এনে বসাল শওকত। দেখলাম পরিপাটি গুছানো। এক ধারে তাকের ওপর দুটো বনস্পতির টিন, আর তারই কাছ ঘেঁষে মার্কিনী পঁচিশ সেণ্টের বই গাদী কোরে সাজানো। ছোট্ট একটা লেবেলে ঠিক তারই পাশে সযত্নে লেখা—দয়া করিয়া বই লইবেন না।

কথাটা জমাবার জন্যই বোললাম, ভাল কালেকশন ত হে?

হ্যাঁ, ভাল আর কই। ভাল যা ছিল, গেছে বন্ধু বান্ধবদের পাল্লায়। নেসফিল্ডের একটা গ্রামার ছিল। বড় রেয়ার বই। গেল সেবার। তারপর শেকশপীয়ারের কি যেন একটা লষ্ট—

বোললাম, বোধ হয় মিণ্টন বোলতে চাচ্ছো।

হ্যাঁ হ্যাঁ, শেকশপীয়ারের সেই মিণ্টনটাই হবে। তাও গেল।

পরিহাসের অবস্থা তখন আমার নয়। এ মুহূর্তে সব ভুল ওর ক্ষমার্হ হোতে পারে আমার চোখে।

একটা বাচ্চা মেয়ে পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল। দুর্বল শীর্ণ দেহ। অদ্ভুত নির্জীবতায় একমাত্র জলজ্যান্ত যেন ওই দুটি চোখ। কাছে টেনে আদর কোরলাম। বোললাম বড় নাদুসনুদুস, ফুটফুটে চেহারা ত। বড় মিষ্টি হাসে ত। এই যে খুকি, কি নাম তোমার?

ভেতর থেকে ডাক এল, পুঁটু। মেয়েটা চলে গেল।

শওকত একটু নড়ে চড়ে বোসে বোলল, হ্যাঁ ভাই, বেবীকে ভেবেছিলাম একটা ইস্কুলে দেব। কোথায় আর তেমন স্কুল। দিয়েছি কনভেণ্টে—তা যে কি ছাইপাঁশ পড়াচ্ছে। তবে ইংরিজী মিডিয়ম, এই যা রক্ষে।

পুঁটু জাতীয় মেয়েরাও আজকাল তা'হলে শওকতের অভিধানে বেবীতে রূপান্তরিত হোয়েছে।

কিন্তু রসভঙ্গ ঘটালো সেই বেবী অর্থাৎ পুঁটু। হন্তদন্ত হোয়ে শওকতের কাছ ঘেঁষে এসে বোলল, বাবা অধ্যবসায় মানে কি?

বিলিতী কনভেন্টওয়ালারাও কি তা হোলে আজ কাল 'অধ্যবসায়' শেখাচ্ছে। চুপ করে গেলাম। দেখলাম মেয়েটার দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে শওকত। পুঁটু দৌড়ে পালিয়ে গেল।

কি যেন আরেকটা প্রসঙ্গ শুরু কোরতে যাচ্ছিল শওকত। এবার এক ভদ্রমহিলা হাতে কি নিয়ে ঢুকলেন। ভাবছিলাম আমারই শুভাগমনে মিষ্টি মুখের একটা বিনীত আয়োজন বোধ হয়।

ভদ্রমহিলা আর যাই হোক, দৈহিক সৌষ্ঠবে অপূর্ব। একটা পোষ্টকার্ড হাতে কোরে নিয়ে এসে বোলল, ছোট বুবু মতলব থেকে চিঠি লিখেছে—

তারপর আমাকে দেখে একটু সরে দাঁড়াল।

শওকত বোলল, ও ভাল কথা। পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি। আমার বৌ। আর আমার বন্ধু শিণ্টু কি যেন ক্লার্ক—

আদাব বিনিময় কোরে বোললাম, সওদাগরী অপিসে।

বৌ-টি সলজ্জ হোয়ে বোসল।

যত লাজুক ভেবেছিলাম তত নয়। চিঠিটা নিয়েই পড়ছিল। হঠাৎ বোলে উঠল, দেখো, কি মজার ব্যাপার। আমাদের দু'জনেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হোল। দেখেছো, কত জায়গা খালি। এটারই ফাঁকে ফাঁকে জবাবটা লিখে দি। তোমাকে পোষ্টকার্ড আনতে বোললে ত উলটো বল, পয়সা কি গাছে তৈরী হয়?

সামান্য তিন পয়সার জন্যে অতখানি আহ্লাদিপনা তাও আবার বাইরের একজন আগন্তুকের সামনে বোধ হয় ভাল লাগলো না। বিনয়ের সুরে সেও কত বোলল ওটা যে এসেছে তোমার নামে।

তাতে কি। নাম ত আর কাটবো না। ঠিকানাটা বদলে রি-ডাইরেক্ট কোরে দোব। কত কোরেছি এমন।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বৌকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বোলল ওসব কিন্তু ভারি অন্যায়—ধোরতে পারলে—

ফিরে এসে চেয়ারটায় বোসে বোলল শওকত, ব্যাপারখানা দেখ। সেদিন এক টাকার খাম পোষ্টকার্ড এনে দিলাম—এরই মধ্যে গায়েব।

কোন প্রয়োজন ছিল না এ-ধরনের কৈফিয়ৎ-এর। বিশেষ কোরে শওকতের চোখে-মুখে এই কষ্ট কল্পিত অজুহাতের ছদ্মবেশটা যখন ভাল কোরেই ধরা পড়ছিল।

এবার আর্জিটা জানাব ভাবলাম। দ্বিগুণ উৎসাহে সিঁড়ি পর্যন্ত নেবে আরও খানিকদূর পথ চলা শুরু কোরল আমার সঙ্গে।

অনেক দূর এসে পড়েছি। কথাটা প্রায় বোলতে যাচ্ছিলাম। শওকতই বোলল, দেখো কিছু মনে কোর না। গোটা তিনেক টাকা হবে। কাল টেণ্ডারটা পেলেই—

বোললাম আমার কাছে ত মাত্তর ছ' আনা।

তাই দাও—তাই দাও! চল এসেই পড়েছি যখন এই বেলা বাজারটাও সেরে ফেলি।

আরো দুটি মৃত্যু

হাসান হাফিজুর রহমান

নারায়ণগঞ্জ থেকে বাহাদুরবাদ যাচ্ছে যে রাত্রির ট্রেনটা, এই যে ষ্টেশনে এসে থামলো, মাত্র দুমিনিট দাঁড়ায় এখানে। অন্ধকার রাত, কিছুই চোখে পড়ছে না। ষ্টেশন ঘরটার জানালা ও দরজায় যে আলোর আভাস ছিল, চোখের ওপর অকস্মাৎ ঝাপটা দিযে চলে গেছে ট্রেন থামতে না থামতেই। কামরাগুলোর আলোকিত গহ্বরকে চারিদিক থেকে মুড়ে দিয়েছে কালো রাত। বাইরে হাতটি মেলে ধরলেও চিহ্নিত করা যাবে না। ভীষণ শীত পড়েছে; যাত্রী কেউ উঠবে, কি উঠবে না কে দেখে! ভেতরে সব গুটিগুটি মেরে বসে আছি নির্লিপ্ত হয়ে।

এমন সময় পাশের কামরা থেকে আওয়াজ শোনা গেল, এহানে জাগা নাই, এহানে জাগা নাই, আরে দেহ না? কথাগুলো শেষ হতে না হতেই ব্যস্ত সমস্ত থপ-থপ পায়ের আওযাজ, চুড়িরও শব্দ। মানুষের হাঁপানোর সাথে সাথে কে যেন কামরা ছেড়ে সামনে এগোতে লাগলো। তারপর আমি যে কামরাতে বসে ছিলাম সেইটের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল যারা, ওরা চিৎকার করে উঠলো, এহানে জাগা নাই, এহানে জাগা নাই, আরে দেহ না।

কিন্তু ততক্ষণে ঘণ্টি বাজিয়ে দিল ষ্টেশনের। গার্ডও চলার ইঙ্গিত জানালো হুইসিল বাজিয়ে। কেউ এবার অধৈর্য হয়েই যেন হাতল খুলে দরজাটা ভেতরের দিকে ঠেললো যতো জোরে পারে। নিচে কিশোর কণ্ঠে ভয়ার্ত চিৎকারও শোনা গেল একটা, কাকীমা গো! শব্দটা সেই ভয়াবহ নিথর নিস্ত-ব্ধতাকে মুচড়িয়ে দেবার মতো যে লোকটা উঠতে দেবে না বলে দরজাটা চেপে ছিলো এতক্ষণ, সে এমনি বিমূঢ় হয়ে গেল যে তার হাতদুটো নিজের থেকেই সরে

এলো, নিজেও পেছিয়ে গেলো দুপা। এরপর, প্রথমে একটি পুটলি ও টিনের স্যুটকেস ঠেলে দিয়ে ভেতরে উঠলে প্রৌঢ় একজন হিন্দু ভদ্রলোক। সাধারণ ধুতি কাপড় পড়েছে, ঘিয়ে রঙের চাদর গায়ে জড়ানো। দাঁড়াবার একটু জায়গা করে নিয়েই হাত বাড়িয়ে নিচের থেকে কিছু তোলার জন্যে এমন সযত্ন ভঙ্গিতে চেষ্টা করতে লাগলেন যেন ঠুনকো কাচের কিছু তুলছেন। কিন্তু যা তুললেন তা একজন মেয়েলোক। মধ্যবয়স্কা, প্রায় ত্রিশ। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয় যে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। উঠে পড়েই মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে বসে হাঁপাতে লাগলো। এরপর ছোট একটি মেয়ে উঠলো, ন'দশ বছরের, দৌড়তে দৌড়তে। কেননা ট্রেন ততক্ষণে হুইসিল বাজিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে ঝকঝক করে।

আমরা যেটায় বসে ছিলাম সেটা একটা 'একুশ জন বসিবেক' কামরা। ঠাসাঠাসি করে বসে, একজন অন্যজনের উপর ঢুলে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙছিলাম আর ঘুমাচ্ছিলাম। দুজন বেপরোয়া লোক উপরে দেদার জায়গা নিয়েছে। আমি নিজে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করছিলাম। কারণ, তন্দ্রার ঘোরে পাশের লোকটির শরীরের ওপর পর পর দুবার ঢুলে পড়ার জন্যে যে বিভীষিকাময় আপত্তি শুনেছি, আমার নিজের বেলাতে অন্য কাউকে যদিও তাই তাই বলতাম, তবু হজম করতে পারি নি।

জেগে থাকতে থাকতে প্রথমে কথা বলার ইচ্ছে করছিল। কিন্তু চার পাশের লোকগুলোকে এমনি স্থবির মনে হলো যে প্রাণপণ বেগে ঘা দিলেও এদের একজনের ভেতর থেকে শব্দ বেরুবে না। ফাল্গুনের বিদায়ী শীতের ঠাণ্ডা তো আছেই, তাছাড়া এমনি ক্লান্তির স্তব্ধতা সারাটা ঠাঁই জুড়ে; যেন কথা বলতে গেলেই যতটুকু উষ্ণতা জমিয়ে নিয়েছে বুকের ভেতর এতক্ষণ ধরে, তাও শেষ হয়ে যাবে। এরপর আমাদের জমে যাওয়া ছাড়া কোন উপায়ই থাকবে না। সেজন্যেই শ্বাস প্রশ্বাসের উত্তাপটুকু এতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে উঠেছিলো, এবং সেটুকুই উপভোগ করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই ছিল না। পরস্পরের অজ্ঞাতেই আমরা একে অন্যকে অনুভব করছিলাম শুধু

এ স্তব্ধতা যে শুধু ক্লান্তির তা নয়,—আতঙ্কেরও।

আমি ঢাকা থেকে আসছি, সেজন্য এ অনুভূতিটা আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। পরস্পরের প্রীতির ওপরেই যেমন সামাজিক সুস্থতার নির্ভর, তেমনি পরস্পরের আক্রোশের ভেতরেই সবচেয়ে বড়ো অশান্তি। এ অশান্তি যে কি, আমি জেনেছি

ঢাকার দাঙ্গায়, কোলকাতার পরেই যা শুরু হয়েছিল। এমন ভয়ংকর যন্ত্রণার অনুভূতিতেই কোন দিন ক্লান্ত হইনি ; এই চল্লিশ বছরের জীবনে কখনও জানি নি। ঢাকায় গিয়েছিলুম মেয়েকে দেখতে, জামাই বেলওযে কলোনীর বাসিন্দা, সেখানেই ছিলাম। এই এলাকা দাঙ্গাকে বোধ করেছিল। সেই হয়েছে এক মুশকিল আমার জন্যে। খুন-উন্মত্তদের ভেতবে থেকে যদি আমারও সারা শরীর তেতে উঠতো, যদি চিন্তাবুদ্ধি উবে যেতো ধুয়োব মতো আগুনের হলকায়—তা'-হলেও হয়তো এক সান্ত্বনা ছিল! কিন্তু যে পরিবেশে আমি ছিলাম সেখানে থেকে এই পাশবিতাকে ঘৃণা কবা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। যে সুস্থ প্রতি-বোধের ভেতর আমি ছিলাম, সেখানে থেকে এই হিংস্রাতার ভয়াবহ পবিণতিকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি কবা ছাড়া কোন পথ ছিল না। এই ঘৃণা যে একবার অনুভব করেছে.তার অস্বস্তি যে কি আমি জানি।

জরুরী কাজ ছিল বটে, বাড়ী ফিরতে পারি নি। মাঘ-শেষের পড়ন্ত-শীতের দিন, অথচ এমনি হিম বাতাস ঝাপটা দিচ্ছিল যে আমার মনে হয়েছিল অন্ততঃ আমার জীবনের এতগুলো বছবের সজাগ অভিজ্ঞতায এমনটি আর কখনো দেখিনি। আকাশে প্রান্তরে ছিল শীত আর আতঙ্ক, মানুষেব মুখে মুখে ছিল স্তব্ধতা আর আতঙ্ক। শান্তিকামী কলোনীর সারা ঠাঁই জুড়ে সে কি প্রতিরোধ, দাঙ্গাকে রুখ্‌তে প্রাণান্ত হয়েছিল।

আত্মীয়তার এই শেষ রশ্মিটুকু যদি না দেখতাম তবে হযতো পাগলই হয়ে যেতাম।

এখন ফিরছি বাড়ি ; না জানি সেখানে কি হযেছে। যমুনাপারের দুর্দান্ত মানুষগুলো যে হুজুগে মাতে ; আমি তো তা জানি, আপন ভাইকেও মানাতে পারি নে। এখন অবশ্য আবহাওয়া শান্ত হয়েছে অনেকটা। মানুষের স্বভাব শুভ বুদ্ধি ও চেতনার জন্যেই এ অবস্থা টিকতে পারে না। যদিও গুণ্ডা বদ-মায়েশের অত্যাচার একেবারে শেষ হয়নি, তবুও অনেক শান্তির আশ্বাস এসেছে মনে। এবং এই সুযোগেই যে এই হিন্দু ভদ্রলোকটা সঙ্গে আর দুজনকে নিয়ে, অনেকেরই মতো নিরাপদ জায়গায় চলে যাচ্ছেন তা আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলুম।

লোকটা উঠেই একটিমাত্র কাজ করলো শুধু : জড়িয়ে বাঁধা বিছানাটা, হয়তো ওর ভেতর অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসই আছে যাতে বেশ মোটাসোটা

দেখাচ্ছে, মেঝেতে সমান করে রাখলো, হাত ধরে বসিয়ে দিলো মেয়েলোক-টাকে সযত্নে! যেন পবিত্র কিছু রাখছে, এমনি সম্ভ্রমশীল, স্পর্শকেও যেন পবিত্র করে নিয়েছে। ছোট্ট মেয়েটি ওঁর শরীর ঘেঁষে বসলো বাকী জায়গাটায়। এর-পর প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কোন দিকে না চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ওদের পাশেই। এমন মনে হলো যে, কোন দিন কিছু দেখবেন না' কোন কিছু দেখতেও চাইবেন না। যান্ত্রিক; মূক।

লোকটাকে দেখেই প্রথম অবধি আমার কেমন ঠেকছিল। অনুভূতিটা ঠিক যে কি বুঝতে পারি নি। অথচ একটা স্পষ্ট আকর্ষণ ছিল মনে, চোখই ফেরাতে পারছিলাম না।

ভয় আর আতঙ্কে মুখটা তার চুপসে গেছে, ফ্যাকাশেও হয়েছে, বেশ একটু দূরে বসলেও আমার নজরে পড়লো। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, আর একটু বড় হলেই মৌলবীদের মুখের মতো হয়ে উঠবে। কিন্তু লোকটা পরে এসেছে ধুতি; তিনটি মানুষের ভেতরে কারুরই—ওরা যে হিন্দু এই ইঙ্গিতটি লুকিয়ে ঢেকে রাখবার এতটুকুও চেষ্টা নেই। অথচ ট্রেনটা নিরাপদ, এমন মনে করার কোন কারণ আছে বলে ভাবা যায় না। ট্রেনেও খুন খারাবি হয়েছে এবং হচ্ছে। একজন হিন্দুর পক্ষে বিপদটা এখানেও কম নয়। লোকটা একথা জানে বলেই মনে হলো। উট পাখি যেমন বালুতে মুখ লুকিয়ে বিপদ এড়াবার চেষ্টা করে, তেমনি আমাদের কারো দিকে একবার পর্যন্ত না তাকিয়ে ভয় আর আশঙ্কা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রাণপণে নিজেকে শক্ত করে রাখছে! সে জন্যেই আমার সহযাত্রীদের মুখের দিকে একবার করে চেয়ে চেয়ে না দেখে পারলাম না। প্রায় সবাই ঘুমিয়ে আছে, দু-চার জন যারা জেগে, তাদের চেহারাটাই কেমন স্তিমিত। চাইছে যখন ভেজা আর নিরীহ চোখে কি ম্লান দৃষ্টি! ওদের সবাই এদেরকে লক্ষ্য করেছে সহজেই বোঝা যায়। লোকগুলোর দৃষ্টিতে এবং কয়েকটা দীর্ঘ শ্রান্ত শ্বাস প্রশ্বাসে এই প্রমাণ করছিল যে এই তিন জনের এমন দুরবস্থার জন্যে ওরা নিজেরাও কম অনুশোচনা ভোগ করছে না। কম অস্বস্তি নয়।

সব মিলিয়ে কেমন একটা ক্লান্ত গুমোট ভাব।

আমি অনেক স্থানে যাতায়াত করেছি; রাজধানী ঢাকায় প্রায়ই তো আসতে হয়। কিন্তু এ দুর্বিসহ মুহূর্তের স্পর্শ কোন দিন পাই নি। আমার

মনে হচ্ছি, এটা দাঙ্গার আতঙ্কেরই ফল। চারদিকের অমানুষিকতাই মনগুলো এমন করে থুবড়ে ছেঁচড়ে দিয়েছে। এ বিষণ্নতা অপরাধ বোধের।

লোকটা যমুনার গাঢ় জলের মতো ঘোলা, দৃষ্টিহীন চোখ মেলে আছে। আর আমি উৎকণ্ঠিত।

সারাটা কামরার কেউই কি ওঁর সঙ্গে একটি কথাও বলবে না? সংকোচই কাটাতে পারছে না কেউ। না এর সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজনই সবার মিটে গেছে হঠাৎ? যেন এ এখন এক আলাদা জগতের মানুষ; যার সাথে আবার সহজ সম্বন্ধ করার জন্যে এমনই অনুভূতির প্রয়োজন যা আসবে কি যে এক আত্মমন্থন থেকে, যে ভাবতেই শিউরে উঠতে হয়!

এতক্ষণে আমার কাছে স্পষ্ট হলো, লোকটার জন্যে একটা নিবিড় করুণাও অনুভব করছি মনে মনে।

সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হলো, লোকটা অত্যন্ত সরল; জীবনের ভয় আছে, ফাঁকি ঝুঁকি নেই। অথচ এমনি প্রাণের তাগিদে বেরিয়ে আসতে হয়েছে যে এই রাত্রি বেলাতে ট্রেনকেও নিরাপদ মনে করতে হয়েছে।

ভাবলাম একবার ডাক দিই; ভাবলাম একবার কাছে এনে বসাই।

পর মুহূর্তেই সমস্ত কামরাটার দিকে চেয়ে গলা দিয়ে আর শব্দই বেরিয়ে আসতে চাইলো না। মনে হলো এখন যদি একটি মাত্র কথাও বলি, তবে তা ভারী কাচ ভেঙে চুরমার হাওয়ার মতো শব্দে খান খান করে ফেলবে এই দুঃসহ নিস্তব্ধতাকে। সেই আওয়াজ অনন্ত কাল ধরে কুরে কুরে বাজতেই থাকবে, কোনদিন থামবে না। আর সেই তিনটি মানুষও ভয়াবহ আতঙ্কে ও শঙ্কায় শুধু কাঁপবেই, কাঁপতেই থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত না বিবর্ণ নীল হয়ে মরে যায়।

যমুনার সেই উত্তাল ঢেউগুলো যেন খলখল করে উঠলো বুকের ভেতর। কেমন একটা ভয়ে চুপ করে গেলাম।

মানুষের বন্য আক্রোশ ওদের তাড়া করে ফিরছে।

মুখটি ঘুরিয়ে নিয়ে ঘাড় গুঁজে রইলাম কতকক্ষণ নিচের দিকে চেয়ে। তারপর লাইটের চারদিকে ঘূর্ণমান পতঙ্গগুলোর অধৈর্য পাখা ঝাপটানো দেখলাম। আমাদের কামরার তিনটি সার। আমি বসেছিলাম জানালার কাছের একসারে। মধ্যের সারের লোকগুলোরই অসুবিধা বেশী। ওদের হেলান দেয়ার সুবিধে আমাদের মতো নয়; তাছাড়া হাওয়াও তো পায় না

গরমে। ঠিক যেন মাঝের জমি, নালার পানি পায় সবচেয়ে কম। ওদের একজনের লালা গড়িয়ে পড়ছিল চোয়াল বেয়ে। ঘুমকাতুরে আর একজনের দাড়ির অগ্রভাগটা গাড়ীর ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে যেয়ে লাগছিল আর একজনের ঘাড়ে। সে লোকটাও ঘুমে—সুড়সুড়ি লাগা জায়গাটা বারবার চুলকিয়ে নিচ্ছিল ঘুমের ঘোরেই।

অন্যসময় হলে হাসতাম হয়তো। কিন্তু এখন কেমন মায়া লাগলো তিনজনের ওপরেই। ঘাড় ফিরিয়ে আবার চাইলাম সেই হিন্দু লোকটার দিকে। লোকটা এখন আমার উল্টো দিকের থাকে রাখা বেডিংয়ের সাথে ঝুলানো একটি লোটার ওপরে চোখ রেখেছে। তৃষ্ণায় নিষ্প্রভ চোখ দুটো যেন জ্বলছে। কয়েকবার শুকনো ঢোকও গিল্‌লো বলে মনে হলো। মনের জড়তাকে এক মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলে হাত নেড়ে হঠাৎ ডাকলাম তাকে। লোকটা অপ্রস্তুতের মতোই সামনে এসে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। আসবে কি আসবে না এই ইতস্ততটুকু করার সাহস পর্যন্ত নেই। ঠোঁট নেড়ে বললোও যেন কি! কিছুক্ষণ অসাড় কণ্ঠে সাড়া জাগাতে চাইলাম আমি নিজেও। পরে সহসা পাশে অনেকটা জায়গা করে দিয়ে বলে উঠলাম, বসেন। আমার পাশের লোকটাও সমর্থন করে বলে উঠলো হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসেন। অন্ততঃ শরীরের গরমে আর একটু চাঙ্গা হওয়া যাবে—আমাদের শীতের কাপড় যা আছে তা ত দু……

এদিকে রাতও শেষ হয়ে আসছে। আমরা অনেকগুলো ষ্টেশন পার হয়ে এসেছি ইতিমধ্যে। লোকটা বসলো। উপায়ান্তর নেই বলেই বোধ হয়। কিন্তু উসখুস করতে থাকলো কেমন। বারবার তার সাথের অসুস্থা স্ত্রীলোকটার দিকে তাকাতেই লাগলো। উৎকণ্ঠায় একটা শিখার মতো দপ্‌ দপ্‌ করে উঠছে, আবার নেতিয়ে যাচ্ছে। ওর পাশ থেকে চলে আসার জন্যেই কি অস্বস্তিটা হঠাৎ বেড়ে গেছে? ভাবলাম, হয়তো বা আমাদের সান্নিধ্যে এসে সে কিছুতেই সহজ হতে পারছে না।

লোকটা গলা উঁচু করে বসেছিল। কণ্ঠনালীর বাঁকা জায়গাটায় আলোর চিকচিকে ছাট এসে পড়ছে। হঠাৎ চোখ পড়লো আমার তার ওপর। ওই সামান্য জায়গাটুকু—জোরে টান দিলেই হয়তো, একটু ছুরির আঁচড় লাগালেই তো শেষ হয়ে যেতে পারে লোকটা! এত ক্ষীণ প্রাণ মানুষ, এতো সংক্ষিপ্ত।

একেই নিশ্চিহ্ন করার জন্যে কি বিভীষিকাময় পরিকল্পনা, এতো হিংসা। লোকটাকে যেন মুঠির ভেতর অনুভব করতে পারছি। সম্পূর্ণ আয়ত্বে আমার সে! এতো ছোট, ভীরু কপোতের মতো একটা মানুষ!

বুকটা শির শির করে উঠলো। লোকটাকে কি আমি মুচড়িয়ে দিতে পারি? এক্ষুনি?

বুকের উত্তাল ঢেউটি জোরে বাঁক নিয়ে নামলো। সঙ্গে সঙ্গে কেমন অদ্ভুত একটা স্নেহে ঝিমিয়ে এলাম। নিস্তেজ, তৃপ্ত অবসাদে।

ইচ্ছে হলো সারাটা রাত গল্প করে কাটিয়ে দিই। নিয়ে যাই একে আমাদের বাড়ী। কোথায় যাবে কষ্ট করে আর নিরাপত্তার খোঁজে, আমি ওকে আগলাবো।

লোকটার দিকে চেয়ে জোরে একটা নিশ্বাস ফেললাম।

মেহনতী মানুষ আমরা, প্রাচুর্য না থাকলেও দুটো তিনটে মানুষকে যে ভার বলে মনে করবো, এতো ছোট হয়ে যাই নি। কিন্তু গ্রামের কথা ভাবতেই প্রথমেই মনে হলো, এদের নিয়ে যাব বাড়ীতে, আমরা সব একসাথে বসতি করব, এমন সময় আর নেই। আবার কবে তা আসবে, তাও জানিনে। গ্রামের কথা মনে হতেই আবো চিন্তা এলো বানের পানির মতো হু হু করে। কি হয়েছে, কেমন আছে, কেমন চলছে—সংসারের মধ্যে জড়িয়ে গেছি আমরা—চিন্তা একবার শুরু হলে একেবারে অতলে ডুবে যেতে হয়।

কিন্তু সব ফেলে পাশের লোকটার দিকেই যে খেয়াল দেয়া প্রয়োজন, তাই মনে হলো। নেড়েচেড়ে বসলাম জুতোটা খুলে। ভাইয়ের ছেলের জুতো পরে এসেছিলাম, আঁটসাট হওয়াতে পা গেছে কেটে। টাটাচ্ছিল। পা তুলে নিলাম ওপরে। শরীরটা একটু প্রসারিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা এমন সংকুচিত, একটি সরল রেখার মতো শীর্ণ হয়ে জায়গা দিতে চাইলো যে, লজ্জায় শিউরে উঠলাম।

এখনো কি সে ভয় করছে আমাকে। ভয়?

পা নামিয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি করে। ওর পিপাসার কথাটাও মনে হলো তখনি। অনেকক্ষণ থেকেই খচ্ খচ্ করছিল। হঠাৎ প্রশ্ন করে উঠলাম, পানি খাবেন?

মাথা নেড়ে বলল, না।

কথাটা শেষ হতে না হতেই সারাটা শরীরও কেঁপে উঠলো তার থরথর করে। ঘাড় ফিরিয়ে স্থির, নিস্পন্দ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল সেই মেয়েটার দিকে। এবার অবাক হলাম আমি। মেয়েটাকে ঘিরে ওর অস্বস্তিকে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কাঁপছে কেন এ? এতো? কিন্তু ওর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে যা দেখলাম তাতে অবাক হলাম আরো। গাড়ীটা যতোবার কেঁপে উঠছিল, মেয়েটারও সারা শরীবে ঝাঁকি দিয়ে অদ্ভুত বেদনায় কুঁকড়ে দিচ্ছিল মাংস পিণ্ডগুলো। প্রত্যেক কাঁপুনির সাথেই এমনি করে সে শিহরিত হচ্ছিল। যেন মৃত্যুর দাঁত থেকে নিজকে ছিনিয়ে নিচ্ছে বার বার।

ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করি, ব্যাপারটা কি।

কিন্তু লোকটা নিজেই এবার মুখ ফিরিয়ে বলল, আর্ত, অথবা চাপা, ফিসফিসে স্বরে,—প্রসব!

কথাটা প্রথমে বলকিয়ে বলকিয়ে সেই ভয়াবহ নিস্তব্ধতাকে দুমড়াতে লাগলো। তারপর থমথম করে বাজতে থাকলো। অবশেষে সমগ্র নিস্তব্ধতাটাই যেন কথাটার ভেতর স্থির হয়ে, পাথরের ওপর খোদাই করা অক্ষর যেমন থাকে, তেমনি স্থবির হয়ে গিয়ে সমস্ত কামরাটা ভরাট করে ফেললো। মেয়েটা যে আসন্ন-প্রসবা, তা আমার প্রথমেই লক্ষ্য করা উচিত ছিল। গ্রামে একটা সুনাম আছে, সবার টুকিটাকি খোঁজও রাখি বলে। কিন্তু এটা এমনি অসম্ভব যে আমার ধারণাতেও আসার সুযোগ পায় নি। কেননা একজন প্রসব-উন্মুখ মেয়েকে পথ হাঁটিয়ে আনা, গাড়ীর ঝাঁকুনিতে অন্য কোথায়ও নিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক কথা নয়। এদের সম্পর্কে অন্ততঃ এতটুকু কল্পনাতেও আসেনি আমার। কিন্তু এখন ভাবতেই সারা দেহ রাগে শির শির করে উঠলো। কেমন, মানুষ! লোকটাকে ধিক্কার দেব মনে করলাম, মনে করলাম অভিসম্পাত করব। সেজন্যেই মুখ ফেরালাম। কিন্তু তখনি মনে হলো এ ছাড়া হয়তো এদের আর কোন উপায় ছিল না। মৃত্যু এদের সব দিকে ঘিরে আছে। যে মুখটাতে অভিসম্পাতের বিষ ছড়াবো ভেবেছিলাম, সেখানে চাইতেই দেখি সেই ম্লান চোখ দুটো ছল ছল করছে! কান্নাকে প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখলে যেমন হয়, তেমনি।

ছোট মেয়েটা ঘুমুচ্ছে। আর ও মেয়েটা সমস্ত বেদনাকে সংযমে রাখার জন্যে এখন এমনি তীব্র আবেগে শরীর চেপে রাখছে যে একটি নিঃশব্দ গর্জনই

যেন প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে গুমরিয়ে উঠছে। কাঁপছে, কুঁচকাচ্ছে; মাথাটা হাঁটুর ভেতর সেঁধিয়ে দিতে চাচ্ছে। অথচ রা পর্যন্ত করছে না। কি যে দুঃসহ এই জনান্তিকে লক্ষ্য করা! বিহ্বল করে ফেলে সমগ্র চেতনাকে। নিরুপায় বিহ্বল।

এতক্ষণে ঘেমে উঠেছি আমি।

আরো, আরো কতকাল সে অমনি নিঃশব্দে গুমরাতে থাকবে!

মেয়েটা সেখানে থাকতে পারলো না আর। বেদনা এখন সারা দেহে সংক্রমিত হয়ে পেশীগুলো উৎক্ষিপ্ত করছে। অবশেষে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে পায়খানার ভেতর চলে গেল, নিজেকে প্রাণান্ত চেষ্টায় ছ্যাচড়িয়ে টানতে টানতে।

এবার লোকটা নিশ্চয়ই চিৎকার করে উঠবে? বুক ফাটিয়ে দেবে চৌচির করে, নয়তো দুহাতে ওকে চেপে ধরবে যেয়ে উচ্ছৃঙ্খলের মতো। কিন্তু সে কিছুই করলো না। আবো শক্ত হয়ে বসে রইল নিজের জায়গাটাতেই।

এ অবস্থায় কি করা যায় ভেবেই পেলাম না, কি সাহায্য করা যেতে পারে ধারণাতেই আসলো না। লোকটা কি সংজ্ঞালুপ্ত হয়েছে? বজ্রাহত মানুষ যেমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, একটু স্পর্শ পেলেই হুড়মুড়িয়ে পড়ে যায় মাটিতে, এও তেমনি;—স্থির হয়ে আছে, একটু স্পর্শ পেলেই ভেঙে পড়বে কি?

ভেবেছিলাম সমবেদনা জানাব,—চুপ করে গেলাম।

ভেবেছিলাম নানা রকম গল্প করে মনটা সরিয়ে নেব তার গাঢ় উদ্বিগ্নতা থেকে,—গলা দিয়ে কথাই বেরুল না।

মনে হলো আমারও পিপাসা, ভীষণ!

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। আর একটা ষ্টেশনের পরেই ঘাট। যমুনা বিধৌত বাহাদুরাবাদ। ঘাটেই নামতে হবে আমাকে। বাড়ি সেখানেই তো। ইতিমধ্যে এই কামরার অধিকাংশ যাত্রীরাই নেমে গেছে। গুটি কয়েক যারা ছিলাম, খুব সম্ভব আমি বাদে সকলেই নদী পার হয়ে যাবে। এখন জেগে উঠছে। আয়েশের হাই তুললো কেউ কেউ জোরে জোরে। অস্ফুটকণ্ঠে দু-একটা ঠুনকো কথাও বললো আলগোছে। সেই প্রসব-বেদনা-কাতর দীর্ণপ্রাণ মহিলাটির গোঙানির আওয়াজও শোনা যাচ্ছে নাকি? এতক্ষণে জাগছে সব শ্লথ-ভাবে। এখন কেমন করছে সে পায়খানা ঘরটার

ভেতর? বিছানাপত্তর বাঁধতে লাগলো অনেকে। বন্ধ জানালাগুলো নামিয়ে দিলো। বাইরের আবছা আলোয় লাইটের দগদগে লাল মুখটা নিষ্প্রভ হয়ে গেলো। নিষ্প্রভ মুখ। সকালের হাওয়ায় অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠলাম, লোকটাও এবারে কিছু জোর পাবে মনে হয়তো।

অনেক সংকোচ কাটিয়েই দমকা হাওয়ার মতো হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলাম, একবার দেখা যায় না, তাঁর কি হলো······উচিত······

কিন্তু এ কথা শোনামাত্রই এক অকস্মাৎ লজ্জায় লোকটা এমনই বিমূঢ় হয়ে গেল যে, মনে হলো, তার সমস্ত শরীরটাই আগুনের হলকার মতো জ্বলে উঠেছে, শিরা উপশিরা দপ্ দপ্ করছে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম তার ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে। বুড়ো মানুষের এমন করে ঠোঁট কাঁপতে আর কখনও দেখি নি আমি। অন্ততঃ এই চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতায় যতদুর জানি—এই বয়সের মানুষ সাধারণত ভেতরের দুর্বলতাটা কিছুতেই জানাতে চায় না। কিন্তু লোকটা সংযম হারাচ্ছে।

এতো লজ্জা আর সংকোচই বা কিসের বুঝতেই পারলাম না।

কিছু জিজ্ঞেস করে যে উত্তর পাবো, লোকটা তেমন অবস্থায় আছে—তাও মনে হলো না।

প্রায় এক ঘণ্টারও ওপরে হয়ে গেল মেয়েটা সেই যে পায়খানার ভেতরে ঢুকেছে, কি যে হলো তার! এই লোকটাব মতোই আমার নিজেরও চুপ করে থাকা ছাড়া কি উপায় আছে! ব্যাপারটা আমার আওতার বাইরে বলেই হয়তো, হয়তো এমন নিষ্ক্রিয়তা অসহ্য ঠেকছিল সে জন্যেই, এক অদ্ভুত উষ্মায় মনটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছিল বার বার।

যা হচ্ছে, মোটেই কাম্য নয়। এখনি কিছু করতে হবে।

কিন্তু লোকটাকেই তাড়া দেব, না আমি নিজে কিছু করব; ব্যাপারটা আদতে কেন এমন হচ্ছে, তাই জিজ্ঞেস করব, না অভিসম্পাত দেব বুড়োকে—কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। দপ্ দপ্ করতে থাকলো রগগুলো। অবশেষে আরো স্তব্ধ হয়ে যেয়ে অস্বস্তিকে শান্ত করতে চাইলাম।

কান পেতে রইলাম আকাঙ্ক্ষায় উৎকীর্ণ হয়ে—হয়তো নবজাত শিশুর কোমল কান্নায় এই ভয়াবহ ফসিলের মতো স্তব্ধতা এক আর্ত নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ, তীব্র প্রতিবাদে দুমড়িয়ে যাবে এই স্থবিরতা। এই প্রাণান্তকর গাম্ভীর্যের অবসান হবে নবজাত সৃষ্টির কলকণ্ঠে। তাই হোক, তাই হোক।

কিন্তু কিছুই হলো না।

দাঁতে দাঁত চেপে ফিবে তাকালাম লোকটার দিকে। এই শীতেও আমার কপালে জমে উঠেছে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। ঘৃণায়, বিরক্তিতে কাঁপছে ঘাড়ের রগ। কঠিন দৃষ্টিটি ফেরালাম উদ্ধত করে ; কিন্তু সে শীর্ণ প্রৌঢ় মুখে তখন গড়িয়ে পড়ছে পানি, কোঠরাগত চোখ বেয়ে বেয়ে।

অবশেষে এক ভাবী নিঃশ্বাস ফেলে বুকটাকে শূন্য কবতে চাইলাম।

ইতিমধ্যে ঘাটে এসে ঢুকলো ট্রেন। দুপাশে সাব দেয়া কুলিব ভেতরে থামলো অবশেষে। যাত্রীরা সব হুডমুডিয়ে নামতে লাগলো। এতক্ষণেব স্তব্ধ-মানুষগুলো সহসা নতুন এক বেগ পেয়ে ছটফটিয়ে অসম্ভব ধৈর্যহীনতায় চাবদিকে ভাঙতে থাকলো। এও এক নতুন বিষণ্ণতাব গর্জন যেন। এ স্তব্ধতাব আওয়াজ আছে, আবো ভয়ংকব। আবছা অন্ধকাবে মানুষগুলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগলো। কামবায কেউ বইলো না আব। মনে কবলাম লোকটা এবারে উঠবে। কিন্তু সে নড়লোও না।

আমিও দাঁড়াতে পাবছিলাম না কেন, জানি নে।

ঘুমকাতুবে ছোটমেয়েটা যাত্রীদেব দাপাদাপিতে জেগে উঠেছিল। চোখ মুছলো, হাই তুললো। তারপর আশে পাশে কোথাও কাকীমাকে না দেখে উদ্বিগ্ন হতে থাকলো। অস্ফুট কণ্ঠে চিৎকাব কবে উঠলো, কাকী, কাকীমাগো। বুড়ো লোকটার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে সে চিৎকার কবলো। কিন্তু সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করতে পারলো না কিছুই। দুর্বোধ্য লোকটা তেমনি বইল যেমন ছিল ; স্তব্ধ, নিথর, নিষ্প্রাণ।

সেখান থেকে কোন উত্তর আসবে না জেনে আমিই চেচিয়ে উঠলাম প্রাণ-পণে। কিন্তু পবক্ষণেই টের পেলাম গলা থেকে আওয়াজই বেরুচ্ছে না এতটুকু শুধু হাতটা নেড়ে নেড়ে ইশাবা করছি মেয়েটাকে। তারপব শব্দ যখন বেরিয়ে আসলো নিজের কাছেই কেমন বেসুবো ঠেকল, ওই পায়খানাটায় দেখ, খুলে দেখ ...শিগগির.......ওই, ওই খান ..

মেয়েটা হতভম্বের মতো দেখলো আমাকে। ছুটে গেলো সেদিকে। দরজা খুলল। তরিৎপৃষ্ঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। তারপর ঝাঁপিয়ে পডলো ভেতরে বিকট চিৎকার করে, কামীমাগো। অনবরত সে চীৎকার করতে লাগলো। জেঠা মশাই গো,......আসনা গো.... কি হলো গো,......কাকী.......

ভয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি। সমস্ত লোম সোজা হয়ে উঠেছে। শির শির করছে।

লোকটার দিকে তাকালাম, সে আরো স্থির হয়ে গেছে। এতক্ষণ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ হচ্ছিল, বুক উঠছিল নামছিল—এখন তাও বন্ধ। তারপর পাগলের মতো দু'হাতে ঝাঁকাতে লাগলাম তাঁকে।

পিতৃস্থানীয় জেঠামশাই ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর অমন বীভৎস মৃতদেহ দেখবেন না, বুঝতে পারলাম এতক্ষণে। ছোট মেয়েটা কাঁদতেই থাকবে কুরে কুরে, আমারও যে বলার কিছু নেই—তাও মনে হলো। আমরা তিনটি প্রাণীর উৎকণ্ঠা যে কি, কে বুঝবে! কে বুঝবে!

ভাবলাম একবার দেখি, অবস্থাটা কি। কিন্তু যে আজন্ম সংস্কার আর নিরুপায় বিহ্বলতা সেই প্রৌঢ় লোকটাকে অমন করে ফেলেছে তাই আমাকেও স্থবির করলো। অসহ্য নিষ্ক্রীয়তায় চোখদুটো বন্ধ হয়ে এলো। তীব্রতম আবেগের মুহূর্তেই মানুষ বুঝি এমন করে বন্ধা হয়ে যায়।

চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেলো, সামনে নিরন্ধ্র অন্ধকার।

অন্ধকার, যেখানে স্পষ্ট একটি নারীদেহ ভেসে উঠেছে। রক্তাক্ত দেহ, মুখ হাঁ হয়ে আছে। পেট অত্যন্ত উঁচু। চোখ উল্টে গেছে বিকৃত হয়ে অসম্ভব বেদনাকে সহ্য করার অস্বাভাবিক চেষ্টায়। একটি মা। একটি মাতৃত্ব আকাঙ্ক্ষী নারী, জীবনের জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুঝেছে! তার ফুলে-ওঠা পেটের ভেতর আছে একটি শিশু, একটু আগেও জীবিত ছিল যে। জন্মাতে পারলে অনেক কিছুই হয়তো করতে পরেতো; সুখী আগামী পৃথিবীর বুকে শ্বাস টানতে পারতো অন্ততঃ। এ জন্মকে রুখলো কে?

তখনি কি এক যন্ত্রণায় সারা বুকটা কুঁকড়িয়ে উঠলো আমার। আর কি ঘৃণা। ধ্বংসের জন্যে ঘৃণা। অসহ্য।

প্রৌঢ় লোকটার মুখ আমি মনে করতে পারিনে আর; কিন্তু তার স্তব্ধতাটি এখনও আমার বুকের ভেতর জড়িয়ে আছে।

চরমুরলী

ফজলে লোহানী

ধরুন ষ্টেশনের নাম চরমুরলী। ষ্টেশনমাষ্টারের নাম । মনে নেই। এ বিরাট জনারণ্যে অনেক লোকেরই তো নাম হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। অনেকেরই নাম জানা হয়নি জীবনের অনেক অন্ধকার গলিঘুঁজিতেই। আরও একটা নাম না হয় নাই বা জানা হলো।

ষ্টেশনে এসে যখন ট্রেনটা থামলো ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন সাইন-বোর্ডটা। চরমুরলী। আপনাকে নাব্‌তে হবে এখানেই। ষ্টেশনে ভিড় নেই মোটেই। আপনার সঙ্গে নাবলো কয়েকজন জন-মজুর। দূরের শহর থেকে এলো বোধ হয়। ট্রেন থেকে নেমেই খোঁজ করলেন ষ্টেশন মাষ্টারের। যেখানে টিকিট দে'য়া হয় সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, ষ্টেশন মাষ্টারকে পাব কোথায় ?

গলাবন্ধ কোট-পরা একজন বুড়ো ভদ্রলোক টিকিট দিচ্ছিলেন। মুখ না তুলেই বললেন, আমি।

আপনি জিজ্ঞেস করলেন, বাহাদুরপুরের ট্রেন আসবে ক'টায় ?

এবারে মুখ তুলে চাইলেন ভদ্রলোক, সে তো আজ আর আসবে না। কাল সকাল ছ'টায়।

কয়েকজন যাত্রী পানের ঝাঁকা নিয়ে গাড়ীতে চাপলো। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ট্রেন ছেড়ে দিল।

গোটা প্ল্যাটফর্মটা ফাঁকা আর নিঃসঙ্গ। কালো কয়লার সুরকীতে ঢাকা কাঁচা প্ল্যাটফর্মের ওপর পায়চারী করে বেড়াতে বেশ লাগে। ওয়েটিংরুমের সামনে আপনার স্যুটকেস আর বন্দুকটা হেলান দিয়ে রেখে ট্রাউজারের পকেটে

হাত দিয়ে পাইপটা ধরিয়ে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে পায়চারী করতে লাগলেন প্ল্যাটফর্মের এধার থেকে ওধারে।

ষ্টেশনমাষ্টার ভদ্রলোকের ততক্ষণে কাজ সারা।

—বাহাদুরপুরের ট্রেনের কথা আপনিই জিজ্ঞেস করেছিলেন না? ষ্টেশন-মাষ্টার আপনার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে এলেন।

—হ্যাঁ, ভেবেছিলুম করেসপণ্ডিং ট্রেন পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন দেখছি...।

—আর বলবেন না, সে কথা,—আপনার কথা শেষ হবার আগেই ভদ্রলোক শুরু করলেন এই আটটার সঙ্গেই করেসপণ্ডিং ট্রেন ছিল বাহাদুরপুরের। কিন্তু অথরিটির ব্যাপার। ওরা কি আর লোকের সুখ-সুবিধে দেখবে? বললে, পোষাচ্ছে না। ব্যাস, দুপুরের ট্রেনটা দিলে উঠিয়ে। ভদ্রলোক আপসোস্ করে বলতে লাগলেন, তারপর যত অসুবিধে যাত্রীদের। লংগ ডিষ্ট্যাণ্ট প্যাসেঞ্জার কচিৎ কদাচিত এদিকে আসেন। আর এসেই ভোগান্তির একশেষ। পাক্কা চব্বিশটি ঘণ্টা ঠায় বসে থাকেন ওয়েটিং রুমে।

ওয়েটিং রুমের ছোট তক্তোপোষটার দিকে তাকিয়ে আপনার জীবনের আগামী চব্বিশটি ঘণ্টার কথা ভেবে হয়তো শঙ্কিত হয়েই উঠেছেন।

ভদ্রলোক তখনও বলে যাচ্ছেন, অনেক লেখালেখি হলো সাহেব, অনেক লেখালেখি হলো। কিন্তু কাজের বেলায় ফক্কা। বললে কয়লা বাঁচাতে হবে। আরে বাপু কয়লা বাঁচাতে হবে বলেই কি ট্রেন বন্ধ করে দিবি? পাবলিকের সুবিধে-অসুবিধে দেখতে হবে না?

এই নির্জন ষ্টেশনে চব্বিশটি ঘণ্টা একা কাটাতে হবে ভেবে হয়তো আপনি ততক্ষণে হিমসিম খাচ্ছেন।

—আচ্ছা, এখানে চা পাওয়া যাবে কোথায়? ষ্টল, রেস্তোরাঁ? চা-এর আশায় প্রশ্ন করলেন আপনি।

—এসব পাড়াগেঁয়ে ষ্টেশনে ষ্টল-রেস্তোরাঁ পাবেন কোথায়? ভদ্রলোক একটুখানি থেমে নিকেলের চশমাটা চোখ থেকে খুলে নিয়ে বললেন, দেখেছেন কি সাংঘাতিক ব্যাপার।

—আপনি চমকে উঠলেন, কেন কি হয়েছে?

—দেখুন তো আপনার সকালের চা হয়নি এখনও, তা একটুও মনে করতে পারিনি এতক্ষণ ধরে। শুধু বকবকই করে চলেছি।

—না, না, তেমন কিছু নয়,...আপনি হয়তো লজ্জিত হয়ে মিথ্যেই বল্‌লেন, সকালে আমার চা না হলেও চলে। চা'টা তেমন আমার ধাতে সয় না।

—সে কি হয়, আপনারা শহুরে মানুষ। ভাত খান না বল্‌লে হয়তো বিশ্বাস করব। কিন্তু চা খান না! উহুঁ, আপনি বসুন আমি এক্ষুনি আসছি।

ভদ্রলোক আপনার উত্তরের অপেক্ষা না করেই লোহার রেলিং-এর ওধারে তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে হারিয়ে গেলেন লাল সুরকীর পথ ধরে।

আচ্ছা লোক তো দেখছি। আপনি এসে ওয়েটিংরুমের বেঞ্চে বসে পড়লেন।

সকালের রোদ গা এলিয়ে দিয়েছে বুড়ো বটের মাথায়। ষ্টেশনের ধারে সারি সারি শিমুলের ডালে থোকা তুলোর সোনালী আঁশগুলো চিক্‌চিক্ করে ওঠে প্রভাত সূর্যের আমেজে। লোহার বেলিং-এর ধাব ঘেঁষে গাঁদা ফুলেব চারা। দূরে গাঁগুলোর কাছে ছবির মতো দেখা যায় রেলওযে ব্রিজ। ষ্টেশনের লাল সুরকীর পথ বেযে রোদের বেখা লাইন পেরিয়ে দূরে খোয়াইর পথে হারিয়ে গেছে। সকালেব জলধোয়া মেঘগুলো দক্ষিণ আকাশে জটলা কবছে। উঁচু রেল সড়কের নীচেই জংলা ঘুঘুব ডাক শোনা যায়।

আপনি হয়তো হাবিয়ে গেছেন এই বিরাট পৃথিবীর নিঃসঙ্গতায়। অনুভব করছেন এই পাড়াগেঁয়ে ষ্টেশনেব প্রাচীন পরিবেশ। সময়ের দীর্ঘ পবিক্রমণে তেমনি স্থির। তেমনি সম্বিৎহারা।

কখন এসে একটা ছোট ছেলে আপনাব সামনে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্যই কবেন নি।

—আব্বা বল্‌লেন আপনি হাতমুখ ধুয়ে নিন, উনি একটু পবেই আসছেন। হাতের কলাই করা বদনা আর সাবানের বাক্স এগিয়ে ধবল ছেলেটি।

মুখ ধুতে ধুতে আপনি জিজ্ঞেস কবলেন, খোকা তোমাব নাম কি?

—ভাল নাম জামিল আব আব্বা ডাকেন সন্তু বলে।

—বাঃ, বেশ নামখানা তো, কোন্ ক্লাসে পড়?

—ক্লাসে না, বাড়ীতে পড়ি। নবসুধা পাঠ আব ক্ল্যারেনডন রিডার-বুক ওয়ান! নাম্‌তাও পড়ি। সন্তু গড় গড় করে বলে গেল।

কিছুক্ষণের ভেতর ষ্টেশনমাষ্টার ভদ্রলোকটি ফিরে এলেন।

—বিশেষ কিছুই করতে পারলুম না, এই যৎসামান্য চা-নাস্তা। ভদ্রলোকটি বিনীত হয়ে বললেন।

এক জায়গায় কিছু মুড়ি আর পাটালী গুড়, পিরিচে দুটো ডিমের পোচ আর একবাটি সধুম চা এলো।

—আহা এত সবের কি প্রয়োজন ছিল। আপনি বিব্রত হয়ে উঠলেন।

চা খেতে খেতে আলাপ আরও জমে উঠল। দু'জন ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন।

—কিছু যদি মনে না করেন,—ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, আপনার দেশ।

—উত্তর বঙ্গে। আপনি আরও জানালেন, পেশা লেখা। শিকারের খোঁজে চলেছেন বাহাদুরপুরে।

—বেশ, বেশ, আপনাদের মত সাহেব লোকের দেখা পাওয়াই তো সৌভাগ্য। আপনারা লেখেন টেখেন, মানুষের জীবন নিয়েই আপনাদের কারবার। আর আমরা হলুম গে একরকম মুখ্যুই,—ভদ্রলোক বলে যেতে লাগলেন, সেই যে বাপের জন্মে রেল কোম্পানিতে ঢুকেছি। ব্যাস। তারপর একেবারে কলুর বলদ যেন। ঘানির টানে চলেছি তো চলেছি। এর আর শেষ নেই।

আলাপ ক্রমেই ঘন হয়ে জমে এলো।

ভদ্রলোক আগে ই, আই, আর-এ ছিলেন। অনেক জায়গা ঘুরেছেন। গয়া, দ্বারভাঙ্গা, মুংগের, এলাহাবাদ, পাটনা! মেলা ষ্টেশনে কাজ করেছেন।

—বুঝলেন, গয়াতে মাত্র আমরা এক ঘরই বাঙালী ছিলুম,—ভদ্রলোক গল্প বলতে লাগলেন, আহা তোফা জায়গা, ছোট ছোট পাহাড়ের মাঝখানে শহরটা। পরিষ্কার তক্‌তকে। চড়াই-উৎরাইয়ের মাঝ দিয়ে শহরের রাস্তাগুলো এঁকে বেঁকে গেছে। আর সিউজীর মন্দির? ওটা কিন্তু একটা দেখবার মতো জিনিস। পাহাড় কেটে সিঁড়ি করা হয়েছে। তার ওপর শিবের মন্দির। এক হাজার সিঁড়ি ভেঙে আপনাকে উঠতে হবে। আরে সাহেব ওঠাই ছিল যত কষ্টের। নাব্‌বার সময় বাতাসে গা এলিয়ে দিয়ে শরীরটা আল্‌গা করে দিন। দেখবেন ঠিক নীচে নেবে এসেছেন। তবে আশ্চর্য ব্যাপার কি ছিল জানেন?—ভদ্রলোক অশেষ আগ্রহে কথা বলতে লাগলেন, ওপরে ওঠবার সময় ধাপগুলো গুণে এক হাজার, কিন্তু নাব্‌বার সময় ভাল করে গুণেও দেখবেন একটি কম। ন শ' নিরানব্বুই। একটা মিষ্ট্রি সাহেব, মিষ্ট্রি।

এমনি করেই গল্প বলতে বলতে সময় কেটে গেল। একটা ছোট প্যাসেঞ্জার ট্রেনও পাশ করলো। আপনি নিজের অজান্তেই হয়তো হাতঘড়িটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন।

ভদ্রলোক গল্প বলতে বলতে ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেলেন।

—গরীবের এখানে যখন এসেছেনই দাওয়াতটা কবুল করতেই হবে।

—আপনি হয়তো নানা ওজর আপত্তি তুললেন, অত কষ্টের দরকার কি? কেন মিছেমিছি ঝামেলা বাড়াচ্ছেন? আমার অভ্যেস আছে বিদেশে কাটিযে।

কিন্তু ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। সেই এক কথা, যখন এসেছেনই গরীবখানায তখন আমার ওখানে চাট্টে খাবেন না, তা কখনও হয়। —ভদ্রলোক বলসেন দেখুন, মনের মানুষ আর ক'জন পাই যার সঙ্গে বসে দু'দণ্ড গল্প করতে পারি। আপনারা এলে তবু এই বুড়ো বযসেও মনটা বেশ খেলোমেলা হযে ওঠে।

ভদ্রলোকের আতিথেয়তা অসীম। দাওয়াত আপনাকে কবুল করতেই হলো। লোহার রেলিংএর ওধারে সিঁড়ি ভেঙে আবার তিনি অদৃশ্য হলেন লাল সুরকীর পথে।

দুপুর ঘনিয়ে আসছে ষ্টেশনটার আশেপাশে। খোযাইর পথ ভেঙে উঁচু রেল লাইন ধরে লাল ডুরে জড়ানো ডুলীতে চড়ে কোন গাঁযের বউ চলেছে শ্বশুর বাড়ী। মৌমাছির মতো শব্দ হচ্ছে। ডুলিবেহারা যাচ্ছে রেল সড়কের ধার ঘেঁষে। তরল আমেজে যেন সময়টা রসিয়ে রসিয়ে চলেছে। বুড়ো বটের নীচে রেলযাত্রী নিযে দুটো গরুর গাড়ী এসে থামলো। আদুল গায়ে কোনো চাষার ছেলে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে দূর দিগন্তের দিকে যেখানে রেললাইন গিযে মিশেছে এক বিন্দু রেখায়।

আপনার মনটা উদাস হযে এলো। এখানে এত অবসর। এত সুষুপ্তি। সময়ও যেন ভুলে গেছে তার অস্তিত্ব। সব কিছুতেই ছাপিযে রয়েছে এখানকার অজানা ছন্দ। গভীর আর অন্তর্মুখী তার বেগ। বুড়ো বটের নীচে বসে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানগুলো বিশ্রামসুখ উপভোগ করছে। সময়ের কি শেষ নেই এখানে? সময়ের বেগ আছে, তবে তা মন্থর। গতি আছে, কিন্তু শ্লথ। এক ঝলক দমকা বাতাস ষ্টেশনের ধুলো উড়িয়ে দিয়ে গেল আপনার সামনে। কত তফাত। আপনি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলেন বিংশ শতাব্দী আপনাকে কতদূরে নিয়ে গেছে। যেখান থেকে এখানকার পরিবেশ, বুড়ো বট, ডুলি-বেহারা, আর দূরের গাঁগুলোকে মনে হচ্ছে আপনার কাছে বাংলার এক টুকরো প্রাচীন ইতিহাস। আপনার মনে হতে লাগলো আদিম পৃথিবীর চরমুরলী ষ্টেশনের এই রেললাইনই যেন কালের সংযোজন করেছে। দিগন্তের ঐ বিন্দু থেকে যদি ইস্পাতের এ দুটো পাত এখান দিযে না চলে যেত, তবে

বোধ হয় এখানকার মাটি হতো ধন্যা। কালের কলুষ থেকে রক্ষা পেয়ে হতো পবিত্রতম। এখানেই হয়তো নিরাভরণ পৃথিবীর আদিম সৌন্দর্যের পূজো করতে আসতো পরিব্রাজকের দল। এ যুগেব হিউয়েন সাঙ্‌রা এখানেই নালন্দা বসাতেন।

দুপুরের খাওয়াটা একটু গুরুতর রকমেরই হলো। রুই মাছের মুড়ো ঘণ্ট গলদা চিংড়ির দোপেয়াজী। নানা রকমের ভাজা। একটু আমেব চাটনী!

পরিবেশন করছিলেন ভদ্রলোকের কন্যা।

বললেন, এটি আমাব মেয়ে-শেফালী আর ইনি হচ্ছেন মস্ত বড় লেখক। খুব গুণী লোক। মেলা বই বেরিয়েছে ওর জানিস?

প্রশংসাতিশয্যে আপনি তখন লজ্জায় নুযে পড়েছেন। বললেন, দেখুন আমি একজন নগণ্য লেখক মাত্র।

—আপনি কি তা আমি জানি, আপনি নন। নিজের রসিকতায় ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন।

খাওয়াব শেষে পান নিয়ে এলো শেফালী।

—পান।

—আমি পান খাই না, একটু সুপুরী দিন।

শেফালী এগিয়ে ধরলো পানেব পিবিচটা।

একহারা গড়ন মেয়েটির। শ্যামলা গায়ের রং। ব্রীড়াবনতা মেয়েটির সব চাইতে স্পষ্ট আর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ওর চোখ দুটি। পদ্মফুলের মতো ভাসা ভাসা। সাদা থানের অমলিন শুভ্রতায় বিষাদের জড়িমা ওর সর্বাঙ্গে।

ভদ্রলোক গল্প শুরু করলেন, চরমুরলীতে দেখবার মতো কি জিনিস আছে জানেন?

আপনি আপনার অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

সাগরপুরের দুর্গ, বাংলার বৌদ্ধ রাজাদের আমলের দুর্গ,—ভদ্রলোক বললেন, উনিশ শ' ছত্রিশ কি সাইত্রিশে দুর্গটা আবিষ্কার করা হয়। তখনকার ভারত সরকারের পূর্ত বিভাগেব এক সাহেব এখানে এসে দুর্গটা আবিষ্কার করেন। দেখবার মতো জিনিস বটে। বিরাট তার চৌহদ্দি। আর সে যুগের ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একটা বিস্ময়। চলুন না, দেখে আসবেন। বেশী দূর নয়, এখান থেকে সিকি মাইল হবে।

বিকেলে সাগরপুরের দুর্গ দেখতে বেরুলেন। ভদ্রলোক হঠাৎ একটা

কাজের জন্য যেতে পারলেন না। বল্‌লেন, শেফালী আর সন্তু যাচ্ছে। দেখে আসুন, চবমুরলীতে এসে সাগরপুর না দেখলে জীবনে আপনি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবেন না।

রেল লাইন পেরিয়ে নীচু গাঁয়ের পথে আপনারা চলতে শুরু করলেন। এবড়ো-খেবড়ো কাঁচা মেঠো রাস্তা। কিষাণেরা মাঠ থেকে ফিরছে। গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে রাখাল ছেলে। দূরের একটা ফাঁকা জমিতে শকুন বসেছে।

আপনি গায়ের র‍্যাপারটা ভাল করে জড়িয়ে নিলেন। সন্তু আপনার হাত ধরেছে। শেফালী তার পাশে। আপনারা এগিয়ে চলেছেন গাঁয়ের পথ ধরে।

—আচ্ছা, সন্তু, তুমি এদিকে এর আগে কখনও এসেছ? আপনি জিজ্ঞেস করলেন।

—কতবার এসেছি। আব্বার সাথে এসেছি একবাব, আব একবার চড়ুই-ভাতি খেতে এসেছিলাম। আপা ভাত রেঁধেছিল ঐ পিপুলগাছেব নীচে, তাই না আপা? সন্তু হাত দিয়ে দূবের একটা গাছ দেখিয়ে দিল। ঐ পথ ধরেই তো সাগরপুরে যেতে হয়। মবারক ডাক্তাব ঘোড়ায় চড়ে ঐদিক দিয়েই তো আসে। সন্তু গডগড় কবে বলে যায়, জানেন নয়া ভাই—

নয়াভাই? আপনি বিস্মিত হন। এ নাম আপনাকে কে দিলে? শেফালী তখন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছে।

জানেন? মবারক ডাক্তারের সাদা ঘোড়াটাই তো পুরুর ঘোডা ছিল।

—কোন পুরুব ঘোড়া? আপনি চিন্তিত হন।

—ঐ যে ইতিহাস সোপানে যার ছবি আছে।—সন্তু আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, ইয়া গোঁফওয়ালা মবারক ডাক্তাবের সাদা ঘোডাটাতে চডেই তো পুরুরাজ আলেকজাণ্ডারের সাথে যুদ্ধ করেছিল। পুরুবাজ ধবা পড়লে ঘোড়া পালিয়ে যায়। যুদ্ধ অনেকদূরে হয়েছিল তো তাই ঘোড়ার বাংলা দেশে পালিয়ে আসতে একটু দেরি হয়। মবারক ডাক্তার একদিন রুগী দেখে ফিবতেই জংগলের ধারে সাদা একটা ঘোড়া দেখে চিনে ফেললেন এই তো পুরুর সেই পালিয়ে যাওয়া ঘোড়া। তারপর থেকে মবারক ডাক্তার ঐ ঘোড়ায় চড়ে চরমুরলী আর সাত গাঁয়ের রুগী দেখে বেড়ান।

আপনি শুধোলেন, সন্তুমিয়া, তোমায় এ গল্পটা কে বলেছে, বলো তো?

—কেন, আপনি তা-ও জানেন না?—এবারে সন্তু বিস্ময় প্রকাশ করে, আপা আপনাকে এমনি কত গল্প বলতে পারবে।

এই সন্তু, অস্ফুট তিরস্কারের ভঙ্গীতে শেফালী সন্তুকে কাছে টেনে নেয়।

মাঠের পথ ছেড়ে একটা উঁচু বাজারের ওপর উঠতেই আপনি দেখতে পাবেন সাগরপুর।

সন্তু চীৎকার করে উঠলো, ঐ যে সাগরপুর। ঐ যে।

আপনি দেখলেন প্রাক-সন্ধ্যার সূর্য সমারোহ সাগরপুরের মাথায় রাজ-তিলকের মতো সমুজ্জ্বল। বিংশ শতাব্দীর বেগবান ইতিহাস নিমেষের জন্য যেন স্তব্ধ হয়ে আছে সাগরপুরের বৌদ্ধ দুর্গপ্রাকারে।

দক্ষিণের একটা পথ দিয়ে দুর্গের সিংহদ্বারে গিয়ে পৌঁছুনো যায়। অবশ্যি সিংহদ্বার এখন নেই। পাঁচিলের খানিকটা অংশ ফাঁকা আর সেখান দিয়ে ওপরে উঠবার সিঁড়ি। বোঝা যায় এটাই দুর্গে ঢোকবার প্রধান পথ ছিল।

দুর্গের কাছে এলে প্রথম নজরে পড়বে টিনের একটা আটচালা। সরকারী ডাক-বাংলো। টুরিষ্টদের জন্য দেখবার মতো জিনিস ছিল ওখানে। এখন আর বিশেষ কিছুই নেই। যুদ্ধের আগে নানা দেশ থেকে লোক আসতো সাগরপুরে। সাগরপুরের সে আর এক স্বর্ণযুগ। এখন সব অনাদরের অন্ধকার গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

দুর্গটা চারদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পুরোনো পাতলা শিলীভূত ইটের স্তূপ।

কয়েক জায়গায় ভেঙে গিয়েছিল। সে জায়গাগুলো নতুন ইট দিয়ে ভরাট করার চেষ্টা হয়েছে।

এবারে শেফালী প্রথম কথা বললো, এদিক দিয়ে ওপরে উঠতে হবে।

সিঁড়ি তো নয়। ঢালু পথ একটা ঘুরে ওপরে উঠে গেছে। মাঝে মাঝে ঘাস গজিয়েছে।

শেফালী বলতে লাগলো, বাংলায় যখন পাল রাজারা রাজত্ব করতেন, তখনই নাকি দুর্গটা তৈরী হয়। অনেকের বিশ্বাস ধর্মপালই সাগরপুরের দুর্গ তৈরী করেছিলেন।

সন্ধ্যের শেষ সূর্য তখন বিদায় নিচ্ছে। আপনার মনে হতে লাগল পৃথিবীটা যেন অনেক বদলে গেছে। অনেক গম্ভীর আর আত্মস্থ। এমনি করেই হয়তো সেদিনও সূর্য বিদায় নিয়েছিল। কবে? কতদিন আগে? আপনার হয়তো দিন-ক্ষণ মনে নেই। অনেকদিন আগে। শতাব্দীর পর শতাব্দী পিছিয়ে গেলে

এমনি এক প্রাচীন দিন আপনি ফিরে পাবেন, যেদিন এমনি করেই মেঘের আড়ালে সূর্য ডুবেছিল। আর রাজকন্যে....?

শেফালী অস্ফুটস্বরে ডাকলো, এদিকে নীচের গুহাটা দেখুন।

নীচে সূচীভেদ্য অন্ধকার। গুহার ভেতরে কিছুই দেখা যায় না। ওখানে কি হতো ?—হযতো কোনো রাজকন্যের শাপে বিদ্ধ দাস তিল তিল করে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করত ওরই একটা অন্ধকার কুঠরীতে। হযতো কোনো...না, না, ক্ষমাই যাদের ধর্ম সর্বজীবে দয়াই ছিল যাদের মন্ত্র, তাদের বোধ হয মৃত্যুকুঠরীর প্রয়োজন ছিল না। তবে ওখানে কি হতো ? হয়তো ওটা মৃত্যু কুঠরী নয়। দণ্ডিত দাস হযতো আদৌ এ দুর্গে স্থান পেতো না। হয়তো ওখানেই ঐ গুহামুখে মঙ্গল ঘণ্টা বাজ্‌ত। সন্ধ্যেদীপ জ্বালিয়ে সিদ্ধার্থের পূজা হতো। সংঘং শরণং গচ্ছামি...।

—চলুন, নীচে দেখবেন। শেফালী নেমে গেলো গুহামুখে।

দিযেশলাইযের একটা কাঠি ধরালেন আপনি। শেফালী একটু এগিযে গিযে বললো, এটা একটা গুপ্তপথ। এ পথ দিযে বাইরে যাওযা যায। কোনো এক যুদ্ধে যখন এ দুর্গটা ঘেরাও হযে যায তখন রাজকুমার রাজকন্যেকে নিযে এ পথ দিয়েই পালিয়েছিল।

কোন্ রাজকুমার ? কি তার নাম ? আপনার মনে প্রশ্ন জাগে। আর রাজকন্যে ? তার সর্বঅঙ্গে কি লোধরেণু মাখা ছিল ? পরিধানে কি ছিল শিপ্রাতট থেকে আনা অঙ্গবাখা ? কোন্ সে রাজার কুমার যে মঞ্জুশ্রীকে নিযে এই পথ দিযেই পালিযেছিল। অতীতের সেই বিযোগবিধুর ঘটনায আপনার মন তখন আকুল। গুহার গাযে গাযে প্রাচীন বৌদ্ধস্থাপত্যের নিদর্শন। অতীতের শিল্পমাধুরী বুকে নিযে যেন এখানকার প্রত্যেকটি ইট মহিমান্বিত। কালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে এরা সযত্নে ধরে রেখেছে এদের গুপ্তধন। আপনাকে এ যুগের প্রতিনিধি পেযে যেন বলছে, হেরে যাবো তবু মাথা নোযাবো না। ওরা লুপ্ত হযে যাবে তবু গর্বোদ্ধত।

ফেরার পথে দেখলেন চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমা রাতে বিশালকায দৈত্যের মতো সাগরপুরের দুর্গ দিগ্‌বলযে মিলিযে যাচ্ছে।

—আশ্চর্য জাযগা।

—আপনার ভালো লেগেছে ? শেফালী ভীরু লজ্জিত চোখে তাকালে আপনার দিকে।

—অদ্ভুত। ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না কত ভালো লেগেছে।

সন্তুকে কাছে টেনে নিলেন আপনি। কিছুক্ষণ থেমে আবার বললেন, আপনার কাছে কিন্তু আমি ঋণী।

—কেন ?

আপনি বললেন, এমন একটি জায়গা আমায় দেখালেন, যার কথা আমি জীবনেও ভুলতে পারবো না।

—সত্যি ? শেফালী স্মিত হেসে বললো।

—দেখুন এত কাছে এসেও যদি সাগরপুর থেকে দূরে থেকে যেতুম তাহলে আর নিজেকে ক্ষমা করতে পারতুম না।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ভদ্রলোক বল্লেন, কেমন বলেছিলুম না। দেখবার মতো জিনিস। আরে সাহেব, এগুলো তো আপনারাই দেখবেন। আমরা কি আর ওসব দেখে কিছু ছাই বুঝি ?

বেশী রাতে ভদ্রলোক গানের আসর বসালেন। আমরা দু'টি মা ও ছেলে রোজ রাতে গান গাই আর নিজেরাই শুনি, ভদ্রলোক সেতারের তার সুরে আনতে আনতে বললেন। আমার মা যেদিন থেকে ঐ সাদা থান পরলো সেদিন থেকেই মনে মনে সুরের সাধনা করেছি।—ভদ্রলোক বললেন, বেদনা থেকেই সুরের সৃষ্টি। সুরের এমন এক ভাষা আছে, যার মুখে কথা লাগে না। এমনিই কথা বলে। সে এক অব্যক্ত ভাষা, উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু প্রকাশ করা যায় না।

বাবা ও মেয়ে বসেছেন আসর জমিয়ে। মেয়ে গাইয়ে, বাবা বাজিয়ে। বেহাগের সুরে সুরে গোটা ঘরটা অভিসিঞ্চিত। সঙ্গীতের অব্যক্ত ভাষায় গোটা ঘর মন্দ্রিত। বাইরে চাঁদনী রাত। এক ঝলক চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে। অস্পষ্ট রেখায় দেখা যাচ্ছে শুভ্রবসনাকে। সঙ্গীতের মূর্ছনায় হারিয়ে গেছে যেন। নিজের সত্ত্বাকে যেন মিশিয়ে দিয়েছে সুরের ভাঁজে ভাজে। অঙ্গে অঙ্গে রাগিণীর মৃদংগ স্বর। আপনার মনে হতে লাগলো, এ কোন রহস্যলোক। এ কোন অমৃতধারা। আপনি নিঃশেষে খুইয়ে দিলেন নিজেকে।

ঘণ্টা খানেক পরে গান থামলো।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনবেন? মা আমার বড় ভাল রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়।

আবার শুরু হয় গান। তবে এবাব আগের মতো নয়। আগে সুর ছিল আগে, কথা ছিল পেছনে। এবাব কথা এলো আগে আর সুব রইলো পেছনে।

গান গাইলো শেফালী—

রূপে তোমায় ভোলাবো না
ভালবাসায় ভোলাবো
হাত দিয়ে দ্বার খুলবো না
গান গেয়ে খোলাবো।

কখন যে গান থেমে গেছে আপনি বুঝতেই পারেন নি। সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ। শুধু দেয়াল ঘড়ী টক্‌টক্‌ কবে শব্দ করছে।

আপনি বল্‌লেন, এবার তাহলে উঠি অনেক রাত হয়েছে।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি উঠে বল্‌লেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার আবার সকালেব ট্রেন বয়েছে।

বেরিয়ে আসার সময় দেখলেন শেফালীর চোখ দু'টো অশ্রুসজল। ভোবের শুকতারা জমে হিম হয়ে আছে চোখেব পাতায়।

তারপর। সকালে ষ্টেশনমাষ্টাব ভদ্রলোক চোখ দু'টো ডান হাত দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন, আজ না হয় থাকলেই পারতেন, বড্ড মায়া পড়ে গেছে। ট্রেন তখন প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে গেল।

দুরে দু'নম্বর রেল কোয়ার্টারটা দেখা যাচ্ছে। ওরই একটি জানলা দিয়ে হয়তো কোনো মেয়ে দেখছে সকাল ছ'টার ট্রেন চলে গেল। দূরে যেখানে দিগন্তের কাছে রেল লাইন দু'টো এক বিন্দুতে মিশেছে, সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, আপনাব দৃষ্টিশক্তি ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছে।

বাঁধ

জহির রায়হান

'আর কিছু নয়, গফর গাঁ থাইকা পীর সাহেবেরে নিয়া আস তোমরা।' অনেক ভেবে চিন্তে বললেন রহিম সর্দার।

'তাই করেন হুজুর, তাই করেন!' একবাক্যে সায় দিল চাষীরা।

গফর গাঁ থেকে জবরদস্ত পীর মনোয়ার হাজীকেই নিয়ে আসবে ওরা। দেশজোড়া নাম মনোয়ার হাজীর। অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি তিনি। মুমূর্ষু রোগীকেও এক ফুঁয়ে ভালো করেছেন এমন দৃষ্টান্তও আছে।

সেবার করিমগঞ্জে যখন ওলাবিবি এসে ঘরকে ঘর উজাড় করে দিচ্ছিল তখন এই মনোয়ার হাজীই রক্ষা করেছিলেন গাঁটাকে। সাধ্য কি ওলাবিবির মনোয়ার হাজীর ফুঁয়ের সামনে দাঁড়ায়। দিন দুয়েকের মধ্যে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে পালিয়ে গেল ওলাবিবি, দু দশ গাঁ ছেড়ে। এমন ক্ষমতা রাখেন মনোয়ার হাজী।

গাঁয়ের লোক খুশী হয়ে অজস্র টাকা পয়সা আর অজস্র জিনিসপত্র ভেট দিয়েছিল তাঁকে।

কেউ দিয়েছিল বাগানের শাক-সব্জী। কেউ দিয়েছিল পুকুরের মাছ। কেউ মোরগ, হাঁস। আবার কেউ দিয়েছিল নগদ টাকা।

দুধের গোরুও নাকি কয়েকটা পেয়েছিলেন তিনি। এত ভেট পেয়েছিলেন যে, সেগুলো বাড়ি নিয়ে যেতে নাকি তিন তিনটে গোরুর গাড়ি লেগেছিল তাঁর।

সেই সৌভাগ্যবান পীর মনোয়ার হাজী! তাঁকেই আনবে বলে ঠিক করল গাঁয়ের মাতব্বরেরা, চাষী আর ক্ষেত মজুররা।

কিন্তু পীরকে আনতে হলে টাকার দরকার। পীর সাহেব কি এমনি আসবেন? তাঁর জন্যে বিশেষ ধরনের পাল্কি চাই। আট বাহকের পাল্কি।

ঘি ছাড়া কোন কিছু মুখেই রোচে না পীর সাহেবের। গোস্ত ছাড়া ভাত খান না। খাবার শেষে এক প্রস্থ মিষ্টি না হলে খাওয়াটাই অসম্পূর্ণ রয়ে যায় তাঁর। তাই টাকার দরকার।

'টাকার চিন্তা করলে তো চলবো না। যেমন কইরা হক পীর সাহেবেরে আনতো হইবো।' কোমর খিঁচে বললে জমির ব্যাপারী। 'পর পর দুইডা বছর ফসল নষ্ট অইয়া গেল, খোদা না করুক, এবার যদি কিছু অয়, তাইলে যে কোনমতেই জান বাঁচান যাইবো না।' শেষের দিকে কান্নায় ভিজে এল জমির ব্যাপারীর কণ্ঠস্বর।

পর পর কত বছর বন্যার জলে ফসল নষ্ট হয়ে গেছে ওদের। ভরা বর্ষা শুরু হতেই বাঁধটা ভেঙে যায়। আর, হড় হড় করে পানি এসে ভাসিয়ে দিয়ে যায় সমস্ত প্রান্তরটাকে।

কপাল চাপড়িয়ে খোদাকে অনেক ডেকেছে ওরা। অনেক কাকুতি মিনতি ভরা প্রার্থনা জানিয়েছে খোদার দরবারে। কিছুতেই কিছু হয়নি। খোদা কান দেননি ওদের প্রার্থনায়। নীরব থেকেছেন তিনি।

'নীরব থাকবো না ? খোদা কি আর যার তার ডাকে সাড়া দেয়। গাঁয়ের লোকদের বোঝাতে চেষ্টা করলে জমির মুন্সি। 'খোদার ওলিদের দিয়া ডাকাইলে পর খোদা শুনবো। মন টলবো। তাই কর, পীর সাহেবেরে নিয়ে আস তোমরা।'

ঠিক হল বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলবে ওরা। অবশ্য চাঁদা সবাই দেবে। দেবে না কেন ? বান ডাকলে তো আর একা রহিম সর্দারের ফসল নষ্ট হবে না, হবে সবার। সবার ঘরেই অভাব অনটন দেখা দেবে। সবাই দুঃখ ভোগ করবে। ধুঁকে ধুঁকে মরবে, যেমন মরেছে গত দু-বছর।

কিন্তু মতি মাষ্টার যুক্তি তর্কের ধার ধারে না। চাঁদা চাইতেই রেগে বললে, 'চাঁদা দিমু ? কিসের লাইগা দিমু ? ওই লোগডার পিছে ব্যয় করার লাইগা ?'

মতি মাষ্টারের কথায় দাঁতে জিভ কাটলো জমির মুন্সি।

'তওবা, তওবা, কহেন কি মাষ্টার সাব। খোদাভক্ত পীর, আল্লার ওলি মানুষ। দশ গাঁয়ে যারে মানে, তার নামে এত বড় কুৎসা!'

'ভাল কাজ করলা না মাষ্টার, ভাল কাজ করলা না।' ঘন ঘন মাথা নাড়লেন জমির ব্যাপারী। 'পীরের বদ দোয়ায় ছাই অইয়া যাইবা!'

কথা শুনে সশব্দে হেসে উঠল মতি মাষ্টার। 'কি যে কও চাচা, তোমাগো কথা শুনলে হাসি পায়।'

'হাসি পাইবো না, লেখাপড়া শিখাতো এহন বড় মানুষ অইয়া গেছ।' মুখ ভেংচিয়ে বললেন জমির ব্যাপারী। 'চাঁদা দিলে দিবা, না দিলে নাই, এত বাহাত্তরী কথা ক্যান ?'

কিন্তু, বাহাত্তরী কথা আরো একজনের কাছ থেকেও শুনতে হল তাদের। শোনালো দৌলত কাজীর মেজ ছেলে রশিদ। শহরে থেকে কলেজে পড়ে। ছুটিতে বাড়িতে এসেছে বেড়াতে। চাঁদা তোলার ইতিবৃত্তি শুনে সে বলল, 'পাগল আর কি, পীর আইনা বন্যা রুখবো! এ একটা কথা অইলো।"

'কথা নয় হারামজাদা!' জমির মুন্সি কোন জবাব দেবার আগেই গর্জে উঠলেন দৌলত কাজী নিজে। 'আল্লার ওলি, পীর দরবেশ, ইচ্ছা করলে সব কিছু করতে পারে। সব কিছু করতে পারে তাঁরা।' এই বলে নূহ নবী আর মহাপ্লাবনের ইতিকথাটা ছেলেকে শুনিয়ে দিলেন তিনি।

খবরটা রহিম সর্দারের কানে যেতে দেরি হল না। দু-দশ গাঁয়ের মাতব্বর রহিম সর্দার। পঞ্চাশ বিঘে খাস আবাদী জমির মালিক। একবার রাগলে, সে রাগ সহজে পড়ে না তাঁর। জমির মুন্সির কাছ থেকে কথাটা শুনে রাগে থরথর করে কেঁপে উঠলেন তিনি, 'এ্যাঁ! খোদার পীরেরে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা। আচ্ছা, মতি মাষ্টারের মাষ্টারি আমি দেইখা নিমু। দেইখা নিমু মইত্যা এ গেরামে কেমন কইরা থাহে।' অত্যন্ত রেগে গেলেও একেবারে হুঁশ হারাননি রহিম সর্দার। কাজীর ছেলে রশিদের নামটা অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলেন তিনি। কাজী বাড়ি কুটুম্ব বাড়ি, বেয়াই বেয়াই সম্পর্ক, তাই।

পীর সাহেবের নূরানী সুরত দেখে গাঁয়ের ছেলে বুড়োরা অবাক হল। 'আহা! এমন যার সুরত, গুণ তার কত বড়, কে জানে!' ভক্তি সহকারে পীর সাহেবের পায়ের ধুলো নিল সবাই। 'গরীব মানুষ হুজুর! মইরা গেলাম, বাঁচান।' হুজুরের পা জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠলেন জমির ব্যাপারী।

জমির ব্যাপারী বোকা নন। বোঝেন সব। খোদার মন টলাতে হলে আগে পীর সাহেবের মন গলাতে হবে। পীর সাহেবের মন গললে এ হতভাগাদের জন্যে খোদার কাছে প্রার্থনা করবেন তিনি। তার পরেই না খোদা মুখ তুলে তাকাবেন ওদের দিকে!

পীর সাহেব এসে পৌঁছলেন সকালে। আর ঘটা করে বৃষ্টি নামল বিকেলে।

বৃষ্টি, বৃষ্টি আর বৃষ্টি। সারাটা বিকেল বৃষ্টি হল। সারা রাত চললো তার একটানা ঝপ ঝপ ঝন ঝন শব্দ। সকালেও তার বিরাম নেই।

প্রতি বছর এ সময়ে শ্রাবণ মাসের 'ডাত্তব'। কেউ কেউ বলে বুড়ো বুড়ির 'ডাত্তব'। এই ডাত্তরের আয়ুষ্কাল পনের দিন। এই পনের দিন একটানা ঝড় বৃষ্টি হবে। জোরে বাতাস বইবে। বাতাস যদি বেশী থাকে আর অমাবস্যা কি পূর্ণিমার জোয়ারের যদি নাগাল পায় তাহলে সর্বনাশ! নির্ঘাত বন্যা।

'খোদা, রক্ষা কর। রক্ষা কর খোদা। রহম কর এই অধমগুলার ওপর।' কান্নায় ভেঙে পড়লেন জমির ব্যাপারী। মনে মনে মানত করলেন। যদি ফসল নষ্ট না হয় তাহলে হালের গোরু জোড়া পীর সাহেবকে ভেট দেবেন তিনি।

গম্ভীর পীর সাহেব ঢুলে ঢুলে তবছি পড়েন আর খোদার মহিমা বর্ণনা করেন সবার কাছে। খোদার মহিমা বর্ণনা শেষ হলে পীর সাহেবের মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে অসংখ্য আজগুবি ঘটনার অবতারণা করেন তাঁর সাকরেদরা।

মনে আশা জাগে চাষীদের। আনন্দে চক চক করে ওঠে কোটরে-ঢোকা চোখগুলো। ভিড়ের মাঝ থেকে গনি মোল্লা ফিসফিসিয়ে বললেন, 'কই নাই মনার পো। এই পীর যেই হেই পীর নয় খোদার খাস পীর!'

কথাটা মিনু পাটারীর কানে যেতে গদ গদ হয়ে বললো সে, 'শুন নাই তোমরা? সেই বার এক বাঁজা মাইয়া পোলারে এক তাবিজে পোয়াতী বানাইয়া দিছলেন তিনি। শুন নাই?'

যারা শুনেছে তারা মাথা নেড়ে সায় দিল, 'হ্যাঁ, কথাটা সত্যি।' আর যারা শোনেনি তারাও সেই মুহূর্তে বিশ্বাস করলো কথাটা। পীর সাহেব সব পারেন। ইচ্ছে করলে এই ঝড় বৃষ্টিটাকে মুহূর্তে থামিয়ে দিতে পারেন তিনি। কিন্তু, থামাচ্ছেন না প্রয়োজন বোধে থামাবেন তাই।

কিন্তু মতি মাষ্টার বিশ্বাস করলো না কথাটা। হেসে উড়িয়ে দিল। বললো, 'ঝড় থামাবে ওই বুড়োটা? মন্তর পড়ে ঝড় থামাবে?'

'হ্যাঁ, থামাবে। আলবৎ থামাবে।' আকাশভেদী হুংকার ছাড়লেন গনি মোল্লা। চোখ রাঙিয়ে ফতোয়া দিলেন। 'এই নাফরমান বেদীনগুলো গাঁয়ে আছে দেইখাই তো গাঁয়ের এই দুরবস্থা।'

'হ্যাঁ, ঠিক কইছ মোল্লার পো।' তাঁকে সমর্থন করলেন বুড়ো তিনজী মিঞা। এই কাক্কের গুলোয়ে গা থাইকা না তাড়াইলে গায়ের শান্তি নাই।'

কিন্তু গাঁয়ের শান্তি রক্ষার চাইতে 'ঢল' রোখাটাই এখন বড় প্রশ্ন।

প্রকৃতি উন্মাদ হয়ে পড়েছে। ক্ষুব্ধ বাতাস বার বার সাবধান করছে। 'ঢল হইবো ঢল'। পানি ভরা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনজী মিঞা। রক্ত দিয়ে বোনা সোনার ফসল।

হায়রে ফসল!

হঠাৎ পাগলের মত চিৎকার করে ওঠেন তিনি, 'খোদা!'

মসজিদে আজান পড়ছে। পীর সাহেব ডাকছেন সবাইকে। 'এস মিলাদ পড়তে এস। এস মঙ্গলের জন্য এস।'

টুপিটাকে মাথায় চড়িয়ে বৃষ্টির ভেতর ভিজে ভিজেই মসজিদের দিকে ছুট দিলেন জমির ব্যাপারী। যাবার সময়, ঘরের ঝি বৌদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন, 'এ রাত ঘুমাইবার রাত নয়। বুঝলা? অজু কইরা বইসা খোদারে ডাক।'

অজুটা সেরে উঠে দাঁড়াতেই কার একটা হাত এসে পড়লো ছকু মুন্সির কাঁধের ওপর। জমির মুন্সির ছেলে ছকু মুন্সি। গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান মানুষ। প্রথমটায় ভয়ে আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করলো, 'কে?'

'ভয় নাই আমি মতি মাষ্টার।'

'ব্যাপার কি? এ রাত্তির বেলা?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে ছকু।

মতি মাষ্টার বললো, 'যাও কন হানে?'

'যাই মসজিদে।' ছকু জবাব দিল। ক্যান তোমরা যাইবা না?'

'না।' স্বল্প থেমে মতি মাষ্টার বললো। 'এক কাজ কর ছকু। মসজিদে যাওয়া এহন রাখ। ঘর থাইকা কোদালটা নিয়া বাইর অইয়া আয়। যা জলদি কর।'

'কোদাল দিয়া কি অইবো?' রীতিমত ঘাবড়ে গেল ছকু মুন্সি।

'যা ছকা। কোদাল আন।' পেছন থেকে বললো মস্ত সেখ।

এতক্ষণে পুরো দলটার দিকে চোখ পড়ল ছকু মুন্সির। একজন দুজন নয়, অনেক। অন্ততঃ জন পঞ্চাশেক হবে। সবার হাতে কোদাল আর ঝুড়ি।

মতি মাষ্টার এত লোক জোটালো কেমন করে? কাজী বাড়ীর পড়ুয়া ছেলে রশিদকে দলের মধ্যে দেখে আরো একটু অবাক হল ছকু।

ব্যাপারটা অনেক দূর আঁচ করতে পারল সে। গতকাল এ নিয়েই কাজী পাড়ায় বুড়ো কাজীর সঙ্গে তর্ক করছিল মতি মাষ্টার। 'গত কয়েক বছর কি খোদারে ডাকেন নাই আপনারা? হ্যাঁ, ডাকছিলেন। কিন্তু ফল কি হয়েছে? ফসল কি বাঁচছে আপনাগো? বাঁচে নাই। তাই কইতে আছলাম কেবল বইসা বইসা খোদারে ডাকলে চলবো না। এ কয়টা গাঁয়ে মানুষ তো আমরা কম নাই। সবাই মিলে বাঁধটারে যদি পাহারা দিই, সাধ্য কি বাঁধ ভাঙে?'

মতি মাষ্টারের কথা শুনে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এসেছিলেন বুড়ো কাজী। অশ্রাব্য গালি-গালাজ করেছিলেন তাকে। সে কাল বিকেলের কথা।

মসজিদে আজান দেওয়া হচ্ছে। পীর সাহেব ডাকছেন সবাইকে, 'এস মিলাদ পড়তে এস। এস মঙ্গলের জন্য এস।'

সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল ছকু। তারপর টুপিটাকে মাথায় চড়িয়ে মসজিদের দিকে পা বাড়ালো সে। খপ করে ওর একখানা হাত চেপে ধরলে রশিদ, 'ছকু।'

'এই ছকা।' ক্ষেপে উঠলো পণ্ডিত বাড়ীর চাঁদু।

অগত্যা, কোদাল আর ঝুড়ি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ছকু মুন্সি।

মাইল খানেক হাঁটতে হবে ওদের। তারপর বাঁধ।

নবীন কবিরাজের পুকুর পাড়ে এসে পৌঁছুতেই জোরে বিদ্যুৎ চমকে উঠে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল একটা।

ভয়ে আঁতকে উঠে থমকে দাঁড়ালো ছকু। খোদা, সাবধান করছে তাদের। 'খবরদার যাইও না।' 'যাইও না মাষ্টার।' থামো, থামো!' হঠাৎ চীৎকার করে উঠল ছকু মুন্সি। 'খোদা নারাজ হইবো, মসজিদে চল সবাই।'

'ইস, চুপ কর ছকু।' বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপছে মতি মাষ্টার। 'এখন কথা কইবার সময় না। জলদি চল।'

আবার চলতে শুরু করলো ওরা।

দূর মসজিদ থেকে দরুদের শব্দ ভেসে আসছে। পীর সাহেবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দরুদ পড়ছে তিনজী মিঞা, জমির ব্যাপারী, রহিম সর্দার ও আরো কয়েক-শো জোয়ান জোয়ান মানুষ। অসহায়ের মত উর্ধ্বে হাত তুলে চীৎকার

করছে তারা : হে আসমান জমিনের মালিক ! হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ! হে রহমানুর রহিম ! তুমিই সব ! তুমি রক্ষা কর আমাদের।

ওদিকে মরিয়া হয়ে কোদাল চালাচ্ছে মতি মাষ্টারের দল। এ বাঁধ ভাঙতে দেবে না তারা। কিছুতেই না।

তাদের সোনার ফসল ডুবতে দেবে না তারা। কখনই না।

ঝাঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আকাশে বিদ্যুৎ চমকিয়ে বাজ পড়ছে। সোঁ সোঁ বাতাস বইছে। খরস্রোতা নদী ফুলে ফেঁপে ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে। অমাবস্যার জোয়ার। নির্ঘাত বাঁধ ভেঙে পড়বে।

'হায় খোদা।' ঘরের ঝি-বৌয়েরা করুণ আর্তনাদ করে ফরিয়াদ জানায় আকাশের দিকে চেয়ে। দুনিয়াতে ইমান বলে কিছু নেই। ধর্ম উঠে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে। মানুষ খোদাকে ভুলে গেছে। তাই তো খোদা রাগ করেছেন। মানুষ গোরু সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন তিনি। ধ্বংস করে দেবেন এই পৃথিবীটাকে, পাপে ভরা এই পৃথিবী !

দুরু দুরু বুক কাঁপছে তিনজী মিঁঞার। চোখের জলে ভাসছেন জমির ব্যাপারী। আর দুলে দুলে তছবি পড়ছেন।

হায়রে ফসল !

সোনার ফসল !

এ ফসল নষ্ট হতে পারে না। টর্চ হাতে ছুটোছুটি করছে মতি মাষ্টার। কোদাল চালাও ! আরো জোরে !

বাঁধে ফাটল ধরেছে।

এ ফাটল বন্ধ করতেই হবে।

অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে কোদাল চালাচ্ছে ওরা।

মস্তু সেখ চিৎকার করে বললে, 'আলির নাম নাও ভাইরা, আলির নাম নাও।'

'আলির নামে কাম হইবো সেখের পো ?' বললে বুড়ো কেরামত। 'তার চে একডা গান গাও। গায়ে জোস আইবো।'

মস্তু সেখ গান ধরলো।

গানের শব্দ ছাপিয়ে হটাৎ বাজ পড়লো একটা কাছে কোথায়।

কোদাল চালাতে চালাতে মতি মাষ্টারকে আর তার চোদ্দ পুরুষকে মনে মনে গাল দিতে লাগলো ছকু মুন্সি, 'খোদার সঙ্গে লাঠালাঠি। হা-খোদা, এই

কি জমানা আইছে। খোদা, এই অধমের কোন দোষ নাই। এই অধমেরে মাপ কইরা দিও।'

ঝুড়ি মাথায় বিড় বিড় করে উঠলো পণ্ডিত বাড়ীর চাঁদু, 'হাত পা গুটাইয়া মসজিদে বইসা বইসা চল রুখবো না আমার মাথা রুখবো।'

তারপর হঠাৎ এক সময়ে মতি মাষ্টারের গলায় শব্দ শোনা গেল, 'আর ভয় নাই চাঁদু। আর ভয় নাই। এবার তোরা একটু জিরাইয়া নে!'

এতক্ষণে হাসি ফুটল সবার মুখে। শ্রান্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁধের ওপর এলিয়ে পড়লো অবশ দেহগুলো। পঞ্চাশটা ক্লান্ত মানুষ। সূর্য তখন পূব আকাশে উঁকি মারছে।

আধ আলো অন্ধকার আকাশ বেয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। মৃদুমন্দ বাতাসের তালে তালে নাচছে সোনালী ফসল। মসজিদ থেকে বেরিয়ে হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়তে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো জমির ব্যাপারী। ডোবেনি ডোবেনি। ফসল তাদের ডোবেনি। ডুবতে দেননি পীর সাহেব।

খুশীতে চকচক করে উঠলো জমির মুন্সির চোখ দুটো। দৌড়ে এসে পীর সাহেবের পায়ে চুমো খেলেন গনি মোল্লা। ডোবেনি, ডোবেনি। ফসল তাদের ডোবেনি। ডুবতে দেননি পীর সাহেব।

এক মুহূর্তে যেন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে সমস্ত গাঁটা। ছেলে বুড়ো সবাই হুমড়ি খেয়ে ধেয়ে আসছে পীর সাহেবের পায়ে চুমো খাবার জন্যে।

ঘুম চোখে তখনও ঢুলছেন পীর সাহেব। স্বল্প হেসে বললেন, 'খোদার কুদরতের শান কে বলতে পারে।'

সাকরেদরা সমস্বরে বলে উঠলো, 'সারারাত না ঘুমাইয়া খোদারে ডাকছেন আমাগো পীর সাব। বাঁধ ভাঙে সাধ্য কি?'

পীর সাহেব তখনো হাসছেন। স্বল্প পরিমিত হাসি আপেলের রক্তিমাভার মত ফেটে ছড়িয়ে পড়ছে মুখের সর্বত্র।

তৃষ্ণা

সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্

হাটে যেতে যেতে আধা রাস্তা থেকে আজিজ মৌলবী বাড়ী ফিরে এলো।

ঘটনাটা এতো অপ্রত্যাশিত যে, ছোটো মেয়ে নইমা পর্যন্ত স্থির থাকতে পারলো না, কলরব করে বাড়ীটাকেই সে মাথায় তুলে নিলো।

ই কি! বাজান যে ফিরা আইছে। ওমা! মা! দেহ আইয়া, বাজান যায় নাই।

হামিদাবানুও তাকে দেখে অবাক হলো।

ফিরা আইলাইন যে!

আজিজ মৌলবী গম্ভীরভাবে বললো—হ! একটু তামুক হাজাইয়া দিতে কও। কইতাছি! নারকেল মালার দিশি হুকোয় গুড়ুক গুড়ুক কয়েকটা টান কষে নিয়ে সে বললো, ট্যাহাডা নিয়া কাদেররে হাটে পাঠাইয়া দেও। আমি আইজই ঢাকায় যামু!

ঢাকায় যাওয়ার কথা শুনে হামিদাবানুর বিস্ময়ের সীমা রইলো না। হঠাৎ ওর হোলা কি! কথাবার্তায় বা কাজে কর্মে কোনদিন এমন আবোল তাবোল তাকে দিয়ে সম্ভব হয়নি। গম্ভীর মানুষ, চটুল কোনকিছুতে সে কোনদিন অভ্যস্ত নয়। তবে একথা ঠিক, যাবে মনে করে যখন সে ফিরে এসেছে তখন যাবে নিশ্চয়ই, তাতেও কোনো ভুল নেই। কিন্তু হঠাৎ ঢাকা যাবার বাতিকে পেলো কি করে তাই হামিদাবানু ভেবে পেলো না। কৌতুহল দমন করতে না পেরে ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞাসা করলো,হটাস ঢাকা যাবাইন ক্যা?

হুকোর পানি দিয়ে মাটিতে ঢালা তামাকের আগুন নেবাতে নেবাতে

প্রত্যুত্তরে আজিজ মৌলবী ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বললো, যামু শহীদরে দেখইয়া আমু। মোনডা বড় ছট ফটাইতাছে।

হামিদাবানু খুব খুশী হোলো। দীর্ঘ দেড় বৎসরে শহীদকে কেউ তারা দেখতে পায়নি। সেই যে একবার সে বাড়ী এলো তারপরে আর আসেনি। তাদেরই কোলে-পিঠে করা শহীদ আজ বেদনাদায়ক স্মৃতি মাত্র। নিজের পেটের ছেলে অথচ চোখের পানি ছাড়া তাকে আজ ভাবা যায় না! চিঠিপত্র সে মাঝে মাঝে লেখে সত্যি কিন্তু তাতে যেন আগের শহীদকে তন্নতন্ন করে খুঁজেও আর ফিরে পাওয়া যায় না, কোথাও প্রাণের উত্তাপ নেই। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় গুটিকয় কথার তড়িৎ ব্যস্ততা; নিজের শারীরিক কুশল, বাড়ীর সকলের কাছে আদাব সালাম, স্নেহ দোয়ার মামুলিআনায় চিঠি শেষ—আর তা যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি রুক্ষ। পড়তে পড়তে হামিদাবানু নিজেরও অলক্ষ্যে কতো যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে, আড়ালে আবড়ালে শাড়ীর আঁচলে, ভেজা চোখ কতোবার যে মুছেছে! একটা কথাই বার বার তার মনে উঁকি দেয়, পড়তে গিয়ে ছেলে তার পর হয়ে গেলো।

কতো আশায় বুক বেঁধে ছেলেকে ঢাকায় পাঠিয়েছিলো হামিদাবানু, পড়াশুনো করে পাশ করে তার ছেলে কতোবড়ো নামী লোক হবে। সারা দেশটা যে শহীদের কথাই একদিন বলাবলি করবে তার কানের কাছে। আরো কতো কি! সে আশার পূরণ তো হোলোই না, ছেলেও পর হয়ে গেলো। সে বাড়ী আসা ছেড়ে দিলো, নিজের ভালোমন্দ খোঁজ খবরটা পর্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের কাছে বলতে তার যেন আপত্তিকর বলে মনে হয়।

বাড়ী না আসে আসুক। তার জন্য হামিদাবানুর কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু মনের এই ফাঁকটাকে কোনক্রমেই সে ভরে তুলতে পারে না। ছেলে মানুষী বলে উপেক্ষাও করতে পারে না, তাই সব সময়ই তা বুকের তলায় কাঁটার মত খচখচ করে বিঁধে।

ওর কাছেও এ কথাটা তোলা যায় না। আভাসে ইঙ্গিতে কিংবা কোনো অসতর্ক মুহূর্তে এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করলেও মৌন গম্ভীর মানুষটি চলায় বলায় কেমন বিচলিত হয়ে পড়ে। আজিজ মৌলবী তখন অপরাধ বোধে এমনি অপ্রস্তুত ও বেসামাল হয়ে পড়ে যে, তাতে হামিদাবানুর দুঃখ বাড়ে বৈ কমে না। তাই ভেতরে ভেতরে দুঃখের পাহাড় জমে উঠলেও

কোনদিন হামিদাবান্থ তা স্বামীর কাছে মুখ ফুটে বলে না, প্রাণপণ চেষ্টায় মনের ভেতরেই চেপে রাখে।

কিন্তু যে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে এ অঞ্চলটাই একসময় নিজেদের দুর্লভ ভবিষ্যতের কথায় মেতে উঠতো তার সম্পর্কে চুপ করে থেকে যন্ত্রণার হাত এড়ানা যায় না। নানা প্রশ্নে নানা জনে সেই কথাটাই বার বার তাকে মনে করিয়ে দেয়; দৃষ্টির আড়ালে কেউ কেউ খারাপ ইঙ্গিতও করে। লোকের বেদনাময় আগ্রহটাও যেমন কষ্টকর তেমনি অসহ্য কুলোকের ফিসফিসানি হাওয়ায় উড়ানো বিশ্রীকথা, কোনো অবস্থাতেই হামিদাবান্থর মনে শান্তি নেই।

এসব ছাড়াও একান্ত ব্যক্তিগত তার নিজেরও একটা দিক আছে। সব দুঃখ কষ্ট ছাপিয়ে কখনো কখনো একটা উদ্বেল অভিমান বোবা জোয়ারে তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, লেখাপড়ায় যার এতো মাথা, সেকি আর সাংসারিক অভাব অনটনের সামান্য ব্যাপারটা বোঝে না? সেকি বোঝে না এতে তাদের হাত নেই! বুঝেসুঝেও·যদি সে সবাব বিরুদ্ধে গোঁ ধরে থাকে তবে তা হৃদয়হীনতা ছাড়া আব কি! আজিজ মৌলবী মেয়েকে তাড়া দিলো।

যাও তো মা! ছাতি আর জুতো জোড়া নিয়া আহো। গাড়ি আহনের সময় আইয়া গেল।

হামিদাবান্থকেও একই নিঃশ্বাসে সে বললে, তুমি আর চাচির কাছ থিকা তিনডা ট্যাহা চাইয়া নিয়া আহো।

চোখের পলকে আজিজ মৌলবী জুতো-ছাতায় তৈরী হয়ে অধৈর্যভাবে হামিদাবান্থর অপেক্ষা কবতে লাগলো। বারকয়েক উঠানময় পায়চারী করে আজিজ মৌলবী আর স্থির থাকতে পারলো না! পাশের ঘর থেকে তিনটা টাকা চেয়ে আনতে এতো সময় লাগলে চলে কি করে! অতিষ্ঠ আজিজ মৌলবীর কাছে প্রত্যেকটা মুহূর্তকে একেক যুগের মতো দীর্ঘ মনে হতে লাগলো। থাকতে না পেরে নিজেও সে ঢুকে পড়লো ছোটো ভাইয়ের উঠোনে। ব্যস্তভাবে ডাকলো, বৌমা, বৌমা!

ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী জোবেদা লম্বা ঘোমটা টেনে দুয়ারে এসে দাঁড়ালো।

কি বড়োমিয়া?

ক্যান, শহীদের মায় তোমারে কয় নাই কিছু?

কইছে! কিন্তুক—

'কিন্তুক পরে বুঝাইও। গাড়ির সময় অইয়া গ্যাছে তাড়াতাড়ি ট্যাহাডা নিয়া আহ।

'জোবেদা তবু ইতস্তত করলো, আমতা আমতা করে বললো, তেনি কইতাছিলো আগেরই মাহি ট্যাহা পাওনা আছে—

জোবেদার কথা শুনে আজিজ মৌলবী থ হয়ে গেলো। এক মায়ের পেটের ছোটো ভাই, চরম দুর্দিনে যাকে সে যক্ষের মতো সকল বিপদের হাত থেকে আগলে রেখেছে সেও তার অভাব অনটন নিয়ে এমনভাবে বিদ্রুপ করবে এ তার কল্পনার অতীত। ছমিরের জন্য আজিজ মৌলবী জীবনে কি না করেছে? কোন অপমান কোন হীনতাটা সে ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে না সয়েছে? আর সেই ছমির পাঁচটা টাকা দিতে দেরি হয়েছে বলে আজ নির্লজ্জের মতো বৌকে দিয়ে তাগাদা দিতে ডানবায়ে তাকায় না? আজিজ মৌলবীর বুকের তলা থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো, সাধে কি লোকে বলে উপকারীকে বাঘে খায়! জোবেদার কথায় তার মনটা বিষিয়ে উঠলো, ট্যাহা পায় তা না করছে ক্যারা? ছমিররে কইয়ো গোরে গিয়া অইলেও তার দেনাডা আমি শোধ দিমুই।

আজিজ মৌলবী আর এক মুহূর্তেও ছমিরের উঠোনে দাঁড়াতে পারলো না। হনহন করে চলে এলো।

ব্যাপারটা এমন আকার ধারণ করবে জোবেদা তা ভাবতে পারেনি। সে ভেবেছিলো বড়োমিয়া যা ফেরেশতার মতো মানুষ তাতে ওর কথাকে তিনি আমলই দেবেন না। অথচ পাওনা টাকার কথাটাও বলা হয়ে যাবে। স্বামীর নাম করে যা সে বলেছে তার সবটাই বানানো, ছমির কোনদিন ভুলেও টাকার কথা বলেনি। ভয়টা রয়েছে জোবেদার মনেই। যা দিনকাল যাচ্ছে তাতে বড়োমিয়া হয়তো নানা অজুহাতে টাকা পাঁচটা কোনদিন আর ফেরত দেবেন না। মাঝে মাঝে একটু মনে করিয়ে দিলে হয়তো ফিরে পাওয়া যেতেও পারে। এই সূক্ষ্ম সাংসারিক বুদ্ধিটা গত কয়েকদিন থেকে তার মনে সূঁচ ফোটাচ্ছিল, তাই হাতের নাগালে সুযোগ পেয়ে জোবেদা তার অপব্যবহার করেনি। কিন্তু ভাসুরকে রেগে যেতে দেখে জোবেদা ঘাবড়ে গেল। নির্জলা মিথ্যে কথাটা যদি স্বামীর কানে ওঠে তাহলে শুধু যে কেলেঙ্কারীর একশেষ হবে তাই নয়, এখনো বড়ো ভাইয়ের ওপর ছমিরের যে ভক্তিশ্রদ্ধা আছে তাতে এই কথার জন্য মারধোর করে পাড়া

মাথায় তোলাটাও ছমিরের পক্ষে অসম্ভব নয়। তাই জোবেদা আর দেরি না করে ভাসুরের উঠোনে এসে তাড়াতাড়ি টাকা তিনটা তার হাতে তুলে দিলো। এ সম্পর্কে আজিজ মৌলবী কোনরকম ভাবনার সুযোগও পেলো না, তার আগেই জোবেদা বললো, কবে ফিরা আবাইন? শহীদরে যানি সাথে কইরা নিয়া আছুইন বড়োমিয়া। কতোদিন ধইরা যে অরে দেহি নাই। বাড়িডাই যান দুই বচ্ছর ধইয়া কানা অইয়া রইছে।

জোবেদা শহীদের উদ্দেশ্যে মৃদু তিরস্কার করলো স্নেহ কোমল স্বরে, কতো মানুষের পোলাপানই তো পড়াশুনা করনের জন্য বিদেশে যায়। তাই বইলা কি বাপু তর নাগাল কেউ বাপ মাও, বাড়িঘর ভুইলা যায় নাহি। যতোবড় বিদ্বান হওনা ক্যান মায়ের একধার দুধের দামও তাই দিয়া দেওন যাব না। মুরুব্বিগরে মোনে খুশী না রাখলেও বিদ্যা কামে নাগব না।

এতো বলেও জোবেদা নির্ভর হতে পারলো না। আবার সে বললো, শহীদরে যানি নিয়া আছুইন বড়োমিয়া।

কথাটা শেষ হবার আগেই কি মনে করে হঠাৎ জোবেদা নিজের ঘরের দিকে ছুটে গেলো, চোখের পলকেই আবার ফিরে এলো, শহীদের জন্যে বড়ই রাখছিলাম। বড়ই কয়ড়া জানি অরে দিয়া আছুইন।

হাসিমুখে আজিজ মৌলবী বললো, আইচ্ছা।

একটু আগে মনে যে তিক্ততা জমে উঠেছিলো আজিজ মৌলবী তা একেবারে ভুলে গেলো।

ট্রেনটা যতোই ঢাকার নিকটবর্তী হতে লাগলো, আজিজ মৌলবী লজ্জায় ততোই সংকুচিত হয়ে মাটির সাথে মিশে যাবার উপক্রম করলো। এমনকি কামরার অন্যান্য সহযাত্রীদের মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত তার সাহস হোলো না। তার মনের মধ্যে একটা অন্ধবিশ্বাস জট পাকিয়ে উঠছে—এ সবাই জানে আজিজ মৌলবী জীবনে পরাজিত। সেকথা মনে করে তাদের কৌতুহলী চোখগুলো বুঝি তার মুখের উপর এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। অস্বস্তিতে সে ছটফট করতে লাগলো, ছানিপড়া ভূতুড়ে বাতিটাকেও আজিজ মৌলবীর কাছে অসহ্য দীপ্তিতে উজ্জ্বল বলে মনে হোলো। মুখ নীচু করেই সে একটু নড়েচড়ে বসলো, যেন অন্ধকার রাত্রে চলমান একটা কেঁচোর গায়ে হঠাৎ কেউ চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোর বর্শা ছুঁইয়েছে।

আসলে তাইতো ! জীবনে ব্যর্থ ছাড়া আর সে কিছু নয়! কাজেই লোকেও যদি তাই ভাবে তাতে তাদের তো কোনো দোষ নেই। এরজন্য সে নিজেকে ছাড়া আর কাকে দায়ী করবে ? ছেলেকে সাধারণ মোটা ভাত কাপড়ে অতি প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শিক্ষাটুকু দেবার সামর্থ যার নেই সে ব্যর্থ বৈকি !

কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করতে বসলে সে অন্য আলোর নাগাল পায়, তাতে আনুপূর্বিক ঘটনার মানে ভিন্নতর। সে কিছুতেই নিজেকে এজন্য দোষী করতে পারে না। চল্লিশ টাকা মাইনের স্কুলের মৌলবী—সারা মাসের রোজগারের এইতো তার নিশ্চিন্ত পরিমাণ। দেশে অবস্থা যখন ভালো ছিলো তখন নানা ভাবে আরো বেশ কিছু হোতো। কিন্তু গত দু'বছব ধবে দেশের বুকে দুর্দিন এমনিভাবে পাষাণ ভার চাপিয়ে দিয়েছে যে তার গুরুভারে লোকের মেরুদণ্ড থেঁতলে গুঁড়িয়ে গেছে। ধর্ম কর্মের কথায় লোকে একেবারে উৎসাহ পায় না। দুটো খেয়ে কোনরকমে বেঁচে থাকার চেষ্টাতেই দুর্দিনের ধর্ম এসে আশ্রয় নিয়েছে ! কতো উপলক্ষ গেলো, কতো ভালো দিন! কিন্তু মৌলুদ শরীফ পড়ানো দাওয়াত জিয়াফত করে লোক খাওয়ানো, চাঁদা তুলে ওয়াজ-শোনাও কোনকিছু রেওয়াজ যেন আর চোখে পড়ে না। বিদেয় নিয়েছে। আর এসব অনুষ্ঠানই যদি দেশে না থাকে সেখানে আজিজ মৌলবীর মতো লোকের রুজি-রোজগারে টান পড়বে নাতো পড়বে কার ?

এই অমঙ্গলেব দিনে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার চেষ্টাতেই লোক স্থির হয়ে বসে আছে তা নয়, অনুষ্ঠানাদি বাড়িতে বাড়িতে অনেক হয়, এখনো। তবে দিনের প্রকৃতি অনুযায়ী তার নিয়ম পালটেছে, বিনা দক্ষিণায় এখন এসব কাজের পক্ষপাতি অধিকাংশ লোক। দু-এক জায়গা থেকে যে সামান্য দু'চার পয়সা পাওয়া তা দিয়ে অন্য কাজতো দূরের কথা একমাসের নুন খরচও চলে না। এ অবস্থায় প্রবাসী ছেলের জন্য বরাদ্দ টাকাটা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া তার অন্য কি উপায় ছিলো ?

আগের সুদিন ফিরে আসুক সেজন্য আজিজ মৌলবীও অন্য সকলের মতো আল্লার কাছে অহরহ কান্নাকাটি করে, আগের চেয়ে অনেক বেশী সময় সে এখন কোরান তোলাওয়াত করে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের শেষে অতিরিক্ত কয়েক রাকাত নফল নামাজ, যা পড়লেও চলে না পড়লেও চলে, তাও সে নিয়মিত আদায় করছে। কিন্তু দু'বছরেও সে প্রার্থিত সুদিন ফিরে তো এলোই না, দিন কাল ক্রমশঃই আরো খারাপ হচ্ছে।

প্ল্যাটফরমে নেমে আজিজ মৌলবী ইতস্তত করতে লাগলো। ছেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মুখ কি তার আছে।

কেমন এক অবসন্নতায় সমস্ত উৎসাহ নিস্তেজ হয়ে এলো। এখনও তো ফিরে যাওয়া যায়!

গেটের দিকে দু'পা এগিয়ে সে আবার দু'পা পিছিয়ে এলো, এমনি করতে করতে কখন যে সে টিকিট দেখিয়ে গেট পার হয়ে শহীদের হোস্টেলের দিকে রওয়ানা হয়েছে নিজেই তা জানতে পারেনি। বারান্দার সিঁড়িতে পা দিয়ে তবে সে বুঝতে পারলো যে এতোক্ষণ সে থেমে ছিলো না কোথাও, বেশ খানিকটা পথ হেঁটে এসে গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি হাজির হয়ে পড়েছে। বারান্দায় উঠেও সে বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথাটা আরেকবার ভাবলো। কিন্তু আজিজ মৌলবী ফিরে যেতে পারলো না, কি একটা দুর্নিবার শক্তি প্রবল আকর্ষণে মনে সকল প্রতিকূলতা, দ্বিধাদ্বন্দ্বকে আগ্রহ্য করে টেনে হিঁচড়ে তাকে শহীদের ঘরে এনে দাঁড় করালো।

কাপড়-চোপড় পরে শহীদ ট্যুইশনি করতে যাবার উদ্যোগ করছিলো, অপ্রত্যাশিতভাবে আব্বাকে তার ঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমত সে কিছু ঠাহর করে উঠতে পারলো না। আব্বার এই হঠাৎ-আসাকে সে কল্পনাও করতে পারেনি। তাই খানিকটা বিস্ময় আর খানিকটা অপ্রস্তুত অবস্থায় সে তার পায়ে হাত দিয়ে ছালাম করে উঠে দাঁড়ালো। ঘটনাটা শহীদের কাছে এতোই অভাবিত, যে বেশ কিছু সময় তার মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হোল না, বলার তো কোনো কথাই সে খুঁজে পেলো না। অত্যন্ত খাপছাড়াভাবে সে বলে উঠলো, আব্বা ভালো আছেন?

বলেই শহীদ লজ্জিত হোলো, নিজের কাছেই প্রশ্নটাকে বড়ো বেমানান ও সম্পর্কশূন্য লাগলো। কিছু সময় সে আর আব্বার মুখের দিকে তাকাতে পারলো না। আজিজ মৌলবীও ছেলের বিছানার উপর জবুথবু হয়ে বসে এক-দৃষ্টে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভুলেই গেলো যে, তারও কিছু একটা বলা দরকার। অনেকক্ষণ পরে চৈতন্য ফিরে আসতে চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলো,বাবা তোমার শরীরডা ভালো আছে তো?

মুখ নীচু রেখেই শহীদ জবাব দিলো জী!

কথাটা বলবে কি বলবে না, অনেক ইতস্তত করে মনের দ্বিধা কাটিয়ে অবশেষে সে বলেই ফেললো, কি কইরা চলতাছো বাবা ?

কয়েকটা ট্যুইশনি করি, তাদিয়েই চলে যায়।

কথাটা জিজ্ঞাসা করে আজিজ মৌলবী বিব্রত হয়ে পড়ে। পরের বাড়ি ছেলে পড়িয়ে সে পড়া চালাচ্ছে এরজন্য সে নিজের এতোখানি দায়ী বোধ করলো যে, সেও আর ছেলের দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস করলো না। এঅপমানের লজ্জা তো তারই! আজিজ মৌলবী ভেতরে ভেতরে একেবারে কুঁকড়ে গেলো। তাছাড়াও তার মনে হোলো কথাটা জানতে চাওয়া ঠিক হয়নি, সে অধিকারই তার নেই।

ঘরে ঢোকার সাথে সাথেই শহীদের ভুমড়ানো মুখটা আজিজ মৌলবীর বুকে প্রচণ্ডভাবে আঘত করেছিলো, ঘুরে ফিরে সে মুখটাই এখন আবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সারা মুখে ছড়িয়ে রয়েছে দুর্ভাবনা আর ক্লান্তির ছাপ, দেখে মনে হয় ছেলেটা যেন ধসে গ্যাছে। অথচ পরশু রাত্রিতে পূর্ণিমা চাঁদের জগজ্জ্যোতিঃ দিব্যচ্ছটা দেখেই না তার মনটা অমন উতলা হয়ে উঠেছিলো ঃ হাটে যেতে যেতে মনে হয়েছিলো শহীদের মুখটাও তো এমনি, ধবধবে, পূর্ণিমা আলোর স্নিগ্ধ-বিভা তারও মুখের চারিদিক ঘিরে। এসে দেখতে হোলো সে আলোর লেশমাত্রও আর নেই—

তারই অক্ষমতার প্রায়শ্চিত্ত করছে শহীদ। তারই পাপের জমানো ঋণ শোধ করতে সবই সে খোয়াতে বসেছে, তারুণ্য, রূপলাবণ্য, আনন্দ, মেধা—সবই। অনেকক্ষণ তারা কেউ আর কোন কথা বলে উঠতে পারলো না, সারা ঘরে বিস্তৃত হলো এক টুকরো হিম স্তব্ধতা।

শহীদ মাঝে দু-একবার মুখ তুলে তাকাতে চেষ্টা করেছে। তার মনে হোলো আব্বার মুখটা কেমন যেন শূন্যে ঝুলছে। দু'বছরেই আব্বা কি অস্বাভাবিক রকম বুড়ো হয়ে পড়েছে, মাথার সমস্ত চুল পেকে সাদা হয়ে গ্যাছে এ কয়দিনেই। নানা কথাই তার মনের মধ্যে জড়িয়ে পেঁচিয়ে তোলপাড় করতে লাগলো, কিন্তু মুখ ফুটে সেও কিছু বলে উঠতে পারলো না।

টেবিল ঘড়িতে আটটা বাজতেই শহীদ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

আব্বা! আমি তাহলে উঠি—ছাত্র পড়াতে যাবার সময় হলো।

এতোক্ষণ বসে বসে আজিজ মৌলবী যন্ত্রণায় কেবলি ছটফট করছিলো,

অসহ্য লাগছিলো এই দিনের আলো, যে আলোয় সে নিজের ছেলের দিকে তাকাতে পারে না। পুঁটলিটা হাতে নিয়ে সেই আগে উঠে দাঁড়ালো, ফিরতি গাড়ির সময় আইয়া গ্যাছে বোধ হয়, আমিও যাই, বাড়ি ঘরতো খালি।

ন্যাকড়ায় জড়ানো একটা ছোট্ট পুঁটলি সে পকেট থেকে বের করে শহীদকে দিতে দিতে বললে, তোমাব ছোট চাচি কিছু শুকনা বড়াই দিয়া দিছিল আহনের সময়।

এতোক্ষণ ঘরে থাকার জন্য কৈফিয়ত দেবার মত করে কথা কয়টি বলেই আজিজ মৌলবী ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা সে গেটের দিকে এগিয়ে গেলো।

কিন্তু হোষ্টেলের সীমানা পার হয়ে যেতেই শহীদের মুখটা অস্পষ্ট হয়ে উঠলো, কিছুতেই আজিজ মৌলবী তার মনের আরশিতে সে মুখকে স্পষ্ট করে তুলতে পারলেন না। হু হু কান্নায় তার বুক ভরে উঠলো, পাঁজরের পুরনো হাড়গুলো ব্যথায় যেন ঝনঝন করে বাজতে লাগলো। কেউ জানতে পারে না, কেউ বুঝতে পারে না ইচ্ছা করলেই শহীদের মুখটা তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে, সে গোপন অধিকার, তাও হারিয়ে যাবে।

এদিক সেদিক তাকিয়ে শার্টের কোণায় সে ভেজা চোখ মুছে নিলো। ঘুরে আবার সে রওনা হোলো শহীদেব ঘরের দিকে। প্রাণভরে আরেকবার দেখে তার মুখটাকে মুখস্ত করে আনতে হবে। কোনদিন যাতে তা আর এমন করে মুছে না যায়, হারিয়ে না যায়।

শহীদ ট্যুইশনি করতে তখনো বেবিয়ে যায়নি।

আব্বা যাবার পবই তার মনে হোলো ছেলে পড়াতে একদিন না গেলে এমন কি হোতো? ভাবতে ভাবতে সে অস্থির হয়ে উঠলো, কি হোতো একদিন না গেলে? কোনদিন সে কাজে গাফিলতি করেনি, এক মিনিটও সে ফাঁকি দেয়নি আজ পর্যন্ত। একটা দিনের কথা তারা কি আর ভেবে দেখতো না? ভাবতে ভাবতেই আব্বা চোখের আড়ালে চলে গেলো। ছুটে গিয়ে পিছু ডেকে ফিরিয়ে আনতে তার ভালো লাগলো না। ঘরে পায়চারি করতে করতে সে ভাবলো আব্বা হয়তো এখনো ষ্টেশন অবধি পৌঁছয়নি। তবে কি সে যাবে তাকে ফিরিয়ে আনতে? বুড়ো মানুষ এতো পথ কষ্ট করে এসেছেন শুধু তাকে দেখবার জন্য, আর এমনি ইতর সে যে নামার সাথে সাথে তাকে তক্ষুণি বাড়িমুখো কবে ছাড়লো। না সময়ের না টাকা

পয়সার, তার জন্য আব্বা তো কখনো হিসেব করেনি, আর সে তার জন্য একটা দিনও ছেড়ে দিতে পারলো না। নিজের এই স্বার্থপরতার জন্য নিজকে সে ধিক্কার দিতে লাগলো বারবার। এমনি সময় আব্বা গলা খাঁকারি দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। ফিরে আসাতে শহীদ খুব খুশী হলো।

আজিজ মৌলবী ছাতা আর পুঁটলিটা বিছানায় রেখে দিতে দিতে আরেকবার ভাবলো কি বলা যায়। আসতে আসতে সে অজুহাত খুঁজেছে। ঘরের এক কোণে রাখা মাটির কুঁজোটার উপর দৃষ্টি পড়তেই সে নিশ্চিন্ত হোলো, জিজ্ঞেসা করলো, শহীদ তোমার ইহানে পানি আছে বাবা?

হ্যাঁ আছে! বসুন, দিচ্ছি।

হ, এক গেলাস ছাও বাবা। বড়ো পিয়াস পাইছে। তাই ভাবলাম তোমার ইহান থিকাই পানিডা খাইয়া যাই, রাস্তা ঘাটে কিছু খাওনডা ভালো না।

কুঁজো থেকে গড়িয়ে নেওয়া পানি ভরতি গ্লাসটা শহীদ আব্বার হাতে তুলে দিয়ে বললো, আব্বা আজ থেকেই যান। বিশ্রাম নিয়ে ধীরে আস্তে গেলেই চলবে।

আজিজ মৌলবী কোন কথা বললো না, নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় গড়িয়ে পড়লো।

আদিম

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

নদী আর গ্রাম পাশাপাশি। ইলশা আব সোনাকান্দি। সোনাকান্দি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। হাট, বাজার, মন্দির, মসজিদ, হিন্দু, মুসলমান, চাষাভুষা, জোতদার, জমিদাব মিলে একাকার। কিন্তু পাশ দিয়ে প্রবাহিত খরস্রোতা নদী আর নদী নেই। ক্রমশঃ উটের পিঠের মত কাঁচা মাটির স্তর জমাট হয়ে চর পরিধি বাড়াচ্ছে। সবুজ ঘাসের আস্তরণের নীচে নতুন মাটির জীবন আবাদ হচ্ছে। নদী মজে যাচ্ছে। কেবল বর্ষাকালে ইলশা তার পূর্বরূপ ফিরে পায়। দুকূল প্লাবিত বিপুল বন্যাবেগে সংহারী মূর্তির মত ইলশা তার মহাসামুদ্রিক বাহুর বেষ্টনে যেন সোনাকান্দিকে মুছে ফেলতে চায়।

প্রতি বছর এই বর্ষাকালে তরঙ্গায়িত মেঘনার বুকে জেলে নৌকায় রঙিন পাল ওড়ে। জোয়ারের তীব্র টানে সারি সারি নৌকা ইলশার দিকে পাড়ি জমায়। বর্ষার পানিতে ডোবা সোনাকান্দির চরের কাছাকাছি নৌকা বাঁধে। বাজারে নতুন মাছের ধূম পড়ে। "বেবুজ্জে" মেয়েরা পিঠে কাপড়ের আঁচল বেঁধে তার দোলনায় শিশু সন্তানকে রেখে, ঘোমটাহীন নির্মুক্ত মাথায় মাছের ঝাঁকা নিয়ে হাটে বাজারে ঘুরে বেড়ায়। আবার কখনো তেমনি সন্তানকে পিঠে বেঁধে, নৌকার গলুইয়ে বসে, পা-বৈঠা বেয়ে তীব্র গতিতে নদীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়। স্বাস্থ্য পুষ্ট দেহের রেখায় রেখায় শানিত তরোয়ালের আভা যেন চমকায়। সোনাকান্দির আদিম রক্তে ঝড় ওঠে।

এবারও নৌকা এলো সারি সারি। ঘাটে বাঁধা নৌকার ব্যূহ থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। মাথায় ঝাঁকা, বয়স বিশ কি বাইশের কোঠায়। লতানো গাছের মত একটা লাল ডুরে রঙের তাঁতের শাড়ী সঙ্কোচমুক্ত, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল

দেহের দীপ্তি বাড়িয়ে, ববং আরো কিছুটা বিস্ফারিত, রহস্যময় করে একহারা দেহটাকে পেঁচিয়ে ঘাড়েব কাছে উঠে যেন গতিহীন ঝর্ণাব মত হয়ে গেছে। সঙ্গের লোকটি অর্ধপ্রৌঢ। তালগাছের মত শক্ত, ঋজু, ক্রুর চেহারা।

সোনাকান্দির মনসুর তালুকদার তাদের উভয়কে বাড়ীতে দেখে বিস্মিত হল। বাপ হজ্জে যাবেন। নিজেই সে জমি জমা দেখাশোনা করছে। সদ্য উঠতি বয়স, সঙ্গে দায়মুক্ত অর্থ ব্যয়ের অধিকার। দুটো মিলে দেহেব রক্তে তালুকদার বংশের আদিম আভিজাত্য কথা কয়ে উঠছে। মেয়েটিকে দেখে লোভে তার চোখ চকচক করে উঠল। কিন্তু সঙ্গেব লোকটিকে দেখে সে মনের আনন্দ প্রকাশ করতে পারলো না।

মাথা থেকে ঝাঁকা নামিয়ে মেয়েটি ততক্ষণে একটা বিবাট মাছ মনসুরেব পায়ের কাছে রেখে দিয়েছে। মনসুব কথা বলাব পূবেই সে একান্ত বিনম্র কণ্ঠে বলল—হুজুরের মেহেরবাণী। আমার নাম লক্ষ্মী। আমি বেবুজ্জে। ও আমাব সোয়ামী। বলে সে সঙ্গেব লোকটাকে দেখালো। ‘তাব নাম যুগল চাদ।’ সে তার কর্কশ গলা যথাসম্ভব মোলায়েম করে বলল—হুজুরেব গাঁও গ্রামে এলাম। তাই সেলাম দিতে এসেছি। মাছ বেচে খাই। গরীব মানুষ। তাই হুজুরের যুগ্যি কিছু দিতে পারলাম না।

মনসুর সরাসরি লক্ষ্মীর দিকে তাকাতে না পেবে উভয়েব উপব চোখ বুলিয়ে বলল—না, না সেলাম কিসেব ? তাবপব লক্ষ্মীর দিকে চেয়ে বলল—তুমি বুঝি আগেও এ গ্রামে এসেছো ?

লক্ষ্মীর চঞ্চল চোখ কিছুক্ষণ মনসুরের সম্মোহিত চোখের উপর নেচে বেড়াল। পবক্ষণে চোখ নামিয়ে মৃদু হেসে বলল—না আমি আসিনি। আমার মা এসেছে, ভানুমতী। আপনাদের বাড়ীতেও অনেকবার এসেছিল। তাব কাছে কত গল্প শুনেচি সোনাকান্দির। দেখেন নি তাকে ?

মনসুর শৈশবে দেখা এক স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী নারীমূর্তির কথা কল্পনা করতে লাগলো। লক্ষ্মী তাব প্রতিবিম্ব। তাই তাকে দেখে প্রথমেই তাব চমক লেগেছিল।

যুগল আর লক্ষ্মী উভয়েই সেদিন লম্বা সেলাম ঠুকে বিদায় নিল।

দুদিন পর লক্ষ্মী আবার এলো। মাথার ঝাঁকা থেকে আবার একটা বড় মাছ বেরুল। কিন্তু মনসুর সবচেয়ে খুশী হল তাকে একা আসতে দেখে। কণ্ঠে নির্মুক্ত আনন্দ ছড়িয়ে সে বলল—কি মনে করে লক্ষ্মী ? তাতে নৈকট্যের

স্বর চাপা রইল না। লক্ষ্মীর চঞ্চল চোখ যেন আবেশে নত হল। বলল—একটা নিবেদন আছে হুজুর গরীবের নিবেদন।

মনসুর উঠে দাঁড়ালো, বলল,—বলো।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করল। লক্ষ্মী তারপর দ্বিধা জয় করে মুখে হাসি টানল—ইলশার চরে এবার জোয়ারের পানি দেখেছেন হুজুর? নদী আর চর একাকার। এখন চর থেকে পানি নামতে শুরু করেছে। নদীর মুখ জুড়ে বড় করে বাঁধ দিতে পারলে বহু মাছ ধরা পড়তো। তাতে এই গরীবদেরো দু'পয়সা লাভ হত, হুজুরেরও লোকসান হত না। বরং বেশ মোটা টাকা পেতেন।

জবাবের প্রত্যাশায় লক্ষ্মী চোখ তুলে তাকাল। সে চোখের দিকে চেয়ে মনসুর কিছুক্ষণ ভাবল, বর্ষার মেঘাবৃত আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ জটিল সমস্যা সমাধানে বিষণ্ণ মুখে দাড়ি চুলকালো। তারপর জিজ্ঞেস করল—তোমরা তো প্রতিবার মাছ বেচতে আসো। এবার হঠাৎ চর ঘেরাও করে মাছ ধরবার দিকে নজর দিলে কেন?

—লাভ আর লক্ষ্মী যে এক কথা হুজুর। নিজের রসিকতায় লক্ষ্মী নিজেই হেসে উঠল।

মনসুর নিজে দেহের শিরায় শিরায় সেই হাসির প্রতিধ্বনি শুনলো। চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক সময় লক্ষ্মীর সামনে দাঁড়িয়ে বলল—চরে আমি তোমাদের বন্দোবস্তী দেব লক্ষ্মী। সে কেবল তোমার খাতিরে। চরের লাগসই সোনাকান্দির চাষীদের জমি। এবার যে রকম পানি উঠেছে তাতে ভাদই ফসল বাঁচানো কষ্ট। তার উপর মাছ ধরার জন্য বাঁধ দিয়ে পানি জমিয়ে রাখলে তাদের জমির পানি সরে যাবার পথ পাবে না। ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। এ সব ক্ষয় ক্ষতি দেখে শুনে ..

লক্ষ্মী তাকে কথা শেষ করতে দিল না, বলল—যুগলও এ কথা বলেছিল হুজুর। বলেছে বাঁধ বেশীদিন রাখা লাগবে না। আর হুজুরের লোকসানটা সেলামীর টাকায় পুষিয়ে দেওয়া যাবে।

মনসুর তার সর্বাঙ্গে তীব্র দৃষ্টি বুলিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসি লুকোল। বলল—লাভ লোকসান আমি বুঝি না। কেবল তোমার খাতিরে—বুঝেছো লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলো। মনসুর শশব্যস্ত হওয়ার ভান করে নুয়ে তার হাত চেপে ধরল, ঠাণ্ডা নরম হাত।

চঞ্চল চোখের দৃষ্টিতে স্থির সন্ধ্যাতারার আলোটা একটা ধূর্ত হাসিতে নুয়ে পড়ল যেন। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, মাথায় ঝাঁকাটা তুলে সে তড়িৎ গতিতে রাস্তায় নেমে গেল।

বংশীর সাথে যুগলের মনোমালিন্য বহুদিনের। যুগলের একই সম্প্রদায়ের একই দলের লোক বংশী। বিবাদটা লক্ষ্মী-ঘটিত। বংশী যুগলের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। সে লক্ষ্মীকে ভালবাসতো, তার ধারণা ছিল লক্ষ্মীও তাকে ভালবাসে। কিন্তু বাদ সাধল যুগল। সামাজিক প্রতিপত্তি, আর টাকা পয়সার জোরে লক্ষ্মীকে বিয়ে করে বসল। নারীর হৃদয়হীনতায় যতখানি মর্মাহত হল বংশী সেদিন থেকে তার চেয়ে বেশী বিদ্বেষ পুষতে লাগল যুগলেব উপর।

ইলশার তীরে বাঁধা সারি সারি বেবুজ্জে ডিঙ্গির সামনে উন্মুক্ত মাঠে গানের আসর বসেছে। এক হাতে ঢোল বাজাচ্ছে আর গান গাইছে যুগল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠের আওয়াজ ফুরিয়ে আসছে। কাঁসার আওয়াজ থেমে থেমে আসছে, আর গানের ধূয়া ধরে যারা হল্লা করে নাচছে, তাদের তালে তালে ফেলা পা ক্রমশঃ বেতাল হয়ে আসছে। দোষ অবশ্য সবাইর নয়। যৌবনে যুগলের অভ্যাস দোষটা অসম্ভব রকম তীব্র ছিল। এখনো তাব প্রভাব সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। নেশাব ঘোরে ঢোলের উপব বেতাল হাত চালিয়ে গান গাইতে গিয়ে বাব বার তার স্বর জড়িয়ে আসছিল।

রস মা রসময়ী, তোমাবে কেমনে ভুলি

এ দীনতারণ অধম তোমাব বইবে নামের ঢুলি।

বংশীও দাঁড়িয়ে গান শুনছিল, র—স মা···

তু' একজন বিরক্ত হয়ে চাপা স্বরে বলল—বংশী ঢোলটা ধর না। বেটা পাঁড় মাতালের পাল্লায় পড়ে আসরটাই মাটি হয়ে গেল।

বংশী এতক্ষণ কথাটা আমলে আনেনি। হঠাৎ লক্ষ্মীর দিকে চোখ পড়তেই যুগলের কাছে এগিয়ে এসে অতর্কিতে ঢোলটা ছিনিয়ে নিল। নেশার আমেজ কেটে যেতেই যুগল চোখ মেলে তাকাল। ব্যাপারটা আঁচ করে কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল—ঢোল ছেড়ে দে বংশী।

বংশী ঢোলের উপর হাত চালিয়ে বাজাতে বাজাতে বলল—মাতলামী কোর না। যাও। তারপর নির্বিকার গান ধরল রস'মা রসময়ী। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল যুগলের। দীর্ঘ ঋজু দেহটা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ক্রুদ্ধ গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল বংশীর উপর। ঘাড় ধরে তাকে টেনে তুলে প্রচণ্ড এক চড়

কষিয়ে দিল তার গালে। বংশী কিছুক্ষণ জগৎ অন্ধকার দেখল। চোখ মেলে ঢোল, যুগল, আসরের সবাইর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। কেবল লক্ষ্মীকে এড়িয়ে গেল। তারপর অস্ফুট হাস্য ধ্বনিকে পেছনে রেখে ধীর পায়ে চলে গেল সে। সবচেয়ে জোরে হাসল লক্ষ্মী।

পরদিন বাঁধের কাজ আরম্ভ করার দিন। বংশী নৌকা ছেড়ে সোনাকান্দিতে চলে গেল। রমজান আলী প্রতিপত্তিশালী চাষী। তার বাড়ীর দাওয়ায় এসে বসল। রাত জাগরণে দু' চোখ লাল। মনের হিংস্র উত্তেজনা কথার আওয়াজে ফুটে বেরুতে চায়। যথাসম্ভব স্বাভাবিক হয়ে বংশী বলবার চেষ্টা করল—এদিকেই আসছিলাম। ভাবলাম একটু তামাক টেনে যাই। সেকান্দার মিঞা কই ?

সেকান্দার রমজান আলির বড় ছেলে। মাছ কেনা বেচা নিয়েই সেকান্দারের সঙ্গে বংশীব বহুদিনের আলাপ। রমজান জানাল, সে বাড়ীতে নেই। তারপর হুঁকো আনতে ভিতরে চলে গেল।

হুঁকো টানতে টানতে ধীরে সুস্থে বাঁধ দেওয়ার কথাটা পাড়ল বংশী। শুনে রমজান চেঁচিয়ে উঠল—সর্বনাশ, আমাদের উপায় ?

উপায় নেই-ই বটে। নদী লাগোয়া রমজান আলির জমি এমন কি তার প্রায় খোরাকি ফসলের জমিও। নদীতে বর্ষার পানি নেমে যাবার পথে বাঁধ দিলে ধীরে ধীরে পানি সরবে আর মাছ ধরা পড়বে। কিন্তু চরের আশে পাশে যে সমস্ত জমি আছে, তাতে পানি জমে ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। এখনই—কিছু একটা বিহিত করা দরকার। সেকান্দার বাড়ী নেই, অন্যান্য চাষীরাও দিনের কাজে বেরিয়ে গেছে। উপায় ভেবে না পেয়ে রমজান বংশীর হাত চেপে ধরল। বংশী হেসে বলল—আপনি ভাববেন না। সেকান্দার মিয়া ফিরলে তাকে পাঠিয়ে দেবেন। সব ঠিক হয়ে যাবে।

বংশীর মনের উত্তেজনা কিছুটা লাঘব হল। চরে সকলের সাথে একত্র হয়ে বন্দোবস্তী নিতে পারলে মাছ ধরে তারও মোটা লাভ হত। কিন্তু টাকার জন্য কি বংশী বিড়াল বনে যাবে ? তাহলে বেবুজে মেয়েরা পর্যন্ত কেন কোমরে ধারাল ছুরি লুকিয়ে রাখে ?

পূবের সূর্য পশ্চিমে সরে আসার পর সেকান্দার বাড়ী ফিরল। বাপের কাছে খবর শুনেই সে ছুটল চরের দিকে। এমনিতেই জমিতে ঢের পানি জমে আছে। তার উপর বাঁধ! স্ত্রী সখিনা বাধা দেবার চেষ্টা করল—ভাত খেয়ে

যাও। এমন কি ব্যগ্র দু'হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে রাখতে চাইল। কিন্তু তার আগেই সে রাস্তায় নেমে গেছে।

সেদিনের মত বাঁধের কাজ শেষ। নিকটে উঁচু ডাঙায় দাঁড়িয়ে যুগল আর লক্ষ্মী সব দেখছিল। বাঁধের উঁচু মাথা ছাপিয়েও ঢল হয়ে প্রচণ্ড বেগে পানি নেমে যাচ্ছে। ইলশার মহা সামুদ্রিক ব্যাপ্তি দিগন্তের কোণে মিশে গেছে। আকাশের খণ্ড খণ্ড মেঘে অস্তাচলের রং লেগেছে। বর্ষার কালো মেঘের রক্তাভা। লক্ষ্মী দেখছিল এসব, আর যুগল দেখছিল বাঁধ।

সেকান্দার দু'জনকে দেখেই থমকে দাঁড়াল। মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে বলল—তোমরা বাঁধ দিলে কার হুকুমে? যুগল মুখ ফিরিয়ে চাইল। সেকান্দরের কথা শুনে তার ক্রুর চোখমুখের রং আরো ক্রুর হয়ে উঠল। কর্কশ কণ্ঠে বিদ্রূপের সুর গোপন না করে বলল, যিনি হুকুম দেবার, তার হুকুমে।

লক্ষ্মী তাকে থামিয়ে দিল। তারপর চঞ্চল ঘৃণিত চোখ সেকান্দরের চোখের উপর রেখে লীলায়িত ভঙ্গীতে হাসল, ঠিক যেমন করে হেসেছিল, মনসুরের চোখে চোখ রেখে। বলল—আপনার জমি আছে বুঝি এখানে। তা পানি দেখেছেন এবার। বাঁধ না দিলেও দু'দশ দিনে পানি সরবে না। তাই বাঁধ দিয়ে আমরা গরীব জেলেরা মাছ ধরে দুটো পয়সা পেলে আপনাদের ক্ষতি কি? বাঁধও তো ভেঙে দেওয়া হবে তাড়াতাড়ি।

সেকান্দারের মুখচোখে ভাবান্তর দেখা গেল না। সে বলল, তা হয় না। বাঁধের ফাঁক দিয়ে পানি সরবে ধীরে ধীরে। তদ্দিনে ফসল একেবারে পচে যাবে।

যুগল হঠাৎ চেচিয়ে উঠল, কেন হবে না? চর আমারো নয়, আপনারো নয়, যার চর সে দিয়েছে, আপনি চোখ রাঙাবার কে?

যুগলের মেজাজ এম্নিতেই রগচটা। তার উপর কাল রাত থেকেই সে ক্ষেপে আছে। লক্ষ্মী তাকে থামাতে গিয়ে ধমক খেল। সেকান্দারও সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠ্‌ল—আলবাৎ রাঙাবো। চর মনসুর মিয়ার। জমি আমাদের। ধান আমরা নষ্ট হতে দিতে পারি না।

বলেই সে উত্তেজনাভরে বাঁধার জন্য ডাঙার নিকটে পোতা বাঁশগুলির দিকে এগিয়ে গেলো। যুগল কঠিন কণ্ঠে বল্‌ল—মালিকের হুকুম ছাড়া যে বাঁধে হাত দেবে, তার জান থাকবে না।

সেকান্দার তখন ক্রোধে কাঁপছে। চকিতে ক্ষিপ্ত হয়ে সে একটা বাঁশ টেনে

ছুঁড়ে ফেলল। যুগল বিস্মিত হল। বংশীকে দেখে দেখে এতদিন নিজের ঋজু সবল দেহ সম্পর্কে সে উচ্চ ধারণা পোষণ করে এসেছে। সেকেন্দারকে তা উপেক্ষা করতে দেখে তড়িৎপদে ক্রুদ্ধ গর্জনে ছুটে আসলো। কিন্তু তার আগেই সেকান্দার সাবধান হয়ে গেছে । যুগলকে আসতে দেখে সে একটু সরে দাঁড়াল মাত্র। তারপর পাশ কাটিয়ে এমন আঘাত হানল যে যুগল মাটিতে পড়ে গেল। দ্বিতীয়বার উঠবার উপক্রম করতেই সেকান্দার তাকে সাপ্‌টিয়ে ধরল। দুই মত্ত হাতীর মত দু'জনে লড়েই চললো । লক্ষ্মী এতটা হবে ভাবেনি। যুগলকে মার খেতে দেখে সে সেকান্দারের ফেলে দেওয়া বাঁশটাই তুলে নিল। তাক্ বুঝে প্রচণ্ড আঘাত হানল তার মাথায়। একটা আর্তনাদ করে নিস্পন্দ হয়ে গেল সেকান্দার।

ধুলো শয্যা ছেড়ে উঠে গা ঝাড়তে ঝাড়তে যুগল নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল—যাক্ শালা মরুকগে।

হঠাৎ কি মনে পড়ায় সে চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল, লক্ষ্মীকে বলল—কাজটা ভাল হল না লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী তখন অজ্ঞান সেকান্দারের রক্ত ফাটা মাথা দেখছে। ফিনিক দিয়ে রক্ত ছুটছে, রক্ত বন্ধ করার জন্য সে কাপড়ের গিট পাকাচ্ছে। যুগলের কথা শুনে বলল, কথা পরে শুনব, চলো একে ধরাধরি করে নিয়ে যাই। নইলে কেউ আবার দেখে ফেলবে।

নৌকায় এসে যুগল আবার বলল—কাজটা ভালো হল না লক্ষ্মী। আমরা বাঁধ দেওয়ার হুকুম এনেছি ব্যস। একে মনসুর মিয়ার কথা বলে দিলে সেখানে গিয়ে যা হয় করবার করত! এখন এর ফাটামাথা দেখলে গ্রামের সব লোক ক্ষেপে ছুটে আসবে। আমরা আর ক'জন? উপায় নেই।

লক্ষ্মী চোখের হাসি মুখে ফুটিয়ে বলল—তুমি ওদিক দেখো। এসব তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি দেখবো যাও।

জ্ঞান হতেই সেকান্দার মাথার কাছে যে নারী মূর্তিকে দেখল, তার মুখ বিষণ্ণ, চোখে করুণ আভা। সেকান্দারের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। তাকে চোখ খুলতে দেখে লক্ষ্মী মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়ে তুলল। তার চোখ, নাক, ঠোঁটের উপর হাত বুলাল। সেকান্দার সম্মোহিত হয়ে গেল। তার স্পর্শ লিপ্সু মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।

হঠাৎ মনে পড়ল তার সখিনার কথা। ভাত খাওয়ার জন্য সখিনার করুণ

মিনতি, তার উদগ্র বাহুর বেষ্টন। সেকান্দারের মোহ ভেঙে গেল। লক্ষীর দিকে কিছুক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ তাকে বিস্মিত করে সে তড়িৎ পদে নৌকা থেকে নেমে গেল। মাথার যন্ত্রণা তাকে আটকাতে পারল না।

বংশী যা চেয়েছিল, তাই হল। একবার চুপি চুপি যুগলের নৌকার কাছে যেয়ে লক্ষীর কোলের কাছে অজ্ঞান সেকান্দারকে সে পড়ে থাকতে দেখেছে। দেখে সে হেসেছে। কৌশল তাহলে তার ব্যর্থ হয়নি। সোনাকান্দির মানুষ এবার ক্ষেপবে, জাগবে। সেকান্দারকে মারার প্রতিশোধ বাঁধ ভেঙে তুলবে। আর এই সুযোগে বংশী যুগলকে পৃথিবী থেকে সরাবে। কেউ তাকে সন্দেহ করবে না, ভাববে, গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিবাদে খুন হয়ে গেছে। তারপর লক্ষীকে নিয়ে এখান থেকে বংশী চলে যাবে গ্রামের ভিটায় নয়, অথই সাগরের নিরুদ্দেশ বুকে। লক্ষী রাজি না হোক, যুগলকে সে ক্ষমা করবে না। যুগল তাকে জীবনে বহুবার নাকাল করেছে। তারপর চরমতম আঘাত হেনেছে লক্ষীকে কেড়ে নিয়ে। জীবনের স্বপ্ন সাধ টুটে গেলে মানুষ বেঁচে থাকে কিসের টানে?

রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই বংশী প্রস্তুত হয়ে বের হল। যুগলকে নৌকায় পাওয়া গেল না। সে তখন থাকবে না জেনেই বংশী এসেছে লক্ষী বলল—কি চাও? বংশী এক ফুয়ে পিদিমটা নিবিয়ে দিল। বলল—চুপ করে থাক, চেঁচাসনে।

মনে মনে সে যুগল এলে তাকে অতর্কিতে আক্রমণের কায়দাটা রপ্ত করতে লাগল। লক্ষী চীৎকার করার চেষ্টা করতেই বংশী সজোরে তার মুখ চেপে ধরল। লক্ষী অন্ধকারে কোমরের ছোরাটা খুঁজতে লাগল। কিন্তু বংশীর শক্ত হাতের দৃঢ় চাপ খেয়ে যন্ত্রণায় কাৎরে উঠে তার বুকে ঢলে পড়ল। আদিম হিংসা আর কামনা। বংশী থর থর করে কাঁপতে লাগলো উত্তেজনায়। ইলশার বুকে দীর্ঘ এক শতাব্দী যেন কেটে গেল। বাইরে হঠাৎ মৃদু ডাক শোনা গেল—লক্ষী। বংশী লাফিয়ে উঠল, নিশ্চিয়ই যুগল ফিরে এসেছে। ফিসৃফিসিয়ে ধমকানির স্বরে সে লক্ষীকে বলল—চুপ করে থাক। চেঁচাবি তো তোকেই আগে শেষ করবো।

অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে ছোরা হাতে সে বাইরে এলো। ভালো করে ঠাহর করল মূর্তিটাকে। লক্ষীদের নৌকা ঘেষে আর একটা ছোট ডিঙ্গি। তার উপর একা দীর্ঘ ঋজু দেহ দাঁড়িয়ে। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত

বংশী লাফিয়ে পড়ল। ক্ষীণ আর্তনাদটা তখনো থামেনি। দেহটা নদীতে ফেলে দেবার জন্য দু'হাতে উঁচু করে তুলতেই বংশী নিজেই আর্তনাদ করে পিছিয়ে গেল। তার হাত থেকে লাশটা অতর্কিতে নদীতে পড়ে গেল। দেহটা যুগলের নয়, মনসুরের। সে এখানে কি জন্য এল বংশী ভেবে পেল না। ভাববার সময়ও পেল না। অতর্কিতে পেছন থেকে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে সে নদী গর্ভে পড়ে গেল। ধাক্কা মারল লক্ষ্মী। বর্ষার অন্ধকার আকাশ মৃত্যুর মত নিথর স্তব্ধ। তার নীচে ইলশার মহা সামুদ্রিক বুকে তল নেই। প্রবল পানির স্রোত সগর্জনে ছুটে চলেছে। স্রোতের টান থেকে আত্মরক্ষার জন্য বংশী দু'বার মাথা তোলার চেষ্টা করল। কিন্তু পৃথিবীর বাতাস যেন ক্রমশঃই ভারী হয়ে আসছে। ততক্ষণে সে বহুদূরে চলে এসেছে। অতি কষ্টে মাথা তুলতেই বহু কণ্ঠের গর্জন তার কানে এসে বাজলো। সোনাকান্দির মানুষ বাঁধ ভাঙছে। বংশী শিউরে উঠল। সেই বাঁধ ভাঙা প্রচণ্ড ঢলের স্রোতে সে চলে যাচ্ছে।

এপার থেকে ওপার

সুচরিত চৌধুরী

চোখ ধাঁধানো দিগন্ত মাঠের ওপারে ভ্যাপসা আকাশটা থমকে আছে। তার নিচে পোড়ো পোড়ো ভিটে ঘর,—মজা খাল। পোড়া পোড়া মানুষের ছায়ারা যেন তাদের ভাঙা ফুস্ফুস্‌টাকে নিঃশ্বাসে সঞ্জীবিত করবার জন্যে পোকার মতো কিলবিল করছে। এপার থেকে ওপারের ওই শুকনো ঝলসানো বুকটা দেখলে মন কাঁদায়, বুক ভাসায় আর চোখ জ্বালায়।

কিন্তু একদিন ওপার থেকে ভেসে আসত রাখালিয়া বাঁশীর মিঠে সুর। ক্ষেতে ক্ষেতে ছিল প্রাণসজীব শাকসব্জীর ইশারা, ধানশীষের ঢেউ। পথ চলতে চলতে লাজ শরমে রাঙিয়ে উঠত কলসী কাঁখে নেওয়া বৌ-কন্যারা। ঢেঁকিশালে ছিল ধানভানার রাত। ভিটে ঘরের দাওয়ায় বসে তাগড়া মরদ জোয়ানরা হল্লা করে গাইত বারমাস্যা, মলুয়া সুন্দরীর কাহিনী, ধান তোলার গান। হঠাৎ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ এসে সমস্তই তচ্‌নচ্‌ করে দিয়ে গেল। ফসলভরা মাঠটায় জ্বলে উঠল আগুন। লাঙল-জোয়াল পড়ে রইল দাওয়ায়। বেচাকেনার হাটে ঘনিয়ে এল দুর্যোগ। এক মুঠো ভাতের জন্যে ভিটে বাড়ী, ঘটি-বাটি, সর্বস্ব খুইয়ে শেষকালে প্রাণটুকু কান্নায় কান্নায় মিশে গেল হাওয়ায়। সে কি কান্নার বৃষ্টি! শ্রাবণ বৃষ্টিকেও যেন হার মানায়। বিন্দু বিন্দু, তির্যক। প্রতিটি বিন্দু যেন এক একটি শব্দের ইতিহাসঃ ভাত, ভাত, ভাত। রাখালিয়া তার বাঁশীটি বুকে জাপটে ধরে পেটের জ্বালায় কুঁকড়ে মরল পথে, কাঁখের কলসীর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল বৌ-কন্যাদের উপচে পড়া যৌবন, মরদ জোয়ানদের গান হয়ে গেল স্তব্ধ। যে দিকে তাকাও সেদিকেই মৃতের পাহাড়। অনেক মরল, অনেকে বেঁচে রইল আবার অনেকে শহরমুখো ভুখ্‌ মিছিলের পায়ে পা মিলাল।

যারা মরেছে তাদের কান্নার ইতিহাস, আর যারা বেঁচে রয়েছে তাদের বেঁচে থাকবার শেষ প্রচেষ্টা—এই সব মিলে মিশে এক অদ্ভুত সুরের বন্যা বয়ে চলল দিক থেকে দিগন্তরের, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, মাঠ থেকে মাঠে—প্রত্যেকটি দুর্ভিক্ষ পীড়িত পোড়া পোড়া মানুষের বুকের খনিতে,—ওপার থেকে এপারে। স্রোত, ঢেউ, কম্পন। তারপর দুর্ভিক্ষ শেষ, যুদ্ধ শেষ। সবাই ভাবল ঃ এবার বাঁচব—ক্ষেত, ভিটে-ঘর আর বৌ-কন্যাদের নিয়ে সংসার পাতব, আকাশ দিগন্তে সূর্যের লুকোচুরি দেখব। কিন্তু কিছুই মিলল না, মিলল শুধু হতাশা আর হৃদয় নিংড়ানো ব্যথা।

দিন যায়, রাত্রি আসে। পোড়া পোড়া মানুষগুলোর চোখ তবু সবুজ স্বপ্নে রাত্রি জাগর। ধুঁকতে ধুঁকতে কুকুরের মতো জন্ম দেয় নবজাতকদের, পোকার মতো কিল্‌বিল্‌ করতে থাকে ওরা। এপার থেকে ওপার, গ্রামকে গ্রাম নাকি বদলে গিয়েছে। একদিন ওরা কান সজাগ করে শুনল, যুদ্ধের সময় যে সব সাদা চামড়ার লোকগুলো এখানে টহল দিয়ে বেড়াত—ওরাই নাকি এখানের আকাশ বাতাস বিষিয়ে তুলেছে। সুতরাং তাড়াও ওদের—ওরা চলে গেল। তারপর নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা—ভাগাভাগিতে মীমাংসা। গগনঠাকুর, ধীরু কোবর্ত, নোটন চাষী তাদের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ধুক্‌ধুকে প্রাণটি নিয়ে চলে গেল। দূর বহুদূর, মাঠ ক্ষেত পেরিয়ে—সেখানে নাকি তাদের ভাগের দেশ। মুখ চাওয়া চাওয়ি করল সবাই। ওপারের পোকাদের ভিড় কমল। তবু সেখানকার ভ্যাপসা আকাশে সূর্য উঠলো না, পোড়ো পোড়ো ভিটে ঘরে আলো জ্বলল না। কুকুরের মতো দিন দিন বাড়তে লাগল নবজাতক শিশুরা। একদিন এরা জানবে এদের বাপ মা'দের কান্নার ইতিহাস, কবিয়ালদের মুখে মুখে শুনবে দুর্ভিক্ষের কাহিনী। তারপর হয়ত জীবনের আসল সত্যের সন্ধান পেয়ে ভ্যাপসা আকাশটাকে মেঘমুক্ত করে তুলবে। হয়ত আবার ওপার থেকে ভেসে আসবে রাখালিয়া বাঁশীর মিঠে সুর, পথ চলতে চলতে রাঙা হয়ে উঠবে কলসী কাঁখে বৌ-কন্যারা, মরদ জোয়ানরা গাইবে বারমাস্যা, মলুয়া সুন্দরীর কাহিনী আর ধান তোলার গান। এপার থেকে ওপারের প্রাণ সজীবতা দেখে তখন আনন্দে মন কাঁদাবে, বুক ভাসাবে, চোখ ধাঁধাবে।

এপারে শহর, ওপারে গ্রাম। এপারে হঠাৎ ঝলসে উঠা চোখ, ওপারে পোড়া পোড়া চোখ। এপার আর ওপারের সবগুলি চোখ একই আকাশকে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

ওপারের ওই দৌলত মাঝির মেয়ে আমিনা। ভরা কলসীর মতো উপচে পড়ে দেহের যৌবন, নোংরা ছেঁড়া শাড়ীর মধ্য দিয়ে উঁকি মারে ওর পাকা আতার মতো দু'টি বুক। তেলহীন রুক্ষ চুলগুলি আষাঢ়িয়া মেঘের মতো বাতাসে ওড়ে। দৌলত মাঝি দাওয়ায় বসে মেয়েটার দিকে চেয়ে শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। সাজ নাই, পোষাক নাই রাজ-কন্যার রূপ। ওর মা'ও ছিল ঠিক অমনটি, একরাশ কালো চুলের অরণ্য নিয়ে যখন সামনে এসে দাঁড়াত তখন জুড়িয়ে যেত দু'চোখ। সাদা সাদা কতকগুলি ভাতের জন্যে মরে গেল সে। কোলের একরত্তি মেয়েটা বেঁচে রইল ধুঁকতে ধুঁকতে। উঃ, কি ভীষণ যন্ত্রণা। ভুলতে পারবে না দৌলত মাঝি। মেয়েটাকে দেখলে চমকে চমকে জাবর কাটতে থাকে সে।

'আব্বা তুমি কি ভাবতাছ ?'

'কই ? কিচ্ছু না।'

গা ঝাড়া দিয়ে দৌলত মাঝি উপুড় হয়ে বসে দাওয়ায়।

'ক্ষেতে যাইবা না ?'

'হ হ।'

উঠে পড়ে দৌলত। ক্ষেতে যেতে হবে, দিন মজুরীর কাজ। ঢিলা চামড়ার শরীরটা দিয়ে তবু যে ক'দিন চলে হাড় খাটুনী খেটে যেতে হবে। না হলে উপোস দিয়ে মরতে হবে। একদিন সব ছিল—ক্ষেতে ক্ষেতে ধান, বিরিষ গরুর হাল, নিকোনো দাওয়া; সে সব শুধু অতীতের স্মৃতি। এখন সর্বহারা, চোখে স্বপ্ন। লাঙল চালাতে চালাতে ভাবনা যতো বাড়ে মন ততো শুকনো মাটির ঢেলার মতো শক্ত হয়ে উঠে।

'পান্তাবাত খাইয়া যাবা না ?'

'ও! হ।'

মাটির বর্তনের ভিজে চপ্‌চপে কয়েক মুঠো ভাত গোগ্রাসে গিলে লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌলত এগিয়ে যায় দিগন্ত প্রসারিত মাঠের দিকে। আমিনা বাঁশের খুঁটি ধরে এক পলকে চেয়ে থাকে সেদিকে। আর ভাবে, আব্বা অতো ভাবে ক্যান্?

'কি লো কইন্যা, চান্‌পানা মুখখান অতো মেঘ মেঘ ক্যান্?' ঝাকড়া কোকড়া চুলওয়ালা মহসীন কবিয়াল এসে সামনে দাঁড়ায়। কচি বয়েস, হলুদ ছোঁয়া গায়ের রং। এতটুকুন বয়েস থেকে মুখে মুখে গান বানিয়ে আসছে। কি সুন্দর সব গান। গাঁয়ের প্রত্যেকটি ছেলে বুড়ো ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে শোনে।

আনিমা ফিক্ করে হেসে দেয়। ছোটবেলা থেকে এক সঙ্গে বড় হয়েছে, চামচিকের মতো এ বিলে ও বিলে ঘুরে বেড়িয়েছে, পেটের ক্ষিধেয় এক সঙ্গে কেঁদেছে।

'বিজলীও য্যান্ চমকাইতাছে।'

আমিনার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে।

'তুর লাইগ্যা একখান্ চিজ্ আন্‌ছি আমিনা।' কাগজে মোড়ানো একটি বোতল দেখায় মহসীন।

আমিনা তার মিছরির দানার মতো না সাজানো দাঁত বের করে শুধোয়, 'কি?'

'তুই ক দিখিন্।'

'আলু।'

'ধ্যেৎ। তুই একখান্ আস্ত পাগলী। তেল, তেল—খশবু তেল।'

'খশবু তেল?' আমিনার চোখে বিস্ময়।

'হ। তুর মেঘের মতন চুল ছাইপ্যা খশবু ছড়াইবো আসমান থাইক্যা আসমানে ফুল থাইক্যা ফুলে।'

আমিনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। খপ্ করে মহসীনের হাত থেকে কাগজ মোড়ানো বোতলটা নিয়ে দৌড়ে পালায় ঘরের ভেতর। মহসীন চিৎকার দিয়ে হেসে ওঠে। তারপর দাওয়ায় বসে গুন্ গুন্ করে গানের কলি ভাঁজে ঃ

কইন্যা তোর আলুথালু কেশে আমি
ঝড়ের হাওয়া দেখি
ও ঝড় ভাইংগা চান্ সুরুযের
দেখুম্ ঝিকিমিকি।

আমিনা ভেতর থেকে খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে। মহসীন তার ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো দোলাতে দোলাতে আবার সুর তোলে ঃ

চাঁপা বরণ রংরে কইন্যা
পদ্মকলির মুখ
ওই মুখেতে আছে কইন্যার
ভাংগা বুকের দুখ।
কইন্যা আমার আখি তুইল্যা
আড়ে ঠাড়ে চায়
মরা মানুষ দেইখ্যা কইন্যা
ভয়েতে চমকায়।

মহসীন চোখ বন্ধ করে গেয়ে চলে। আমিনা সামনে এসে দাঁড়ায় কালো কেশে খশবু তেল ছাপিতে ওঠে, চান্‌পানা মুখটি আকাশ চন্দ্রিমার মতো উজ্জ্বল, উপোস দেওয়া শরীরের ভাঁজে ভাঁজে যেন মরাগাঙের মতো দু'কূল ছাপানো বন্যা।

কইন্যা আমার ভাতের লাইগ্যা
বুক কুডিয়া মরে
রসের যৌবন নিল ঝাপটায়
আষাঢ়িয়া ঝড়ে।

ফুলেল তেলের খশবু পেয়ে মহসীন চোখ খুলে তাকায়। আমিনার ওই কালো কুচকুচে কেশ দেখে সে মুগ্ধ হয়ে যায়। আমিনা দাঁত বের করে হাসে বলে, 'বন্ধ করলা ক্যান? তারপর?'

মহসীন নীরব। তারপরের কাহিনী মর্মান্তিক, হাজার হাজার বৌ-কন্যাদের করুণ ইতিহাস।

'তারপরে কথাডি হুন্‌লে তোর চোখ থাইক্যা পানি ঝরব।'

'ঝরুক, ডর নাই।'

'না। সময় অইলে গামু, এহন নয়।'

'কোন্ দিন?'

'যেদিন তোর কাঁচা বুকখান্ ভাইংগ্যা যাইব।'

'ধ্যেৎ। আমার বুক আবার ভাংগব ক্যান্!'

'ভাংগব, ভাংগব। ভাইংগ্যাই আছে, তুই টের পাস্ না।'

আমিনা অবাক হয়ে যায়। মহসীন এত কথা শিখল কোত্থেকে? এতটুকুন বয়স থেকে সে তা'কে দেখে আসছে। মা নেই, বাপ নেই, মাথা গুঁজবার ভিটে-ঘরটি পর্যন্ত নেই। এ বিল থেকে ও বিলে, এ পথ থেকে ও পথে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। খেয়েছে কি খায়নি সে খবর কেউ রাখে না। কেবল গান গায়, মুখে মুখে গান বানায়। গান শোনায়।

আমিনা তার ছেঁড়া শাড়ীটি দেহের সঙ্গে লেপটে ধরতে ধরতে জিজ্ঞেস করে, 'এতো কথা তুমি কোত্থইক্যা শিখ্‌লা?'

ভ্যাপসা আকাশটার নিচে পোড়ো পোড়ো ভিটে-ঘর ও মজা খালের দিকে আঙুল দেখিয়ে দেয় মহসীন।

বোকা বোকা দৃষ্টি মেলে আমিনা তাকায়, কিছুই সে বুঝল না।

'বুঝছস্ ?'

'না।'

মহসীনেব মুখে ফ্যাকাশে হাসি। ভাবে, কচি কাঁচা মন ভেঙে একদিন বুঝবে। সেদিন আর চোখের তারায় এমনটি অজানার কুয়াশা থাকবে না, বিদ্যুৎ চমকাবে, ঝলসাবে।

আমিনা মহসীনের নিষ্পলক দু'চোখ দেখে জিজ্ঞেস করে, 'কি ভাবতাছ ?'

'তর কথা, আমার কথা, ওই পোড়া পোড়া বিল্ডির কথা।'

হঠাৎ আমিনার জিজ্ঞাসা, 'আইচ্ছা আমার আব্বা কি ভাবে ?'

বিজ্ঞের মতো ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি দুলিয়ে মহসীন উত্তর দেয়, 'তর আম্মার কথা, লাঙ্গল জোয়ালের কথা, ঘরডির কথা।'

'আর আমার কথা ?'

'হ। তর কথাডিও ভাবে।'

আশ্চর্য, মহসীন মনের কথাও বলতে পারে। তাকে বড্ড ভালো লাগল আমিনার। আরো ভালো লাগে ওর কথাগুলো।

মহসীন দাওয়া থেকে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'চল্লাম। সারাডি রাইত গানে গানে কাটাইয়া দিছি, এহন ঘুমামু।'

'গান গাইছো ? কোন্হানে ?'

এপারের দিকে আঙুল নিক্ষেপ করে মহসীন বল্ল, 'ওই হান্ডায়। বিজলী বাতি আর হাওয়া গাড়ী যেহানে, হেই শহরডায়।'

আশ্চর্য চোখে আমিনা এপারের দিকে তাকায়। ভাবে, যদি পাখী হতো সে'—তবে উড়কা মেরে একবার শহরটাব চাকচমক দেখে আসতো।

'আইচ্ছা, ওই হান্ডায় মাইযা লোক কত গুলাইন্ ?'

দু'হাত প্রসারিত করল মহসীন।

'অগো সুরৎ কেমন ?'

চোখ বিস্ফারিত কবল মহসীন।

'তোমাব লগে কথা কইছে ?'

'হ।'

আমিনা গম্ভীব হয়ে গেল।

মহসীন হাসে।

তারপর পা বাড়িয়ে দেয় সে পথে। আমিনা দাওয়ার খুঁটি ধরে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

চলতে চলতে মহসীন ভাবে অনেক কথা, এপারের কথা, ওপারের কথা। শহরের কবি গানের জলসা বেশ জমেছিল। তার ওস্তাদজী করিম কবিয়াল পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, বাঃ ব্যাটা! কি জমজমাট লোক। সকলেই ওর গানের তারিফ করেছিল। দুর্ভিক্ষের গানঃ হাজার হাজার নরনারীর ব্যথিত কাহিনী। এ গান গাইতে গাইতে তার সব সময়ে মনে পড়ে জলিল মাষ্টারের কথা। একদিন পোড়া মাঠটার ধারে শুনেছিল মহসীনের গলা, তারপর দোস্তর মতো অনেক কথা বলেছিল মহসীনের কানে কানে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঢেলে দিল চোখের তারায়। এর পর থেকে মহসীন গেয়ে চলল অদ্ভুত রকমের গান। তার ওস্তাদজী ভ্রূ কুঁচকাল, পরে বুকে টেনে নিল। গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল মহসীনের নাম। আগে সে মনে করতো ভদ্দর মিঞারা ওর গান শুনে মুখ ভেংচাবে, কিন্তু গত রাত্রির জলসা তাকে সে ধারণা থেকে মুক্তি দিয়েছে। জন কয়েক ভদ্র ছোকরা এসে তাকে আবেগে জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল, আরো চাই আরো। অর্থাৎ কবিয়াল তুমি আরো কাহিনী সৃষ্টি করো, যে সব কাহিনী প্রত্যেকটি মানুষের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। ভাবতে ভাবতে মহসীন এগিয়ে চলে। অনেক গান বানাবে, গাইবে। জলিল মাষ্টার, সেলাম তোমাকে সেলাম। যেখানেই তুমি থাকো—জেলে কিম্বা হাসপাতালের মৃত্যুশয্যায়, আমার শ্রদ্ধার্ঘ তুমি নিয়ো। এই দিগন্ত পোড়ো পোড়ো মাঠ আর পোড়া মানুষদের পিঙ্গল চোখে যে আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে, সে আগুনের প্রত্যেকটি কণিকা হবে আমার কাহিনী। ভাবতে ভাবতে আবেগ মুখর হয়ে উঠে মহসীন। আমিনার কথাও তাকে ভাবিয়ে তোলে। কবুতরের মতো মেয়েটা যুদ্ধ দানবের আক্রমণে পর্যুদস্ত হাজার হাজার মেয়ের প্রতিনিধি। বুকের লজ্জা ঢাকবার জন্যে এক টুকরো কাপড় নেই, এক মুঠো ভাত নেই। চুলগুলো তেলের অভাবে রুক্ষ হয়ে গেছে, উকুনে বাসা বেঁধেছে। তবু ভালবাসবার কি আকুল ইচ্ছা। খশবু তেলের গন্ধ ছড়িয়ে মরদ জোয়ানদের স্বপ্নে দু'চোখে প্রতীক্ষা। বোকা বোকা মেয়েটা। উপোস দিয়ে দিয়ে বুকটা পাথর হয়ে গিয়েছে। জানে না, বোঝেনা—কেন তারা উপোসে রাত

কাটায়! কেন তার কুচ্‌কুচে চুলগুলোয় তেল জোটেনা? দিন দিন আমিনার এই ভাবনা মহসীনকে ভাবায়, ওর বুকের বন্যা আমিনার পোড়া বুকে বয়ে যেতে চায়।

ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলে মহসীন।

দুপুরের ইস্পাত-গরম রোদ। খাঁ খাঁ করে ওঠে মাঠ, ক্ষেত, খাল, পথ আর প্রত্যেকটি মানুষের বুক। যুদ্ধ বিধ্বস্ত, দাংগা বিধ্বস্ত এই গ্রাম। চারদিকে চাপা হাওয়া, চাপা গোঙানী।

ছনের চালাঘরের খুপড়ি খুপড়ি ভিটে-ঘর, ঘাড় গোঁজা মানুষের জীবন। যেদিকে তাকাও সমস্ত মাঠ ক্ষেতের মালিক জমিদার ইউনুস মিঞা, বিরাট জায়গা জুড়ে তার খামার ঘর। মুঠো মুঠো ধান গিয়ে উঠে সেখানে। পোড়া পোড়া মানুষগুলো ঠিকরে পড়া চোখে সেদিকে তাকায়। জমিদার ইউনুস মিঞা শহরে থাকেন, এখানকার জায়গা জমি তদারক করেন এক বেঁটে খাটো লোক। নাকটা ছুঁচোলো, এক চোখ কানা নাম কাদের মিঞা! সবাই ডরায়, নেকড়ে বাঘকে কে না ডরায়?

'এই ব্যাডা হুন্!'

কাদের মিঞা মহসীনকে দূর থেকে ডাকে।

মহসীন সামনে এসে দাঁড়ায়।

'তুই রমজান আলীর পোলা না?'

'হ।'

'থাকস্ কই?'

ভ্যাপসা আকাশটার দিকে তাকিয়ে পোড়া পোড়া ভিটে ঘরগুলির দিকে আঙুল নিক্ষেপ করল মহসীন। কাদের মিঞা পাখা বিস্তার করা ছাতাটি মাথা থেকে সরিয়ে সেদিকে তাকায়।

'কি কাম করতাছস্ এহন?'

'গান গাই।'

থুথু ফেলল কাদের মিঞা। ওর পাশে ইদ্রিস-আলী ছাগলের মতো ডাক ছেড়ে হেসে উঠল। লোকটা যুদ্ধের বাজারে মেয়ে মানুষের বেসাতি করত। সব সময় কাদের মিঞার পেছন পেছন লেগে থাকে। ধূর্ত শেয়ালের মতো চোখ। মা বোন বিচার নেই, যার দিকে চোখ পড়ে তাকেই বঁড়শিতে গেঁথে নেয়।

কাদের মিঞা ইদ্রিস আলীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'সবুর, সবুর।' তারপর মহসীনকে শুধোয়, 'কি গান করস্?'

'দুর্ভিক্ষের গান।'

'হেইডা কেমন?'

ইদ্রিস আলী ফোড়ন দেয়, 'যুদ্ধের বাজার ভাইংগ্যা দিলো আমাগো জীবন··· ওই সব।'

কাদের মিঞা চমকে উঠে।

'এ গুলাইন্ গাস্?'

'হ।'

'তবে রে'····বলেই ছাতাটা গুটিয়ে নিয়ে সেটা দিয়ে মহসীনের পিঠে সজোরে আঘাত করে। মহসীন চেঁচিয়ে উঠে, 'মারতাছেন ক্যান্?' তারপর ফস্ করে কাদের মিঞার ছাতাটি সে বাগিয়ে ধরে। ইদ্রিস আলী ঝাঁপিয়ে পড়ে মহসীনের ওপর। মাঠ ভেঙে ছুটে আসে ক্ষেত মজুররা। সবাই থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। কিলের পর কিল্, লাথির পর লাথি। ইদ্রিস আলী আর কাদের মিঞা সমানে মহসীনকে ঠেঙিয়ে চলে।

মাথা যায় ফেটে, মুখ থেকে বেরোয় সাদা সাদা ফেনা, তারপর বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে মাটির ওপর!

ক্ষেত মজুররা ভিড় জমায়। ভিড়ের মধ্যে থেকে এক জোড়া চোখ ঝলসে উঠে,—সে চোখ বুড়ো দৌলত মাঝির।

'যা—যা ভাগ।'

সবাই মাঠে গিয়ে নামে।

কাদের মিঞা ও ইদ্রিস আলী হাঁফাতে হাঁফাতে খামার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। যেতে যেতে বলে, 'খানকির বাইচ্যা। আবার যদি ও-গুলাইন গায় তো জানে খতম্ কইরা দিমু।'

ইদ্রিস আলী ফোড়ন যোগায়, 'কতো আগেই না আম্নারে কইছি, কানও দেন নাই। হক্কলডিই জলিল মাষ্টারের কাম্। হেই ব্যাডা ইস্কুল ডারে কাফেরগো আড্ডা বানাইয়া গেছে, পর্‌জা গুলাইন্‌রে যা তা তালিম দিয়া গেছে।'

কাদের মিঞা গর্জে উঠে, 'আমিও দেইখ্যা লমু। ওই ব্যাডা এহন জেইলে মরতাছে।'

'হাঁছা?'

'হ। শহরে গিয়া কি সব বে আইনী কাম করছে। আমাগো সরকার যেমন তেমন আদ্‌মী নয়, খান্‌কীর বাইচ্যারে ধইরা জেইল ভইরা দিছে।'

ইদ্রিস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ওই জলিল মাষ্টারটাকে তার বড্ড ভয় লাগত। চোখগুলি কেমন জানি আগুনের মতো ছিল ওর। যাক্ ভালোই হয়েছে, আপদ বিদেয় হয়েছে।

'চলেন হুজুর ইস্কুলডারে একবার চাক্ মাইরা যাই।'

'যাইতে হইব না। সব ঠিক আছে। নতুন মাষ্টার আমদানী করছি, হেই ব্যাডা কুত্তার মতন পা চাইট্যা থাকব, ডর নাই।'

'কিন্তুক হুজুর ওই শিরখিত গুলাইন্‌রে বিশ্বাস নাই।'

'গুলি মারো শিক্ষিত, টাকা দিলে হক্কলডিই বশ।'

ইদ্রিস আলী কিন্তু সে কথা মানতে চাইল না। জলিল মাষ্টারকেও তো টাকার লালছ দেখানো হয়েছিল, কিন্তু সে তো বশ মানেনি। সন্দিগ্ধ মন নিয়ে সে কাদের মিঞার পেছন পেছন পোষা কুকুরের মতো হেঁটে চলে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। তারপর রাত। হাজার তারার মিছিল।

ক্ষেত থেকে ফিরবার পথে ওরা সবাই মহসীনকে পথের ওপর খুঁজতে লাগল, নাম ধরে ডাকল কয়েকবার। তারপর মুখ চাওয়াচায়ি করে বিস্ফারিত চোখে ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে দিল। দৌলত মাঝি এদিক ওদিক তাকিয়ে ওদের সঙ্গে হেঁটে চলে কি যেন সে হারিয়ে ফেলেছে।

ওরা। ক্ষেত মজুররা। ফিস্ ফিস্ করে বলতে বলতে চলল ঃ

'রাড়ের দিনের গান গায় তো কি হইছে ?'

'হের লাইগ্যা মার্‌বা ক্যান্ ?'

'রমজান চাষীর ঘর খাইলা, বৌ খাইলা—আবার পোলাডিরেও ধইরা মারলা কুত্তার মতন। এতো জুলুম সওন্ যায় না।'

দৌলত কিছুই বলল না। মাথা নিচু করে সে এগিয়ে চলল।

বুকের ভেতরটায় হাজার হাজার ঝিঁঝি পোকার গোঙানী, মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা, সমস্ত শরীরটায় বিষ ফোড়ার মতো আগুন। দিঘির পাড়ে এসে হাঁফাতে থাকে মহসীন। পানির তেষ্টায় বুকটা ফেটে যাচ্ছে। হামাগুড়ি দিয়ে নামল পানিতে। আঁজলা ভরে, পানি নেয়, কাঁপতে থাকে হাত দুটো। ঢোক

গিলতেও কষ্ট হয়। পানির ভেতর জ্বলে উঠে আকাশ তারার মিছিল। টলতে টলতে পাড়ে এসে নরম ঘাসের ওপর মাথা এলিয়ে শুয়ে পড়ে সে। চোখ দুটো আকাশের দিকে নিবদ্ধ, ঝাঁকড়া, কোঁকড়া চুলগুলো মৃদুমন্দ বাতাসে দোলে। কি আশ্চর্য ওই আকাশ, কি আশ্চর্য এই বাতাস, কি আশ্চর্য ওই তারার মিছিল। মহসীনের মনে হল, ওই আকাশটার বুকে যেন হাজার হাজার অত্যাচারীতদের খুন কালো হয়ে জমাট বেঁধেছে ; মনে হল এই মৃদুমন্দ বাতাস যেন সেই সব আহতদের চাপা গোঙানী ; মনে হল ওই সব হাজার তারার মিছিল যেন হাজার হাজার মানুষের সংগ্রামোদ্যত মিছিল।

দিঘির পাড় ঘেঁষে একটা ছায়া নড়ে ওঠে। মেয়ে মেয়ে ছায়া। চুলগুলো রুক্ষ, কাঁধের ওপর আঁচলটুকু নড়ছে, মাথাটা একবার এদিকে একবার ওদিকে ঘুরছে, গলা থেকে বেরোচ্ছে একটি চাপা ডাক, 'মহসীন ! মহসীন !'

'আমিনা', মহসীন যন্ত্রণাকাতর মাথাটা তুলে ডাক দেয়, 'এই তো আমি এহানে।'

আমিনা সন্ধানী চোখে রাত্রির অন্ধকার ছিঁড়ে মহসীনের সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে। মহসীনের মাথাটা কোলে তুলে নেয়। তারপর কাঁপাস্বরে শুধোয়, 'জমিদারগো লোক গুলাইন নাহি তোমারে মাইরা ফেলাইছে ?'

'দুর পাগ্‌লী, অতো সোজা কাম্ না।'

মহসীনের কণ্ঠে উপেক্ষার সুর।

'না, না। অরা তোমারে মাইরা ফেইল্‌বো।'

'ক্যান্ ?'

আমিনা নিরুত্তর। শুধু বলে, 'জানি না।'

'তোরে কইছে কে ?'

'আব্বা।'

হেই বুঝি ছুইড্যা আইলি ?'

আমিনা নীরব।

মহসীনের ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলোতে নরম সরু আঙুল চালাতে থাকে আমিনা। ওর আঙুলগুলি খুনে খুনে চপচপে হয়ে যায়। আমিনা অস্ফুট শব্দ করে ওঠে, "খুন, ইস্ তোমারে তো মাইরা ফেলাইছে।'

মহসীন দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা দমাবার চেষ্টা করে। আমিনা হঠাৎ কোল থেকে মাথাটা সরিয়ে উঠে এক দৌড় দেয়।

'কই যাইতাছস্ ? আমিনা, আমিনা।'

আমিনা বলতে বলতে ছুটতে থাকে, 'তোমার লাইগ্যা দাওয়াই লইয়া আছি।' অন্ধকার সমুদ্রে মিলিয়ে যায় মেয়েটা।

মহসীন ছট্‌ফট্ করতে থাকে। কি বোকা মেয়েটা। খবর শুনেই বেপরদা ছুটে এসেছে। আসবে না ? মহসীন যে তার ছেলেবেলার সঙ্গী, এক সঙ্গে ক্ষিধের জ্বালায় কেঁদে উঠেছে, ইউনিয়ন বোর্ডের লঙ্গরখানায় খিচুড়ী ভাগ করে খেয়েছে।

সহস্র বৃশ্চিকের কামড়ের মতো সমস্ত দেহের যন্ত্রণায় মহসীন কতক্ষণ নির্জীব হয়ে পড়েছিল সে জানে না, যখন সে চোখ খুলল দেখল তার মাথাটা কতকগুলো ঠাণ্ডা পাতায় মোড়ানো—তার ওপর পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা কাপড়ের ন্যাকড়া। কোলের ওপর মহসীনের মাথাটা আলতোভাবে চেপে ধরে আমিনা চুপি চুপি শুধোয়, 'ক্যামন্ লাগতাছে ?'

মহসীনের কণ্ঠে উত্তর নেই। চোখের দৃষ্টি ঘনায়িত, বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল। হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আমিনা তুই আমার লাইগ্যা এতো করছ ক্যান্ ?

'জানি না।'

ওর কোমল হাত দুটি শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে মহসীন বলে, 'তুই জানস্ কিন্তু ক'স্ না।'

আমিনা নীরব। টপ্ টপ্ করে পানি টপ্‌কে পড়ে মহসীনের কপালের ওপর।

'কাঁদতাছস্ ক্যান্ আমিনা ?'

আমিনার কান্নার বাঁধ ভেঙে যায়। ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠে মেয়েটা।

'তুমি আমারে ছাইরা চইল্ল্যা যাইবা। আমি কি বুঝি না ? হক্কলডিই বুঝি। দেশে দেশে গান গাইয়া নাম কিইন্যা তুমার মাথা ঘুইরা গ্যাছে। আমার কথা একটুকাইনও ভাবো না। খালি ভাবো ওই পোড়া পোড়া বিল্‌ডার কথা, মানুষ গুলাইনের কথা।'......হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায় সেই কান্না মিশানো কথাগুলো।

মহসীন ভাবে, মেয়েটা কি বোকা! কিন্তু কি সরল! হাজার হাজার পোড়ো মানুষের কথা ভাবি—এখানে ওর অভিমান। কিন্তু ও জানে না ওকে নিয়ে শান্তিমুখর একটি স্বপ্ন দেখে মহসীন।

বিস্ফারিত বুকটা দেখিয়ে মহসীন বলে, 'এই বুকডা দেখ্‌তাছস্ ?'

'হ।'

'বুকডার তলে একটা পরাণ ধুক্ ধুক্ করতাছে না?'

'হ।'

'হেই পরাণডা যদি না রয় তাইলে বুকডা রইব কোনহানে?'

আমিনা অবাক হয়ে যায়। বোকা বোকা দৃষ্টি মেলে শুধু বলে, 'কোনহানে থাকব না, ভাইংগ্যা যাইব।'

'তুই হইলি আমার বুক, ওই পোড়া পোড়া বিলখান্ আর মানুষ গুলাইন হইল আমার পরাণ। তার লাইগ্যাই তো অগো কথা ভাবি।'

আমিনা মুগ্ধ হয়ে যায়, কি সুন্দব কথা।

'পরাণডা উইড়া গেলে বুকডা ফাইংগ্যা যাইব, তেমন আমাগো এই পোড়া পোড়া বিলডা আর মানুষ গুলাইন যদি এক্কেরে মইরা যায় তাইলে তুইও তো ভাইংগ্যা যাইবি।'

'হ।'

'তাইলে?'

'পরাণডারে বাঁচাইতে হইব।'

'হ। হ। তুই হক্কলডিই বুঝস, কিন্তুক বুঝস্ না বুইলা ভান করচ খালি।'

আমিনা আত্মসন্তুষ্টি পায়। মহসীনের মাথাটা বুকের কাছে চেপে ধরে। মহসীনের চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসে যন্ত্রণা মিশানো আবেগে।

আকাশে তখন হাজাব তারাব চোখ, অন্ধকাবের ঢেউ, চামরদোলা বাতাস।

মশালের আলো দেখে ওরা চমকে উঠে। আমিনা কোল থেকে মহসীনের মাথাটা সরিয়ে উঠে দাঁড়ায় ভীত চকিতা হরিণীর মতো মশাল হাতে দৌলত মাঝিকে দেখে, তারপর সে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে, 'আব্বা'?

দৌলত মাঝি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে মেয়ের দিকে তাকিযে বলে, 'পাইছস্? কই?'

মহসীনের শায়িত শরীরটার দিকে আমিনা আঙুল দেখায়। দৌলত মাঝি মশালের আলোয় মহসীনের চেহারাটা দেখে আঁৎকে ওঠে।

'ইস্ এক্কেরে মাইরা ফেলাইছে।'

তারপর আমিনার দিকে চেয়ে বলল দৌলত, 'ধর্ ধর্, ঘরে লইয়া চল্। এহানে খোয়া খাইয়া মইরা যাইব।'

মেয়ে বাপেতে মিলে ওরা ধরাধরি করে নিয়ে এল মহসীনকে। এনে ছেঁড়া কাঁথার বিছানা করে দিল দাওয়ায়। ঘর নেই, বাড়ি নেই, মা নেই, বাপ নেই এমন ছেলেকে এ অবস্থায় বাইরে থাকতে দেখলে কার না প্রাণ কাঁদে। দৌলত ভাবে, তা' ছাড়া দিল্ বলে তো একটা জিনিস আছে। ভাত নেই, কাপড় নেই—কিন্তু সেটা থাকতে দোষ কি ?

মহসীন সারারাত ছটফট করে কাটাল। সকালে উঠে চলে যেতে চেয়েছিল কিন্তু দৌলত যেতে দেয়নি। আমিনা এসে জোর করে তাকে শুইয়ে দিল বিছানার ওপর! খড়কুটো কুড়িয়ে এনে জেলে গরম পানির সেঁক দিতে লাগল মাথার ক্ষতস্থানে। তারপর হাঁড়ি উজাড় করে কয়েক মুঠো চাল সিদ্ধ করে খেল দুজনে মিলে। দৌলত সকালে উঠে ক্ষেতে চলে যায়, রাত্রে আসে হাঁপাতে হাঁপাতে। মজুরী যা পায়, সংসার চলে না। তবু স্বপ্ন আছে ফসলের, স্মৃতি আছে অতীতের।

মহসীনের শিয়রে বসে বক্ বক্ করে চলে, আমিনাও বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে।

'রমজানের ব্যাডা বুঝলিনি, হেইদিনের কথাডি মনে পড়লে বুকডা ফাইট্যা যায়। এই লম্বা লম্বা লাউয়েব ডগা, এই থোপা থোপা মরিচের ক্ষেত। আমিনার আম্মা যেহানে হাত দিছে, ওহান্‌ডা সোনা হইয়া গ্যাছে! এক কাণি জমিন্ আছিলো, গরু লইয়া লাঙ্গল চালাইছি তো চালাইছি, এক্কেরে ধানকে ধানে ভইরা গ্যাছে। ওই জমিন্ গুলাইন্ এহন জমিদারগো হাতে। হেইদিন লাঙ্গল চালাতে গিয়া কতোই না কাঁদলাম, মাডি গুলাইন যেন্ কাঁইপ্যা উঠল। হক্কলডিই ভোজবাজি। বুঝলিনি মরজানের ব্যাডা ?'

মহসীন মাথা দোলায়; বুড়ো দৌলত আবার বকে যায়, 'তোরা তহন্ মাডির লগে কথা ক'স্। উরে বাপরে কি যে অবস্থা। চর্‌চর্ কইরা চাইলের দাম বাইড়্যা গেলো, কাপড়ের দাম বাইড়্যা গেলো। বাজারে কি যে সোরগোল। হক্কলডির মুখে একই কথা: আমরা মইরা যামু, মইরা যামু। কথার লগে অমনে সিঁধু তাঁতির ঘরডা খাঁ খাঁ কইর‍্যা উঠল। হেই ব্যাডার জমিন নাই, ক্ষেত নাই—আছিল্ খালি ইন্দুরের বাইচ্যার মতন কতো গুলাইন পোলা। কাজ নাই, রোজগার নাই, এক্কেরে মইরা গেল ভাত ভাত

কইর‍্যা। আমরা তবু টিইকা রইলাম জমিনের জোরে। কিন্তুক পারলাম না। এহানে ওহানে গিয়া যা কিছু পাইতাম তা দিয়া সংসার চলত। এক কাণি জমিনের ধানে কি আর দশ এগারো জনের খোরাকী চলে? আব্বা আছিলো বুড়া মানুষ, আম্মা তহন কবরে, আমার ভাইগো পরিবার, আমি আর ওই আমিনার আম্মা। কি করমু, কি করমু? ভাই আইস্যা কইল, জমিন বেইচ্যা দ্যাও, দিলাম বেইচ্যা। হাঁড়ি চড়লো চুলায়, তারপর চাল নাই। কি করমু তহন? গরুডা বেইচ্যা দ্যাও—বুকডা ছাঁৎ কইর‍্যা উডল। গরুডা ত হাডে যাইবার চায় না। কি সুন্দরই ছিলো গরুডাব। আমার ডাক হুইন্যা যহন্ তহন্ ছুইড্যা আইত মাইনষের লাহান। কত্তাইন্ তাল বাহানা কইর‍্যা অইডারে দিলাম বেইচ্যা। তারপর আবার চোখ আঁধার। বুড়া বাপ্ডা রাইতের বেলায় মইর‍্যা গেল্, ফজরে উইড্যা দেহি—সারা শরীরে মাছিয়ে ভন্ ভন্ করতাছে। এমনি কইর‍্যা ভাই, ভাইয়ের জেনানা, পোলাগুলাইন্ গেল্ মইর‍্যা। সারা ঘরখান্ খাঁ খাঁ কইর‍্যা উডল। আমিনার আম্মাতো না খাইয়া না খাইয়া দড়ির মতন শুকাইয়া গেল্। বুঝলিনি রমজানের ব্যাডা, হেইদিনের কথাডি ভুলন্ যায় না। এ ঘর থাইক্যা ওঘরে, এ মাঠ থাইক্যা ওমাঠে—খালি মরণের কাঁন্দন্। কি কাঁন্দনরে বাপ্! কাঁইন্দা কাঁইন্দা কইল্জ্যাডা ছিইড়্যা যায়, তবু কাঁন্দন থামে না। শেষে আর কাঁন্দনের পানিও নাই, মুখ থাইক্যা আওয়াজও বারয়না। জমিদার ইউনুস মিঞাগো অই খামার ঘরডি তহন্ কি সুন্দর ধানে ধানে ভরতি। একদিন হক্কলডি জোট্ বাইন্দ্যা গেলাম হেইহানে অই কাদের মিঞা আমাগো লড়াইয়া ছুডল। তারপর ঘুরঘুইট্যা রাইত্যা গোলার তালা ভাইংগ্যা ঢুকলাম, লুঙ্গীবস্তা ভইর‍্যা ধান লইয়া দে ছুড। আইলাম ঘরে। আমিনার আম্মাডারে যাওনের সময় দেখছিলাম ছডফড্ করতাছে, কিন্তুক বেডি মুখ খুইল্যা কিছু কয় না। আমি ত বুঝি, আমিনা তহন্ এই একটুকাইন্ কচুর লতি, কেবল ইঁদুরের বাইচ্যার মতন চ্যা চ্যা করত। ইউনুস মিয়াগো গোলার ধান চুরি কইর‍্যা আইন্যা আমার কি খুশী। আইজ ভাত খাইমু। কিন্তুক ঘরের ভিতর ঢুইক্যা হাত বাড়াইয়া দেহি আমিনার আম্মাডি একদম ঠাণ্ডা হইয়া গেছে, আমিনা তখন চ্যাঁ চ্যাঁ করতাছিল। বেকুব বইন্যা গেলাম, হারাডি রাইত বইস্যা রইলাম অর পাশে। ফজরের সুরুয ঢুকল ঘরে। হেই সুরুযের সোনা সোনা রইদে দেখলাম আমিনার আম্মার চোখ দুইডা গেছে উইন্ট্যা।

কিচ্ছু কইলাম না, কাঁন্দলাম না পর্যন্ত। বুগের ভেতরডা য্যান্ পাথর হইয়া গেল্।'...

এই বলে দৌলত থামে। একটা চাপা কান্নার শব্দ শোনা যায়, আমিনা কাঁদছিল। মহসীন পাথরের মতো নিথর। কতক্ষণ নিস্তব্ধতা। আমিনা ঘরের ভেতর গিয়ে ঢোকে। সেখানে গিয়ে ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

দৌলত চুপি চুপি বলে ওঠে, 'বুঝলিনি রমজানের ব্যাডা, অর আম্মার কথা মনে পড়ছে। না ?'

মহসীন নীরব, তার মুখ থেকে এর কোনো জবাব আসে না। দৌলত চুপসে যায়। রাত্রির গাঢ় অন্ধকার তখন কালো মেঘের মতো হাওয়ায় জটলা পাকাচ্ছিল। একটা তারা আকাশ থেকে ধনুক তীরের মতো ছুঁড়ে পড়ল দূবে বহুদূরে। মহসীনের চোখে ঘুম নেই। যুদ্ধের আক্রমণে হাজার হাজার মানুষের বিধ্বস্ত আত্মা যেন তার চোখের তারায় এসে ভিড় জমায়।

রাত্রি পেরিয়ে ভোর। জলন্ত সূর্যটাকে দেখায় অগ্নিপিণ্ডের মতো। তার বিচ্ছুরিত অগ্নিকণায় মাটি হয় তপ্ত, খালের পানি যায় শুকিয়ে, ধান শীষ পড়ে নুইয়ে। অথচ মানুষের মুখে মুখে সূর্যের স্তব আলোর সমুদ্রে স্নাত হবার জন্যে, জীবনকে রঙে রঙে ভরিয়ে তুলবার জন্যে। কিন্তু এ জলন্ত সূর্য সমস্ত মাঠ ঘাঠ, নদী পথ, মানুষের প্রত্যেকটি হৃদয় পুড়ে ছারখার করে দিয়ে যায়! কি নির্মম, কি নিষ্ঠুর। মানুষ ভাবে, এ সূর্য ওদের স্বপ্ন কামনা নয়। তাই ওরা প্রতীক্ষায় থাকে নতুন আবেক সূর্যের।

মহসীনের মাথার ক্ষত দুদিনেই সেরে গেল। আমিনা এসে বাঁশের খুঁটি ধরে লতার মতো দাঁড়িয়ে শুধোয়, 'একডা কথা কমু ?'

মহসীন আড়চোখে তাকায়। বলে, 'ক।'

'তুমি আইজ্ কাইল্ গান গাওনা ক্যান্ ?'

মহসীনের ঠোঁটে ফিকে হাসি 'গাই না বুঝি ?'

'না।'

'তুই টের পাস্ না।'

আমিনা ক্ষেপে ওঠে। মহসীন ওকে নিশ্চয়ই বোকা বোকা মনে করে— এখানে তার অসহ্য। সেদিন রাত্রে আব্বার মুখে দুর্ভিক্ষের গল্প শুনে কতোই

না সে কেঁদেছিল, ওই পোড়ো পোড়ো মাঠটার দিকে চেয়ে কতোই না দীর্ঘ নিঃশ্বাস তার বুক থেকে বেরোয়।

আমিনার থমথমে গলাটার দিকে চেয়ে মহসীন বলে, 'রাগ করছস্?'

আমিনা কথা বলে না, মুখ ফিরায় অন্যদিকে।

কতক্ষণ নীরবতা।

মহসীন হঠাৎ ঝঁকৃড়া ঝাঁকৃড়া চুলগুলো বাঁ হাতে সরাতে সরাতে গানের কলি ভাঁজে:

গোস্সায় কইন্যার আমের মতন
গাল্খান্ পাইক্যা ওডে,
চোখের থাইক্যা বিজ্‌লী চমকায়
এদিক ওদিক ছোডে।

আমিনা ফিক্ করে হাসে।

মহসীন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আবার সুর তুলে গায়:

কইন্যা আবার হাসে যেমন
ধারাল্ করা ছুরি,
কাইড্যা কুইড্যা মনে ঢুইক্যা
বুকখান্ করে চুরি।

আমিনা ঝট্ করে এসে মহসীনের পিঠে খাড়ুর আঘাত দেয়। মহসীন খপ্ করে জড়িয়ে ধরে ওর দু'হাত। আমিনা কবুতরের মতো হাত সাপ্টায়। চুপি চুপি বলে, 'ছাইরা দাও'—

মহসীন চোখের বঁড়শী তুলে সুর ভেঁজে বলে,

ছাইরা দাওরে চেম্‌রা বঁধু
আমার মাথা খাও
চাইর দিগে হাওয়ার ঝাপটা
কুকিলার রাও।

আমিনার হাত অবশ। মহসীন ওকে বুকের কাছে টেনে নেয়। আবার কি ভেবে ওর হাত দুটো ছাড়িয়ে নেয়। বলে, 'গান হুন্‌বি?'

আমিনা হরিণের মতো চোখ তুলে তাকায়।

'নয়া একখান্ গান বানাইছি, হুন্‌বি?'

রাজহাঁসের মতো চিবুক উঁচু করে আমিনা শব্দ করে, 'হু।'

'কিন্তুক অই গান তর ভাল লাগব না।'

'খুব লাগব।'

'তাইলে হুন্'—

বাঁ হাত কানে লাগিয়ে মহসীন সুর তোলে ঃ

নছিব হায় রে হায়—

ওরে গাছ বিরিক্ষ নদী নালা পুন্ন মাসীর চান্

তোম্‌গো বুকে লুকায়া আছে হাজার বুকের গান।

হাজার বুকের গানরে নছিব হায়রে নছিব হায়

হোঁতের মতন ভাইস্যা চলে এই দুনিয়াডায়।

নছিব হায় রে হায়

ওরে আসমানের তারা ওরে আসমানের তারা

তোমার মতন জাইগ্যা রইছে মেডির মানুষেবা।

বিরিষ্টি আসে, বজর আসে

আসে ঢেউয়ের ঝড়

হক্কলডিরে রুইখ্যা রুইখ্যা খুনে ঝর ঝর।

ওরে নছিব হায়—

দুনিয়ার ইনসাফেরে ভাই বুকখান্ ফাইড্যা যায়।

মানুষ হইল এগই নদী

সায়রের জলে

দুকুল গাঙে সোনা ফলায়

জানের বদলে।.........

মহসীন একটানা গেয়ে চলে। আমিনা খরগোসের মতো কান সজাগ করে শোনে। কিছু বোঝেনা, অথচ এ টুকু বোঝে মানুষ আকাশের তারার মতো ঝড় বাদলের আঘাতে আঘাতে প্রতিদিন ঝলমল করছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ঝিঝি পোকার গোঙানী, গাছ পালার মাথায় মাথায় রাত্রি তার কালো শামিয়ানা টাঙায়। দৌলত হাঁফাতে হাঁফাতে ঘাড় নিচু করে ঘরে ফেরে, তারপর মহসীনের বাঁশীর মতো গলায় গানের সুর শুনে দাওয়ায় এসে নিস্তব্ধ হয়ে বসে।

মহসীন গেয়ে চলেছে, চোখ দুটি বন্ধ। আমিনা শোনে, দৌলতও নীরব শ্রোতার মতো বুকে হাঁটু জড়িয়ে শোনে।

নিস্তব্ধ রাত্রির সমুদ্র ভেঙে মহসীনের গানের কলি এক একটি ঢেউয়ের মতো কম্পন তুলতে লাগল চারিদিকে।

ঠিক এই সময়ে চারটি মানুষের ছায়া আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল দৌলত মাঝির দাওয়ার দিকে। এসে থামল, তারপর শব্দ করে উঠল দৌলত, হেঁই দৌলত।

মহসীনের গার থামে।

দৌলত বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিল, মহসীনের ধাক্কায় ধড়মড় করে উঠে চোখ দুটো বড় করে জিজ্ঞেস করল, 'কি ? কি ?'

ছায়া চারটি এসে উঠল দাওয়ায়। একটি মেয়ে, অন্য তিন জন পুরুষ। মেয়েটি কাঁদছিল।

আমিনা এসে মেয়েটিকে অন্ধকারে ভালো করে দেখল। তারপর বলে উঠল, 'আরে আমাগো সখিনা য্যান্। ক্যান্ আইছস্ ?' মেয়েটা আমিনার কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

'থাম্! এই হারামজাদি থাম্ কইতাছি। ছায়ার ভেতর থেকে একজন ধমকে উঠল।

দৌলত অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে এদের দিকে। মহসীন জিজ্ঞেস করে 'আমিন চাচা না ?

'হ।'

'উডি কে ?,

'মিঞাজান কালা মিঞা আর আমার মাইয়া সখিনা।'

আমিন এইটুকু বলেই হাঁফাতে হাঁফাতে বসে পড়ে দাওয়ায়।

'কিয়ের লাইগ্যা আইছ চাচা ?'

আমিন নীরব। কথা বলল কালা মিঞা।

'অই সখিনাডারে বেইজ্জতি করছে।'

'ক্যাডা ?'

'কাদের মিঞা আর ইদ্রিস আলীডা।'

এইটুকু বলেই কালা মিঞা থামল।

মহসীনের চোখ দুটো জ্বলে উঠে। ওই টুকুন মেয়ের ওপর বেইজ্জতি। উঠে দাঁড়ায় সে। মেয়েটা ডুকরে কাঁদছিল। মহসীন আবার শুধোয়, 'ব্যাপারডা খোল্‌সা কইর‍্যা কও দিখিন।'

কান্নার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা বলে চলল : সন্ধ্যার সময় নাকি পুকুর ঘাট থেকে ফেরবার সময় ইদ্রিস আলী তাকে দেখতে পায় এবং ফেউয়ের মতো পিছু নেয়। সখিনা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ভিটে ঘরে ঢুকে পড়ে। রাত্রে শোবার পর তার আর কিছু মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে, তার মুখ হাত চেপে ধরে কে যেন তাকে কোলে তুলে নিয়ে পালাচ্ছিল। ওই দুর খামার ঘরটির ভেতরে তাকে নিয়ে যাওয়া হল। ওই কাদের মিঞা আর ইদ্রিস আলী—মেয়েটা দুই হাতে মুখ চেপে ধরল, আর কিছুই বলতে পারল না সে।

মহসীনের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয় তপ্ত লাভা মিঞাজান, কালামিঞা আমিন চাচা মুখ নিচু করে বসে আছে! দৌলত অবাক, আমিনা কম্পিত।

'তুই পালাইয়া আইলি ক্যামনে?'

'পলাইয়া আই নাই, অরা আমারে খেদাইয়া দিছে।'

মহসীন আবার জ্বলে উঠল। কি বদমাইশ! প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই লাথি। কি ভেবে হঠাৎ মহসীন শালগাছের মতো থমকে দাঁড়ায়। গলায় অদ্ভুত একটা স্বর তুলে বলে, 'আমিন চাচা তুমি এহন কি করবা?'

আমিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'হেব লাইগ্যাই তো তোগো কাছে আইছি।'

মিঞাজান ও কালামিঞা মাথা দোলায়।

'পাড়ার হক্কলডি লোক এই খবর জানে?'

'না। তবে হ্যাঁ, অই দিল্লু চোরার পোলাডা কি নাম জানি অর—হ হ জইল্যা চোরা, হেরে কইছি।'

মহসীন জিজ্ঞেস করল, 'হে গ্যাছে কই?'

'জানি না। খবরডা হুইন্যা মাত্র এক দৌড়।'

মহসীন হঠাৎ বলে ওঠে, 'চল চাচা।'

আমিন চোখ পাকায়, 'কই?'

'জমিদারগো খামার ঘরে।'

মিঞাজান ও কালামিঞা আঁৎকে উঠল। আমিন চাচাও চমকে উঠে বলে, 'অগো কাছে যাইয়া কি হইব?'

'অনেক কিছু হইব?'

ওরা ইতস্তত করতে লাগল

মহসীন বলে, 'ডর নাই, অরা আমগো গিইল্যা ফেলাইব না। এদ্দিন চুপ কইর‍্যা ছিলাম বুইল্যাতো অরা আমাগো উপর জুলুম কইরা গ্যাছে।'

মিঞাজান হাবার মতো বলে ওঠে, 'কিন্তুক অগো যে দোনাইল্যা বন্ধুক আছে।'

'কিচ্ছু হইব না। চল।'

ওরা নড়ল না একটুকুও।

মহসীন রেগে ওঠে। বলে, 'চাচা যাইবা না?'

'কিন্তুক।'—

'কিন্তুক কি চাচা? তোমার মাইডারে বেইজ্জতি করছে, হেইডা তুমি ভুইল্যা গেলা?'

মেয়েটা আবার কেঁদে উঠল।

আমিন হঠাৎ বলে উঠে, 'হ—হ—যামু। চল্।'

মিঞাজান ও কালামিঞা একসঙ্গে শুধোয়, 'যাইতাছ?'

'হ। আয়। দৌলত যাইবা না?'

কোন সাড়া শব্দ নেই, দেখা গেল দৌলত আগেই দাওয়া থেকে নেমে গিয়েছে। আমিনা ও সখিনার দিকে চেয়ে আমিন বলল, 'ত'রা থাক এহানে।'

তারপর সবাই ভারী ভারী পা ফেলে এগোয় সামনের দিকে।

পথে এসে মহসীন সবাইকে বলে, 'চল ঘরে ঘরে যাইয়া হক্কলডিবে লই।'

আমিন নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'তর খুশী।'

মিঞাজান হাবার মতো সায় দেয়, 'কথাডা মন্দ নয়।'

এক একটি ভিটে ঘরের সামনে সবাই গিয়ে দাঁড়াল, আর একজন বেরিয়ে আসল, কেউ কেউ ভয়কুঞ্চিত চোখে ঘরের ভিতর পালাল। তারপব সবাই এগিয়ে চলল ভারী ভারী পায়ে।

দিঘির পথ ধরে ওরা এগিয়ে চলল। কতকগুলি ছায়া ছায়া মূর্তি। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় অন্য কতকগুলি ছায়া দেখে।

'কে?'

সেই ছায়ার ভিড় থেকে শব্দ ভেসে আসে, 'আমিন চাচানি ও?'

'হ।'

মহসীনরা এগোয়, ওদের মুখোমুখি দাঁড়ায়।

'আরে জইল্যা চোরা যে! কই যাইতাছস্?' আমিনের চোখে বিস্ময়।

জলিল চোরা বলে, 'তোমরা কই যাইতাছ ?'

'জমিদার গো খামার ঘরে।'

'হাঁছা ? আমরাও তো যাইতাছি।'

'ক্যান্ ?'

'তোমার মাইয়াডার বেইজ্জতির বদ্‌লা লমু।

আশ্চর্য। সবাই থ বনে যায়। ছিঁচকে চোর, এখানে সেখানে চুরিচামারী করে পেট চালায়। কারো ঘরে আগুন লাগলে পর্যন্ত সেখান থেকে হাঁড়ি কুটো সরিয়ে নেয়। তার মুখে এই কথা!

মহসীন এগিয়ে আসে। জলিলের কাঁধ ছুঁয়ে বলে, 'চল্।'

সবাই পা চালায়।

রাত্রি তখন মধ্য প্রহর।

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে ওদের ভারী ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল অনেকটা ঢাকের আওয়াজের মতো। খামার ঘরেব ভেতর কাদের মিঞা ও ইদ্রিস আলী চমকে উঠল, পাইক পেয়াদারাও খরগোসের মতো কান খাড়া করে দাঁড়াল।

'এতো আওয়াজ ক্যান্ ?'

ইদ্রিস পিট পিট করে তাকিয়ে উত্তর দেয়, 'হুজুর ডাকাইত।'

'ডাকাইত ?'

'হ।'

'এই জব্বর আলী, এই শহরমুলুক। লইয়া আয় আমার দোনালী বন্দুকডা, লইয়া আয়।' কাদের মিঞার গলায় উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

পাইক বরকন্দাজরা এক মিনিটে হাজির। লাঠি, বর্শা, বন্দুক। ভারী ভারী পাগুলো আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে। কাদের মিঞা ও ইদ্রিসের চোখে শঙ্কিত দৃষ্টি।

'এক কদম পা বাড়াইব কি মারবি গুলি।'

'হ হুজুর।' বিরাট গণ্ডারের মতো চেহারার জব্বর আলী হুজুরকে সান্ত্বনা দেয়।

ওরা আস্তে আস্তে খামার ঘরের উঠানে এসে দাঁড়ায়। চারদিক শান্ত সমাহিত।

কাদের মিঞা জানালা দিয়ে চোখ মেলে তাকিয়ে বলে, 'ডাকাইত বুইল্যাতো মনে হইতাছে না।'

ইদ্রিস গলা বাড়ায়। 'হ। তাইতো মনে হইতাছে।'

সারি সারি লিকলিকে ছায়াগুলিকে আবছা আবছা দেখে আন্দাজে বলে উঠে ইদ্রিস, 'এ তো আমাগো পাড়ার লোক গুলাইন য্যান্।'

'হ।'

সাহসে ভর করে কাদের মিঞা চিৎকার ছাড়ে, 'এই, তোরা কে ?'

ছায়ার মিছিলে একটা গুনগুনানি শব্দ উঠে।

জলিল হঠাৎ উঁচু গলায় প্রত্যুত্তর দেয়, 'আমরা আপনাগো পর্জা হুজুর।'

প্রজা! তাই এতো ভয়। ইদ্রিস কিন্তু আঁৎকে ওঠে। কাদের মিঞার কানে কানে বলে, 'হুজুর কুমতলব আছে।'

'আরে দুর তর কুমতলব। বন্দুকের গুঁতায় শেষ কইর‍্যা দিমু, গুলি ছাড়নতো পরের কথা।'

কাদের মিঞা বেরিয়ে আসে কাছারী ঘরের বারান্দায়।

'এত্তো রাইতে ক্যান্ আইছস্ ?'

মহসীন উঠোনের মাঝখানে এসে বুক ফুলিয়ে বলল, 'ইনসাফের লাইগ্যা।'

কাদের মিঞার ভ্রুকুটি, 'কিয়ের ইনসাফ ?'

'আমিন চাচার মাইয়া সখিনার বেইজ্জতির ইনসাফ।'

ইদ্রিস কাদের মিঞার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। চুপি চুপি বলে, 'দেখছেন হুজুর! অরা ডাকাইত থ্যাইক্যা কম না।'

কাদের মিঞার ঠোঁটে শ্লেষাত্মক হাসি, 'ইনসাফ। হাঃ হাঃ হাঃ। ইনসাফ। আইচ্ছা, খুব জবরদস্ত ইনসাফ করুম আমি। কিন্তু তোরা ক্যান্ আইছস্ ? সখিনার বাপডা আইলেতো চলত, অরে লইয়া একডা ইনসাফ করতাম আমি।'

মহসীনের নির্ভিক জবাব, 'আমিন চাচাও আইছে।'

'আইছে ? কিন্তু এত্তো রাইতে কি ইনসাফ করুম। কাইল্ ফজরে আই্ছ।'

ছায়ার মিছিল থেকে জলিল চিৎকার ছাড়ে, 'কাইল্ না আইজ্। ইনসাফ না কইর‍্যা আমরা এহান থাইক্যা সরুম না।'

কাদের মিঞার চোখ জ্বলে উঠল। কি বেয়াদব ছোকরা। 'এই কেডা তুই? কার পোলা? আয় এদিকে আয়।'

জলিল বেরিয়ে আসে ভিড় থেকে। তারপর বলে, 'আইছি হুজুর আপনের সামনেই আইছি। অত্তো ধমক দিয়া কথা কন ক্যান্?'

'চুপ বেয়াদব্।' গর্জে ওঠে কাদের মিঞা।

'চুপ করুম ক্যান্? অতো চোখ রাঙ্গানি দেখান্ কারে? মাসের মইধ্যে তিনবার আমি জেলে যাই, আমার নাম জইল্যা চোরা—আমার চৌদ্দগুষ্টি আছিল চোর আর ডাকাইত। অত্তো চোখ রাঙ্গানিতে আমি ঠাণ্ডা হমুনা। ডর দেখাইয়া দেখাইয়া আমাগো হক্কলডিই লুইট্যা নিছেন, আর চলব না ওইসব কেরামতি।'

সবাই স্তম্ভিত। কাদের মিঞা রাগে গোঙাতে লাগল বিলিতি কুকুরের মতো।

'এই চুপ্।'

'চুপ কইর‍্যা কইর‍্যাইতো আছিলাম এদ্দিন্। এহন আর চুপ করুম না। শহরডায় গিয়া হক্কলডিই বুইঝ্যা ফেলাইছি আমি। আইজ্ আমিন চাচার মাইডার বেইজ্জতি করছেন, কাইল্ ডজন ডজন মানুষ মাইরা ফেলাইবেন—এ য্যান মেডির পুতুল পাইছেন।' উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে জলিল, মহসীন এসে বাধা দেয়।

'ছাইরা দাও মহসীন ভাই, আমারে কথা কইতে দাও।' তারপর কাদের মিঞাব সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, 'ক্যান্ বেইজ্জতি করবেন? এত্তোটুকাইন মাইয়া। আপ্নেব মাইয়াতো অর লাহান হইছে। ক্যান্? ক্যান্?'

কাদের মিঞা পোড়া ইস্পাতের মতো লাল হয়ে ওঠে।

'ছোডলোকের বাইচ্যা, টুঁটি চিপটা ধরুম।'

'হ, আমরা ছোডলোকের বাইচ্যা আর আপনে পীরজাদার ছাওয়াল। লাথি খাইয়া খাইয়া আমাগো বুকডা কালা হইয়া গ্যাছে তাই আমরা ছোডলোক আর আপ্নে কচি একখান মাইয়ার বেইজ্জতি কইর‍্যা পীরজাদা বইন্যা গ্যাছেন।'

ছায়ার মিছিল স্তম্ভিত। দিল্লু চোরার পোলা বলে কি? সবই সত্যি কথা। এতো কথা সে কোত্থেকে শিখল?

'চুপ্ হারামজাদা।' কাদের মিঞা ফোঁস করে ওঠে।

'ক্যান্?'

'এই জব্বর আলী মার্ গুলি, মার।'

গুড়ুম করে গুলি গর্জে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। ছায়ার মিছিল মৌচাকে ঢিল পড়ার মত এলোমেলো। কেউ দৌড়ে পালায়, কেউ সামনে এগোয়। কাদের মিঞা কাছারীঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, ইদ্রিস অনেক আগেই উধাও। পাইক ও বরকন্দাজরা লাঠি উঁচিয়ে নেমে পড়ে উঠানে। খুনের দরিয়ায় উঠোনটা ভিজে চপ্চপে হয়ে যায়।

ছায়ার মিছিল উধাও। জলিলকে কাঁধে নিয়ে মহসীন টলতে টলতে দৌলত মাঝির দাওয়ায় এসে হাজির। আমিনা ও সখিনা দৌড়ে আসে, হাতে তেলের ঢিবে।

'আয় বাপ্ এত্তো খুন!!' ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর।

জলিলের বুকটা সম্পূর্ণ থেঁৎলে গেছে, একটা গুলি ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কাৎরাচ্ছে। হয়ত কিছুক্ষণ পর প্রাণটা উড়ে যাবে।

আমিন, মিঞাজান দৌলতমাঝি, কালু মিঞা, শেখ করিম—পাড়ার অন্যান্য চাষী মজুররা এসে ভিড় জমায়। যারা পালিয়েছিল, তারাও এসেছে। সমস্ত গাঁ উজাড় করে লোক আসতে লাগল ব্যাপারটা জানবার জন্যে। খামার ঘরের বন্দুকের আওয়াজটা ইতিমধ্যে সকলকে জাগিয়ে তুলেছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে আসল এদিকে। ছেলে বুড়ো জোয়ান সবাই এল। রাত্রি তখন শেষ প্রহর।

জলিল যেন বিড়বিড় করে কি বলে যাচ্ছে, সবাই কান পেতে শুনল।

'আমিন চাচা, তোমার মাইয়াডির বেইজ্জতির ইনসাফ না কইর‍্যা ছাড়বা না। হারামজাদা কত্তো আর গুলি ছাড়ব। আমরা হক্কলডি খেইপ্যা গেলে অর ফসফসানি একদিনেই খালাস। না হয় দুই একজন মরুম, কিন্তুক হাজার জন তো বাঁইচ্যা যাইব। চুপ কইর‍্যা থাকলে তোমাগো কুত্তা বানাইয়া ছাড়ব।'

ঢেকুর তুলে তুলে জলিল বলছিল কথাগুলি। আবার বলতে লাগল, 'আমি হইলাম চোরের পোলা চোর। তোমরা ভাবতাছ এই ব্যাডা কয় কি! কিন্তুক ওই-ওই বিলের ওপারে ওই শহরডা আছে না।'

সবাই তাকাল মাঠের এপারের দিকে।

'ওই হানডায় যাইয়া আমি দেইখ্যা আইছি ওই কাদের মিঞাগো মতন লোকগুলাইনের লগে আমাগো মতন লোকের কি লড়াই!'

সবাই অবাক হয়ে যায়।

'হ, হ, চাচা। আগে মনে করতাম খোদায় আমাগো দেবাইল্যা বানাইছে, কিন্তুক এহন হে ভুল ভাইংগ্যা গেছে। কাদের মিঞাগো মতন লোকগুলানই আমাগো দেবাইল্যা বানাইছে। বিশ্বাস যদি না করো ওই শহরডায় গিয়া দেইখ্যা আসো। আমাগো মতন লিকলিক্যা শরীর লইয়া দিনকে দিন, রাইতকে রাইত বাঁচনের লাইগ্যা আওয়াজ তুলতাছে। কত্তো লোক মরতাছে, কত্তো লোক জেলে যাইতাছে। কিন্তুক একদিন দেখবা চাচা, ওই লোকগুলাইনই দুনিয়াডার মালিক হইব।'...... এই বলে আস্তে আস্তে জলিলের গলার স্বরটা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেল। নিঃশ্বাস গেল বন্ধ হয়ে। মহসীনের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা জল।

সবাই কান পেতে শুনল। অবাক, বোবার মতো। চোরের ছেলে চোর। কিন্তু কি আশ্চর্য সব কথাগুলো বলে গেল, কেউ কোন দিন ভাবে নি। সবাই চেয়ে রইল মাঠের ওপারের দিকে। তাদের মতো কতকগুলো লোক নাকি ওপারে লড়ছে, মরছে, বাঁচার আওয়াজ তুলছে।

রাত্রি তখন শেষ হয় হয়। সবাই আকাশের দিকে তাকায়। মনে হয় এপারের অনেকগুলো চোখ ভোরের সূর্য প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুনছে।

কয়েকটি লাল ফুল

সিরাজুল ইসলাম

দুপুর বেলাটা আম্মা ঘুমিয়ে পড়তেই চুপি চুপি সতর্কভাবে ছাদে উঠে এলো রাজু। সারাটা সকাল খাঁচায় আবদ্ধ পাখির মত ঘর ছেড়ে না বেরুতে পেরে মনটা ওর হাঁপিয়ে উঠেছে। অন্যান্য দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হেসে খেলে ছুটোছুটি করে কাটিয়ে দিতো আর তাতে আম্মাও বাধা দিতেন না। দিনটা যে কেমন করে নিঃশব্দে হামাগুড়ি মেরে মেরে চলে যেতো তা সে টেরই পেতো না। আজ এ বন্দী-জীবনের প্রহরগুলো যেন কিছুতেই কাটতে চায় না, কেমন যেন নীরস একঘেয়ে লাগে। রাজুর অন্তরে শুধু বাইরে ছুটে বেরিয়ে যাবার দুর্বার বাসনাই ঘুরে মরছে কেঁদে কেঁদে। দুঃখে বেদনায় আর অভিমানে বারে বারে দু চোখ ভরে জল আসে, বারে বারে মনে প্রশ্ন জাগে কেন আম্মা আজ বাইরে যেতে দিলেন না। কি এমন ক্ষতিটা হবে বাইরে গেলে! পাশের বাড়ীর টুকু মিন্নু ওরা তো সকাল থেকে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ এমন একটা দিনে শুধু রাজুই একমাত্র ঘরের সঙ্কীর্ণ দেয়ালের গণ্ডীতে বন্দী হয়ে রইলো। ছাদের কার্নিশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রাজু তাকিয়ে রইলো বড় রাস্তাটার দিকে। রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই হয়, শুধু দু'একটা ভবঘুরে কুকুর এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে নিতান্ত অসহায়ের মত। গাড়ী ঘোড়ার চিহ্ন নেই কোথাও। দুপুরের দুরন্ত রদ্দুরে দূর থেকে বড় রাস্তাটাকে নিশ্চল মৃতপ্রায় অজগরের মত দেখাচ্ছে। রাজু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো বড় রাস্তাটার দিকে।

সকাল থেকে বাইরে বেরুবার জন্যে কত অনুরোধ কত কান্নাকাটিই না রাজু করেছে তবু আম্মার পাষাণ মন গলেনি, একটুও টলেনি। আজই রাজু

অনুভব করতে পারলো আম্মা তাকে ভালবাসে না, আদর সোহাগ সবই বাইরের নিষ্প্রাণ একটা খোলশ মাত্র। ভাবতে ভাবতে গুম হয়ে বসে রইল রাজু। আম্মার উপরে রাজুর মনটা বিরূপ হলেও কেমন যেন সম্পূর্ণভাবে বিরূপ হচ্ছে না। আম্মাও তো সকাল থেকে এ পর্যন্ত দু' একটা কথার বেশী বলেননি। কেমন যেন স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন।

আম্মার বেদনাভারাক্রান্ত শুকনো মুখটাই রাজুর মনে পড়েছে বারবার। শুধু আম্মা নয় আব্বাও কেমন যেন থমকে থমকে কথা বলছেন। সকালে ঘুম ভাঙতেই রাজু শুনলো আব্বা আম্মাকে বলছেন, আজ যেন রাজু ঘর ছেড়ে বাইরে না যায়। সাবধানে থাকবে।

আব্বার কথার কোন অর্থই উদ্ধার করতে পারেনি রাজু। আব্বার কথা শুনতে পেয়ে মুহূর্তে মন ওর খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তবু আম্মার সম্মুখে সাহস করে মুখ থেকে একটি শব্দও বের করেনি। আম্মাকে একটু আড়ালে পেয়েই রাজু বলল, আব্বা বাইরে যেতে নিষেধ করলেন কেন আম্মা? বাইরে গেলে কী হবে? পাশের বাড়ীর টুকু মিন্টু ওরা তো বাইরে বেরুবে আম্মা।

আম্মা রাজুর কথাটা শুনেও শোনেন নি এমন একটা দৃষ্টিতে তাকালেন রাজুর দিকে। রাজু আবার বলল, বলনা আম্মা। আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?

—আঃ, কি বিরক্ত করছিস। যা ঘরে গিয়ে পড়তে বস। শুনলি না উনি বাইরে যেতে নিষেধ করলেন।

রাজু আম্মার কথা শুনে অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, হু। বাইরে গেলে কি হবে?

রাগে দুঃখে রাজুর দু চোখ ভরে জল এলো। চোখের জলকে কোন মতে চেপে রেখে ঘরে এসে বসে রইলো সে।

অনেকক্ষণ পর আম্মার ডাক শোনা গেলো, রাজু চা খেয়ে যা।

রাজু হাঁ-বা-না কিছুই বলল না। চুপ করে বসে রইলো। না চা সে খাবে না। কিছুই খাবে না সে। না খেয়ে মরে যাবে। মরলেই আম্মা সুখী হবেন। টুকু মিন্টু ওরা রাস্তায় রাস্তায় ছুটোছুটি করে বেড়াবে আর সে কিনা আঁতুড়ের মত ঘরে বসে থাকবে। কেন সে ঘরে বসে থাকবে? বাইরে সে যাবেই, এক'শ বার যাবে দু'শবার যাবে। রাজু মনে মনে আঘাত-খাওয়া সাপের মত ফুলতে লাগলো। আম্মা ঘরে এসে রাজুকে গালে হাত দিয়ে

বসে থাকতে দেখে অবাক হলেন, কিরে চুপ করে বসে রইলি যে? খাবি না?

রাজু কোন রকম সাড়াই দিলো না, নিশ্চল পাথরের মত বসে রইলো।

—কিরে কথা বলছিস না যে! কি হলো? চা খাবি না?

—না।

—কেন?

—এমনি।

—ও রাগ হয়েছে বুঝি! চা খাবি আয়।

আম্মা এগিয়ে এসে রাজুর ছোট্ট হাত দুটো চেপে ধরলেন। রাজু এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, ছেড়ে দাও, আমি কিচ্ছু খাব না। আমার দু চোখ যেদিকে যায় চলে যাব।

—ছিঃ! এসব কি কথা। দিন দিন তুই বড্ড একরোখা হচ্ছিস। আয়।

আম্মার টানাটানিতে শেষ পর্যন্ত রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

অন্যান্য দিন আব্বা আম্মা সবাই একসাথে নাস্তা করতে বসেন, কিন্তু আজ চলতি নিয়মের ব্যতিক্রম দেখে রাজু অভিমান করে আর নিশ্চুপ থাকতে পারল না।

—তুমি নাস্তা করবে না আম্মা? আব্বা নাস্তা করবেন না?

—না বাবা, আজ খিদে এখনো লাগেনি।

—বারে, সবদিন তো এমনি সময়েই নাস্তা কর।

—তুই খা, আমাদের জন্যে ভাবিসনে।

—না। তোমরা না খেলে আমি কিছুতেই খাব না।

—ছিঃ বাবা। ছেলে মানুষি করতে নেই। খেয়ে নে আমরা পরে খাচ্ছি।

আম্মার কথা শুনে চমকে উঠল রাজু। আম্মার কথায় কিসের যেন অব্যক্ত একটা কান্নার সুর মেশানো। রাজু কথা কাটাকাটি না করে নীরবে নাস্তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। নাস্তা করতে করতে আম্মার মুখের দিকে চোখ পড়তেই আচমকা চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠল রাজু। একি! আম্মার চোখে জল! আম্মা কাঁদছেন!

—কি হলো আম্মা, কাঁদছো কেন?

রাজুর কথা শুনে চকিতে শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে আম্মা বললেন, কিছু হয়নি। তুই খা।

—হুঁ—উঁ—বলনা আম্মা কি হয়েছে।

—বলছি তো কিছু হয়নি। চোখে যেন কি একটা পড়লো তাই পানি পড়ছে। আর চোখেরও বা দোষ কি, বয়েসও তো হয়েছে।

—যাও, শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলছো!

—না বাবা, মিথ্যে নয়। তুই খা।

রাজু কোনরকমে নাস্তা খাওয়া শেষ করলো ঠিকই তবু ওর মনে কাঁটার মত খচ খচ করতে লাগলো আম্মার কথাটা। কেন আম্মা কাঁদলেন এ প্রশ্নের জবাব সে পেলো না। রাজু চুপি চুপি লক্ষ্য করলো আব্বা আম্মা দুজনেই আজ নাস্তা করলেন না। অফিসেও আব্বা না খেয়েই গেলেন। রাজু আম্মাকে খাবার জন্যে কত সাধাসাধিই না করছে কিন্তু আম্মা পানিটুকু পর্যন্ত স্পর্শ করেননি। ছাদের কার্নিশে বসা একটা কাক কর্কশভাবে ডেকে উঠতেই রাজুর সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে তালগোল পাকিয়ে গেলো।

ঘরের বাইরে বেরুতে না পারার দুঃখটা আম্মার না খাওয়ার কথা ভাবতেই অনেকটা হালকা হয়ে গেল। এবারে রাজু স্পষ্ট বুঝতে পারলো আম্মা সত্যিই ভালবাসে, আদর সোহাগ জানায়। রাজুর চোখে জল দেখলে আম্মারও বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে। আম্মার জন্যে রাজুর মনটা কেঁদে উঠলো। ইস, আম্মা আজ এককণা দানাও মুখে দেননি! রাজু ছাদ থেকে আস্তে আস্তে নেমে আম্মার ঘরে এসে—আম্মাকে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখে চমকে উঠলো। আম্মা তাহলে ঘুমোননি শুধু মরার মত বিছানায় শুয়েছিলেন! আম্মা এখনো নীরবে চোখের জল ফেলছেন! নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদছেন! রাজু নিঃশব্দে আম্মার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো তারপর ছোট্ট হাত দুটো দিয়ে আম্মাকে জড়িয়ে ধরলো। আম্মার চোখে জল দেখে রাজুর চোখেও জল টলমল করছে। অব্যক্ত ব্যথায় চিন চিন করে উঠলো রাজুর বুকটা। আম্মা রাজুর স্পর্শে চমকে উঠলেন। তারপর গভীর আবেগে নিবিড়ভাবে বুকে চেপে ধরলেন রাজুকে। রাজু কিছুই বুঝতে পারছে না। সবই অদ্ভুত বেখাপ্পা ঠেকছে। আম্মা চোখের জল মুছে বললেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলিরে?

—ছাদে ছিলাম আম্মা।

—ছাদে! দুপুর রদ্দুরে ছাদে কেন?

—এমনি।

—ছুর পাগলা ছেলে কোথাকার।

তারপর অনেকগুলো প্রহর নীরবে কাটলো। কারো মুখে কথা নেই। ঘরের দেয়ালে দেয়ালে মাথা কুটে মরছে একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। রাজু এবারে ভালো করে আম্মার মুখের দিকে তাকালো। ইস, আম্মার মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে নীল হয়ে গেছে। কালো দাগ পড়েছে চোখের কোণে।

কি হলো আম্মার।

—আম্মা!

—কিরে?

—তুমি তো কিছুই খেলে না। আর তুমি শুধু শুধু কাঁদছো কেন আম্মা?

—এমনি কাঁদছি রে।

—হুঁ—উঁ—এমনি বুঝি কাঁদে। বল না আম্মা। তোমার কান্না দেখে আমারও যে কান্না পাচ্ছে।

—ছিঃ, ওকি কথা। তুই কাঁদবি কেন?

আম্মা প্রাণপণে অন্তরের বেদনাকে চেপে রাখতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু এবারে সব চেষ্টাই বুঝি ব্যর্থ হতে চলেছে।

—ছিঃ, কাঁদছিস কেন রাজু। আজকের দিনে যে কাঁদতে নেই বাবা। কাঁদলে যে গুণা হবে।

রাজু অদমিত কান্নাকে চেপে রেখে চোখ মুছতে মুছতে বললো, তবে তুমি কেন কাঁদছিলে আম্মা?

—আমি—আমি কাঁদছি তোর হাসু ভায়ের জন্যে।

—হাসুভাই!

হাসুভায়ের নাম শুনে মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল রাজু। অকস্মাৎ গুরুতর একটা আঘাত এসে ওর ছোট্ট বুকটাকে যেন দুমড়ে-মুচড়ে দিলো। হাসুভাই অর্থাৎ হাসেম ভাইয়ের কথা তো সে ভুলেই গিয়েছিল। হাসুভাইকে এত শিগগীর ভুলে যাওয়ার জন্যে লজ্জায় দুঃখে মুষড়ে পড়লো রাজু। এবারে সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো কেন আব্বা আম্মা খাননি। কেন আম্মা কেঁদেছেন। আম্মাও রাজুকে কথাটা বলে অনুতপ্ত হলেন। নিজের অন্তরকে বারংবার ধিক্কার দিলেন সাময়িক দুর্বলতার জন্যে। ছিঃ, ছিঃ, একি করলেন তিনি। হাসুর কথা শুনলে রাজুর শিশুমনে গুরুতর আঘাত লাগবে—এরই জন্যেই তো আম্মা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন কথাটাকে চেপে রাখতে। কিন্তু একি সর্বনাশ করলেন তিনি!

হাসুভায়ের কথা একের পর এক রাজুর শিশু মনে ভেসে উঠতেই চোখের জল কোন প্রতিবন্ধকতাই মানলো না—বন্যার জলের মত তীব্র ধারায় গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো। রাজু কিছুতেই কান্নাকে চেপে রাখতে পারছে না। ক্রমশঃ কান্নার গতি বেড়েই চলেছে। আম্মাও অবরুদ্ধ কান্নার বন্যায় ভেসে গেলেন। কান্নাকে চেপে রাখবার সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হলো। অনেকগুলো নির্বাক প্রহর নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলো।

আম্মা রাজুর কান্না দেখে নিজেকে অতিকষ্টে সামলে নিয়ে বললেন, ছিঃ, আজকের দিনে কাঁদতে নেই বাবা। কাঁদিস নে।

হাসুভায়ের কথাটাই বার বার রাজুর মনে পড়তে লাগলো। আজ থেকে ঠিক একবছর আগে এমনি একটা দিনের কথাই রাজুর অন্তর-আসমানে ঘুরপাক খেতে লাগলো। হাসুভাই সেদিন সকাল হতেই তাড়াহুড়ো করে চা-নাস্তা-খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে পড়বার জন্যে তৈরী হলো। হাসু-ভাইকে বাইরে বেরুতে দেখে আম্মা বললেন, এতো সকালে কোথায় বেরুচ্ছিস। আজ শহরে কি সব গোলমাল হতে পারে। আজ ঘরের বাইরে যাসনে।

হাসু আম্মার কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলো, ও তুমি কিছু ভেবো না আম্মা। শহরে আজ কিছুই হবে না!

—নারে আজ বাইরে যাসনে। আমার মনটা কেমন যেন করছে।

—তুমি একেবারে ছেলেমানুষ আম্মা। আমি কি এখনো কচি খোকা না কি যে, ভালোমন্দ কিছুই বুঝতে পারি না।

আম্মা আর কিছুই বলেননি। বলবারই বা কি আছে। ছেলে বড় হয়েছে লেখাপড়া শিখেছে ওকে আর কি বলা যায়। হাসু বেলা ন'টা বাজতেই চুপি চুপি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেই রাজু ওকে দরজার সামনে ধরে ফেললো।

—কি হাসুভাই চুপি চুপি পালানো হচ্ছে বুঝি। আম্মাকে বলে দেবো কিন্তু।

—আম্মা

—চুপ কর বোকা। পালাচ্ছি না। এক্ষুনি চলে আসবো। আসবার সময় তোর জন্যে ভালো ভালো লজেন্স আনব দেখিস। আর জানিস আজ আমাদের বিরাট মিছিল হবে। তুই ছাদে দাঁড়িয়ে দেখবি। খুব মজা হবে দেখিস।

—হুঁ—উঁ—তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

—ছিঃ, ছেলে মানুষি করে না রাজু। এক্ষুনি চলে আসব বলছি। আর শোন, আমাদের মিছিলটা যাবার সময় ছাদ থেকে তুই ফুল ছড়াবি। বুঝলি? দেখিস কত হাততালি পাবি। কত ছেলে তোর দিকে তাকাবে, হাসবে। খুব মজা হবে। যা ঘরে গিয়ে খেলগে।

হাসুভাই সেই যে গেল আর ফিরে এলো না। এই তার শেষ যাওয়া। বিকেলে বুকভাঙা খবর এলো। আম্মা তো খবর শুনে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। আব্বা কিছুই বলতে পারলেন না, ব্যথায় বেদনায় আকস্মিক আঘাতে স্তব্ধ পাষাণ হয়ে গেলেন। রাজুও কিছুই বলতে পাবলো না। একি হলো! হাসুভায়ের একি হলো! হাসুভায়ের রক্তাক্ত বিকৃত মৃত দেহটাকে দেখে রাজু সহজেই এ অপমৃত্যুকে স্বীকার করে নিতে পারলো না। চঞ্চল প্রাণ সদা হাসিখুশি মাখা হাসুভায়ের সে প্রাণ-চাঞ্চল্য গেলো কোথায়? রাজু পরে শুনেছিলো হাসুভাই নাকি মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন। পুলিস মিছিলের গতিকে থামিয়ে দেবার জন্যে এগিয়ে এলো, হাসুভাই এগিয়ে গেলো সমস্ত বাধা বিপত্তিকে তুচ্ছ করে। তারপরই পুলিসের বুলেটের আঘাতে হাসুভায়েব বুকের পাঁজরগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। হাসুভাই নাকি মরতে মরতেও বলেছিলেন, ভাইসব এগিয়ে যাও। ভাষার দাবিকে আমাদের হাসিল করতেই হবে।

রাজুর স্পষ্ট স্মরণ আছে হাসুভাই চলে যাবার পর মিছিলে ফুল ছড়াবার জন্যে কত কষ্ট স্বীকার করে ফুল সংগ্রহ করেছিলো, কিন্তু সে-ফুল আর দেওয়া হলো না। ঘরের কোণে পড়ে দিনের পর দিন শুকিয়ে কবে যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সে-খবর কেউ জানে না।

রাজু মরার মত আম্মার কোলে পড়ে রইলো। আম্মাও স্তব্ধ পাষাণের মত বসে আছেন। চোখে তার অশ্রুর বন্যা। আম্মার অন্তর-আসমানে ব্যথা-বেদনার অশান্ত ঝড়। সে ঝড়ের ঝাপটায় চারাগাছের মত আম্মা কাঁপছেন। কতক্ষণ এভাবে কাটলো কে জানে। অকস্মাৎ কিসের একটা সমবেত গর্জনে আম্মা চমকে উঠলেন, ও কিরে, কিসের শব্দ ওটা?

রাজু কান পেতে শুনলো। কিছুই সে বুঝতে পারলো না। কিসের শব্দ ওটা!

—বাইরে দেখে আসব আম্মা?

—না বাবা, ছাদের ওপরে গিয়ে ছাখ।

—আচ্ছা।

আম্মাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। যাক সাময়িকভাবে হাসুকে হয়তো রাজু ভুলতে পারবে। রাজু দৌড়ে ছাদে উঠলো। একি! বড় রাস্তার মোড়ে এত লোকের ভিড় কেন! লোকগুলো আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। হাতে ওদের কালো পতাকা। বাতাসের আঘাতে কালো পতাকাগুলো এক ঝাঁক কালো পায়রার মত উড়ছে। শুধু মানুষের মুখ আর মুখ। অসংখ্য মুখে বড় রাস্তাটা জমজমাট হয়ে আছে। রাজু এবারে বুঝতে পারলো এটা মিছিল। মিছিলের লোকগুলো চীৎকার করে উঠলো, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। রাজবন্দীদের মুক্তি চাই। শহীদ স্মৃতি অমর হোক।

রাজু অন্তরের বেদনা যেন মুহূর্তে অনেকটা হালকা হয়ে গেলো। মিছিলটা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। রাজু ছাদ থেকে চীৎকার করে উঠলো, আম্মা —আম্মা গো, দেখে যাও। ও আম্মা, এসো না এদিকে।

—কিরে চেঁচাচ্ছিস কেন রাজু?

—এদিকে এসে ছাখই না।

রাজুর ডাকে আস্তে আস্তে আম্মা ছাদে উঠে এলেন। রাজু মিছিলটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, ছাখো আম্মা।

আম্মা দেখলেন। শত শত মুখ নির্মেঘ দিনেব তীব্র রদ্দুরের আঁচে লাল। বিন্দু বিন্দু ঘাম ওদেব মুখে। শ্রান্ত ক্লান্ত হলেও ভেঙে পড়েনি ওরা। এগিয়ে যাবার দুর্জয় বাসনা যেন ওদের হৃদয়ে ছাই-চাপা আগুনের মত জ্বলছে। আম্মা মিছিলটার দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন।

আম্মার বুকটা আবার তীব্র ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো। হাসু বেঁচে থাকলে হয়তো সেও এমনি মিছিলে সামিল হয়ে এগিয়ে যেতো। রাজুও আম্মার মত বিস্ফারিত নেত্রে দেখছে মিছিলটাকে। মিছিলটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফেলে আসা দিনের ছোট্ট একটি কথাই মনে পড়লো রাজুর। হাসুভাই বলেছিলো, আমাদের মিছিলটা যাবার সময় তুই ছাদ থেকে ফুল ছড়াবি, বুঝলি?

—আম্মা।

—কিরে?

—ছাদ থেকে মিছিলে ফুল ছড়িয়ে দেবো আম্মা?

আম্মা রাজুর কথাটা বুঝতে না পেরে বললেন, হঠাৎ তোর এ খেয়াল হলো কেন রে।

—দেবো কিনা বল না।

—আচ্ছা দে। কিন্তু ফুল পাবি কোথায়?

—কেন মিনুদের বাড়ীতে তো রয়েছে।

—আচ্ছা যা, শিগগীর আসিস—নয়তো মিছিল চলে যাবে।

রাজু প্রাণপণ শক্তিতে মিনুদের বাগানের দিকে এগিয়ে গেলো। বাগানের ভিতর যেতেই রাজুর নজরে পড়লো গাছে একটি ফুলও নেই, শুধু লাল জবা ফুল রয়েছে কয়েকটা। রাজু তাই ছিঁড়ে নিয়ে দৌড়ে বাড়ীর দিকে চললো। ছাদে এসে দাঁড়াতেই দেখলো মিছিলটা ওদের বাড়ীর দরজার সম্মুখ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। রাজু চলন্ত মিছিলটার উপর ছেড়ে দিলো লাল জবা ফুল ক'টা। ফুলগুলো মিছিলে পড়তেই শত শত কণ্ঠের আনন্দ-মুখর শব্দ আর হাত-তালিতে মুখরিত হয়ে উঠলো আকাশ বাতাস। রাজুর ঘামে-ভেজা ছোট্ট মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো আনন্দে আর উত্তেজনায়। আম্মা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মিছিলটার দিকে। লাল জবা ফুলগুলো দেখে আম্মার মনে হলো ফুলগুলো যেন হাসুর বুকের খুনে লাল হয়ে গেছে।

রাজু অকস্মাৎ চীৎকার করে উঠলো, দ্যাখো মা, ওই ছেলেটা ঠিক হাসুভায়ের মত দেখতে। না মা?

আম্মা দেখলেন। হ্যাঁ, ছেলেটার মুখের সঙ্গে হাসুর মুখের আশ্চর্য সামঞ্জস্য রয়েছে। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আম্মার মনে হলো মিছিলের প্রতিটি মুখেই যেন হাসুর মুখের ছাপ। মিছিলটা আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলো। আম্মার হৃদয় অপূর্ব অনুভূতির দোলায় দুলছে। ওরা তাহলে হাসুকে ভুলে যায়নি। হাসুর বেদনা কাতর মুখটা হয়তো মিছিলের লোকগুলোর হৃদয়ে জ্বলজ্বল করছে। রাজু অবাক হয়ে দেখলো আম্মার মুখটা খুশীতে ঝলমল করছে, কিন্তু আম্মার চোখে অশ্রুর বন্যা।

—তুমি আবার কাঁদছো আম্মা?

—না বাবা কাঁদিনি।

—তবে তোমার চোখে পানি কেন?

—পানি! পানি কোথায় দেখলি। বোকা ছেলে!

গভীর আবেগে রাজুকে বুকে চেপে ধরলেন আম্মা। রাজু হাতের ছোট্ট আঙুলগুলো দিয়ে মুছে দিলো আম্মার চোখের পানি। তারপর নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরলো আম্মাকে।

মোড়ল মাঝির নাতনী

শাহেদা খানম্

মোড়ল মাঝির নাতিনের গল্প আমার আগেই কিছু শোনা থাকলেও এই প্রথম ওকে দেখলাম। পরনে বাসন্তী রঙে ছোপানো শাড়ী, সাধারণ সাঁওতাল মেয়েদের চাইতে পাতলা আর লম্বা।' চুলও ওদের নিয়মমত টেনে টুনে ঝুঁটি বাঁধা নয়। দিব্যি বব্‌ড্‌ হেয়ার, তাতে ফুলও আছে আবার লাল ক্লিপও। পায়ে জুতা, যা ওদের পায়ে কখনো দেখিনি।

আমি ওদের নাচ দেখার জন্যে এসেছি, একটা দড়ির চারপাইতে আমাকে বসিয়ে মোড়ল মাঝি উঠে গেছে ওই মেয়েটির কাছে। গেছে তো গেছেই, কি যে নিজেদের ভাষায় বলাবলি করছে তা আর শেষ হচ্ছে না। মধ্যে মধ্যে মোড়ল মাঝির গলার আওয়াজ পাচ্ছি, তা শুনে মনে হচ্ছে না যে আলোচনাটি খুব প্রীতিকর। একটু পরে মুখ থেকে একগাদা থুতু ছিটিয়ে মোড়ল এসে আমার চারপাইটার একপাশে বসল।

জিজ্ঞাসা করলাম—'কার সাথে ঝগড়া করছিলি মোড়ল মাঝি? কে মেয়েটা?

'আর বুলবেন না দিদি, হামার নাতনী আছে, কুসমী গো।'

যদিও মোড়ল মাঝির মেয়ে ছিল না একটিও আর একটি মাত্র ছেলে জোয়ান বয়সেই মারা গেছে বহুদিন, তবু মোড়ল মাঝির নাতি আর নাতিনের সংখ্যা অসংখ্য।

'তা নাতিনের সঙ্গে ঝগড়া করলি কেন?'

'কুসমী নাচ দেখাবে, গানা করবে বুলছিল।'

'তা বেশ ত।'

'বেশ ত' কথাটা শুনবার..সাথে সাথে মোড়ল মাঝি খুব উত্তেজিত হয়ে সোজা হয়ে বসল—

'তু জানিস না দিদি' উ মেয়াটা খারাপ আছে, নষ্ট আছে। উ বে-জাতের কাছে জাত দিছে। আপনা ধরম বেচে দেছে বে-ধরমের কাছে। উ নাচুক বাবুর বাংলায় যঁ্যায়া, কেনে নাচবেক হামাদের সাথে!'

তখনি ওদের নাচও শুরু হল। মোড়ল মাঝি উঠে গেল মাদল বাজাতে। মাদল বাজল, বাঁশী বাজল আর তারি তালে তালে একটুখানি দুর্বোধ্য গানের সুর আর ড্রিলের মত নাচ।

কিন্তু আজ যে কি হয়েছে মোড়ল মাঝির। ড্যাডাং ড্যাডাং করে মাদলে একটা আওয়াজ হচ্ছে সত্যি কিন্তু 'বুলি বুলছে না।'

মোড়ল মাঝির মোটা সোটা বুড়ি মাঝিন হেসে অল্প বয়সী রতনা মাঝিকে বলল—'তুদের মোড়ল বুড়া হঁছে রে, তু যা মাদলটা বাজা।'

মোড়ল এ অভিযোগে ভীষণ রেগে গেল, কি বা এমন বয়স হয়েছে তার, যে এরি মধ্যে তাকে বুড়ো বলে গাল দেওয়া। হলদে পাগড়ীতে গোঁজা ময়ূরের পাখনাসমেত মস্ত মাথাটা নাচিয়ে মস্ত একটা লাফ দিয়ে মাদলে দিল প্রচণ্ড এক ঘা, আর সেই সঙ্গে নেচে উঠল সমস্ত দলটা।

কিন্তু আবার তাল কাটল মোড়ল মাঝির। এবারে মোড়ল মাঝি নিজে থেকে মাদল তুলে দিল রতনা মাঝির কাঁধে। তারপর এসে বসল আমার চারপায়ের এক পাশে। বড় বড় দুই হাতে নিজের বুকের ওপরে দুম দুম থাপড় মেরে মোড়ল মাঝি বলল—'তু বল দিদি, হামি বুড়া হঁছি?'

'একটুও না।'

পরবকার দিন আছে দিদি, মেয়্যাটা_ নাচলেক নাই গাইলেক নাই চলা গেলেক—

বটে! মোড়ল মাঝির পশুর মত প্রকাণ্ড আর কুৎসিত শরীরে মনও আছে তা হলে?

'তুই তো আসতে দিলিনে, নইলে—'

আবার মাঝি উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল—'কেনে দিবে? হামি মোড়ল মাঝি আছি, হামি বল্লে, কুসমী তু বাংগালী বাবুর মুখে থুক দিয়া আয়, আসলেক নাই। হামি বল্লে, তু শেঠ বাবুর মুখে থুক দিয়া আয়, আসলেক নাই। হামি বল্লে, তু সাহেব বাবুর মুখে থুক দিয়া আয়, আসলেক নাই। কেনে

দিবে মোড়ল মাঝি উয়ারে নাচ করতে!' মোড়ল মাঝি যতবার থুতু দেবার কথা বলছিল ততবারই খ্যাক্ করে এক খাবলা থুতু ফেলছিল। আমার গা ঘিন ঘিন করে উঠছিল। মোড়ল মাঝির তবু বিরাম নেই। একটানা বকেই চলেছে।

ওই যে দূরে দশ বিঘা জমি নিয়ে গড়া রানীপুর প্যালেস দেখতে পাচ্ছ, ও জমি কার ছিল জানো? ও ছিল কুন্দন মাঝির, আর ওই যে সারি সারি বাংলো ঘরগুলো, ওই সত্তর বিঘা জমি, ছিল রতনা মাঝির বাপের। বাংগালী বাবু ওদের নিয়ে গেল শহরে, সেখানে যেয়ে দু বোতল দারু পিয়ালো, কাগজে টিপ নিল ব্যস ও জমি হয়ে গেল বাবুর। আর মুংলা মাঝির কথা জানো, ওই যেগো যার ফাঁসী হল? ওই মুংলা মাঝির মেয়ে ছিল রুন্টি, রুন্টির ছেলেপুলে হবে, মুংলা মাঝি বাবুকে বলল—তু উকে শাদী কর। তার পরে একদিন রুন্টি, বাবুর বাড়ীর হাতায় কাঠ কুড়াচ্ছিল, বাবু বন্দুক ছুঁড়ে মারল, রুন্টি মরে গেল। বাবুর কিছু হল না, কিন্তু মুংলা মাঝি যেই তীরের আগায় এই এতটুকু বিষ মাখিয়ে বাবুকে মারল, আর বাবু মরে গেল। ব্যস্ মুংলার হল ফাঁসী। এমনি কত আছে, কত বলব? নীল ধোঁয়ার মত দূরে যে পাহাড়গুলো দেখতে পাচ্ছ তার ওধারও আমাদের রাজত্ব ছিল একদিন। শেরশাহ এসে বসাল, বলল—এ জমি তোদের ও সব পাহাড় তোদের। তোরা চাষ করবি, বরা মারবি আর বিষ মাখান তীরে ওই পাহাড় ডিঙিয়ে যত দুশমন আসবে সবাইকে খতম করবি। কিন্তু কি যে হল, জমিগুলা নিল কেউ, পাহাড়গুলো নিল কেউ। শেঠবাবু বলল 'হারামী', বাঙালী বাবু চাবুক দিয়ে মারল। আচ্ছা তুমি বলত সারা শরীর কাপড়ে মুড়ে মুখটুকু যারা শুধু বাইরে বার করে রাখে তারা হারামী, না সাঁওতাল হারামী? পুরানো কথায় ফিরে আসল আবার মোড়ল মাঝি—'কুসমীর কথা কই গো দিদি, উ কেনে বেধরমের কাছে ধরম ঝুটা করলেক।'

এরপরে কুসমীকে দেখলাম আমাদেরই বাড়ীতে। বাড়ীর কাজ কিছু অসম্পূর্ণ ছিল, সেজন্য জনকতক কুলি-কামিন লাগানো হয়েছিল। কুসমী এল এই দলে ভিড়ে।

সন্ধ্যেবেলা যখন ওদের মজুরী দেওয়া হচ্ছিল, তখন একটা প্রচণ্ড গোলমাল শুনে বেরিয়ে এলাম। কুসমীর গলা পাচ্ছি, শুধু শুধু চেচাছে,

'লিবেক নাই, লিবেক নাই,' বাকী মেয়ে পুরুষগুলো তার চাইতে বেশী চেঁচিয়ে কি সব বলছে। কুসমীকে ঘিরে একটা ছোটখাট ভিড়, মাঝখানে বিরক্ত বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে কুলিদের সর্দার চমন আর বাড়ীর দারোয়ান। কুসমীকে আজ অন্য রকম দেখলাম। খাটো ছাট শাড়ী, খোঁপা নেই, অবশ্য ওদের মত টেনে চুল আঁচড়ে পিন আটকানো। সমস্ত শরীরে গেরুয়া রঙের প্রলেপ।

কুসমী আমাকে দেখে এগিয়ে এল—

'কেনে লিবেক, তু বল কেনে দিদি! উরা গপ্প করছে, বিড়ি খেছে। কুশী গপ্প করে নাই, বিড়ি খেছে নাই, তবে কেনে কুশী ওদের মত লিবেক নাই?' বলে, আঙুল দিয়ে পুরুষ মজুরদের দেখিয়ে দিল।

বুঝলাম কুসমী পুরুষদের সমান মজুরী চায়, যেহেতু ও পুরুষদের সমান খেটেছে। চমন সর্দার ভারী গলায় কড়া এক ধমক দিয়ে বলল—'সব জায়গায় এই রুল, ঢুমকা, গিরিডি, রাণীগঞ্জ, সব জায়গায় এই কানুন। পুরুষে বেশী পায়, জেনানা কম পায়। খাটুনী কার বেশী কার কম সে কথাই ওঠে না।' পয়সাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কুসমী বলল—'সব হাবামী আছে, কুত্তা আছে। লিবেক নাই পয়সা, করবেক নাই কাম।' গজগজিয়ে বেরিয়ে গেল। মনে মনে বললাম, 'বাঁচা গেল।' কিন্তু তারপর দিন দেখলাম আবার ও এসেছে। আশ্চর্য হলাম। বুঝলাম মজুরী না হলে মেয়েটি নিরুপায়। আমি কামিনদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম—'কুসমী খেটে খায় কেন? ওর বাবুরা ওকে পয়সা কড়ি দেয় না?'

সে বলল—'অত কটা পয়সায় কুসমীর হয় না। বাড়ী তো দেখেন নি। এই খাট, এই পালঙ্ক, চেয়ার, কুর্সী, মেম সাহেবের বাড়ী লাজ পেয়ে যায়।'

মেয়েটির কথা শুনে আরো আশ্চর্য হলাম। ভেবেছিলাম ওর সম্বন্ধে আর একটু খবর টবর নেব, তা আর হয়ে উঠল না।

সেদিনই দুপুরে এমন একটা অঘটন ঘটল যার ফলে কুসমীকে চমন সর্দার দল থেকে ছাঁটাই করে দিল। দুপুরবেলা, বাড়ীর ঝি হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল—'শীগগীর বেরিয়ে আসুন। কুসমী আমাদের ঝুম্মন মালীকে খুন করেছে। ঘটনাস্থলে বেরিয়ে এসে দেখলাম খুন নয়, জখম। দুপুরে হাজরি খেয়ে কুসমী কুয়োতলায় গিয়েছিল জল খেতে। ঝুম্মন কুয়ো থেকে জল তুলে দিয়ে—বোধ হয় রসিকতা করে বলেছে, 'এই কুসমী শাদী করবি হামারে?'

ব্যস, কুসমী ভরা বালতী তুলে ছুড়ে মারে ঝুম্মনকে। ঝুম্মনের সারা অঙ্গ ভিজে চুপচুপে, বালতির ঘায়ে কয়েক জায়গায় জখমও হয়েছে বেশ।

ভীষণ রাগ হয়ে গেল। বললাম—'তোকে যে ও বিয়ে করতে চেয়েছে সেই তোর ভাগ্যি। ইয়ে কোথাকার।'

—'কুসমী সান্তাল কে শাদী করে না, সান্তাল আদমী আছে না শূয়ার আছে। সান্তাল ময়লা থাকে ময়লা খায়। যে ঘরে সান্তাল থাকে সে ঘরে থাকে বরা, থাকে কুত্তা, থাকে ভঁইস।'

আর সহ্য করতে পারল না একজন সাঁওতাল কামিন। বলে উঠল—হারে ঝুম্মন, বুলছিস কি ইটা? তু উরে শাদী করবি, ছোটা ফাগুসনের মেম আছে না উ?'

বলতে হল না শেষ পর্যন্ত, কুসমী ওর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে খামচে একাকার করে তুলল। কয়েকজন মিলে ওদের টেনে-টুনে আলাদা করে দিল।

সেদিন থেকে কুসমী আর আমাদের বাড়ীর কাজে আসেনি। তবে আমি ওকে আরো একবার দেখেছিলাম, ওরি বাড়ীতে।

পাড়া ছাড়িয়ে শুধু নয় গাঁ পর্যন্ত ছাড়িয়ে কুসমীর ঘর। বেড়াতে বেড়াতে একটু দূরে এসে পড়েছি, একটা ঘর দেখে থামলাম। ঘরটার চার পাশে বেড়া আর তাতে ফুলের লতা। দাঁড়িয়ে আছি, দেখি কুসমী বেরিয়ে এল। ভীষণ ভয় পেলাম। সেদিন ওর যে প্রলয় মূর্তি দেখেছিলাম তা ভুলিনি। আর সেদিন ওকে যারা গালি দিয়েছিল, তার মধ্যে আমিও ছিলাম।

কুসমী কিন্তু এক গাল হেসে আমার দিকে এগিয়ে এল—'তু কুঠি বাড়ীর দিদি আছিস না?'

'হ্যাঁ। তোর বাড়ী নাকি? বেশ বাড়ী তো!

কুসমী কৃতার্থ হয়ে গেল। আগড় খুলে সে আমাকে ডাকল—'আয় না দিদি। কুশী সান্তালদের মত থাকে না, দেখ না এসে।'

বাইরেটা দেখেছিলাম, এবারে ভিতরে ঢুকলাম। চেয়ারে, টেবিলে, খাটে পালঙ্কে ঘর ঠেসে গেছে সত্যি, কিন্তু সাজানোর মধ্যে খুব আনাড়ীপনাও নেই বরং দক্ষতারই পরিচয় আছে। আন্তরিকভাবে প্রশংসা করে বললাম—'তোকে দেখলে সাঁওতাল বলে মনে হয় না রে কুসমী।'

কুসমীঅত্যন্ত সরলভাবেই জবাব দিল,—আমি তো সাঁওতাল আছি না দিদি।

হাঁ করে রইলাম। কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে আমার প্রচণ্ড হাসির বেগ থেমে গেল। বিশ্বাসের আভায় সে মুখ ভাস্বর। কুসমী বলল—'সান্তালিন কখনো বব কাটে? জুতি পিন্ধে? তাদের ঘরে কি খাট থাকে, কুর্সী থাকে? বাবু লোকের সাথে ওঠা বসা করে?'

সহ্য হল না আর, বললাম—'বাবু লোকের কথা আর বলিস নে কুসমী, বাবুলোকে তোর ঘরে আসে সে তুই খারাপ বলে।' বলে ভুল করলাম। কুসমীর মুখ সেদিনকার মত কঠিন হয়ে উঠল। মহা মুশকিলের মেয়ে তো। নিজেকে না সাঁওতাল বলে মানবে, না খারাপ বলে। অথচ ও দুটো সংজ্ঞাই ওর সম্বন্ধে সত্যি। কথাটা চাপা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললাম—'বাবু লোককে দিয়ে তোর দরকারই বা কি? তুই তো নিজেই রোজগার করিস। তাই দিয়েই যতটা হয় করলে পারিস। এই দেখনা লোকে তোকে মিছামিছি খারাপ ভাবে।'

কুসমী নরম হল। মুখটা একটু মলিনও হয়ে উঠল। বলল—পসা' কুথাকে পাব দিদি। দশ আনা, কাম বুঝে বারো আনা মজুরী পাই, তাতো শুধু খেতেই চলে যায়। সান্তালিন, হলে তো অতো পসার দরকারই হতো না। মরা খেত, সরা খেত। সান্তালিন তো আছি না দিদি, তাই তো খারাব হছি। মোড়ল মাঝি কিছু বুঝে না, বলে কুশী খারাব হছে উরে লিব না গাঁয়ে ঘরে।'

সহানুভূতি জাগল মেয়েটির ওপরে! সভ্যতা ওকে ভালবাসেনি, কিন্তু সভ্যতাকে ও বড় গভীরভাবে ভালোবেসেছে। ওকে বললাম—'দেখ কুসমী, তুই তোর জাতে ফিরে যা। বাবু লোকত তোকে কখন আপন ভাববে না বরং তোকে ঘেন্নাই করবে। নিজের জাতে বিয়ে শাদী করে ভালো হয়ে থাক। এমনিভাবে মান ইজ্জত বেচে চেয়ার টেবিলে ঘর সাজাবার কোন মানে হয় না।' তারপরে আমি আমার সাধ্য মত সরলভাবে বুঝিয়ে বললাম সভ্য সমাজে কেন ও চিরদিন অপাংক্তেয় হয়ে রইবে। কুসমী কিন্তু কিছুই বুঝল না। ও বলল—'সান্তালকে আমার ঘিন লাগে দিদি।'

'কেন ঘিন লাগবে? তুই সান্তাল, তোর চৌদ্দ পুরুষ সান্তাল। সান্তালকে ঘিন লাগবে কেন রে?' একটু রেগেই বললাম।

'আমি সান্তাল আছি না দিদি। ফার্গুসন বলেছে ও আমাকে শাদী করবে, হামারে উর মেম বানাবে। বিলাত নিয়া যাবে উ হামারে।'

কিছুদিন আগে আমাদের বাড়ীর ঝগড়ায় এমনি একটা কথা শুনছিলাম বটে, কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'কে ফার্গুসন, থাকে কোথায় ?'

আশ্চর্য হল কুসমী। বলল—'তু ফার্গুসনকে চিনিস না দিদি ? উ তো কাম করত কোলিয়ারীতে। এখন কুথাকে আছে জানি না।'

'তবে যে বললি তোকে বিয়ে করবে বলেছে।'

'হাঁ উ ফিরে আসবেক। হামাকে শাদী করবেক বলল্যা গেছেক।'

'তাই বুঝি খাট পালঙ্ক সাজিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিস ?' হাসি পেল আমার।

শান্ত-নির্বিকার কণ্ঠে কুসমী উত্তর দিল—'ফাগুসন বলেছে তু মেম আছিস কুসমী। মেমরা কি সান্তালদের মত ময়লা থাকে, ময়লা খায় ? তু মেম দেখিস নাই দিদি ?'

কুসমীর দেহের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম। মুখটুকু বাদ দিলে ওর শরীরটা সত্যি সুন্দর। এই সুন্দর দেহের চড়াই উৎরাইতে একদিন সাগর পারের একটি যুবক হোঁচট খেয়ে পড়েছিল আর অসংখ্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে আদায় করেছিল কুসমীর ভালবাসা। কুসমীর উৎকট সভ্যতা প্রীতির মানে এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলাম কিন্তু ওর এই সাধনা যে কতখানি হাস্যকর আর নিরর্থক সে সম্বন্ধে আমি ওকে কিছুই বলতে পারলাম না।

আমি যখন উঠলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে মিঠে মিঠে চাঁদনী সারা মাঠে সাদা চাদরের মত ছড়িয়ে পড়ে আছে।

কুসমী বলল—'চল দিদি, তুরে ঘর দিয়া আসি।'

কতক্ষণ আমার সাথে পথ চলে এক সময়ে কুসমী আমাকে জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা দিদি, তু তো লিখি পড়ি মানুষ আছিস, তু বল না কেনে খারাপ আছি হামি ?'

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে এখন অসম্ভব। কারণ এই সম্বন্ধে আমি এখন চিন্তা করছি।

কিছুক্ষণ পরে কুসমী ওর নিজের কথার উত্তর দিল। বলল—'হছি হছি, খারাপ হছি। জানবার ত' হছি না দিদি।'

ডায়মণ্ড-কাটা কাঁকন

রাবেয়া খাতুন

সুন্দর স্বপ্নটা ছিলো। ঝকমকে একজোড়া ডায়মণ্ড-কাটা কাঁকনের স্বপ্ন।

সকাল হতে দেবি ছিলো, দেহে আলস্যও ছিলো যথেষ্ট তবু তাকে উঠতে হলো। রোজই হয়। শেষরাত্রির মিষ্টি তন্দ্রাবেশটুকুর সঙ্গে রোজই চলে জোর জুলুম। ছেলেবেলার বদ অভ্যাসটা আজও বশ মানেনি স্বভাবের কাছে।

হাই তুলে, আড় ভেঙে অসংযত শাড়ীর অংশগুলো সংবরণ করে উঠে দাঁড়াবার মুখে আঁচলে টান পড়ে—আঃ, কি ছেলে মানুষী হচ্ছে···মাহফুজারের উদ্দেশ্যে কথা কটা বলেই দাঁড়িয়ে ঈষৎ লজ্জিত হলো আম্বিয়া। আবুল ততক্ষণে আঁচল ছেড়ে নাকি সুর নিয়েছে—এক্ষুনি উঠলে? গতরাতে যে তোমার জ্বর উঠেছিল······

—ডেপোমী হচ্ছে, না?······চোখ রাঙানীতে ছেলেটাকে হতভম্ব করে আম্বিয়া চলে যেতে চায়। ট্যা ট্যা করে কেঁদে ওঠে ছোট্ট মলিটা। খুঁটিবাঁধা জীবের মতো দড়ির টান খেয়ে বসতে হলো। বুকের ওপর কোমল হাতের স্পর্শ এনে চেষ্টা করতে হলো মেয়েকে ঘুম পাড়াবার—ও.... ও···ও···

ট্যা ট্যার শেষ নেই, বিরাম নেই, মাঝখান থেকে নড়ে চড়ে উঠলো ডলি, পলিরা, জেগে গেল মাহফুজার।

—অমন ও-ও করলে কি আর বাচ্চা ঘুমোবে?

—না, বাচ্চার জন্যে এখন গান গাইতে হবে। আম্বিয়া রাগ করে।

—দুধ দাওনা·········বিরক্তিভরা কণ্ঠস্বর মাহফুজারের।

আম্বিয়া নিজেও মহাবিরক্ত। পাঁচ মাসের ঐ হাড্ডিসার অবাঞ্ছিত শিশুটার ওপর, নিজের ওপুর। ওটা ত খাবার জন্য হাঁ মেলে আছেই, কিন্তু দুধ কোথায় ? সারারাত ধরে যেটুকু চেটেছে মাথা ঝিমঝিম করছে তাতে। তা ছাড়া এখন কত কাজ।

তবু মেয়েটার পাশে শুতে হলো; টেনে নিতে হলো বুকের কাছে। মাহফুজার মুখ ফিরিয়ে কাঁথাটা ভালো করে টেনে নিলো। গতরাতের দুপ্রহর সময় তার নাইট ডিউটিতে কেটেছে। ক্লান্তি এখনও জমে আছে দেহের ভাঁজে ভাঁজে।

অশান্ত দুর্বল মেয়েটাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে আম্বিয়ার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে, দৃষ্টি হয় অস্বচ্ছ। কঠিন একটা কর্তব্য ভার শুধু বুকের ভেতর সজাগ হয়ে থাকে দুঃস্বপ্নের মতো। কত কাজ তার! সকালের সবগুলি কাজ তাকে একা হাতে সারতে হবে, একার হাতে সামলাতে হবে বাকি দিনটার বিপর্যস্ত সংসার। পেরে উঠতে কষ্ট হয়, দাম দিতে হয় বিরতির সামান্য অবসরটুকুকে যন্ত্রণাদায়ক শব্দে ভ'রে ভ'রে; তবু আধ খোরাকী একটা ঠিকে ঝির নামে সে শিউরে ওঠে, আপত্তি তোলে প্রাণপণ।

মেয়েটার তীব্র চীৎকারে চমকে উঠতে হয়। আরও চমকাতে হয় মাহফুজারের কণ্ঠস্বরে—বাচ্চাকে দুধ দিয়ে শান্ত করবে, না নিজেই পড়ে পড়ে ঘুমুবে ?

—গরু ছাগলেরও দুধ দেবার একটা সময় অসময় আছে। আমার যেন তাও নেই······নিজের মনে বিড়বিড় করে আম্বিয়া। ময়লা কাঁথাটা কাঁধে ফেলে মাহফুজার ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে ঘর ছেড়ে।

বিছানা ছেড়ে উঠতে দেরি হলো। ঘুমন্ত বাচ্চাটার শীর্ণ মুখের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আম্বিয়া রান্নাঘরের দিকে চলে। পানিওয়ালীর সঙ্গে আজ অকারণে খিটিমিটি বাঁধলো। ও আসতেই অভদ্রভাবে খেঁকিয়ে উঠলো আম্বিয়া—বলি রাজ্যের চোখে আজ মরণ নেমেছিল নাকি গো!

—কি বলছ মা ?

—বলছি এত বেলা করে পানি দিলে ত আমার চলবে না বাপু! পয়সার বেলা কি আধলাও কমতি নিয়েছ কখনও ?

—তা আমি কি করবো মা! দু-দুবার তোমার দোর থেকে ফিরে গেছি। তোমরাই ত উঠলে দেরি করে······

যেতে যেতে বলে যায়—এর চেয়ে আলাদা লোক দেখ মা! দু-এক দণ্ডের গাফলতির মাপ না পেলে ত কাজ করা চলে না।' ষ্টেশন কেন্দ্র করা মফস্বল শহর। গোটা রেলওয়ে কলোনীটার খাবার পানির দায় কুলোচ্ছে ঐ একটা মেয়ে মানুষ! কলটা একটু কাছে হলে কিংবা বৌ-ঝিদের কলে যাবার ব্যবস্থা থাকলে কি সে অন্যের মুখ চেয়ে থাকে?

চুলোর মুখে জোর আগুন ঠেলতে ঠেলতে আম্বিয়া ক'দিনের বাজার হিসাব মিল দেয়। তারপর অতি সাবধানে খাতার পেছনের একটা পাতা মেলে ধরে। এতে বিয়োর্গের অঙ্ক নেই শুধু যোগ আর যোগ। সামান্য সংখ্যা হলেও। সারা সকালের বিরক্তিটা কমে এসেছে অনেক। কপালের ঘাম মুছে যোগফল দেখে নিজের কাছে নিজেই কেমন চমকে ওঠে আম্বিয়া। তিন শো টাকা! নাই বা জমবে কেন? এত দু-একদিনের চেষ্টায় করা সঞ্চয় নয়। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে কত বুদ্ধি, কত বল, কত ধৈর্য এর পেছনে সে ঢেলেছে। তার তুলনায়·······

ভাবনাটা ওখানেই চেপে রেখে আম্বিয়া উজ্জ্বল স্বরে বড় মেয়ের নাম ধরে ডাকে—ওরে ডলি, আমার বালিশের তলা থেকে টিনের ডিবেটা নিয়ে আয় ত মা!

মায়ের তিরিক্ষে মেজাজে ভীত ছেলেমেয়েগুলো দূর থেকে চা মুড়ি খেয়ে দূরে সরে ছিলো ভয়ে ভয়ে। ভালো মুখের ডাক শুনে শুধু ডলি নয় এক সঙ্গে ছুটে এলো সব ক'টি ছেলেমেয়ে।

একটা জিনিসের জন্যে একসঙ্গে সবগুলো ছেলেমেয়ে ছুটছে। আম্বিয়া আনমনা হয়ে ভুলে গেছে তার ইদানীং এর স্বভাবকে। তাই ধমক দেবার কথা স্মরণ না হ'য়ে স্মৃতির কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একজোড়া ধাতব বস্তুর ঝকমকি। স্বপ্নে দেখা ক্ষণিকের স্পর্শমধুর কাঁকন সেটা নয়। জীবনে একবার সে যে তাকে স্পর্শ করতে পেরেছিলো। সেই যে সিরাজগঞ্জ থেকে স্বামীর বদলির সময়টাতে দু'ঘণ্টার ষ্টীমার জার্নি। পাশে বসা ভদ্রমহিলার হাতে ছিল একজোড়া সোনার কাঁকন। রেলিং-এর ফাঁকের টুক্‌রো টুক্‌রো সূর্যের আলোগুলি অদ্ভুত দ্যুতি দিচ্ছিল তাতে। মনে হচ্ছিল একসঙ্গে অনেকগুলি হীরে মুক্তা জ্বলছে। সারাক্ষণ সে কাঁকন দুটোর দিকেই তাকিয়ে ছিল আর মনে মনে তাজ্জব হচ্ছিল বিধাতার যোগ্য পাত্রে দান করার ধীমত্তা দেখে। তার অমন শুভ্র সুডোল সুন্দর হাতদুটি নগণ্য কাঁচের চুড়িতে বারবার শাড়ীর

অন্তরাল খুঁজছে আর ভদ্রমহিলার ঐ কোলা ব্যাঙের মতো ছোপান বিশ্রী হাত দুটি অমূল্য বস্তুর স্পর্শ পেয়ে স্পর্দ্ধিত গতিবেগে দুলছে এপাশ ওপাশে মাহফুজারের কাছে বুঝি এক সময় বলেও ফেলেছিল কথাটা। মাহফুজারের তখন নতুন চাকরি। হাসিমুখে বলেছিলো, কাঁকনের নামটা জিজ্ঞেস করে নাও।

—কি হবে ?

—মাইনেটা একটু বাড়লেই অমনি একজোড়া তোমায়ও গড়িয়ে দেবো।

—সত্যি……শব্দটা স্পষ্ট উচ্চারণ পায়নি ; ধ্বনিটা ডুবে গেয়েছিলো আনন্দাবেগে।

—ডায়মণ্ড-কাটা কাঁকন…ভদ্রমহিলা গুরু গাম্ভীর্যে জবাব দিয়েছিলেন।

—সোনা কতটুকু আছে ওতে ?

—পাঁচ ভরি…

—পাঁচ...নিস্তেজ হয়ে এসেছিল আম্বিয়ার উৎসাহ। মাহফুজার মলিন হেসে বলেছিল, মেয়েলী আবরণে আশ্চর্য হবার·কিছু নেই। ওরা বিশ হাত শাড়ীকে যেমন সহজে সামলাতে পারে ; হাতে কানে তেমনি সাজিয়ে রাখতে পারে কাঁদি কাঁদি টাকার অঙ্ক।

—তোমার বিশ্বাস ছিল কতটুকু ?

—দু কি আড়াই ভরি।

এরপর কথা বাড়েনি আর। ব্যাপারটা হয়ত ভুলেই যেতো আম্বিয়া কিন্তু দুদিনের ট্রেন ডিউটি করতে গিয়ে মাহফুজার যে উপহার এবং সুসংবাদ বয়ে আনলো তাতে করে পুরোনো আকাঙ্ক্ষাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো আম্বিয়ার মনে।

আবুল ডলি তখন এতটুকু। দুধভাত খেয়ে সন্ধ্যে বেলাতেই ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। মাহ্ফুজারের ডিউটি থাকে বারোটা সাড়ে বারোটা অবধি। আম্বিয়া প্রায়ই ঘুমোতে পারে না এ সময়ে। টিম্‌টিমে বাতির কাছে বসে স্বজন প্রিয়-জনের কাছে চিঠি লেখে, পড়ে বা আকাশে তারাগুলির দিকে চেয়ে খুঁজে ফেরে তার বিবাহিত জীবনের মধুময়, স্বপ্নময় অধ্যায়গুলি।

প্রায় রাতের মতো সেদিনও স্বামীর বেশবাস আলনায় তুলছিল সে। হাতমুখ ধুতে না গিয়ে মাহফুজার যে তাকে আলিঙ্গন করতে ব্যগ্র হবে বুঝতে পারেনি। একটা রঙিন বাক্স তার হাতে দিয়ে মাহফুজার বলেছিলো, দেখ ত কি !

—কি-ই…বোকা বোকা চাউনি দিয়ে আম্বিয়া লক্ষ্য করলো স্বামীর অত্যুজ্জ্বল চোখ, সুকোমল রহস্যময় হাসি।

ব্লু মখমলের ওপর ততক্ষণে ঘরের মিটমিটে আলোতে ঝিলমিল করে উঠেছে এক জোড়া কাঁকন। ডায়মণ্ড-কাটা কাঁকন। ষ্টীমারে দেখা সেই কাঁকন।

—কোথায় পেলে ?

—বারে, পকেটের টাকায় ?

—তা ত বুঝলাম সাহেব। পদ্মফুল পানিতেই ফোটে কিন্তু তাই বলে সব পানিতে কি তার জন্ম সম্ভব।

—মানে ?

—আমাদেব মতো মানুষদের পকেটে যে পয়সা থাকে তা দিয়ে কি আর মনে করলেই কাঁকন কেনা চলে ?

—চলে অন্ততঃ এমনি রাংতায় মোড়া নিখুঁত জি···

—এটা তবে···

—ভারী চমৎকাব তাই না···আম্বিয়ার হাতে কাঁকন দুটো তুলে দিতে দিতে মাহফুজার আবার বলে, এটা স্যাম্পল বুঝলে ? টাকা ত আর একদিন আমাদের হাতে লাফিয়ে আসবে না। হয়ত ঐ জমানোর চেষ্টাটুকুব মধ্যে পৃথিবী আর তাব আধুনিক হালচালে কত পবিবর্তন এসে যাবে।

—কিন্তু ওতে যে সোনা অনেক।

—ঐ দেখ বলাই হযনি। শহর থেকে যে খোঁজ নিয়ে এলাম ও কাঁকনে আড়াই থেকে তিন ভবির বেশী সোনা লাগে না। তোমাব ঐ ভদ্রমহিলা দামী জিনিসের দাম বাড়াতে গিয়ে কিছু বাজে কথাব আমদানী কবেছিলো।

—দেখেছ এ দুটো কি সুন্দব মানিয়েছে আমার হাতে···নিজেব হাতদুটো থেকে যেন চোখ ফেবাতে পারছে না আম্বিয়া।

মাহফুজার মুগ্ধস্বরে বললেন, রোজ পরে থাকবে।

—ইস্ বাদলা টাদলাগুলো বুঝি টিকবে··

—নাই টিকুক আবার এনে দেবো···জেদ করে মাহফুজাব।

কিন্তু আর এক জোড়া কিনে দেবার মতো বাড়তি পয়সা জোটেনি। ইতিমধ্যে ছেলেপুলের সংখ্যা বেড়েছে, খরচ বেড়েছে, জিনিস পত্রের দাম চড়েছে কিন্তু মাইনে বাড়েনি। সরকারী রিপোর্টে মাইনে বাড়ানোর যে আশ্বাস ছিলো বিল সিদ্ধান্তে দেখা গেছে হাববৃদ্ধির ভাগে আবার রুইকাতলার দলই পড়েছে চুনো পুটিরা সেই পড়ে আছে আধ হাত পানির ঘোলাটে পাঁকেই। এই নিয়ে বিক্ষোভ, ছাইক আর ছাটাই'এর সকরুণ অধ্যায় পুরোনো

হয়ে গেছে কর্মীদের গতানুগতিক জীবনের কাছে। এ বৈচিত্রহীন একঘেয়ে চলতি পথে মাহফুজারের মন থেকে কবে ম'রে এসেছে পুরান দিনের প্রতিজ্ঞা। কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষার মধ্যে আধমরা হয়ে আম্বিয়ার মনে আজও বেঁচে আছে একজোড়া কাঁকনের স্বপ্ন। স্যাম্পলটা আজও তাই সযত্নে বালিশের তলাতে স্থান পেয়ে আছে। নিম্ন মধ্যবিত্তের অকুলান সংসারে প্রতিদিন চলছে সামান্য সঞ্চয়ের আপ্রাণ প্রচেষ্টা।

ছেলেমেয়েদের ছুটোছুটির সঙ্গে ঘরের মেঝেতে কিছু পড়ার শব্দ হলো। আম্বিয়ার সজাগ শ্রুতি বধির হয়ে তা শুনতে পায়নি। তাই লক্ষ্য করেনি বাক্স আনতে একসঙ্গে সবাই ছুটলেও সেটা হাতে করে ডলি একাই ফিরেছে ভয়ে বিহ্বল হ'য়ে।

বাক্সের ডালা খুলে আম্বিযা চীৎকাব করে ওঠে, কে কে করলে। এমন কাজ ?

—আবুল।

—না আম্মা আমি নই, মলি···

—না ডলি আম্মা....আশেপাশে কোথাও থেকে জবাব শোনা যায় কিন্তু দেখা যায় না। রক্তচোখে আম্বিযা তাকালে মেয়ের দিকে—বল হারামজাদী।

মারেব আগেই ব্যথাব স্মরণে মেয়েটাব চোখে পানি এনে দিয়েছিলো। ইতিমধ্যে খাতাব যোগফলটাব দিকে নজব পড়ে অদ্ভুতভাবে বদলে এসেছিলো আম্বিয়া। ভীত মেয়েটাকে সস্নেহে কাছে টেনে বলে, ওত পীচ দিয়ে তৈবী বাদলাব কাঁকন বে। ভাঙতোই একদিন তাই বলে মিথ্যে কথা বলতে আছে ?

ডলি যেন বোকা বনে গেছে মায়ের এই অভাবিত আচরণে। খিটখিটে মা-টি আজ তাব কত স্নেহময়। ইস, এমনি যদি থাকতো সব সময়।

ফুটন্ত হাঁড়ির কাছে মেয়েকে বসিয়ে বেখে মাহফুজারের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ায়। আনন্দ তাকে দিশেহাবা করেছে। অবস্থা ভাববার অবকাশ কোথায় ? শোবাব ঘর পাব হবার সময় মলি ছুটে এলো—আম্মি, দেখ ভাইয়া কি বলছে।

—কিরে ?

—বলছে···

—হাঁ আম্মা, আমি বলেছি···মায়ের মেজাজের কাছে সাহসী হয়ে উঠেছে আবুল—আমি বলেছি ডেমন নামে যদি শয়তান হয় তবে ও ডামন কাঁকন দু:টা আস্ত শয়তান। কি বিপদে ফেলে দিয়েছিলো আমাদের! দেখছ ওর রাংতা।' ডায়মণ্ডের ঝিলিক স'রে গিয়ে-কালো পীচগুলো কেমন বিশ্রীভাবে হাঁ করে আ···

ঠাস ঠাস দুটো চড় পড়ে আবুলের কথা বন্ধ হলো। সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে বড় বড় পা ফেলে আম্বিয়া বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

বারান্দার কেরোসিন কাঠের বাক্সটার ওপর ময়লা কাঁথায় মুড়ি দিয়ে জড় সড় হয়ে আছে মাহফুজার। ঘাড়ের কাছের কয়েক গোছা চুল ছাড়া শরীরের কোন অংশই দেখা যাচ্ছে না। সে জীবিত সেটা শুধু বোঝা যাচ্ছে ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে কেশে ওঠার শব্দে। কাছে দাঁড়িয়ে চেয়ে হঠাৎ মনটা কেমন মুচড়ে ওঠে। ইস কত রোগা হয়ে গেছে মানুষটা। পুরু কাঁথার ওপর থেকেও যেন তার মমতাতুর হাত স্পর্শ পেতে পারে ওর হাড়জাগা পাঁজরের, চোয়াল জাগা গালের। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে বাচ্চা মেয়েটার শীর্ণ মুখ, আবুলের অশ্রু, বাকি ছেলেমেয়েদের মলিন পোষাক, নির্জীব চলাফেরা। রাগ হয় না, অভিমান আসে না, সহানুভূতি আর মমতায় ভ'রে আসে মন।

হুস্ হুস্ করে ষ্টেশনে প্লাটফর্ম থেকে এ সময় বেরিয়ে গেল একটা গাড়ী। দু'নম্বর ট্রেনটা যাত্রী বোঝাই হ'য়ে এখনও দাঁড়ান। কামরা ভর্তি তার দেশ বিদেশের যাত্রীতে। চোখে তাদের রকমারী দৃষ্টি। ঐ লেডিস ক্লাসের বৌটি। ঘোমটার আড়ালে থেকেও বারবার উৎসুক চোখে পথের দিকে তাকাচ্ছে। হয়ত বাপের বাড়ী যাচ্ছে তাই হবে। নয়ত চোখে অত আনন্দ কিসের। না জানি কতদিন পর।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ওঠে বুক ভেঙে। কতদিন সে যায়নি বাপের বাড়ী। যেন একটা যুগ। ছোট বোনটার বাচ্চা হয়েছে, কেমন দেখতে হলো? বাবার শরীর ভেঙে গেছে, বড় ভাইটি রোগশয্যায়। কেমন আছে সবাই?

কি করে জানবে আম্বিয়া। ভাড়ার টাকাটা সে যে যোগ দিয়ে গেছে তার জমানো অঙ্কের নেশায়। কত যাত্রী এক বছরে তার চোখের ওপর দিয়ে কত

জায়গায় গিয়েছে কিন্তু এমন করে সেত তাকায়নি তাদের দিকে। আজ কি হলো তার ?

মাহফুজারকে ডাকা হলো না আর। চোরের মতো সে ফিরে এলো। শোবার ঘরে। এসেই ইচ্ছে হলো ছুটে বারান্দায় যেতে। চীৎকার করে তিনশো টাকা জমানোর কাহিনী জানাতে। যাতে করে সে আর কাঁকন গড়াবে না, দেবে ছেলে মেয়েদের নতুন কাপড়, স্বামীর কাশির জন্য ভালো ওষুধ।

মনে এলো আলাদা ভাবনা। এ অবস্থায় তারাই ত একা নেই। সহ-কর্মীদের সবাই এমনি করেই বাঁচছে। সুন্দর না হোক স্বাভাবিকতায় স্বীকৃতি পেয়েছে এ জীবন। এই যদি সাধারণ জীবনের স্বাভাবিক রূপ, তাহলে আগামী দিনে জীবনের বিভিন্ন দিক থেকে যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'তে পারে তার জন্য প্রস্তুতি কোথায় ? সেকি শুধু নিজের জন্যে কাঁকন গড়াতে যাচ্ছে ? ওটা তার অঙ্গ সৌন্দর্যের বাহ্যিক কারণ্ হলেও আভ্যন্তরিণ কত ভার বহন-কারী বস্তু ! তা'ছাড়া মেয়েটা বড় হচ্ছে। যে দিন কাল। সোনাদানা ছাড়া কে নেবে গরীবের মেয়ে ?

বিপরীত মনের যুক্তির কাছে সবলা আম্বিয়া বিজয়ীর মতো ফিরে এলো তার গোপন প্রশ্রয়ী দুরাকাঙ্ক্ষার কাছে। মাহফুজারকে হঠাৎ পুলকে উদ্ভাসিত করে দেবার চটুলা বাসনায় আবুলের মারফৎ স্যাকরার সঙ্গে সব বন্দোবস্ত করলো।

আজ পূর্ণিমা। অভাবিত পয়সা পেয়ে ছেলেমেয়েরা ছবি দেখতে গেছে। পুরো একপো গরুর দুধে পেট ভর্তি করে শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে বাচ্চা মেয়েটা। সারাদিন আজ ঘরদোর পরিষ্কার করেছে আম্বিয়া। একটুও ক্লান্তি আসেনি তার। এই মাঘী শীতের সন্ধ্যাতেও গরম পানিতে গা ধুয়েছে সে। ট্রাঙ্ক খুলে বের করেছে একটা ধোলাই শাড়ী।

প্রাঙ্গণে স্বামীর পদশব্দ শুনেই বহুদিন পর সারা দেহ তার ভরে এলো তড়িৎ-শিহরণে। ঝট করে কাঁকন দুটো পরে নিয়ে দুয়োর খুলে দিলো।

ঘরে ঢুকে নিয়মিতভাবে পোষাক ছাড়লো মাহফুজার। তারপর গম্ভীর মুখে এগিয়ে গেল আলনার দিকে। হাত মুখ ধোবার বদনা শূন্য দেখে ছোট কথায় প্রশ্ন করলো—পানি কোথায় ?

প্রত্যুত্তরে আম্বিয়াকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকতে দেখে বুঝি বিরক্তই হলো মাহফুজার—কি ব্যাপার !

—একটু দেখ···উপযাচিকাব মতো আম্বিয়া এগিয়ে আসে। হাতের আবরণ স'বে এসেছে আপনি। সেদিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয় মাহফুজার। গম্ভীর শোকার্ত স্বরে বলে, কি দেখব আমু, দেখবাব কি আর অবশিষ্ট আছে···

আম্বিয়া অবাক হলো। চমকে তাকালো নিজের হাত ছুটোর দিকে। শীর্ণ পাণ্ডুব ছু খানি লিকলিকে হাতেব গোছায় সাপেব চোখেব মতো তীব্র হয়ে জ্বলছে একজোড়া ডায়মণ্ড-কাটা সোনার কাঁকন !

'পূর্ববাংলার সমকালীন সেরাগল্প' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের ইচ্ছা আমাদের রয়েছে। এ সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকারা মতামত জানিয়ে বাধিত করবেন।

পূর্ববাংলার লেখক, লেখিকা, যাদের লেখা স্থান ও সময়ের অভাবে এই খণ্ডে ছাপা সম্ভব হ'লো না, তাঁদের অনুরোধ করা যাচ্ছে আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য।

—সম্পাদক

—পাকিস্তান প্রাপ্তিস্থান—

দি পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটী লিমিটেড্

চট্টগ্রাম ঢাকা সিলেট করাচী

ও

বইঘর

ফিরিঙ্গী বাজার রোড

চট্টগ্রাম